সিনম্যানিয়া

লেখক- মৃত্যু কৃতান্তিক

রহস্য গল্প



গ্রন্থসূচি

জটিল রাজনীতি

বিজয় সিংহ, আমার বাবা, সামাজিক ভাবে তিনি একজন পেশাদার রিপোর্টার। আর আমি মিলি সিংহ, আজ একজন পেশাদার রিপোর্টার হলেও, এই পেশা সম্বন্ধে আমি জানি বা শিখি, আমার বাবার থেকেই। না, কোনো সংবাদমাধ্যমের হয়ে কাজ করতেন না তিনি। তিনি ফ্রিল্যান্সিং করতেন, রিপোর্টার হিসেবে। এখন তাঁরই সেই ফ্রিল্যান্সিং রিপোর্টার পেশাটি, তাঁর অবর্তমানে আমার পেশা হয়ে গেছে, এবং আমি এখন আর ফ্রিল্যান্সিং করিনা। বরং একটা কোম্পানি খুলেছি, "রিপোর্ট নাউ" নামে। আমার কোম্পানি যেই খবর সাপ্লাই করে, তা পেপারে দেখতে পাবেন; খবরের শেষে লেখা থাকে - "আর এন"।

তবে রিপোর্টারের কর্মকাণ্ড আমি শিখি বাবার থেকেই। আজ আমি অনেক রিপোর্টই প্রদান করি, আর বেশ নামডাকও হয়েছে আমার। কিন্তু বাবার কথা না বললে, আমার সমস্ত কিছুই অহেতুক হয়ে যায়। সত্যি বলতে, বাবা যেই কেশগুলি সলভ করতেন, বা করেছেন, বা যেই পরিমাণ রোমাঞ্চ আমি বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে লাভ করেছি, আমি নিজে রিপোর্টার হয়েও সেই রোমাঞ্চ কোনদিন পাইনি।

কি করে তিনি রিপোর্টার হলেন, তা বলতে পারবোনা, কারণ আমার জন্মের আগে থেকেই তিনি রিপোর্টার। তবে, আমার যখন বয়স ১৮, তখন থেকে আমি তাঁর সঙ্গী হই - এসিস্ট্যান্ট বলতে পারেন, কারণ বাবা সেইভাবেই আমার পরিচয় দিতেন সর্বত্র।

বাবা সবরকমের কেশই হ্যান্ডেল করতেন বলে শুনেছি, তবে আমি যবে থেকে সরাসরি বাবার সাথে যুক্ত, তবে থেকে দেখে এসেছি, বাবাকে সংবাদ মাধ্যমরা বাড়ি বয়ে এসে যেই কেশগুলো দিতেন, তা অত্যন্ত গোপন কেস হতো। কখনো সেগুলো রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পিছনের ঘটনা উদ্ধার করা হতো, তো কখনো প্রকৃতির বা মানবজাতির ব্যাপারে কিছু গবেষণা জাতীয় গোপন তত্ত্ব উদঘাটন হতো।

কেসের ক্ষেত্রে বাবার কাছে কোনো না কোনো সংবাদ মাধ্যমের উচ্চপদস্থ ম্যানেজার আসতেন। কেসের বিবৃতি দিতেন, আর অগ্রিম টাকা পয়সা দিতেন। পুরো কেস রিসলভ হলে, বাবাকে দেখতাম রাতজেগে রিপোর্ট সাবমিট করতে, আর সেই রিপোর্ট সাবমিট হলে, বাকি টাকা দিতো। দেশবিদেশের যাতায়াতের, থাকাখাওয়ার খরচের বিল আলাদা করে করতে হতো বাবাকে। আর তাছাড়া পারিশ্রমিক বাবা ধার্য করলেও, সেই নিয়ে একটা স্বল্পসময়ের দরকষাকষি চলতো। এমন নয় যে বাবা, প্রচুর রোজগার করতেন, তবে যা করতেন, তাতে বাবা-মা-আমি এই ছোট্ট পরিবার বেশ আনন্দ করেই কাটাতাম।

মোটামুটি সমস্ত বড় পত্রিকার প্রযোজকদের সাথেই বাবার বেশ গভীর আলাপ। মি: ঘটক, সুখহাট সংবাদপত্রের প্রযোজক সেদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।

মা উনাকে দেখেই বাবার আর উনার চা চাপিয়ে দিলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলে রেখে, মিস্টার ঘটক বললেন - বিজয়, আর কতদিন তুমি একাএকা ট্রাভেল করবে বলতো? প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ, আর তাছাড়া আমরা সকল প্রযোজক তো তোমাকে দুজনের থাকাখাওয়া আর ট্রাভেল অ্যালোয়ান্স দিতে রাজি।

তুমি একজন মোস্ট ট্রাস্ট ওয়ারদি ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার। উই আর হ্যাপি টু ইনভেস্ট অন ইউ। তোমার পিছনে লাগানো টাকা আজপর্যন্ত কোনোদিন জলে যায়নি। আর সত্যি বলতে, তোমার মত এমন ঠান্ডা মাথার রিপোর্টার আমি খুব কমই দেখেছি। ইউ আর পারফেক্টলি আ ব্রিলিয়ান্ট রিপোর্টার।

বাবা - আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। আপনারা সকলেই, আমাকে এতো এসিস্ট্যান্ট নেবার জন্য ফোর্স করেন কেন?

ঘটক আঙ্কেল – এসিস্ট্যান্ট থাকলে, তোমাকে অনেক বেশি কেস দিতে পারি। একা হবার জন্য, তুমি বছরে ২-৩ এর বেশি কেস হ্যান্ডেলই করতে পারোনা। শুধু রাজনীতির কেস নয়, বিলিভ মী, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে তোমার পছন্দের হিস্টরিক কেশও দেব। আই প্রমিশ। বাট, তার জন্য তো একটু বেশি কেস হ্যান্ডেল করতে হবে, তাই না।

চায়ে চুমুক দিয়ে আবার ঘটক বাবু বললেন - আমাদের সংবাদপত্র ছাড়াও অন্য ম্যাগাজিন আছে। সেখানে আমার ইচ্ছা, তোমার নাম দিয়ে কিছু অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার বা ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশ করার। লোকের জানা উচিত, বাঙালি এখনও সোশ্যাল মিডিয়া সর্বস্ব হয়ে যায়নি। আই বিলিভ, বাই প্রজেক্টিং ইউ, আই ক্যান ডেফিনিটলি এস্টাবলিস দ্যাট।

বাবা মৃদু হাস্যে চুপ করে বসে থাকলে, মিস্টার ঘটক আবার বললেন - ডোন্ট ইউ থিঙ্ক, বাঙালি কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আবার সত্যজিৎ রায়ের মত কা উকে প্রয়োজন? আমি জানিনা, তুমি নিজের সম্বন্ধে কি ভাবো। বাট, আমরা পত্রিকার প্রযোজকরা একসাথে হয়ে তোমার কথা উঠলে, আমাদের সবার মুখে, ওই একই কথা আসে।

বাবা এবার মুখ খুললেন - বেশ তবে, এতো করে যখন বলছেন, আমি এবার থেকে আমার এই কন্যাটিকে সঙ্গে নিতে চাই। আই ক্যান্ নট ট্রাস্ট অন এনি ওয়ান এলস।

ঘটক বাবুর মুখে যেই উজ্জ্বল হাসিটাকে কিছু কালো বাদল ঢেকেছিল , তা বোধহয় কেটে গেল। তিনি হেসে বললেন - ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ... (আমার দিকে তাকিয়ে) ওয়েলকাম লেডি সিন।

বলে রাখি এখানে, আমার পুরো নাম, মানে মিলি সিংহ নামটা কেউ নিতেন না। বাবাকে সকলে বিজয় বলেই ডাকতেন, আর অবাঙালীরা বলতেন, মিস্টার সিন। বাবা বলতেন, কি ভাগ্যিস সিংহ থেকে শুধু সিং হয়ে যায়নি। ... আর আমাকে ডাকা হতো, মিলি, লেডি সিন – এই দুই নামে।

বাবা এবার বললেন - নতুন কোনো কেশও নিশ্চয়ই আপনার স্যুটকেসে করে এনেছেন , তাই তো মিস্টার ঘটক?

ঘটক - তা ছাড়া কি তোমার মত ব্যস্ত লোকের দর্শন সৌভাগ্য লাভ হতে পারে সিন?

- তো বলে ফেলুন কি ব্যাপার।

- আচ্ছা তোমার কী মনে হয় , কেন্দ্র সরকারের মৎস্যচাষ বিল নিয়ে যে দেশ জুড়ে হরতাল হচ্ছে , তাতে কোনো জলঘোলা আছে?

- তা আছে বৈকি। আর দেশ জুড়ে হরতাল! না না, মিস্টার ঘটক, দেশ জুড়ে নয়, বলুন কেরল ওনলি। দেশজুড়ে সংবাদমাধ্যম প্রচার করছে মাত্র, কিন্তু হরতাল তো কেবল কেরোলে, অ্যান্ড সেখানেই সব থেকে সারপ্রাইজিং ব্যাপার।

- এখানে সারপ্রাইজিং কি পেলে?

- দেশের সব থেকে বড় ফিশিং হাব হলো ইস্ট করিডর , মানে অন্ধ্র, ওড়িশা, আর এই বাংলা। এই তিন জায়গায় কোন তাপূত্তাপ নেই! হওয়াই ওনলি কেরল?

- হুঁ, এই ব্যাপারটাই একটু গভীরে ঢুকে খবর চাই... কি পারবে তো সিন?

- কতটা গভীর খবর? দেশের মধ্যে কি চলছে, নাকি দেশের বাইরের ইনফ্লুয়েন্স টাও?

- দেশের বাইরেরটা খবর অনো, বাট পাবলিশ দেশের মধ্যেরটাই করবো।

- হুঁ বুঝি।

- কি বুঝলে?

- যা খবর ছাপা হবে, তার দ্বিগুণ খবর সঙ্গে রাখতে হয়। সরকারের সাথে টেক্কা নেওয়া তো, হুমকি তো আসবেই। চার্জ করতে এলে, কর্কে দেওয়া - বাড়াবাড়ি করলে, যা ছাপিনি এখনও, তাও ছেপে দেব।

বাবা আর মিস্টার ঘটকের একসাথে উচ্চস্বরে হাসি। মিস্টার ঘটক বললেন - দ্যাটস হয়ের ইউ সারপ্রাইজ আস। ... যেই ব্যাপার একটা সংবাদমাধ্যমে সুদীর্ঘ ৩০ বছর কাজ করা এডিটারও বুঝতে পারেনা, হাউ ডু ইউ!!

আবার বললেন - এনি ওয়েজ, ট্রিপ প্ল্যান কি থাকবে?

- কেরল, তারপর দিল্লি, লাস্টে ইংল্যান্ড, বা অন্য দেশ। বাট হ্যাঁ, অন্য প্রোডিউসার রাও যেন, আমার এই কাজের ব্যাপারে না জানে, আপনি তো জানেনেই।

- জানিনা আবার, ওরা তোমায় আফ্যোর্ড করতে পারে না , সো ফিল জেলাস। এনি ওয়েজ, টিকিট কি করবো?

- আজ সোমবার, ১৩ ই মার্চ। ... উম..., আপনি ১৬ তারিখ কেরোলের ফ্লাইট , কোচিতে হোটেল, আর ১৮-ই মার্চ রাত্রে দিল্লির ফ্লাইট আর ওখানে সাত দিনের হোটেল বুক করুন। বিদেশের ব্যাপারটা, আমি কোচির আবহাওয়া দেখে কনফার্ম করছি।

- কত এডভ্যান্স দেব?

- ২৫ দিয়ে দিন। বাকি পরে দেখছি।

মিস্টার ঘটক চলে গেলেন এডভ্যান্স দিয়ে। আমার তো চুটিয়ে আনন্দ। বাবা আমার হিরো। তার সাথে যাচ্ছি কোচি, আরো কোথায় না কোথায়। চুটিয়ে আনন্দ। আমার ব্যাগ আমিই গোছালাম , আর বাবার নির্দেশে, বাবারটাও, যদিও বাবা ব্যগপ্যাক আমাকে দিয়ে প্রায় দুই বছর ধরেই করান।

আজ ১৬ই মার্চ

আমাদের ফ্লাইটের সময় বিকাল ৫টায়, এটাই সব থেকে কম সময় নেবে কোচি পৌছাতে। রাত্রি ৮.৩০ এ আমরা পউছাবো কোচি। সেখানে সিভরমন বলে একটি গাড়ি দারিয়ে থাকবে ; গাড়ির নম্বর ৭৫৩১। সে আমাদের নিয়ে রওনা দেবে ওয়িলিংডম দ্বীপ ছাড়িয়ে থপ্পুমপাড়িতে, যেখানে আমাদের হোটেল। হোটেলের নাম ভাইগা হোমস। এয়ারপোর্ট থেকে অনেক দূর, প্রায় ৭ ঘণ্টার রাস্তা। তার মানে আমাদের পৌছাতে পৌছাতে প্রায় ভোর ৩টে। বুঝতে পারলাম না, বাবা এত দূরে কেন নিলো হোটেলটা। যাই হোক, বাবার সাথে সমস্ত যাত্রাই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়। তাই, নিশ্চিন্তে এয়ারপোর্ট থেকে নেমে বাবার পিছনে পিছনে সিভরমনের গাড়িতে উঠে বসলাম।

পথে মাভেলি রোডে একটা ধাবায় আমাদের গাড়ি দাঁড়ালো , আর আমরা রাতের খাওয়াটা সেরে নিলাম। আমাদের ফ্লাইটও প্রায় দুইঘণ্টা লেট ছিল। তাই আমাদের গাড়িতে উঠে বসতে বসতে, প্রায় ১০.৩০ হয়ে গেছিল। বাবার থেকে জানলাম, ৭ ঘণ্টা লাগবে, রাত্রি বেলা, দেরি হবেনা। মানে এই ৫.৩০ নাগাদ আমরা হোটেলে পউছাবো। বেশ সাজানো শহর , সেই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। চওড়া চওড়া রাস্তা , সুন্দর করে রাস্তার ধারের দৃশ্য সাজানো। বেশ ভালো লাগছিলো।

এরই মধ্যে, সুদ্ধ বাংলায়, বাবা আমাকে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলো – কি কি দেখলি, প্লেনের মধ্যে? বিশেষ দৃষ্টি আকষণীয় কিছু পেলি?

প্রশ্নটা আমাকে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছিল , কারণ আমি তো ঠিক ভাবে কিছুই দেখিনি। ... তাও যদি কিছু না বলি, তবে বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে বেমানান হয়ে যাই , তাই বললাম, - না তেমন বিশেষ কিছু দেখলাম না , তবে বেশ কিছু উত্তরভারতীয় ধরনের ধুতিপরা বয়স্ক লোক দেখলাম , মনে হলো রাজনীতিবিধ।

বাবা দেখলাম কথা শুনে খুশী হলেন , বললেন – গুড। আর বললেন – সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা যেখানেই যান, সেখানেই নিজেদের পার্টির চিহ্নটা উত্তরীয় করে যান, কিন্তু এইক্ষেত্রে তেমনটা দেখলাম না, এমন কি বন্দরে উড়োজাহাজ এসে পৌঁছানোর পরেও তেমনটা দেখলাম না। ... সেটা দেখে , কেমন যেন একটা রহস্যজনক লাগলো।

আমি বললাম – এতে রহস্যজনক কি আছে?

বাবা ভ্রুটা কুঁচকে, যেন নিজের মস্তিষ্কের গভীর স্থান থেকে বললেন – এমন হতে পারে যে, রাজনৈতিক নেতা তো এসেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে আসেন নি, বা এমনও হতে পারে যে, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে এলেও, তা প্রকাশ করতে ইনারা অনিচ্ছুক।

আমি বললাম – এমন কেন?

উনি বললেন – কারণ তো অনেক কিছুই হতে পারে!... এমনও হতে পারে যে ... (থেমে গিয়ে) যাকগে, কাল বন্দরে গিয়েই সমস্তটার আঁচ পাওয়া যাবে। ... তোর মুখ গুলো মনে আছে, অই ধুতি পরা মানুষগুলোর?

আমি বললাম – সংখ্যায় তিনজন ছিলেন, আর তাদের সাথেও একজন করে ছিলেন।

বাবা বললেন – হুম, পার্টির দেওয়া সিকিউরিটি, মানে মন্ত্রী নন, অর্থাৎ পরিচিতি কম, প্রতিনিধি... কোন গোপন কর্ম চলছে... বুঝলি, ... এবার দেখতে হবে, গোপন কর্মটি কোন দিক থেকে হচ্ছে।

বাবা একটা কথাতেও কোন ইংরাজি শব্দ প্রয়োগ করলেন না। আমি বেশ বুঝলাম, গাড়ির ড্রাইভারকেও এখানে বিশ্বাস করা যায়না। যেকেউ ইনফরমার হতে পারে। অর্থাৎ এই তামিল- কান্নাদার দেশে, সুদ্ধ বাংলাই হলো কথোপকথনের শ্রেষ্ঠ সুরক্ষিত উপায়। ... আরো বুঝলাম, এবার থেকে সবসময়ে চোখকান খোলা রাখতে হবে। ... যা খালিচোখে সামান্য মনে হয়, তারমধ্যে থেকেই রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সামান্য উত্তরভারতীয় ধরনের ধুতির থেকে রাজনৈতিক নেতা, পার্টির উত্তরীয় ব্যবহার না করার অর্থ গোপনে কর্ম সারা, অধিক সিকিউরিটি নেই মানে মন্ত্রী নয়, অর্থাৎ কম প্রসিদ্ধ কারুকে দিয়ে গোপনে কোন রাজনৈতিক ক্রিয়া চলমান – বেশ বুঝলাম, সামান্য দেখতে ঘটনার মধ্যে থেকেই এত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, অর্থাৎ আরো সচেতন থাকতে হবে আমাকে। আরো বেশি বেশি করে নিখুঁত ভাবে অবসারভেসন চালাতে হবে, তবেই বাবার যোগ্য সঙ্গী হয়ে উঠতে পারবো।

আমাদের হোটেলে উঠলাম ঠিক ৫.৪৫ সকালে। ঘরোয়া দেখতে হলেও, অদ্ভুত সাজানো হোটেলটা, আর আমাদের হোটেল থেকে বট ব্রিজটা খুব কাছে, বাইরের দিকে চোখ রাখলেই জলাশয় আর বট ব্রিজটা দেখা যায়। কিন্তু এখনো আমি বুঝিনি যে বাবা এয়ারপোর্ট থেকে এত দূরে হোটেল নিলেন কেন। বুঝলাম পরের দিন সকালে মাত্র ৩৯ মিনিটের পথ অতিক্রম করেই, আমাদের হোটেল থেকে কোচির বন্দরে পৌঁছান যায়, মাঝে কেবলই বট ব্রিজ আর ইন্দিরা গান্ধী রোড।

ব্রেকফাস্ট করেই, বাবা আমাকে নিয়ে, সিবরমনের গাড়িতে বন্দরে পৌঁছালেন। তখন মাত্র সকাল ৮.৩০। গাড়িতে যেতে যেতে জানলাম সিবরমন হলেন মিস্টার ঘটকের পরিচিত। বাবার থেকে জানলাম, সিবরমন আমাদের প্রতিটি মুভমেন্টের খবর সমানে ঘটককে দিয়ে যাচ্ছে। ... একদিকে ভালো , বিপদের মুকাবিলা সহজে করা যাবে, কিন্তু তথ্য ফাঁশ করা যাবেনা, তাই সুদ্ধ বাংলায় কথোপকথন অনিবার্য।

বন্দরে পৌঁছলাম যখন, তখন সেখানে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু লেখা প্রচুর শ্লোগানযুক্ত প্ল্যাকার্ট নিয়ে , সমস্ত হরতাল চলছিল, আর মুখেও সেই দুর্বোধ্য ভাষাগুলিই নিশ্চয় উচ্চারিত হচ্ছিল , তাই কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। আসলে, বেশ কিছু ইংরাজিতে লেখা শ্লোগানও ছিল তাদের মধ্যে, কিন্তু আমার মনে তখন অন্য বিচার চলছিল, তাই খেয়াল করিনি। ... আমার মাথায় একটা জিনিস তখনও ঘুরপাক খাচ্ছিল যে , বাবার জন্য যেই কিটটা রেডি করি আমি প্রতিবার , সেখানে সুখহাট পত্রিকার প্রযোজক , ঘটককাকুর দেওয়া একটা ইলেক্ট্রনিক নোটপ্যাড , আমি রেখেছিলাম কিন্তু ছিলনা , আর তার সাথে প্রভাতসন্দেশের প্রযোজক , মজুমদারকাকুর দেওয়া ভয়েস রেকর্ডারটাও ছিলনা – সেই নিয়ে।

হঠাৎই বাবার কথায় আমার ঘোরটা কেটে গেল। বাবা বলে উঠলো – সংবাদ জগতে কেউ কারুকে বিশ্বাস করেনা মিলি। সকলেই চায় , সাংবাদিক সংবাদ দেবার আগেই , সংবাদ সংগ্রহ করে নিতে। চাকরিরত সাংবাদিকের ক্ষেত্রে, কোন রাজনৈতিক কাণ্ডকারখানার মধ্যে সাংবাদিক জরিয়ে যাচ্ছে দেখলেই , তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হয় , আর আমাদের মত ফ্রিল্যান্সারদের ক্ষেত্রে তো , যত অধিক সংবাদ সংগ্রহ করবো, তত আমাদের পেমেন্টের বিল বারে। তাই আগে ভাগে যদি আমাদের সংবাদ নিয়ে নেওয়া যায় , তবে তদন্ত বন্ধ করে, ফিরিয়ে নিলে, বিল কমে যায়।

সেই কারণেই , ঘটক আমাকে ইলেক্ট্রনিক নোটপ্যাড দিয়েছিল , মজুমদার দিয়েছিল ভয়েস রেকর্ডার , অবিরামখবরের দাসগুপ্ত দিয়েছিল সেভিং ট্রিমার , আর সন্দেশআজকের-এর লাহিড়ীর দেওয়া ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি। ... আর তাই, অগুলোকে বাক্সবন্দি করে, তুলে রেখে দিবি চিলেকোঠা ঘরে। তুই আসতিস না, তাই তকে বলিনি। প্রতিবারই তুই অগুলো ঢোকাস, আর আমি বার করে দিই।

আমি বললাম – এর মানেটা কি? ওগুলো কি রেকর্ডার?

বাবা – না, শুধু রেকর্ডার নয় , ওগুলো সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কথা রেকর্ড করে যার যার দেওয়া , তাদের সিস্টেমে ফাইল পাঠিয়ে দেয়, মানে পুরো কেস ফাঁশ।

আমি খানিক ভেবে বললাম – নোটপ্যাড না বুঝলাম, যা লিখবে, তাই জেনে যাবে; ঘড়িও বুঝলাম, যা বলবে সব জেনে যাবে, ভয়েস রেকর্ডারও বুঝলাম, কিন্তু দাসগুপ্ত কাকুর দেওয়া সেভিং ট্রিমারটা বুঝলাম না তো!

বাবা হেসে বললেন – আমাকে সব থেকে বেশি অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবার জন্য জোরাজোরি কে করছিল?

আমি বললাম, দাসগুপ্ত কাকু।

বাবা হেসে বললেন – সঙ্গে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে, আমি সব থেকে বেশি সময় গভীর তদন্তের কথা কখন তার সাথে বলবো?

আমি বুঝে গিয়ে, আর কিছু না বলে হাসলাম।

বাবা এবার হেসে বললেন – হরতালটা কিসের জন্য বুঝেছিস?

আমি বললাম – কি করে বুঝবো, অদের ভাষা যে আমি কিছু বুঝতেই পারছিনা!

বাবা বুঝতেই পারলেন, আমি অমনোযোগী ছিলাম, তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললেন – ইংরাজিতেও শ্লোগান আছে, দেখে নে।

আমি এবার সব ইংরাজি পোস্টারগুলো দেখে বুঝলাম, পার্লামেন্টের বিল অনুসারে, সমস্ত সমুদ্র থেকে ধরা মাছ প্রাইভেট কিছু কোম্পানিরাই কিনবে, সরকার এর কোন দায়িত্ব নেবে না, এমনই বলা হচ্ছে। আর বিরোধিতা সেটারই হচ্ছে।

বাবাকে দেখলাম, ভ্রুকুটি কুঁচকে, গভীর দৃষ্টি দিয়ে কিছু দেখছেন। বুঝলাম না, এখানে দেখার কি আছে। তবে সেই সময়ে প্রশ্ন করার সাহস হলো না, হয়তো আমার প্রশ্নের কারণে, উনার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাবে! ... প্রায় দেড় দুইঘণ্টা ছিলাম আমরা সেখানে। সারারাত ঘুম নেই, গাড়িতে যতখানি খাপছাড়া খাপছাড়া হয়েছে আর কি, তাই আর শরীর দিচ্ছিল না। ...

বাবাকে বলতে, বাবা বললেন – চল্ হোটেলের রুমে গিয়ে, স্নান করে, একবারে লাঞ্চ করে, একটা ভাতঘুম দেওয়া যাবে। এখানের ট্রিপিল রিফাইন্ড নারকেল তেলের রান্না, খেয়ে দেখবি চ, খেয়ে বুঝতেও পারবিনা যে নারকেল তেলে রান্না।

বাবার কথা অনুসারে, হোটেলে যাবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলাম , কিন্তু দেখলাম, কিছু সাদা দামি গাড়িতে করে কালকের প্লেনের ওই লোকগুলো নামলো। বাবা, আমার হাতটা চেপে ধরতে, বুঝতে পারলাম, কাজ আছে, হোটেলে এখনই ফেরা যাবেনা। ... আমরা সেই লোকগুলোর থেকে একটু দূরত্ব রেখেই চলছিলাম , তাদের অনুসরণ করে। ...

গলা নামিয়ে, বাবা কে বললাম – কি বলছে শুনতেই পাবো না তো! বাবা বললেন – শুনতে হবেনা। এদের ভাবভঙ্গি পাল্টে যাবে , ওঁদের কথা অনুসারে। ... একটা কাজ করতো , সিবরমনকে ডেকে নিয়ে আয়তো। ... ভোল পালটানোর পর, কি ভোল হয়, সেটা জানাটা খুব দরকার। ... আদেশ পালন করলাম বাবার। ... সিবরমন এলো , প্রায় আধঘণ্টা পরে, সিবরমনের মুখে একটা বিরক্তির ছাপ দেখতে পাওয়া গেল – ওঁদের কান্নাদা ভাষাতেই কিছু বিরক্তির সুরে বললেন সিবরমন। ... আর তা বলতেই , বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে গাড়িতে উঠলো।

কোচির কাজ শেষ

গাড়িতে উঠেই প্রথম কথা যা বাবা প্রশ্ন করলো সিবরমনকে , তা হলো, স্লোগানে কি পরিবর্তন হলো। সিবরমন প্রথমে হিন্দিতেই বলছিল, কিন্তু উনার হিন্দি বোঝা সত্যিই কঠিন , তাই বাবা ইংরাজিতে বলতে বললেন। সিবরমন ইংরাজিতে যা বললেন, তা এরকম –

এঁদের ভাবগতিক কিছু বোঝা যায়না। এতক্ষণ বলছিল, এই প্রাইভেটাইজেশন, তারা কিছুতেই মানছে না, আবার এখন বলে, সরকার যদি বিক্রি না হওয়া মাছ কিনতে রাজি থাকে , তবে তারা রাজি, সরকারের দাবিতে।

সিবরমন আরো অনেক কথা বলছিল , সরকারের সাথে যখন স্ট্রাইক করে, কিছু করতেই পারবিনা, তখন স্ট্রাইক করার কি দরকার , আরো কত কি। ... কিন্তু বাবাকে দেখলাম , গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে , ডান হাতটা ভাঁজ করা বা হাতের উপর রেখে , সেই ডান হাত দিয়ে , নিজের ভ্রু আর চোখকে হাত বুলিয়ে চলেছে। আমি বুঝলাম , বাবার যা জানার জানা হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই বাবা মনের মধ্যে অঙ্ক মেলাচ্ছে।

কিন্তু সেই সময়ে, আমি আর সত্যিই তাকাতে পারছিলাম না, প্লেনের জার্নি, তারপর ৭ ঘণ্টা গাড়িতে করে হোটেলে আসা, আবার এখন দুপুর ১২টা বেজে গেছে, কোন ঘুম নেই। চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না। তবে বাবা গাড়িতে ঘুমোতে দিল না। হোটেলের রুমে আস্তে , আমাকে তাড়াতাড়ি স্নান করতে পাঠিয়ে

দিল, আর স্নান করে বেরোতেই , আমাদের রুমেই দেখলাম বড় বড় পমপ্লেটের ঝাল আর গরম গরম ভাত। সপাসপ খেয়ে নিয়ে, আমি শুয়ে পরলাম। বোধহয়, সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পরেছিলাম। ঘুম ভাঙলো যখন, তখন দেখি রুমের আলো জ্বলছে, আর বাবা কারুর সাথে ফোনে কথা বলে, সবে ফোন রাখছে।

যেটুকু কথা শুনতে পেয়েছিলাম, তা বাংলাতেই বাবা বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।

বাবার দিকে তাকাতে, বাবা নিজের থেকেই বললেন, দু ঘন্টা ঘুমিয়েছে, তারপর এয়ারপোর্ট গেছিল, আর এখন যেই কাজে এয়ারপোর্ট গেছিল, তা সম্পন্ন হলো। মাঝে, উনি সিবরমনকে নিয়ে আরেকবার ফিশিং ডেকে গেছিলেন। এখানের কাজ মোটামুটি শেষ। ... কথাটা শুনে , আমার আনন্দ হলো না, বরং বিরক্তই লাগলো – আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না, তার আগেই কাজ শেষ!

আমার মনের ভাব বুঝেই বাবা বললেন – ঘটককে বলছি শুনে নে।

মিস্টার ঘটককে ফোন করলেন বাবা। বাবাই বেশির ভাগ কথা বললেন , তাই বাবার কথাগুলোই লিখলাম –

মিস্টার ঘটক...

- ঘটক কাকুর কথা

হুম কেস মোটামুটি সলভড

- ঘটক কাকুর কথা

হ্যাঁ, আমাদের সাথেই, রুলিং পার্টির তিনটি ভোটে হেরে যাওয়া ক্যান্ডিডেট এসেছিলেন , ... হ্যাঁ, একই প্লেনে।

- ঘটক কাকুর কথা

হ্যাঁ, ভেরিফাই করে নিয়েছি , উত্তরখণ্ড থেকে দাঁড়ানো , মুকেশ শর্মা; রাজস্থান থেকে দাঁড়ানো , রজনিস গাইকন্ডে; আর ছত্তিসগড় থেকে দাঁড়ানো, মহুসিন তুতেন খান। ...

- ঘটক কাকুর কথা

হ্যাঁ এয়ারপোর্টের লিস্ট থেকেও, আর এম.পি. লিস্টের সাথে ক্রশ ভেরিফিকেশন করেও।

- ঘটক কাকুর কথা

এই স্ট্রাইক, একটা লোকদেখানি স্ট্রাইক মাত্র, দেশের অন্যত্র যদি কোন স্ট্রাইক হয়, তা যাতে ধপে না টেঁকে, সেই উদ্দেশ্যে মেনিপুলেটেড।

- ঘটক কাকুর কথা

অর্থাৎ, রুলিং পার্টি নিজেদেরই এর্যা ঞ্জ করা একটা স্ট্রাইক করেছে, যার থেকে দরকষাকষি করিয়ে, বিদেশী তিন কোম্পানিকে সমস্ত সামুদ্রিক মাছের মালিকানা দিয়ে দেওয়া যায়। তিনটে কোম্পানি যারা সমস্ত মালিকানা নিচ্ছে, তারা হলো টকিয়োজ শিফুডস, দি মিলান ফিসারিজ, আর আমস্টারডাম ফিস স্টক – এই তিন দেশের সাথেই ভারতের খুব একটা রপ্তানি চলেনা। অর্থাৎ, এঁরা কোন একটি কোম্পানির এজেন্ট হয়ে, বা কোন একটি কোম্পানির মাধ্যমে, এই কেনাব্যাচা করবে।

- ঘটক কাকুর কথা

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, বিক্রি না হওয়া মাছ, সরকার কেনার অঙ্গিকার করেছে। আর আমি ডেড শিয়র, সেই মাছ, সরকার এক অন্য সংস্থাকে বিক্রি করবে, যে এই তিন কোম্পানির ইনফ্লুএন্সার নয়। ... আর যাতে এই সমস্ত কিছু করতে বাঁধা না পেতে হয়, সেই কারণে সরকার এই মেনিপুলেটেড স্ট্রাইক করিয়েছে, ভারতের সেই ফিশিং করিডরে, যেই ফিশিং করিডর রিলেটিভলি দুর্বল, অর্থাৎ যেখানে সাধারণ মৎস্যচাষিরা অংশগ্রহণ করবেন না, সেখানে।

- ঘটক কাকুর কথা

না ... এবার আপনি বলুন, কেস ইজ সলভড়। ... এবার আপনি যদি বলেন যে, তিনটি কোম্পানি কার এজেন্ট হয়ে কাজ করছে, বা সরকার যে সেই এজেন্টকে স্ট্রাইক দেখিয়ে, রাজি করালো যে যেই মাছ এই তিন কোম্পানি কিনবে না, সেটা সরকারের হবে, আর সরকার সেই মাছ কার কাছে বিক্রি করবে, তাহলে, আমাকে পরবর্তী তদন্ত করতে হবে। ... এই তদন্ত এখানেই শেষ।

- ঘটক কাকুর কথা

অফ কোর্স নট, যেই তদন্ত করেছি, তার জন্য আমি ১৫র বেশি একটা টাকাও নেবনা। ... আমি আপনাকে ১০ ফিরিয়ে দেব, কারণ আপনি ২৫ দিয়ে রেখেছিলেন। ... তবে হ্যাঁ , এবার যদি এই তিনটি কোম্পানির ব্যাপারে, বা সরকার কার এজেন্ট হয়ে কাজ করছে , এই সমস্ত তদন্ত করতে বলেন , তাহলে, ২৫এ কিন্তু হবেনা। এগুলো এক্সট্রিম্লি কনফিডেন্সিয়াল, তাই এই তথ্য বার করা, বেশ কঠিনও হবে, আর প্রচুর রিস্কও থাকবে।

- ঘটক কাকুর কথা

কত লাগবে, সেটা কাজ করার পরেই জানতে পারবো। ফার্স্ট আমাকে লে-আউট তৈরি করতে হবে , সেই লে-আউটের ভিত্তিতে আপনাকে একটা এস্টিমেট দিতে পারি। ...

- ঘটক কাকুর কথা

ওকে, আমি আপনাকে আজ রাত্রের মধ্যেই জানিয়ে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, আমি শহর ছাড়ার আগে, খবর ফাঁশ করবেন না; যদি করেন, তবে আমাদের প্রাণের ঝুঁকি এসে যাবে।

বাবা ফোন রাখলেন, আমি বিদ্রোহের সুরে বললাম – এয়ারপোর্ট থেকে নামের তালিকা জানলে , কোন চেনা মন্ত্রীর থেকে নামের ভেরিফিকেসান করে জানলে যে রুলিং পার্টির ক্যান্ডিডেট ; বন্দরে গিয়ে, এটাও জানলে, কি কি কোম্পানিতে মাছ বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে। ... কিন্তু স্ট্রাইকটা যে মেনিপুলেটেড , সেটা কি করে বুঝলে?

বাবা বললেন – রাজনীতি বড় কঠিন জিনিস জানিস মিলি... কিছু দুধে রাজনীতিবিদকে ইচ্ছা করে জনপ্রিয়শূন্য করে , হারিয়ে দেওয়া হয় , এই খবর আছে! ... কেন হারায় জানিস ? ... এই সমস্ত মেনিপুলেসান গুলো করার জন্য। রাজনীতিবিদের ট্যাগটা অঙ্গে রইল , কিন্তু জনপ্রিয়তা নেই, তাই এঁদের খবর কেউ রাখেনা, এমনকি রিপোর্টাররাও নয়। আর সেই সুযোগ নিয়ে, এঁদেরকে পাঠানো হয়, এই সমস্ত মেনিপুলেশনগুলো কষে নেবার জন্য।

রাজনীতিবিদ প্রমাণ করতে হবে , নাহলে এঁদের কথা কেউ শুনবেনা , তাই ধুতিপাঞ্জাবি চাপিয়েই আস্তে হয়েছে। কিন্তু এরাও জানে , এঁদেরকে দেখলেই রিপোর্টাররা রাজনীতিবিদ বলে বুঝে নেবে , তাই ইচ্ছা করে, পার্টির উত্তরীয়টা শরীরে চাপায় নি। স্ট্রাইক হচ্ছে , সরকারি বিলের বিরুদ্ধে, তাই স্বাভাবিক ভাবেই রিপোর্টাররা ধরে নেবে যে, অপনেন্ট পার্টির নেতামন্ত্রী হবেন হয়তো। ...

আমি আন্দাজ করেছিলাম, এই মেনিপুলেসান। ঘটকের সামনেই বলেছিলাম, ইস্ট করিডরে এই স্ট্রাইক হচ্ছেনা, মানেই তা সন্দেহজনক। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম, এমন কিছুই একটা হচ্ছে। সেই জন্যই তো, যখন এঁরা গিয়ে কথা বললেন , তখন আমি সিবরমনকে দিয়ে , ওঁদের পাল্টে যাওয়া শ্লোগানটা জানলাম। ... জানলাম, ওঁদের ভোল পাল্টে গেছে, ওরা সরকারকে বাকি মাছ বিক্রি করার কথা বলছে। ... যেই মুহূর্তে এই পাল্টে যাওয়া ভোল শুনলাম , সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম, এর মানে, কারুর কাছে সরকার মাছ রপ্তানি করতে চাইছিল। অপনেন্ট পার্টি জেনে গেল , আর অমনি অপনেন্ট পার্টি একটা অন্য ইনফ্লুএন্সিয়াল বিদেশী কোম্পানিকে দিয়ে সরকারের কাছে প্রেশার ক্রিয়েট করলো।

আর তাই সরকার কি করলো, বিল পাশ করে, সেই তিন কোম্পানিকে রপ্তানি করার কথা বলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হরতালও লাগিয়ে দিল — দেশবাসি জানলো, সরকার বিল এনেছে, আর অপনেন্ট বিরোধিতা করছে। সেই হরতালের মীমাংসা করতে হবে। তাই ট্যাগ না লাগিয়ে রুলিং পার্টির অনামা দুধে রাজনীতিবিদ এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সমঝোতা হয়ে গেল যে, বিক্রি না হওয়া মাছ কিনবে সরকার। আর সেই মাছ সরকার বিক্রি করবে, তাকে, যার সাথে প্রথম চুক্তি হয়েছিল। ...

অর্থাৎ দাঁড়ালো ব্যাপারটা এই যে , অপনেন্ট পার্টি চাপ সৃষ্টি করলো , আর সেই চাপকে পাল্টে অপনেন্ট পার্টিকেই দেওয়া হলো। মানে? ... মানে এই যে, অপনেন্ট পার্টি যেই কোম্পানিদের ঠিক করে দিয়েছিল, ওই তিন কোম্পানির থেকে কমিশন খেয়ে মাঝখানের মাখনটা ওরা খেয়ে নিয়ে সরকারকে বুড়ো আঙুল দেখাবে বলে। সরকার পাল্টা কি করলো এবার — ওই তিন কোম্পানি প্রথম দিকে কিছু মাছ পেলেও , কিছুদিন পর থেকে কোন মাছই পাবেনা। সেই মাছ বিক্রি না হওয়া মাছ , অর্থাৎ সরকার সেই মাছ কিনে নেবে, আর সরকার সেই মাছ বিক্রি করে দেবে, নিজের মনোনীত বিদেশী কোম্পানিকে।

আমি বললাম — অদ্ভুত চাল। ... কিন্তু এতো ভালোই হলো। অপনেন্ট পার্টি কমিশন পেলে , সেটা তো দেশের টাকা হতো না , এখন তো সরকার নিজের পছন্দের বিদেশী কোম্পানিকে মাছ বিক্রি করবে , তাহলে সরকারি তহবিলে টাকা বাড়বে।

বাবা খানিকটা হো হো করে হেসে নিয়ে বললেন — বোকা মেয়ে, যদি সরকারি তহবিলেই সমস্ত টাকা ঢোকাত সরকার, তাহলে কি আর লুকিয়ে চুরিয়ে করতো এসব! ... কলার উঁচিয়ে করতো যা করার।

আমি বললাম - তারমানে, দুই দিক থেকেই সাফারার দেশের মানুষই!

বাবা হেসে বললেন – হ্যাঁ, এই বিদেশী কোম্পানি তিনটে একটু বেশি টাকা দিতো মৎস্যচাষি বা জেলেদের, তাই ইস্টার্ন করিডর, যেখানে সব থেকে বেশি জেলে রয়েছে, তাদের থেকে কোন হরতাল হয়নি। আর সেই হরতাল করানো হলো এই ওয়েস্ট করিডরে, যেখানে জেলের সংখ্যা খুবই কম। সরকার কিনলে, কিনবে টাকার বিনিময়ে, আর তাই দর অনেক কম হবে, আর সরকার বেচবে সেই জিনিস ডলারে, আর সেই মাছই আবার বাজারে বিক্রি হবে, চরা দামে, সেখানেই সরকার ট্যাক্স নেবে। অর্থাৎ সরকার মাছ কেনার জন্য কম টাকা খরচ করবে, আর যা খরচ করবে, সেটা ট্যাক্স বাবদ সরকার তহবিলে তুলেই নেবে। কিন্তু টাকা দিয়ে কিনে, ডলার দিয়ে বেসরকারি কোম্পানির কাছে বেচে, সেই টাকাটা মুনাফা হবে, রুলিং পার্টির।

আমি বললাম - তারমানে এটা তো জালিয়াতি!

বাবা হেসে বললেন – হ্যাঁ, এক প্রকার জালিয়াতিই এটা। যা এভিডেন্স আমি দিয়েছি ঘটককে, বা এবার যা দেব, তার ভিত্তিতে, প্রমাণও করা যায়। ... কিন্তু কথা হচ্ছে, সরকারের সাথে এই কেসটা লড়বে কে? সরকারের হয়ে তো সেই কেস ওই মাল্টিমিলিয়েনিয়ার কোম্পানি লড়বে, কিন্তু সরকারের বিপক্ষে, এই কেস কে লড়বে? সরকার তো কোর্টে কেসের ডেট পিছিয়ে পিছিয়ে, বিশাল বিল করে দেবে। কিন্তু উল্টোদিকে যে কেস লড়বে, তার এত টাকা আছে, এই কেস লড়ার মত?

আমি বললাম - তাহলে, তোমরা যে এই তদন্ত করে রিপোর্ট দিচ্ছ, এর দাম কি? এর গুরুত্ব কি?

বাবা বললেন – কিছুই নয়, দেশের মানুষের কাছে সত্যটাকে তুলে ধরা। যদি, এই সরকারের উপর মানুষের আস্থাটা একটু কমে, আর সেই অন্ধবিশ্বাস কমে এসে যদি একটু আত্মসচেতন হয়, এই আর কি। ... কিন্তু এখানেও আবার গণ্ডগোল আছে। ... তোর কি মনে হয়, সুখহাট সংবাদপত্র, এই কেস পুরো ছাপবে। ... যখন ছাপবে, তখন দেখে নিবি চোখবুলিয়ে। দেখবি, সামান্যই সত্য বলেছে, আর তার সাথে রূপকথার গল্প জুরে দিয়েছে। ... রুলিং পার্টিও বুঝে যাবে, এঁদের কাছে অনেক খবর আছে। আর সেই জন্য রুলিংপার্টি এঁদের সাথে আপোষ করতে আসবে, আর সেই সুবাদে এই পুরো কেস থেকে, যা রুলিং পার্টি উপার্জন করবে, তার থেকে একটা কমিশন আদায় করে নেবে – মাসহারা বলতে পারিস।

আমি - সেটাও কি সংবাদ কোম্পানির হবে, না কেবলই প্রযোজকের?

বাবা হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন – তোর মনে হয়, দিনের পর দিন একটা একটা করে নতুন নতুন সংবাদ মাধ্যম গজিয়ে উঠছে, প্রযোজক দিন প্রতিদিন বড়লোক হয়ে যাচ্ছে, এমনি এমনিই।

... তবে হ্যাঁ , সমস্তটা নিজে পায়না , ডিপার্টমেন্টের মাথাদেরও কমিশন দিতে হয় । ... তাই ওঁদেরকেও দেখ, ছেলে মেয়ে সব বিদেশে পড়াশুনা করছে।

আমি - আচ্ছা বাবা, এই তজ্জুপকে আটকানোর কি কোন উপায় নেই!

বাবা – এই ধর, আমি এই তিনটি কোম্পানির মাথার সাথে চোরাগোপ্তা দেখা করলাম , আর ওঁদেরকে এই খবরটা মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিলাম। ... ওরা সেই খবর পেয়ে , সরকারের সাথে এক নতুন চুক্তি করবে, আর রুলিং পার্টির প্ল্যান ভেস্তে যাবে। ... এমনও অনেক রিপোর্টার করে, আর এই করে প্রচুর টাকাও করে। ... তবে , এতে আখেরে লাভ হয়না। ... কোম্পানি নতুন চুক্তি করবে , রুলিং পার্টি আবার একটা যোজনা করবে , আর এই করতে করতে , শেষমেশ দেখবি, এখন যেই টাকাদিয়ে গ্রাহকরা মাছ কিনবে, সেই টাকাতেই এসে পৌঁছাবে। ... তবে রিপোর্টার এমন করে , পয়সা রোজগার করে , বিশাল বৃত্তবান হয়ে যায়।

আমি জানি, আমার বাবা সেসব কোনদিন করবে না , অন্তত টাকা কামানোর জন্য তো নয়ই। তবে হ্যাঁ , আমি এও জানি যে, বাবা কারুর বাড়বাড়ন্ত আটকে দেবার সমস্ত উপায় জানে , আর কি ভাবে তা করতে হয়, তাও জানে। ... কিন্তু হয়তো , সেই সমস্ত কিছু জেনেও , নিজের প্রফেসানে নিষ্ঠাবান , তাই সকল প্রযোজকের কাছে প্রিয়। বাবা ছক তৈরি করা শুরু করে দিয়েছিল , কিন্তু আমার তখনও শেষ প্রশ্ন বাকি ছিল। আমি বললাম – আমরা শহর ছাড়ার আগে, এই খবর ছাপতে বারং কেন করলে?

বাবা, কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়েই বললেন – খবরটা প্রচণ্ড গোপন খবর , আর খবরটা সুখহাট বার করার মানে, বাংলায় খবরটা বেরুবে। তারপর কি, মার্চ মাসের এই পচা গরমের অফ সিসিনে, এডমিনিস্ট্রেশনের সাথে একসাথে হয়ে, রুলিং পার্টির জন্য খুব অসুবিধে হবে কি, কোন বাঙালি রিপোর্টারকে খুঁজে নিতে?

আমি বুঝলাম, আমার বয়স খুবই কম। এখনো অনেক কিছু বোঝা বাকি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম, একটা জাত রিপোর্টার প্রকৃতপক্ষে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভই হয় , শুধু তার কাছে কোল্ট থাকেনা, আর থাকেনা কেসের সলুউসান করার কৃতিত্ব। মুখ ধুতে উঠে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কি মনে হলো ঘুরে গিয়ে বললাম – কিন্তু সে তো আমরা চলে যাবার পরেও, সন্ধান করে জেনে যাবে!

বাবা - হুম , যাবে বইকি, তাই তো যেখানে যাবো , সেখানের সন্ধান দেওয়া যাবে না। দিল্লির টিকিট ক্যান্সেল করতে হবে। মেসেজ করে দিয়েছি, ক্যান্সেলসান এসেও গেছে।

আমি - আমরা এবার তবে কোথায় যাবো?

বাবা - ভাইজ্যাকে দি মিলানের অফিস , চেন্নাই-এ আমস্টারডাম ফিস স্টকের , আর টকিয়জের অফিস কটকে। ... আর প্রশ্ন না... এবার দেখতে পাবি। ... যা দেখবি, তার উপর প্রশ্ন হবে।

আমি বুঝে গেলাম এবার রেড সিগনাল। বাথরুম চলে গেলাম। বাথরুমে যেতে যেতে বললাম , রাত্রে চিকেন খাবো বাবা। ... বাবা বললেন, ট্রিপিল রিফাইন্ড নারকেল তেলের চিকেন বিরিয়ানি চলবে?

বিরিয়ানি আমার খুব প্রিয়। তাই বললাম – হ্যাঁ, বাইরে যেতে হবে? ... বাবা উত্তরে বললেন, - বিলকুল নেহি, রাইট ইন ডি হোটেল রুম। তবে আমরা রাত্রেই বেরুবো। মুখচোখ ধুয়ে এসে, প্যাক করে নিবি।

আমি বলতে গেলাম – আজই! ... কিন্তু রেড সিগনাল মনে পরে গেল। বাথরুমে চলে গেলাম।

ফিরে এলাম যখন, তখন বুঝলাম বাবা ঘটক আঙ্কেলের সাথে কথা বলছেন –

আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলুন, সিবরমনকে কি আমাকে কিছু পে করতে হবে?

ওকে, তাহলে, পরের ট্রিপগুলোর বিল আমি আপনাকে দিয়ে দেব। সিবরমনের সাথে আমি মাদুরাই জংশন পর্যন্তই যাবো।

ওকে, আমি আপনাকে একবারে কলকাতায় গিয়ে রিপরটিং করছি।

হ্যাঁ, প্রথম চেন্নাই, তারপর ভাইজ্যাক, লাস্ট কটক, গাড়ি আর হোটেলের বিল আমার কাছে থাকবে। ... আমি আপনাকে হাতে হাতে দিয়ে দেব। ...

ওকে ফাইন।

ফোন রাখলেন বাবা। বিরিয়ানি খেয়ে , সিবরমনের সাথে, আমরা চললাম মাদুরাই জংশন স্টেশনে। ওখানেই ওকে ছেড়ে দেব। তারপর, আমাদের যাত্রা আমরা বুঝে নেব। রাস্তায় একটি কথাও বাবা বলেনি, বরং বললেন, একটু ঘুমিয়ে নে। ... সাত ঘণ্টার রাস্তা। আমি ঘুমিয়ে নিলাম , বাবা ঘুমিয়েছেন কিনা জানিনা। ... বাবা মনেহয় , এই ট্রিপগুলোতে অত্যন্ত কম ঘুমায়। তাই হয়তো , একটা কেস শেষ হবার পর, দুই তিনদিন, বাবা খালি ঘুমায়। ... কারণ বুঝতে পারতাম না , এবার বাবার সাথে এসে দেখলাম , তাই জানলাম।

ভোর ৬টা ২২ মিনিটে আমরা মাদুরাই জংশনে প্রবেশ করলাম। ... বাবা একটা অ্যাপ ডাউনলোড করে রেখেছিল, সেই অ্যাপ দিয়ে, দুজনের দুটো প্ল্যাটফর্মটিকিট কেটে, আমার হাতে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের প্যাকেট দিয়ে দিলেন, আর বললেন, লেডিস টয়লেট থেকে এই পোশাকটা যেন পরে আসি। ... কিচ্ছু যেন না ফেলি, সব যেন ব্যবহার করি। ... ড্রেস পাল্টে আয়নায় দেখে , রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। আমার গালগুলো ফুলে গেছে, যেই জ্যাকেটটা চাপিয়েছি, সেটাতে আরো মোটা মোটা লাগছে, মাথায় টুপি, চোখে এত বড় একটা গগলস – ছদ্মবেশ, ভেবেই মনটা দারুণ হয়ে গেল।

কিন্তু বেড়িয়ে, বাবাকে আর খুঁজে পাইনা। শেষে দেখলাম , একটা সাদা দক্ষিণদেশের ধুতিপরা উসকোখুসকো চুলদাড়ি দেওয়া লোক, আমার কাছে এসে বাংলায় বললেন, “চল, মেলুর যাবো। ট্যাক্সি বুক করেছি, উবার... গাড়ির নম্বর ৫৩৪২”।

কি অদ্ভুত, নিজের বাবাকেই চিনতে পারলাম না! ... কিন্তু এই ছদ্মবেশের মানে কি?

কোন কথা নেই। গাড়িতে উঠলাম, মেলুর পৌঁছলাম। ৫২০ টাকা নিলো গাড়ি, আট ঘণ্টার জার্নি! কি সস্তা! আমার ফোন থেকে বুকিং করেছিল বাবা। আমার ফোনটা মাদুরাই স্টেশনে আসার আগেই নিয়ে রেখেছিলেন বাবা, সেটা থেকেই বুকিং। মেলুর গিয়ে, সেখানের কর্পোরেশন বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে, সমস্ত মেকআপ তুলে ফেলতে বললেন বাবা। পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের দিদিটা কেমন করে যেন দেখছিল আমার দিকে, মেকআপ তুলে ফেলার পর। ... বাবা আগেই বলে দিয়েছিলেন , কোনদিকে তাকাবি না, ডাঁটসে যাবি, ডাঁটসে আসবি। তাই করলাম। এবার আবার গাড়ি বুকিং , ৭ ঘণ্টা লাগলো, চেন্নাই পৌছাতে। ... এই ১৮ই মার্চ আমার চিরকাল মনে থাকবে। খালি গাড়িতে চরছি , নামছি, খাচ্ছি, আবার গাড়ি চরছি। ... চেন্নাই এসে, বাবা একটা হোটেল বুকিং করে, আমাকে নিয়ে উঠে, বিছনায় বসে বললেন – বল এবার কি প্রশ্ন আছে।

চেন্নাইতে পৌঁছে

আমি বললাম – কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করার কারণটা আমি তো বুঝতে পারলাম না!

বাবা হেসে বললেন – আর এমন ভাবে ভেঙে ভেঙে আসাটা বুঝতে পেরেছিস?

আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করে বললাম – যাতে আমাদের কেউ ট্র্যাক করলে, মাদুরাই এর পরে আমাদের সন্ধান না পায়, সেই জন্যই তো?

বাবা উত্তরে বললেন – তাহলে যদি বেশভূষাটা এক থাকে, তবে তো ছবি দেখিয়ে ট্র্যাক করে নেওয়াই যায়, কি তাই না?

বাবার দূরদৃষ্টিটা এবার বুঝলাম। বাবা আমায় বললেন – তুই হোটেলের রুমে একটু লাঞ্চ করে ঘুমিয়ে নে, আমি একটা অ্যাপোয়েনমেন্ট করে নিয়েছি। দি মিলান ফিসারিজের , আমস্টারডাম ফিস স্টক আর টকিয়োজ সিফুডস-এর ভারতীয় প্রতিনিধিরা একই সঙ্গে ডি লীলা প্যালেসে রয়েছে। ওঁদের তিনজনের একই সাথে একটা ইন্টার্ভিউ নেবার সুযোগ পেয়েছি, বেলা ১১টায়। ... তুই রেস্ট নে, আমি কাজটা সেরে আসছি।

আমি বললাম – আমি মিস করে যাবো?

বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন – আমি অফিসিয়াল ইন্টার্ভিউ নিচ্ছি, তাই রেকর্ডিং থাকবে। শুনে নিবি।

অতো সকালে লাঞ্চ পেলাম না, তাই একটু ভারি ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে, আমি শুতে গেলাম, আর বাবা রওনা দিলেন লীলা প্যালেসে। ঘুম ভাঙল যখন তখন বিকেল চারটে। দেখলাম বাবা মাথায় হাত দিয়ে, আধ বসা হয়ে শুয়ে রয়েছেন, আর একটা সিগারেট খাচ্ছেন। এস্ট্রে দেখে বুঝলাম, বাবা পরস্পর তিনটি সিগারেট ধরিয়েছেন। ... তারমানে বাবা চিন্তায় আছেন। ...

ধরমরিয়ে উঠে পরে বাবার দিকে চাইতে, বাবা বললেন – উঠে পরেছিস! ... লাঞ্চ করবি তো?

বাবার কথা বলার ধরন অন্য রকম। কিন্তু কেন ? কেস তো শলভ হয়ে গেছে, আবার কিসের চিন্তা! ... আমি বললাম – হ্যাঁ করবো, কিন্তু তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে!

বাবা বললেন – হুম, কোথাও গরবর হচ্ছে বুঝলি। চল আগে একটু লাঞ্চ করে আসি, তারপর বসে বলছি সব কথা।

আমি আর বাবা পাশের রেস্টুরেন্টে গেলাম। কারিপাতা দেওয়া ভাত , চিকেন আর শেষ পাতে প্লেন দই খেলাম। খিদে পেয়েছিল খুব। তাই পরে দু-দু বার এক্সট্রা ভাত নিলাম – আমিও, বাবাও। বাবাকে

দেখলাম, একটা কথাও বলছেন না। রুমে ফিরে আস্তে , বাবা প্রথম আমার হাতে রেকর্ডিংটা ধরিয়ে দিলেন।

হিন্দি- ইংরাজি মেশানো কথা, আমি বাংলায় বললাম, যা রেকর্ডিং-এ শুনলাম –

বাবা – আপনারা তো একটা বিশাল টেন্ডার পেয়ে গেছেন, তাই না?

টকিয়োজ কোম্পানির মালিক – ভেবেছিলাম পেয়েছি, কিন্তু কোথায় কি?

বাবা – কেন? আপনারা তো সমস্ত ইন্ডিয়ার সমস্ত মাছের টেন্ডার পেয়ে গেছেন। সেই মাছ তো পুরো আপনাদের লাগবেও না। তাই উদ্বৃত্ত সব তো আপনারা চরা দামে মার্কেটে বিক্রি করে দিতে পারবেন!

আমস্টারডাম কোম্পানির মালিক – হোয়াট ননসেন্স্! ... আমাদের তো ৩০ পারসেন্টই খালি দেওয়া হয়েছে, তাও অনলি ওয়েস্ট করিডর, ইস্ট করিডর তো দেওয়াই হলো না। গর্ভমেন্ট আমাদের পুরো দেবে বলে বিল পাশ করলো , বাট স্ট্রাইক হলো , আর আমাদেরকে ৩০ পারসেন্টই দিল খালি। বাকি ৭০ পারসেন্ট দেবে নিউ ইয়র্ক ফিশিং হার্ড কে।

বাবা – আপনারাও কি কোন কোম্পানির থার্ড পার্টি হয়ে এসেছিলেন?

টকিয়োজ কোম্পানির মালিক – অফ কর্ষ, আদারওাইজ, ইন্ডিয়ার সাথে এতো বড় ডিল , আমরা করতাম কি ভাবে? আমরা সাউথ চাইনা শি ফিশিং ডকের হয়ে এসেছিলাম। যা আমাদের দেশের লাগতো , তা ছাড়া সব ওঁদেরকে আমাদের বিক্রি করতে হতো। ... এখন ওরাও আমাদের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করছে।

মিলানের মালিক – অল ননসেন্স্, এই স্ট্রাইকটা একটা মেনিপুলেশন , নাথিং এলস্। বেজিং গর্ভমেন্টের সাথেও ডিল করবে , আমার আমেরিকান গর্ভমেন্টের সাথেও। ... তাই আমাদের নামে বিল করে দিল , তারপর স্ট্রাইক ক্রিয়েট করে, আমাদের থেকে ৭০ পারসেন্ট শেয়ার নিয়ে আমেরিকাকে দিয়ে দিল।

বাবা – তাহলে, আপনারা গর্ভমেন্টকে প্রেশার দিচ্ছেন না!

আমস্টারডাম কোম্পানির মালিক – আমরা স্ট্রেট বলে দিয়েছি , যদি ৫০-৫০ হয় , তো আমরা রাজি , নাহলে আমরা ডিল করবো না। চাইনা গর্ভমেন্টও প্রেশার দিয়েছে, যদি ৫০ পারসেন্ট না দেওয়া হয়, তবে চাইনা ইন্ডিয়ার সাথে সমস্ত ট্রেড ডিল ক্যান্সেল করে দেবে।

মিলানের মালিক – জাস্ট আ মিনিট, কল ফ্রম সিবিয়াই হেড কোয়াটারস। ... হ্যালো ... হোয়াট! ... না , আমরা কেন মেসেজ করতে যাবো? কিডন্যাপ! ... নো ওয়ে! ... কে সুরেশ শর্মা! ... গাইকন্ডে , ... তুতেন খান... উই ডোন্ট নো ডেম! ... আমরা যাদেরকে জানিও না , তাদেরকে কিডন্যাপ করে নেব! ... হোয়াট! ... মেসেজ ওভার হোয়াটসঅ্যাপ! ... আমাদের কাছে ওঁদের নম্বরই নেই! ... ওকে , আমরা যাচ্ছি, আপনাদের কাছে। ... আমরা গিয়ে সমস্ত এক্সপ্ল্যানেসান দিচ্ছি... সরি , মিস্টার ... সিন... উই হ্যাভ টু রিচ সিবিয়াই কোচি, বাই নেক্সট ফ্লাইট।

বাবা – থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি ইন্টার্ভিউ।

রেকর্ডিং এর শেষ।

বাবা রেকর্ডিংটা বন্ধ করতে বললেন – ওখান থেকে বেড়িয়ে ঘটককে ফোন করে বলতে যাচ্ছিলাম যে কোন কেস আপডেট পাবলিশ না করতে , কিছু একটা গরবর আছে। ... তা উনি আমাকে বললেন , যেই তিন পলিটিসিয়ানকে আমরা কোচিতে দেখেছিলাম, তাদের অপহরণ হয়েছে। সিবিয়াই ওঁদেরকে খুঁজছে। ... কেসটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, বুঝলি, ততটা সহজ নয়। ... মামলা গরবর আছে।

আমারও মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। কি যে হচ্ছে! ... বাবার কাছে জানতে চাইলাম , কি হচ্ছে ব্যাপারটা, কিছু বুঝতে পারলে?

বাবা উত্তরে বললেন – সব কিছুই ধুয়াসা। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি , কেউ না কেউ মিথ্যা বলছে। আবার এমনও হতে পারে যে সবাই মিথ্যা বলছে। ... (খানিক থেমে) ... যদি কেশটাকে সাজাতে হয়, তবে এমন হয় যে , ভারত সরকারের কাছে বেজিং সরকার কিছু এজেন্ট পাঠাল। বেজিং সরকারের সাথে ডিল করা থেকে ভারত সরকার পিছিয়ে আস্তে পারলো না , কারণ বেজিং ভারতের বড় আমদানি রপতানির জায়গা। কিন্তু যাই বেজিং-এর সাথে ডিল করতে গেল ভারত, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাণ্ডারি আমেরিকা চোখ রাঙিয়ে দিল ভারতের উপর। আর অমনি ভারতসরকারকে এমন কিছু করতে হতো যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

তাই স্ট্রাইক করালো। স্ট্রাইককে মাধ্যম করে , ডিলকে ম্যানিপুলেট করা হলো , আর সোজাসুজি ১০০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ শেয়ারে নিয়ে চলে যাওয়া হলো। নেচারালি এবার বেজিং চাপ দিল, আর ৫০-৫০ করার চেষ্টা হলো। ... কিন্তু ভারতসরকার ৫০-৫০ করতে পারবে না। কিন্তু সেটা বলাও যাবেনা। তাই কি করা হলো? ... তিন রাজনীতিবিদকে অপহরণ করে, এঁদেরকে ফাঁসানো হলো? ...

আমি বললাম – ব্যাস হিসাব তো মিলে গেল?

বাবা – না না মিলি, সমীকরণ এতো সহজে মিলতে পারেনা। ... মাঝে একটা বিরোধী দল বলে জিনিস আছে। ... তার তো একটা ভূমিকা নেবার ছিল। ... কিন্তু সে কোন ভূমিকা নিলোই না! ... এইখানটা তেই তো খটকা লাগছে। ... কিছু তো একটা জিনিস রয়েছে, যা আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। ... কিন্তু সেটা কি? ... কেউ তার মানে মিথ্যা বলছে। কিন্তু সেটা কে? ...

আমি বললাম – আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, বেজিং থেকে প্রেশার আসার পরে, সত্যি সত্যিই, এই তিন কোম্পানির মালিক , ওই তিন রাজনীতিবিদকে অপহরণ করে নিয়ে , প্রেশার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করলো!

বাবা – হতে তো পারে। ... কিন্তু প্রথম কথা সরকার আর প্রশাসনের সাথে এমন করে পার পাবে না , সেটা কি ওরা জানে না! ... আর দ্বিতীয় কথা , এই সামান্য তিন রাজনীতিবিদকে অপহরণ করে , সত্যিই কি সরকারের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করা হলো!

খানিক থেমে, বাবা আবার বললেন – আমার মনে হচ্ছে মিলি, আমাদের একটু অপেক্ষা করা উচিত। ... যদি এই তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করে , ডিলটাই ক্যান্সেল করে দেওয়া হয় , বা ৩০ পারসেন্ট-এই ফিক্স করা হয় ডিলটা, তার মানে, এই কাজ সরকারের। আর যদি উল্টোটা হয় , তারমানে এই ম্যাচফিক্সিং-এ বেজিং-এর হাত রয়েছে। ... কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পরেও , কেন যেন বার বার বিরোধীদলের কথা মনে হচ্ছে। ... হাতে হাত রেখে বসে রইল এরা! ... এতো টাকার ডিল , সেখানে কোন হস্তক্ষেপ নেই! ... চোখের সামনে দিয়ে রুলিং পার্টি সমস্ত খেয়ে বেড়িয়ে যাবে , আর ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে! ... এটা মানতে কষ্ট হচ্ছে মিলি, মানতে কষ্ট হচ্ছে। ...

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, বাবা আমাকে থামিয়ে দিয়েই বললেন – এখন আর কিছু ভেবে লাভ নেই। ... খালি কি হয় দেখতে থাকতে হবে, আর এরই মধ্যে আরো একটা এক্সট্রা ঘটনা ঘটলে যেন ভালো হতো।

... একটা রহস্য অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে, সেটা সামনে আস্তে পারতো, এমন মনে হচ্ছে। ... দেখাযাক। ... চল্, একটু মেরিনা বিচের হাওয়া খেয়ে আসি। ... সমুদ্রদেবের কৃপাতে যদি মাথাটা একটু খোলে।

বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল, আমার মনটাও ফুর ফুর করছিল, কিন্তু বাবা সম্পূর্ণ স্তব্ধ। একটিও কথা বললেন না। কেবল মাঝে মাঝে হুম হুম করে গেলেন উনি। ... যেন মনে মনে কিছু ভাবছেন , আর সেই কথার সার রূপে ভেসে আসছে – হুম, হুম।

বিচ থেকে ফিরে , তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে নিলাম। বাবা যবে থেকে এসেছে , তবে থেকে ভালো করে ঘুমান নি। ... বাবা ঘুমিয়ে পরলেন। আমি একটু দেরি করেই শুয়েছিলাম। একটা সিডনি সেল্ডনের নভেল পরছিলাম। ... সকাল তখন কটা ঠিক জানিনা , বাবা দেখলাম আমাকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তুলে দিলেন। উঠে চোখমুখ কচলে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখলাম ৯.৩০। চোখ থেকে যেন ঘুম কাটেনি তখনও , বেড-সাইডে গরম গরম দুধ চা। বাড়ি থাকলে , মা খালি লিকার চা খাওয়ায়। বাবার সাথে এই কদিন এসে , বেশ দুধ চা খাচ্ছি। বাসি মুখেই চা সাটিয়ে দিলাম।

আর চা খেতে খেতেই , বাবা হাতে একটা ইংরাজি পেপার ধরিয়ে দিলেন। পেপারের হেড লাইনেই দেখলাম লেখা – এলেজড কিডন্যাপিং, ফিশিং বিল ক্যান্সেল্ড, মানে কিডন্যাপের কেসে ওই তিন মক্কেলকে ধরা হয়েছে, তাই ফিশিং বিল ক্যান্সেল করা হলো।

আমি বললাম – তারমানে ওই তিন মালিকই দোষী?

বাবা মুচকি হেসে, অভিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়ে বললেন – ধুর বোকা মেয়ে! এতদিনেও রাজনীতির কিছু বুঝলি না! ... এই তিন মালিককে ফাঁসানো হলো , উদ্দেশ্য ডিল ক্যান্সেল করে, পুরো ফিশিং ডিলটা, বিল না করেই নিউ ইয়র্ক ফিশিং ডকের সাথে ডিল করা। ... সোজা আঙুলে ঘি উঠছিল না , তাই আঙুল বেঁকিয়ে, ডিলটা ক্যান্সেল করে দেওয়া হলো।

আমি বললাম – ভালোই তো হলো, ওই চিচিং মিচিংদের সাথে ডিলটা হলো না। ... কিরকম ভাষা না ওঁদের!

বাবা হেসে বললেন – ভুল করছিস মিলি। বেজিং দাদাগিরি করে না , ওঁদের কথা, আমি তোমাকে দিচ্ছি, তুমি আমাদের পাশে থাকো। ... আসলে ওরা এখনো পুরপুরি দাদা হয়ে ওঠে নি তো , তাই ওরা একটা সমঝোতায় যেতে চায়। কিন্তু নিয় ইয়র্ক পুরোপুরি দাদা। তাই , ওরা পুরোপুরি লুটে নিয়ে চলে যায়। ... আর ভাষা!

ভাষাটা আমাদের তেমন তেমন , যেমন যেমন আমরা বিভিন্ন অন্য যোনি মানে স্পেসিসকে দেখি। ... আমরা, এই আর্যরা হিমালয়ের এইদিকটা নেমে এসেছিলাম , যেইদিকে পশু পাখি বেশি। পশুদের সান্নিধ্য পাবার জন্য, আমরা গভীর শব্দের নির্মাণ করি ; আবার পাখিদের সঙ্গ পাবার কারণে , আমরা সুরেলা বা মধুর শব্দের নির্মাণ করেছি। ... অন্যদিকে, চীনারা অর্থাৎ মঙ্গোলরা, হিমালয়ের উত্তরদিশায় যাত্রা করলো। সেখানে পোকামাকড়, বাদুর, চামচিকে, এইসবই অধিক। আর ওরাও , সেই শব্দ শুনতে শুনতে , ওঁদের মতই, চিঁ, ঝি, মি, ই, এই সব শব্দ ধারণ করলো।

আসল ব্যাপারটা আমরা কি শুনছি, তার উপর ডিপেন্ড করে। ... দেখিস না, যখন একটা বাচ্চার তিন বছর হয়ে গেছে, অথচ কথা বলছে না , তখন ডাক্তার কি চেক করে ? বাচ্চার শ্রবণশক্তি চেক করে। ... আর অনেক সময়েই দেখা যায় যে , সেই বাচ্চা বোবা নয় , আসলে সে কানে কম শোনে বা শোনেই না। ... তাই ডাক্তার তাকে হিয়ারিং এইড দেয় , আর সে আস্তে আস্তে কথা বলতে পারে। ... এর মানে কি ? এর মানে হলো, আমরা আগে শুনি, তারপর বলি। ... অর্থাৎ আমরা যা শুনি, তাই বলি।

সেই কারণেই , চীনাদের ভাষা ওরকম , কারণ ওরা পোকামাকড় , চামচিকে, বাদুরদেরই শুনেছে, তাই বলেওছে ওরকমই। ... এগুলো একটা বিজ্ঞান মিলি – এতে ভালো মন্দ কিচ্ছু নেই। ... আর এই দিয়ে কারুকে ভালো বা মন্দ বিচার করাও সঠিক নয়।

বাবার থেকে এমন জ্ঞান লাভ আমি প্রায়শই করে থাকি। অগাদ পাণ্ডিত্য আছে মানুষটার, কেবল তাই নয়, উনার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব আছে যে প্রতিটি ব্যাক্তিকে , প্রতিটি সভ্যতাকে , প্রতিটি দেশের অধিবাসীদেরকে তাঁদের দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখেন। উনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে বলেন – ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখার চেষ্টা কর। উনার কাছে সকলেই সন্তান। উনি জানেন কার মধ্যে কি হচ্ছে , আর কোন কারণে সে এমন। ... সেই কারণটাকে ধরে নে, দেখবি, সমস্ত মানুষই আপন মনে হবে।

তবে আমি এখন যা দেখলাম, তা হলো, বাবা আবার চিন্তিত হয়ে গেলেন। বাবার চিন্তিত হবার চিহ্ন হলো সিগারেট খাওয়া। ... আমিও তাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বললাম, সব তো ঠিক হয়ে গেল। আবার চিন্তা করতে বসলে কেন?

বাবা একটা ব্যর্থতার হাসি হেসে বললেন – কিচ্ছু হয়নি মিলি , কিচ্ছু রিসলভ হয়নি। ... এখনো বিরোধীদের হস্তক্ষেপ চোখেই পরলোনা... ওটা তো আছেই। ... কিন্তু কি ভাবে ? যদি ওটা ধরা না যায় , তবে কিচ্ছু ধরা গেল না।

এই কথা বলতে বলতেই, বাবার ফোন বেজে উঠলো, ঘটককাকু। দুদিকের কনভারসেশনই লিখলাম –

বাবা – হ্যালো, হ্যাঁ বলুন ঘটকদা।

ঘটক আঙ্কেল – শুনেছ খবরটা!

বাবা – ডিল ক্যান্সেল, তাই তো?

ঘটক আঙ্কেল – কিন্তু ব্যাপারটা কোনদিকে যাচ্ছে, কিচ্ছু তো বুঝতে পারছি না!

বাবা – আমি অনেকটাই বুঝেছি, তবে আরো অনেকটাই বোঝা বাকি আছে। ... আচ্ছা আমাকে একটা ইনফরমেশন দিতে পারবেন? ... মানে, সিবিয়াই-এর তরফ থেকে এই কেসটা কে হ্যান্ডেল করছে, সেটা। ... যদি জানাশুনা হয়, তবে যোগাযোগ করে, পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আর কি।

ঘটক আঙ্কেল – বাঙালি, অতনু বাগচি বলে কেউ একজন।

বাবার মুখটা যেন আলোকিত হয়ে গেল – ও অতনু। ... ওয়েল ওয়েল , আপনি আর চিন্তা করবেন না। অতনুকে আমি, আর অতনুও আমাকে খুব ভালো করে চেনে। তাই খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে সুখবর দিচ্ছি। ... বি শিওর অ্যাবাউট ড্যাট।

বাবা ফোন কেটে দিলেন।... নিজের ফোন ডাইরেক্টরি থেকে অতনু আঙ্কেলের নম্বর খুঁজতে লাগলেন , আমার তাই মনে হলো। অতনু আঙ্কেলকে আমি চিনি। আমাদের বাড়িতেও কয়েকবার এসেছেন। বাবার খুব কাছের বন্ধুও বলা যায়। বাবার একজন গুণমুগ্ধ ফ্যান বলে উনি নিজেকে দাবি করেন। আর অন্যদিকে বাবাও ওর গুনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কিন্তু বাবাকে আর নাম খুঁজতে হলো না। ... কারণ?

কারণ বাবার ফোন বেজে উঠলো। ... নাম দেখলাম , অতনু বাগচি। ... বাবার ভ্রুটা কুঁচকে গেছে। ... একটু বেশীই কুঁচকে গেছে। ... সত্যিই তো, অতনু আঙ্কেল এই কেসে বাবাকে ফোন করলেন কেন?

গণ্ডগোল – খুব গণ্ডগোল

অতনু কাকু কি তবে এমনিই পরামর্শের জন্য বাবাকে ফোন করলেন , নাকি এই কেসের ব্যাপারে! এই কেসের ব্যাপারে বাবা তো ইনভলভড় নন, তবে!

বাবাও নিশ্চয়ই তেমনই কিছু ভেবে , ফোনটা ধরলেন; তারপর যা কথোপকথন হলো , সেটা আমি দুই পক্ষের কথারূপে এখানে লিখলাম –

বাবা – কি ব্যাপার অতনু, বড় কেসে হাত দিয়েছ, শুনলাম।

অতনু আঙ্কেল – কেশটায় তুমিও তো ইনভলভড়।

বাবা – আমি! কি রকমে?

অতনু আঙ্কেল – তুমি কোচিতে এসেছিলে তো , বোধহয় এই কেসের ব্যাপারেই। ভাইগাতে উঠেছিলে , সিভরমণ তোমার ড্রাইভার ছিল। গাড়ির নম্বর ৭৫৩১। কি তাই তো?

বাবা – হুম, কিন্তু সেখানে আমার উপস্থিতির খবর তো মিস্টার ঘটক , মানে সুখহাটের প্রডিউসার ছাড়া কেউ জানেন না!

অতনু আঙ্কেল – জানে জানে বিজয়; তোমার ড্রাইভারের সাথে এখানের এক ডকে হরতালরত ব্যক্তি, নাম হরিষ শিবপ্রসাদের কথাও হয়। আমি যখন ডকে গিয়ে , তিন রাজনীতিবিদের অপহরণের তদন্ত করতে যাই, তখন প্রশ্ন করি যে সন্দেহজনক কারুর উপস্থিতি তারা দেখেছে কিনা। সেখান থেকেই এই শিবপ্রসাদ এসে তোমার কথা বলে।

বাবা – অতনু, কোথাও তো একটা ভুল হচ্ছে। ... সিবরমন তার মানে সিবিয়াই কাস্টাডিতে তাই তো!

অতনু আঙ্কেল – হুম

বাবা – সিবরমনকে জেরা করতে, ও স্বীকার করেছে যে ওই শিবপ্রসাদের সাথে ওর কথা হয়েছে?

অতনু আঙ্কেল – ওখানেই তো সমস্যা। ও স্বীকার করেছে , তুমি ১৬ তারিখ কোচিতে এসেছ , তারপর তোমাকে নিয়ে ও হোটেল ভাইগাতে ১৭ তারিখ নিয়ে পৌছায়। সেদিনকেই তোমাকে নিয়ে এয়ারপোর্ট যায় আবার বন্দরে আসে। এই সমস্ত কিছু ও বলেছে , ... ঠিক জেরাও করতে হয়নি। ... প্রায় ও নিজে থেকেই বলেছে। ... কিন্তু শিবপ্রসাদকে ও সরাসরি বলছে, চেনে না। ... ওখানেই তো গণ্ডগোল।

বাবা – এক মিনিট , এক মিনিট ; একটু ভাবতে দাও আমায়। ... (১ মিনিটের নীরবতা) ... আচ্ছা , শিবপ্রসাদও নিশ্চয়ই তোমাদের কাস্টডিতে?

অতনু আঙ্কেল – হ্যাঁ, আছে তো।

বাবা – ওকে ক্রশ কয়েসচেন করো তো , ও কাকে কাকে দেখেছে , সিবরমনের সাথে? ... আরেকটা জিনিস। ... ও কি সিবরমনের নাম বলেছিল, না কি, ও আমার নাম করেছিল, যে হোটেল ভাইগা হোমসে উঠেছিল? তোমরা কি, ওখানের ম্যানেজারের থেকে গাড়ির নম্বর জেনে, সিবরমনকে আটক করো?

অতনু আঙ্কেল – হ্যাঁ, একজ্যাক্টলি। ... শিবপ্রসাদ বলে , তোমার ড্রাইভারের সাথে ও কথা বলেছে , আর জেনেছে যে তোমার নাম বিজয় সিনহা আর তুমি ভাইগা হোমসে উঠেছ। ... কিন্তু ও ড্রাইভারের অন্য ডিটেলস্ পায়না। ... আমি কারুকে বলিনি যে, আমি তোমাকে চিনি। তাই এঁরা হোটেল ভাইগা হোমসের ম্যানাজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, ওরা বলে, তোমার গাড়ির ড্রাইভার ছিল সিবরমন, গাড়ির নম্বর ৭৫৩১। সেখান থেকে সিবরমনকে আটক। ও তোমার কথা বলেছে , আর সাথে সাথে তোমার পুরো যাত্রাপথও বলেছে। আর শেষে বলেছে , ও তোমাকে মাদুরাইতে ছেড়েছে। কিন্তু শিবপ্রসাদকে ও চেনে না , কথাও হয়নি ওর সাথে কোনদিন।

বাবা – শিবপ্রসাদকে প্রশ্ন করো অতনু। ... অতনু , আমার সাথে মিলি ছিল , সেই কথা নিশ্চয়ই সিবরমন বলেছে।

অতনু আঙ্কেল – হ্যাঁ, সেই কথা সিবরমনও বলেছে, আর হোটেলের ম্যানেজারও বলেছে।

বাবা – কিন্তু আই থিংক, শিবপ্রসাদ সেই কথা বলেনি। ... ঈশ ইট?

অতনু আঙ্কেল – দাঁড়াও, আমি এখনই ওকে জেরা করছি। ...

বাবা – উমহু, জেরা নয়, প্রশ্ন।

অতনু আঙ্কেল – ওকে, আমি তোমাকে উইদিন ১৫-২০ মিনিটস্ কল ব্যাক করছি। ... কিন্তু একটা জিনিস আমাকে বলো, আর ইউ গেসিং সামথিং?

বাবা – নট গেসিং অতনু। ... সত্যি বলতে , আমি এই একটা জায়গাতেই আটকে ছিলাম। তোমার এই কথা আমার জট ছাড়িয়ে দিল। ... তুমি ওর থেকে জেনে আমাকে বলো। ... আমি এর পরের প্ল্যান তোমাকে বলছি।

বাবাকে বেশ খুশী আর উত্তেজিত লাগলো। ... আমি বললাম – এসব কি হচ্ছে বাবা?

বাবা হেসে বললেন – ওই যে বললাম, অপনেন্ট কিচ্ছু করবে না, এটা তো হতে পারেনা। ... অতনু কল ব্যাক করে কনফার্ম করুক। তারপর কেসটা সাজাতে হবে। ... তবে হ্যাঁ শোন, এখানে যা কিছু হচ্ছে, এই ব্যাপারে ঘটক কাকুকে কিচ্ছু বলবি না। যেই রিপোর্ট তৈরি করবো, সেটাই সবাই জানবে, ঘটকও।

আমি বললাম – এতো হাই রিস্কি জিনিস, তুমি যদি না বলো, তবে তো ঘটককাকু আর পেমেন্ট বাড়াবেই না, ওই ২৫ই রেখে দেবে!

বাবা হেসে বললেন – মিলি, টাকার থেকে প্রাণ বড়। ... সমস্ত কথা ডিস্ক্লোজ করলে, প্রাণের ঝুঁকি এসে যাবে। ... আর শোন, তোকে হয়তো, চেন্নাইতেই কিছুদিন থাকতে হবে। ... এখনো কনফার্ম নই , তবে মোস্ট প্রবাব্লি। ... এই দু-তিনদিন হবে। শহরটা ঘুরে দেখে নিতে পারিস। ... কাছাকাছি মহাবল্লিপুরমটা কিছুতেই মিশ করবি না – ওটা একটা পালসেনদের ইউনিক আর্ট প্লেস।

আমি বললাম – আমি যাবো না?

বাবা হেসে – এখন তোর বয়স ছোট। অভিজ্ঞতাও কম। ওই হাঙরগুলোর নজরে এসে গেলে , নিজেকে বাঁচাতে পারবি না। ... আরেকটু অভিজ্ঞতা হোক, তারপর আস্তে আস্তে, সব জায়গায় নিয়ে যাবো।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু বুঝলাম, বাবা যা করছেন, আমার ভালোর জন্যই করছেন। ... কিন্তু আমার একটা আবদারও এসে গেল – যা কিছু হবে, আমাকে বলতে হবে। ... আই প্রমিস , ওটা আমার আর তোমার মধ্যেই থাকবে।

বাবা হেসে বললেন – ওকে তাই হবে। ডান।

বাবা রুমেই দুটো দুধ চা অর্ডার দিলেন। ব্যাল্কনিতে গিয়ে , চা-বিস্কুটের সাথে একটা জমিয়ে সিগারেট খেলেন। সিগারেট প্রায় শেষের দিকে, অতনু আঙ্কেলের ফোন এলো। ... আমার টানটান উত্তেজনা, কারণ কি যে হচ্ছে, আমার মাথায় কিছু ঢুকছিলও না। এদিক সেদিক থেকে এলোপাথাড়ি যেন গুলিবর্ষণ হচ্ছে। আর আমি একবার ডায়ে, একবার বায়ে, খালি মুণ্ডু ঘুরিয়ে চলেছি – কিচ্ছু বুঝতে পারছিনা।

সত্যি কথা সমস্ত ঘেঁটে যাচ্ছে। বাবাকে বলা হল, বাবাকে সাস্পিসন ধরা হচ্ছে, বাবা এর মধ্যে অপনেন্টের ভূমিকা কোথায় পেলেন? কি যে হচ্ছে? যাই হোক, অতনু আঙ্কেলের সাথে কি কথা হলো, সেটা বলি –

বাবা – হ্যাঁ অতনু, জানলে?

অতনু আঙ্কেল – তুমি একদম ঠিক ছিলে। শিবপ্রসাদ মিলির উপস্থিতির কথা জানেই না। ... কিন্তু আমাকে একটু বলো তো, এর থেকে তুমি কি জানলে বা বুঝলে?

বাবা – শোন তবে অতনু , আসল ঘটনা কি সেটা শোন। ... আমি এই তিন রাজনীতিবিদকে একত্রে প্ল্যেনে দেখি, যেই প্লেনে ওরা আর আমি সকলেই কোচি যাই। ... ওঁরা যে রাজনীতিবিদ , সেটা ওঁদের বেশভূষা দেখেই বুঝি , কিন্তু কারা ওরা , আর কোন পার্টির , সেটা কনফার্ম করার জন্য , আমি যোগাযোগ করি, প্রনবেশ লাহিড়ীকে, মানে অপনেন্টের মাথাকে। ... অর্থাৎ বুঝতেই পারছো , সে ছাড়া, আমি যে ভাইগা হোমসে উঠেছি, কোচিতে আছি, আর এই বিশয়ে রিপোর্ট করছি , সেটা কেউ জানেনা। আর সে মিলির উপস্থিতির কথা জানে না।

অতনু আঙ্কেল – ওকে, তারপর?

বাবা – অতনু, এই কেসের সাথে সরকারের যোগাযোগ , আর সরকারের তরফ থেকেই এই তিন বিদেশী কোম্পানির ম্যানেজারদের ফাঁসানো হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো?

অতনু আঙ্কেল – হান্ড্রেড পারসেন্ট। ... সরকার ওঁদেরকে ডিল থেকে বাদ দেবে বলেই, এই সমস্ত নাটক। কিন্তু সেটা জেনেও আমরা কিছু করতে পারব না।

বাবা – জানি, কিন্তু আমার খটকা লাগছিল , এটা ভেবে যে, অপনেন্ট কি হাতে হাত রেখে বসে আছে। ওরা কিচ্ছু করছে না, এটা ভেবে।

অতনু আঙ্কেল – তারমানে, তুমি বলছো, অপনেন্ট সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। ...

বাবা – একজ্যাক্টলি।

অতনু আঙ্কেল – মানে, এই তিন রাজনীতিবিদ রুলিং পার্টির হলেও , এদেরকে কাজ করাচ্ছে প্রনবেশ লাহিড়ী! ... আর সেই জন্যই এরা সকলেই কলকাতার থেকে ফ্লাইটে কোচি আসে?

বাবা – একদম ঠিক। আর যেহেতু আমি এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে জেনে ফেলেছি , আর প্রনবেশ লাহিড়ী আমাকে পার্সনালি জানেন, আর আমি কি ভাবে কেস শলভ্ করি , তাও জানেন, তাই আমাকে এই রাস্তা থেকে সরানোর জন্য, নিজেরই পার্টির একজন, শিবপ্রসাদকে দিয়ে, এই বয়ান দেওয়ায় যে, আমি সেখানে একজন উপস্থিত ছিলাম, যে সন্দেহজনক। সেখান থেকে তোমরা যে সিবরমনকে কাস্টডিতে নেবে , সে তো ও তোমাদের প্রসেস অফ ওয়ার্কিং জানে , তাই ভেবেই নিতে পারে। ... আর সেই প্রসেস অনুসারে , আমাকে তোমরা শাসিয়ে, এই কেস থেকে দূরে রাখবে। এটা ও ধরে নেয়।

অতনু আঙ্কেল – আর যেহেতু মিলির উপস্থিতি ও জানেনা। ... তাই ও শিবপ্রসাদকে মিলির ব্যাপারে আপডেটও দিতে পারেনি।... হুম বুঝলাম। ... মানে , রুলিং পার্টি আর অপনেন্ট পার্টি এখানে এক হয়ে আছে। ... তারমানে, ওই নিউ ইয়র্ক ফিশিং ডকের থেকে এরা দুজনেই কমিশন খাবে, তাই তো?

বাবা – একদমই তাই।

অতনু আঙ্কেল – তাহলে আমাদের এখন করনিয় কি? কেশটাকে তো রিসলভ্ড দেখাতে হবে, তাই না?

বাবা – প্রনবেশ লাহিড়ী এখন নিশ্চয় কলকাতাতেই?

অতনু আঙ্কেল – হ্যাঁ, ওখানেই। কনফার্ম নিউজ।

বাবা – একটা এপয়েন্টমেন্ট প্রয়োজন। ... ওই তিন পলিটিসিয়ান সিউরলি , কোচিতেই রাজার হালে আছে। ওঁদের অপহরণ হয়নি। ... ওঁদের অপহরণ সাজানো হয়েছে। ... আই মিন। ওই তিন বিদেশী কোম্পানির ফোন হ্যাক করে , ওঁদের হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মেসেজ করে , সেই ফোনকে ফেলে রেখে , দেখানো হয়েছে যে ওঁদের অপহরণ হয়েছে। ... তুমি কোচির সেরা হোটেলগুলো খুঁজলেই , ওঁদেরকে পেয়ে যাবে। ...

অতনু আঙ্কেল – বেশ আমি ওটাই করছি। তারপর?

বাবা – আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নাও লাহিড়ীর। তারপর ওই পলিটিসিয়ানদের খুঁজে বারকরে , ওঁদের থেকে জবানবন্দি নিয়ে নাও, আর যতক্ষণ না আমরা লাহিড়ীর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছি , ততক্ষণ ওই তিন পলিটিসিয়ানদের সেফ অ্যান্ড সিকিয়রড্ কাস্টডিতে রাখো। ... এরপর , আমি আর তুমি লাহিড়ীর সাথে দেখা করে , ওকে জানাবো, ওঁদের সমস্ত কীর্তি আমরা জেনে গেছি। ... তারপরটা এই যে , ওই আমাদেরকে বলবে, কি করে কেসটা সাজাতে হবে। ... যাতে ওই তিন ম্যানেজারও বাঁচে, যাতে ওই তিন পলিটিসিয়ানও ছাড়া পায় আর যাতে এই কেসের নিষ্পত্তি হয়। ... উনি যেই কেস সাজাবেন , সেটিকেই আমি আমার রিপোর্টে পাবলিশ করবো – আর কি?

অতনু আঙ্কেল – ওকে, আমি লাহিড়ীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি , আর সাথে সাথে এই তিন পলিটিসিয়ানকেও খুঁজে নিচ্ছি। ... তুমি , দুদিন পরের ফ্লাইটে ব্যাক করো কলকাতা। টাইমিং ম্যাচ করে , আমিও ওই একই সময়ে ব্যাক করবো। আর তারপর মিশান লাহিড়ী।

বাবা ফোন রাখলেন। জট সমস্তই ছেড়ে গেছে। আমিও সমস্তই বুঝে গেছি। কিন্তু এখনো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছেনা। একটা জিনিসই বুঝলাম , ঘটক আঙ্কেলরা ঠিকই বলেন – মাই ফাদার ঈশ আ সিগনেচার অফ ব্রিলিয়ান্স।

যাইহোক, বাবা প্রথম প্লেনের টিকিট বুক করলেন। আর অন্যদিকে অতনু আঙ্কেলকে বলে , পারমিশন করিয়ে নিই আমি যে , আমিও প্রনবেশ লাহিড়ীর কাছে যাবো। ... বাবা আর চোখে আমার দিকে দেখেছিলেন, যখন আমার হয়ে অতনু কাকু বাবাকে রাজি করালেন , লাহিড়ীর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টে। ... কিন্তু কিছু বলেন নি। ... শেষে দুইদিন আমরা চেন্নাই শহরটা ঘুরলাম।

মহাবল্লিপুরামে নিয়ে গেছিল বাবা। অদ্ভুত পাথর কাটা কাজ দেখিয়েছিল, একুরিয়াম, মিউজিয়াম, আর শেষ দিনে চেন্নাইস্বামী ক্রীড়াঙ্গনে গেলাম। রঞ্জী ট্রফির খেলা হচ্ছিল। ... তাই টিকিট কেটে ঢুকলেও , বাবার পরিচিত হলেন সেই ম্যানেজার। তাই পুরো স্টেডিয়ামটাই ঘুরে ঘুরে দেখি। সেখান থেকে হোটেলে ফেরার সময়েই অতনু আঙ্কেলের ফোন এলো।

অতনু আঙ্কেল – ইউ ওয়ের ফুললি কারেক্ট। আমরা তিনজন পলিটিসিয়ানকে তিনটে সেরা হোটেল থেকে উদ্ধার করেছি। কাস্টডি তে রেখেছি , যেমন তুমি বলেছিলে। ... আর ওঁদের জবানবন্দিও নিয়ে নিয়েছি। ... আই ওয়ান্ডার, হাউ ডিড ইউ নো! ... তুমি একদম ঠিক ছিলে। রুলিং পার্টি , আর অপনেন্ট একসঙ্গে একই মিশনে। ... প্রনবেশ লাহিড়ীই , প্রাইম মিনিস্টারের সুপারিসে , এঁদেরকে পুরো ব্রেন করে , কোচি পাঠিয়েছিল। ... তারপর , ওই হ্যাকিং, ওই সাজানো হোয়াটসঅ্যাপ , আর ওই সাজানো অপহরণ। আর

একদমই প্ল্যানড়, যেমন তুমি বলেছিলে। অর্থাৎ ওই তিন কোম্পানির সাথে ডিল ক্যান্সেল করার জন্যই এই নাটক।

বাবা – আমাদের আজ বিকালে ফ্লাইট। ৫.৩০ তে, কলকাতায় পউছাবো, ৮.৩০ তে। ...

অতনু আঙ্কেল – আজকেই ৯.১৫ রাত্রিতে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ... আমিও ফ্লাইট ধরতেই যাচ্ছি এখন। ... আমি সন্ধ্যা ৭.৩০তে পউছাবো। ... লাউঞ্জে অপেক্ষা করবো তোমার আর মিলির জন্য।

বাবা ফোন রাখলেন। ... আমি কিচ্ছু বলিনি , শুধু আমি যে বিজয় সিংহের একমাত্র কন্যা , এটা ভেবে খুব গর্ব হচ্ছিল। আমার বাবাকে কেউ ন্যাসানাল প্রপার্টি বলে দাবি তো করেনা। কিন্তু আমি বেশ বুঝে গেছি , হি ঈশ নথিং লেশ ডেন এ ন্যাসানাল প্রপার্টি। ... এমন মেধাবী রিপোর্টার , সারা ভারতে আর দুটো আছে কিনা, আমার সন্দেহ।

লাহিড়ীর পুরস্কার

প্লেনে বাবাকে খুব রিলেক্সড় লাগছিল। কানে হেডফোন দিয়ে গান শুনছিলেন। আমার সাথেও অনেক গল্প করলেন। আমি খালি বাবাকেই দেখছিলাম। ... মানুষটার প্রশংসা শুনেছিলাম সকল প্রযোজকদের কাছে। কিন্তু বাবার সাথে এই প্রথম মিশনে এসে সত্যি সত্যি জানলাম , বাবা ঠিক কতটা ব্রিলিয়ান্ট। ... অদ্ভুত ভাবে প্র্যাক্টিকাল উনি, আর অদ্ভুত ভাবে বিচার করতে পারেন। সমস্ত সময়ে নির্ণায়ক বিচার , সব সময়ে, বাস্তবকে মাথায় রেখে বিচার। ... আরো অনেক কিছু খোঁজার চেষ্টা করছিলাম , যার থেকে আমি শিখতে পারি। ...

কিন্তু শিখতে কতটা পারবো জানিনা , কারণ বাবার কথা ভাবলেই , মনের মধ্যে অত্যন্ত গর্ববোধ হচ্ছিল , আর নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। ... এই ভাবতে ভাবতে এই ২০ মিনিটের জন্য বোধহয় , বাবার কাঁধে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পরলাম। ... ঘুমোতে যাবার আগে , একটাই কথা ভাবছিলাম, শুনেছি মা বাবার প্রেমে পরেছিলেন। তা তিনি কি বাবার এমন অদ্ভুত কীর্তি দেখেই প্রেমে পরেছিলেন ? মা-কে প্রশ্ন করতেই হবে সেটা।

আমাদের প্লেন সঠিক সময়ের ১০ মিনিট আগে ল্যান্ড করেছিল। চেকআউট করে লাউঞ্জে গিয়ে দেখলাম , অতনু আঙ্কেল রেডি। উনি বললেন, উনার প্লেন ৩০ মিনিট লেটে এসেছে। যাই হোক, তাও আমাদের ২০

মিনিট আগে এসেছেন উনি। তাই ফ্রেস হয়ে নিয়েছেন। বাবাকে দেখে একটা আলিঙ্গন করলেন , আর আমাকে একটা টু-মিনিটস্ হেয়ার ড্রায়ার উপহার দিয়ে বললেন, “ওয়েলকাম টু সিন ইন্সপেক্সান টিম”। ...

বাবা আর আমি আর ফ্রেশ হইনি। ওয়েট টিস্যু দিয়ে , গাড়িতে যেতে যেতেই মুখচোখ পরিষ্কার করে নিলাম। বাবার ওইসব দিকে কোন হুস নেই। ... ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির সুপুরুষ চেহারা , সাদাটে হলুদ গায়ের রঙ, মুখে সুন্দর একটা হাল্কা দাড়ি, বাবাকে এভ্রি টাইম হ্যান্ডসামই লাগে। ... মোস্ট কেয়ারলেশ এবাওউট হিস লুক্স, বাট আমার চোখে পৃথিবীর সেরা হ্যান্ডসাম ব্যক্তি।

আমাদের গাড়ি, উনিওয়ার্ল্ড সিটি, রাজারহাটে ঠিক ৯.১০এ প্রবেশ করলো। রোসডেলে গেটপাস নিয়ে , টাওয়ার ৩, পাঁচ তোলা। লিফটে উঠে, দেখলাম ঘরের দ্বার খোলা, আর একটা ব্ল্যাকক্যাট দাঁড়িয়ে। অতনু আঙ্কেল কথা বলতে, ভিতর থেকে কনফার্ম করে, আমাদের নিয়ে গেল সে প্রনবেশ লাহিড়ীর ঘরে। ... একটা বার্নিশ করা জার্মান কাঠের টেবিলের পিছনে একটা বেঁটেখাটো গোলগাল ব্যাক্তি বসে। সামনে দুটি সোফা চেয়ার, আর বা-পাশেও তেমনই একটা চেয়ার। ... ঘরের মধ্যে, উনার সুন্দরি সেক্রেটারি ছিলেন। উনি চোখের ঈসারা করতে, তিনি বেড়িয়ে গেলেন, দরজাটা বন্ধ করে। ...

অতনু আঙ্কেল দরজাটা ভিতর থেকে লোক করে দিলেন আর বললেন – স্যার, যদি কোন রেকর্ডার বা সিসিটিভি থাকে, বন্ধ করে দিন। এতে আপনিই সেফ থাকবেন।

লাহিড়ী মশাই রিসিভার তুলে বললেন – সিসিটিভি ৩, অডিও ভিজুয়াল অফ। ... রিসিভার রেখে, সোজা বাবার দিকে তাকিয়ে, আমাকে ঈসারা করে বললেন – কন্যা?

বাবা বললেন – হ্যাঁ, মিলি, যার উপস্থিতি কোচিতে ছিল, সেটা আপনি জানতেন না।

লাহিড়ী মশাই হেসে বললেন – সি ঈশ মোর বিউটিফুল, ডেন ইয়োর ওয়াইফ।

বাবা হেসে বললেন – ইয়েস সি ঈশ।

লাহিড়ী মশাই আবার বললেন – বিজয়, তুমি আমার পিছন আর ছাড়লে না হ্যাঁ! ... ইউ নো ওয়ানথিং... তোমার নাম শুনলেই না আমার ভয় লাগে। ... এই সিবিয়াইদেরও অতো কেয়ার করিনা আমি। কিন্তু তোমার নাম শুনলেই না, আমি একটু নড়েচড়ে বসি।

বাবা আবার মুচকি হেসে বললেন — আর সেই কারণেই তো আমাকে চেপে দিতে চেষ্টা করতে শিবপ্রসাদকে কাজে লাগালেন। আর ওখানেই আপনি ফাঁসলেন। ...

লাহিড়ী মশাই একটু চমকে উঠে বললেন — ইউ ক্র্যাকড্ ডেট টু! ... ওহ গড! ... ভাই , বলো আর কি জেনেছ তুমি। ... তুমি শালা আমার কাছে অন্তর্যামী ভগবান হয়ে গেছ। ... যা করি , সব জানতে পেরে যাও। ... নাও টেল মি। ... আর ডিলে করো না। ... এমনিই হার্ট পেসেন্ট। ... হাইপার টেন্সানে ভুগি। ... আর হার্টে প্রেশার পরলে, বন্ধঘরে তোমরা থাকতে, খুনের দায় লেগে যাবে তোমাদের।

বাবা হাল্কা হেসে বললেন — কোথা থেকে শুরু করবো, সেটা বলুন। প্রথম থেকে না শেষ থেকে।

লাহিড়ী মশাই বললেন — ডেট মিন্স, ইউ নো এভরি থিং! ... ওকে টেল ফ্রম ডা বিগিনিং।

বাবা বলতে শুরু করলেন — নিউ ইয়র্ক ফিশিং ডক প্রথমে সরকারকে রিচ করেন , কিন্তু সরকার তেমন গুরুত্ব দেয়না। ... তারিখটা ৪ঠা জানুয়ারি , এই বছর। রেকর্ড পাওয়া গেছে , পার্লামেন্ট অথরিটির কল রেকর্ড থেকে। ... আমি উদ্ধার করি সেটা ১৭ই মার্চ, থ্রু আ কল ফ্রম কোচি। ... এরপর, প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ মরাজি মশাই ভেবে নেন যে এই ডিলটা উনি নিজে করবেন , সরকারকে বলে নয়, পার্টির তরফ থেকে, তাহলে কমিশনটা পার্টি আর উনি পাবেন। ... কিন্তু পাশাপাশি এও ভেবে নেন যে , এই কেসটা এতটাই বড় যে, অপনেন্ট অর্থাৎ আপনাকে সঙ্গে না নিলে, উনি ফেঁসে যাবেন, কারণ আপনি ছেড়ে দেবেন না।

তাই আপনাকে কল করে, এই কমিশনের কথা বলেন। আপনি আপনার ও পার্টির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল , তাই কেসটা একসেপ্ট করে নেন। ... ভেবেছিলেন , সহজেই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু এরই মধ্যে বেজিং থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফোন এসে যায়, একরডিং টু পার্লামেন্ট কল রেকর্ডস অফ ১৫থ জানুয়ারি , ডিস ইয়ার। ... সেই দিনেই আপনার কাছে কল আসে মরাজি মশাইএর, আর আপনি উনাকে প্ল্যান বলে দেন, যা উনাকে করতে হবে, আর যা আপনি করবেন।

সেই প্ল্যান অনুসারে, যেই তিনটি কোম্পানিকে বেজিং ঠিক করে দিয়েছিল , সেই তিন কোম্পানির নামে পার্লামেন্টে বিল পাশ করানো হবে। ... তারপর, ওয়েস্ট করিডর থেকে একটা স্ট্রাইক এরেঞ্জ করা হবে। আর সেই স্ট্রাইকে সরকারের লোক হয়ে যাবে তিনজন দুধে রাজনীতিবিদ , যারা ভোটে হেরে যাবার কারণে নট আ ন্যাসানাল ফিগার, আর ওঁদেরকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠাবেন আপনি। তাই ওরা পার্টির ব্যানার বা উত্তরীয় গায়ে চাপাবেনা, যাতে কোন পার্টি থেকে যাচ্ছে, সেটা ঠিক না করা যায়।

এরপরের প্যানও আপনারা দুইজনে রেডি করে নেন। ওরা ওখানে যাবে , কিন্তু ওখান থেকে ফিরবেনা। হ্যাক করা হবে , তিন বিদেশী কোম্পানির ইন্ডিয়ান রিপ্রেসেন্টেটিভ-এর ফোন , আর সেখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপ করে, অপহরণের নাটক করা হবে। ... স্ট্রাইকের অজুহাতে ডিলকে ১০০ পারসেন্ট শেয়ার থেকে ৩০ পারসেন্টএ নিয়ে যাওয়া হবে। তাতে ওরা রাজি হবেনা , আর ফলে ওরা ওই তিন রাজনীতিবিদকে অপহরণ করেছে, এমন কেস সাজানো হয়, আর সেই অপহরণের মামলার ফলে সরকার বিল প্রত্যাহার করে নেবে, যার ফলে, ডিল উইথ বেজিং উইল বি ক্যান্সেলড়, আর ডিল উইথ নিউ ইয়র্ক ফিশিং ডক ওয়িল বি ফাইনালাইজড়।

সমস্ত কিছু সেই রকমই হলো , যা আপনাদের প্ল্যান ছিল। কিন্তু মাঝে ঢুকে গেছিলাম আমি , এই বিজয় সিংহ। ... মরাজি মশাই আমাকে চেনেন না, কিন্তু আপনি আমাকে খুব ভালো করে জানেন। ... ইউ নো , আই ক্যান বি ডা অনলি গেমচেঞ্জার হেয়ার। ... আর তাই , আপনি আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করলেন। আর তাই শিবপ্রসাদকে দিয়ে সিবিয়াইএর সামনে বলালেন যে, আমি ওখানে উপস্থিত একজন সাস্পিসাস ব্যক্তি ছিলাম।

আমার নাম ও আমার হোটেলের নাম আমিই আপনাকে বলেছিলাম যখন ওই তিন রাজনীতিবিদের বিশয়ে আপনার থেকে জানি। তাই আপনি শিবপ্রসাদকে দিয়ে এই দুই তথ্যই সিবিয়াইকে বলতে পারেন। সিবিয়াই তদন্ত করে, হোটেলের ম্যানেজারের থেকে আমার গাড়ির নম্বর জেনে সিবরমন , অর্থাৎ আমার ড্রাইভারকে ধরে। ... কিন্তু লাহিড়ী মশাই , আমি যে অতো কাঁচা কাজ করিনা! ... আমি তো মিলি , মানে আমার কন্যার উপস্থিতির কথা বলিনি আপনাকে। আর তাই আপনিও শিবপ্রসাদকে সেই কথা বলতে পারেন নি।

অতনু বাগচি যখন সিবিয়াই অফিসার হলেন কেশটাতে , তখনই আমি বুঝেছিলাম , নিশ্চিত রূপে কোন বাঙালি এই কেসের তদারকি করছেন। ... তার সুপারিসেই বাঙালি সিবিয়াই অফিসারকে ইন-চার্জ করা হয়। ... আর এতো বড় কেশে , আমি বিরোধী দলের হস্তক্ষেপ খুঁজছিলাম , তাই আপনার হস্তক্ষেপকে সহজেই ধরে ফেলি। ... কিন্তু আপনি ভাবতে পারেন নি যে অতনু আমার নিকট বন্ধু হবে। ... কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য যে, অতনু আমার খুব কাছের বন্ধু, তাই আমি সমস্ত কথাই জানতে পেরে যাই। আর যখন ওর থ্রুদিয়ে শিবপ্রসাদ যে আমার উপস্থিতি জানে , আমার হোটেল জানে, আর কিচ্ছু জানে না দেখলাম , তখন আপনার নাম তো আমার কাছে জ্বলজ্বল করে সামনে চলে এলো।

লাহিড়ী মশাই – হ্যাঁ শিবপ্রসাদকে আমিই কাজে লাগিয়ে ছিলাম , বাট, ইয়োর আদার ওয়ার্ডস আর বেশলেশ। ... ফোন হ্যাক , কোম্পানির মালিকদের ফাঁসানো। অপহরণের নামে নাটক – হোয়াট ঈশ ডিস! ... যত সব ননসেন্স। ... তোমার মত এমন এফিসিয়েন্টের থেকে এমন মুর্খামি আমি আশা করিনি।

বাবা হেসে বললেন – অতনু।

অতনু আঙ্কেল তিন রাজনীতিবিদের জবানবন্দির রেকর্ড চালিয়ে দিলেন। লাহিড়ী মশাই-এর মুখ ছোট হয়ে গেল। ...

বাবা হাসতে হাসতে বললেন , - এটা যে একটা মেনিপুলেশান , সেটা আমি একা নয় , সিবিয়াই অফিসাররাও বুঝেছে লাহিড়ী মশাই। ... তবে ওরা ভাবছিল যে, কি করে ওই তিন রাজনীতিবিদের সন্ধান পাবেন। ... আমি ওঁদেরকে বলি যে যখন তিনজন কোচি ছাড়েন নি, তখন কোচিরই কোন সেরা হোটেলে রাজার হালে আছেন তাঁরা। ... সিবিয়াই ওঁদেরকে গোপনে উদ্ধার করে , ওঁদের জবানবন্দি নিয়ে নিয়েছে লাহিড়ী মশাই। ... এবার আপনি কি বলবেন। ... এম আই আ ফুল!

লাহিড়ী মশাই এবার কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন – আই আম নট এলোন ইন ডিস কেশ। ... বিলিভ মি।

বাবা হেসে বললেন – আরে আপনি এতো ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ... আমরা জানি, বুঝি, ... সবটাই বুঝি। ... আপনি ও প্রধানমন্ত্রী মিলে যে বেজিং-এর সাথে এমন ষড়যন্ত্র করলেন , সেটা বেজিং জানলে, আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পরটে বিশাল ঘাটতি হবে। ... তাই এই কেস আমরা ডিসক্লোজ করার কথা ভাবিনি। যদি সেটাই ভাবতাম, তাহলে তো সিবিয়াই তিন রাজনীতিবিদকে উদ্ধার করেছে , এটা একটা বড় নিয়ুজ এতক্ষণে হয়েই যেত।

লাহিড়ী মশাইয়ের মুখ লাল। উনি বললেন – তবে?

বাবা – আমার কাছে একটা প্রস্তাব আছে। ... প্রধানমন্ত্রী তো এতক্ষণ সমস্তই শুনছেন , আপনি যে সিসিটিভি আগেই বন্ধ রেখেছিলেন, আর কল করে যে উনাকেই কোড ওয়ার্ড বলে , ফোনটা না রেখেই, হাল্কা করে রেখেছেন , তখনই বুঝেছি। ... তাই উনার থেকে পারমিশন নিয়ে , ওই তিন কোম্পানির ম্যানেজারকে অপহরণের চেষ্টা করার জন্য হুমকি দিয়ে ছেড়ে দিন। আর যাতে তারা মুখ বন্ধ রাখে , তার জন্য আপনাদের হিউজ প্রফিট থেকে একটু ভাগ দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন। ... নিউজ আসবে , অপহরণের চেষ্টা। এতে বেজিংও মুখ লুকাবে। আপনাদের ডিল উইথ নিউ ইয়র্কও হয়ে যাবে। আর সিবিয়াই অপহৃত

রাজনীতিবিদদের উদ্ধার করেছে, তাই গোল্ড মেডালও পাবে। ... কি, সব ওকে হয়ে যাবে না? ... ফোনটা তুলে কথা বলে নিন, স্যার মরাজির সাথে।

লাহিড়ী মশাই-এর কান লাল। প্রেশার খুব বেড়ে গেছে। ... কথা বলে নিলেন রিসিভার তুলে। ... সমস্ত কিছু বলে, আমাদের বললেন। পাঁচ মিনিট ওয়েট করতে হবে তোমাদের । এই বলে আরেকটা ফোন করলেন, বোধহয় সেক্রেটারিকে। কারণ দুই মিনিটের মধ্যে সেক্রেটারি কিছু পাঁচশোর বান্ডেল দিয়ে গেল লাহিড়ী মশাই-এর টেবিলে। তারপরে পরেই ফোন এলো, বোধহয় মরাজি মশাই-এর।

ফোন রেখে লাহিড়ী মশাই বললেন - শাসানির কাজটা সিবিয়াই-ই করবে। ক্যাশ ১০ কটি করে তিনটি ম্যানেজারকে দেওয়া হবে। আপনাদের ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ... কনফার্মেশনএর জন্য। ... টাকাটা নিউ ইয়র্ক ফিশিং ডকই দিচ্ছে।

বাবা হেসে বললেন – তাহলে আপনাকে এই পঞ্চমবার বাঁচালাম, কি বলেন লাহিড়ী মশাই?

লাহিড়ী মশাই হেসে বললেন – টু মি, ইউ আর আ গড , ইউ নো। ... তবে এবারে আমি খালি হাতে তোমাদের ছাড়বো না। ... মিস্টার বাগচি, এটা আনঅফিসিয়ালি আমার তরফ থেকে। ... এই বলে, তিনটি পাঁচশোর বান্ডেল এগিয়ে দিলেন অতনু আঙ্কেলের দিকে।

অতনু আঙ্কেল বললেন – স্যার, আই আম আ স্লেভ অফ গভার্নমেন্ট। ... তাই আমি এই টাকা নিতে পারবো না।

লাহিড়ী মশাই বললেন – ওকে, কত নিতে পারবে। ... কিছু তো তোমাকে নিতেই হবে । ... এই ভাবে, আমাদের কেশটাকে ঠিক করলে।

অতনু আঙ্কেল বললেন – ঠিক আছে, স্যার একটা বান্ডিল করে দিন। ... তবে একটা কথা আমাকে বলতেই হবে। ... বিজয় সিংহ না থাকলে, আমি কিচ্ছু করতে পারতাম না।

এবার লাহিড়ী মশাই বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন – বিজয়, ইউ সুড নট সে নো টু মাই প্রপোজাল। ... এই বলে অতনু আঙ্কেলকে একটা পাঁচশোর বান্ডিল দিয়ে , বাবাকে চারটে ওরকম বান্ডিল দিলেন। ... আমার চোখ তো ছানাবড়া। একবারে দুই লক্ষ টাকা!

বাবা বললেন – স্যার, আমি সুখহাটের তরফ থেকে কেসটা হ্যান্ডেল করছিলাম , আর ডে আর পেয়িং মি ফর ডেট।

লাহিড়ী মশাই মুচকি হেসে বললেন – সঠিক খবর তো তুমি দেবেনা। তাই ফুল পেমেন্টও সে দেবে না। ... কত দিয়েছিল? ২৫ হাজার তো? তাহলে খুব বেশী হলে, ও এই খবরের জন্য ১৫-২০ দেবে। ... আর বিজয়, তুমি আমাকে এই নিয়ে ফিফথ্ টাইম শেভ করলে। ... তাই জন্য এই এক লাখ তো তোমাকে নিতেই হবে। ... আর বাকি এক লাখ, আমার একটা কেস হ্যান্ডেল করার জন্য, আমার এডভান্স।

বাবা ভ্রু কুঁচকে বললেন – কেশ!

লাহিড়ী মশাই একটু গভীর মুখ করে বললেন – হ্যাঁ, আমার একটা রিলেটিভের মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ... সি অয়াজ আ সেন্ট টাইপ। ইন্টারন্যাসানাল রাধে এসোসিয়েশন , মানে আইআরএতে সে গেছিল। ... কিন্তু তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। ... একটু গোপনীয়তা রাখতে হবে। তাই এই কেসটা আমি সিবিয়াইকে দিতে পারছিনা। ... আর কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আমি তেমন বিশ্বাস করিনা। ... বিজয়, যদি কেউ সেই মেয়েটির সন্ধান দিতে পারে, তবে সেটা তুমিই। ... সো একসেপ্ট ডিস কেশ।

বাবা বললেন – কিন্তু স্যার, আমি কোন কেসের জন্য আডভান্স ম্যাক্সিমাম ২৫ হাজার নিই। ... যদি অতে হয়ে যায়, তো ফাইন, নাহলে আরো ম্যাক্সিমাম ১০ হাজারের বেশী আমি আজ পর্যন্ত নিই নি।

লাহিড়ী মশাই বললেন – ইউ নো, ইউ আর আ ফুল , ইন টার্মস্ অফ ডিলিং উইথ মানি। ... তুমি যেই কাজ করো, সেগুলো এক লাখের কমে হবারই কথা নয়। ... এনি অয়েজ , ওটা তোমার আর নিউজ এজেন্সিদের ব্যাপার। ... বাট , আমি তোমাকে এক লাখ টাকা এডভ্যান্স দিলাম। ... যদি মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনতে পারো , আমি তোমাকে আরো চার লাখ দেব। ... এটা আমার কেশ । সো, এর রেটও আমিই ঠিক করবো।

বাবা রাজি হলেন। আমার খুব আনন্দ হলো। ... একটা কেস শেষ হতে না হতেই , আরো একটা কেস পেয়ে গেলাম। ... আর সঙ্গে সঙ্গে, দু লাখ টাকা। ... আর কেস শেষ হলে, আরো চার লাখ টাকা। ... হ্যাঁ আমারও মনে হলো এবারের কেশটাতেই , বাবা বড্ডই কম টাকা নেন। ... আর বাবা কখনোই ফেল করেন না। তাই ৪ লাখ টাকাও বাবারই হবে। ... তবে টপ সিক্রেট। মাকেও বলা যাবেনা।

এক ঘণ্টা হয়ে গেলে, মরাজি মশাইএর ফোন এসে গেল। ... তিনটে কোম্পানির মালিককে কাল সকালে ১০ কটি করে টাকা দিয়ে , ছাড়া হবে। ... বেজিং থেকে তিনটে কোম্পানিকে কড়কানো হয়েছে। তাই তিনটি মালিককেই কোম্পানি থেকে তারিয়ে দেওয়া হয়েছে। ... কিন্তু তাঁদের আপত্তি নেই তাতে , কারণ তাঁদের কাছে ক্যাশ ১০ কটি টাকা রয়েছে।

আমারা সেখান থেকে বেরলাম রাত্রি ১২টা। গাড়ি চলে গেল তপসিয়া , ঘটককাকুর বাড়ি। ... গাড়িতে আমি আর অতনু আঙ্কেল রইলাম। বাবা ভিতরে ঢুকে , প্রায় ৫৫ মিনিট পরে বেরুল। ... পরেরদিন সকালে, এই খবর একমাত্র সুখহাটে বেরুল। হেডলাইন – বিদেশী কোম্পানির কেলেঙ্কারি , তিন রাজনীতিবিদের মুক্তি।

খবরের ভিতরে বলা, তিনটি কোম্পানির মালিক কথোপকথনের জন্য, এই তিন রাজনীতিবিদকে নিজেদের কাছে রেখেছিলেন। ... এখন তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে। ... এই কাজ কোম্পানির পারমিশন ছাড়া করার জন্য, তিনটি মালিককে কোম্পানির চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। ... মৎস্য বিল ক্যান্সেল। আর সমস্ত ঘরের লোক, নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেছে। কেসের নিষ্পত্তি। ...

বাবাকে কিছু বলতে হলো না। মিস্টার ঘটকের খবরের কাগজই প্রথম এই খবর ছাপে। আর উনার থেকেই অন্য কাগজেরা কেনে এই খবর। তাই উনি বিশাল লাভ করেছেন। আর সেই কারণে বাবাকে ২৫ থেকে কিছু ফেরাতে হলো না। বরং আরো ১৫ হাজার টাকা নিজে থেকে দিয়ে গেলেন ঘটক কাকু।

বিকেলে অতনু আঙ্কেল এসেছিলেন। আমাকে বললেন , প্রথম কেসে বাবাকে সামনে থেকে দেখে কি বুঝলে?

আমি বললাম – অসাম! ... কি করে যে, এক স্থানে বসে বসে, সমস্তটা বাবা দেখতে পায়, আমার কাছে এটাই সব থেকে বড় রহস্য।

অতনু আঙ্কেল হেসে বললেন – তুমি এখনও জানোই না, তোমার বাবা একটা রেয়ার এলিমেন্ট। ... সারা ভারত খুঁজলেও, এমন রিপোর্টার্র খুঁজে পাবেনা। ... ইউ সুড বি প্রাউড ফর হিম। আমি হেসে বললাম – প্রাউড নয়, আমি তো উনার ফ্যান হয়ে গেলাম। ... অতনু আঙ্কেল আর মায়ের হাসি। ... বাবা বেড়িয়ে আসছিল, নিজের বারির জামা কাপর পরে। ... বেল বেজে উঠলো। ... পরের কেস নাকি!

অনাশ্রমে আশ্রিত

বেল বাজতে আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে গেলে, বাবা বললেন – মিলি, তুই পাশের ঘরে যা, আর আমি না ডাকলে, কোন কারণে একবারও ঘর থেকে বার হবিনা।

আমি একটু প্রতিবাদী দৃষ্টি রাখলে, বাবা বললেন – কেসের জন্য এটা প্রয়োজন।

সেই কথা শুনে, আমি পাশের ঘে চলে গেলে , বাবা দরজা খুললেন। পাশের ঘর থেকে যা শুনলাম , আর পরে বাবার থেকে যা জেনেছিলাম, সেই মিলিয়ে বলি কি হলো সেখানে –

সিআইডিতে থাকা, বাবার খুব কাছের বন্ধু , রথিন কাকা এসেছিলেন। রথিন কাকা , বাবা, আর অতনু আঙ্কেল, এঁরা তিনজন বহু কেস একসাথে হ্যান্ডেল করেছেন, তাই থেকেই এঁদের ঘনিষ্ঠতা। মায়ের থেকে পরে জেনেছিলাম, বাবাকে নাকি বিবাহের জন্য এই রথিন কাকাই রাজি করিয়েছিলেন। প্রথমে বাবা , বিবাহের নাম শুনেই পিঠটান দিয়েছিলেন। মায়ের ভাষায় , প্রচণ্ড ইনটেলিজেন্ট, এবং ভয়ঙ্কর রমাঞ্চক হলেও, বাবা নাকি অত্যধিক ভাবে আনরোম্যান্টিক।

তবে রথিন কাকা , একা আসেন নি । তাঁর সাথে এসেছিলেন , ইরা, অর্থাৎ ইন্টারন্যাসানাল রাধে এসোসিয়েশনের প্রধান, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের নয়াভূমির যে ইরার মঠ আছে , সেই মঠের মাথা, মহারাজ গবিন্দসখি। বাবা সকলকে নিয়ে এসে বসাতে, প্রথমে নাকি ওই মহারাজ অতনু আঙ্কেলকে দেখে, খানিক ইতস্তত করছিলেন। তারপর রথিন আঙ্কেল উনাকে সিবিয়াই অফিসার বলে পরিচয় প্রদান করাতে , উনি খানিক রিল্যাক্সড হয়ে বলতে শুরু করেন।

কেমন দেখতে সেই মহারাজকে , তা আমি দেখিনি। তবে পরে শুনেছিলাম , শ্যামলা গায়ের বর্ণ, কিন্তু দেহের চামরা অত্যন্ত তৈলাক্ত ; মাথা ন্যাড়া, আর পরনে গেরুয়া পোশাক। মাকে উনার ব্যাপারে বেশ কিছুদিন গদগদ দেখেছি; উনি ভক্তি ভরে নাম নিতেন, বলতেন সন্ন্যাসী মহারাজ। যদিও, উনি কি বলেন, তা আমি পাশের ঘর থেকে কান খারা করে শুনি।

উনি বললেন – পুত্র রথিনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম আমি বেশ কিছুদিন আগে। ... সেই আমাকে নিয়ে এই বেলেঘাটার বাড়িতে নিয়ে আসে। আসলে, একটা কেস নিয়ে আমরা মঠ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিচলিত বাবা। ... একটি মাসে ৪৮টি কন্যা মঠ থেকে উধাও – কোন সন্ধান নেই!

বাবা বললেন – শুধু নয়াভূমির মঠ থেকে ৪৮!

মহারাজ – না না, একটাও এখানের নয় বাবা। কিন্তু এটাই তো হেড কোয়ার্টারস , তাই এখানেই চাপ বাড়ছে।

বাবা বললেন – কোথায় কোথায়, কবে কবে এই মিসিং ব্যাপারটা হয়েছে বলতে পারেন?

মহারাজ বললেন – বাবা, আগ্রা থেকে এই চার সপ্তাহে ৮ জন মিসিং , চণ্ডীগড় থেকেও এই সংখ্যা ৮ ; দিল্লি থেকেও ৮। ... অন্যদিকে বাঙ্গালুরু থেকে ৮, উজ্জয়েন থেকে ৮, আর নাগপুর থেকে ৮।

বাবা – পুরোটা এই এক মাসে? ডেট অফ মিসিংটা বলতে পারবেন?

রথিন কাকা এবার বললেন – দাঁড়াও, আমি নোট করে রেখেছি। ... হ্যাঁ, টু ইচ, উজ্জয়েন, নাগপুর অ্যান্ড বাঙ্গালুরু ... ডেটটা হলো ২২শে ফেব্রুয়ারি , পয়লা মার্চ, ৮ই মার্চ, আর রিসেন্টলি, ১৫ই মার্চ। ... অন্যদিকে, ...

বাবা – দাঁড়াও দাঁড়াও, ২২শে ফেব্রুয়ারি একই সাথে তিনটে মঠ থেকে ২জন করে মিসিং!

মহারাজ – না বাবা, সেইদিনকে ডায়রি করা হয়েছে। কারুর সেদিনই হয়েছে, আবার কারুর, তার আগের দিন, বা কারুর তার আগের আগের দিন।

বাবা – হুম, আর নর্থে!

রথিন কাকা – হুম, টু ইচ ফ্রম চণ্ডীগড়, দিল্লি, আর আগ্রা, অন ডি ডেট অফ ২৩রড ফেব্রুয়ারি, ২য় মার্চ, ১০ই মার্চ, আর ১৭ই মার্চ।

বাবা বললেন – ওই একই রকম, একদিন বা দুদিন আগে!

মহারাজ বললেন – হ্যাঁ বাবা।

বাবা একটু থেমে বললেন – আচ্ছা কন্যাগুলির নাম আছে তোমার কাছে রথিন?

রথিন কাকা – হ্যাঁ আমি পুরো মিসিং রেকর্ড নিয়ে এসেছি।

বাবা – আচ্ছা, আমাকে দেখে বলতে পারো, কোন কন্যা কি এর মধ্যে রয়েছেন, যার সারনেম লাহিড়ী?

রথিন কাকা – উম ... হ্যাঁ, এই তো, ... শ্যামলী লাহিড়ী। ... মিসিং ফ্রম দিল্লি।

বাবা – ওকে। দেখছি কি করা যায়। তবে আমার প্রশ্ন এই যে , আমার মহারাজের কাছে প্রশ্ন এই যে , সমস্ত কিছু ছেড়ে, আমার মত এক রিপোর্টারের কাছে কেন?

মহারাজ – বলতে পারো বাবা, সুপারিশে এসেছি। মুখ্যমন্ত্রী, স্যান্যাল মহাশয়ের সুপারিশে আমার এখানে আসা। পুত্র রথিন আমাকে এখানে আস্তে সাহায্য করেছে মাত্র।

বাবা – আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখছি, কতটা কি করতে পারি। আপনাকে পরবর্তীতে , আমার কাজ নিয়ে আপডেট করে দেব।

মহারাজ উঠে গেলেন। রথিন কাকা উনাকা গাড়িতে তুলে দিতে গেলেন। কিন্তু ফিরলেন একাকী নয় , অবিরামখবরের প্রযোজক, দাশগুপ্ত আঙ্কেলকে নিয়ে এলেন। আমাকে বাবা এবার ডেকে নিয়েছেন ঘরে। আমি এসে বললাম, সবটাই শুনেছি।

দাশগুপ্ত আঙ্কেল এসেই বললেন – এই কেসটা তোমাকে হ্যান্ডেল করতে হবে সিন। ... আমার এই কেসটার পুরো কভারেজ চাই। আমি কিছু শুনতে চাইনা, এডভান্স নিয়ে এসেছি। এই নাও ১৫।

বাবা বললেন – এ তো কোন বড় র‍্যাইকেট কাজ করছে। ... এই কাজ তো সিয়াইডি, সিবিয়াই-এর কেস। ... আমি একা একজন রিপোর্টার এখানে কিই বা করতে পারি?

ঈশ, বাবা কেসটা নেবেন না! – আমি ভাবলাম।

দাশগুপ্ত আঙ্কেল – এসবের মানে কি? মুখ্যমন্ত্রীকে তোমার ব্যাপারে বলে , তোমাকে এই কেসে ইনক্লুড করার জন্য রাজি করিয়েছি। পুরো সিআইডি টিম, তোমার নেতৃত্বে কাজ করবে।

বাবা বললেন – বলেন কি দাশগুপ্তদা। এটা হয় নাকি ? সিয়াইডি টিম কখনো একটা রিপোর্টারের হয়ে কাজ করতে পারে! কস্মিনকালে এমন শুনেছেন আপনি!

দাশগুপ্ত আঙ্কেল – কস্মিনকালে যে তোমার মত রিপোর্টারও আসেনি সিন! ... আসলে নিশ্চয়ই শোনা যেত।

রথিন কাকা – আমরা এই কেস নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মাথার উপর হাতুড়ী পেটাচ্ছেন। বলছেন – কেন্দ্র থেকে এই কেসের জন্য প্রেশার বাড়িয়েই চলেছে। আমরা বললাম , মঠের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে, আমরা জানতে পাচ্ছিনা। তো উনি বললেন , কোন রিপোর্টারকে সেখানে পাঠিয়ে খবর নাও, কিন্তু তাঁর এই কেসের নিষ্পত্তি চাই। সেই জন্যই আমরা দাশগুপ্তদার দ্বারস্থ হই। আর উনি বলেন এই কাজ যদি কেউ করতে পারে, তা তুমিই। তবে পুরো সিয়াইডি-টিমকে তোমার সঙ্গ দিতে হবে।

দাশগুপ্ত আঙ্কেল – ইউ ডোন্ট নো সিন , কতটা স্ট্রাগেল করতে হয়েছে আমাকে এই ব্যাপারে। ... রিপোর্টার সিয়াইডি টিম চালাবে শুনে মুখ্যমন্ত্রী তো আমাকে গালাগালই দিয়ে দিলেন। ... তারপর , আমি উনাকে তোমার কিছু কিছু কেসের কথা বললাম। রথিনও আমার সঙ্গ দিয়েছিল সেখানে। ... তারপর উনি রাজি হলেন।

রথিন আঙ্কেল – কালকে চেতলায় উনার বাড়িতে সকাল ৮.৩০টায় তোমাকে আর আমাকে যেতে হবে । আমাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে , আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। মুখ্যমন্ত্রী তোমার সাথে পার্সোনালি কথা বলবেন কিছু, আর আমাকে এই কেসের ইন-চার্জ করে এপয়েন্ট করবেন।

বাবা চিন্তিত ভাবে বললেন – তাহলে তো আমার কোন কথাই চলবেনা এখানে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ, উনার আদেশ তো মানতেই হবে।

দাশগুপ্ত আঙ্কেল বললেন – নাও এবার তো এড্‌ভান্সটা ধর।

বাবা বললেন – সরকারের হয়ে কাজ করতে হবে। তবে আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন?

দাশগুপ্ত আঙ্কেল – আমি নয়, আমার সংবাদপত্র মানে অবিরামখবর এই পেমেন্ট দিচ্ছে তোমাকে , কারণ এই খবর অবিরামখবরের এক্সক্লুসিভ কভারেজ হবে।

বাবা ব্যাকা ঠোঁটে হেসে বললেন – ও আচ্ছা, বুঝলাম। মানে এই কেসে আমি অভিমন্যু। একদিকে সিআইডি, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী, অন্যদিকে বিরোধী দল , তারপর আপনি মানে অবিরামখবর , আর শেষে মহারাজ গোবিন্দসখি। পুরো চিড়েচ্যাপটা অবস্থা। ... এবার আমি অর্জুন হয়ে ব্যূহ থেকে বেড়িয়ে আস্তে

পারি না ব্যূহেই আটকে মরে অভিমন্যুর মত শহীদ হই, সেটা দেখার। ... ঠিক আছে রথিন। কাল তাহলে চেতলার সেই বিখ্যাত বাড়ি, রাসবিহারীতে আমি আর মিলি তোমায় ঠিক ৮টায় মিট করছি।

মা বললেন – রথিনদা, আজকের ডিনারটা এখানেই করে যান না। দাশগুপ্তদাও রয়েছেন , অতনুদাও রয়েছেন। একসাথে ডিনারটা করা যাবে নয়।

রথিনকাকা বললেন – এখন নয় মাধবি। এই কেস আগে সলভ্ হোক , তারপর জমিয়ে তোমার হাতের মুখরোচক রান্না খাবো। ... আসলে আমার মাথা এখন মুখ্যমন্ত্রী খেয়ে নিয়েছেন। ... যতক্ষণ না বিজয়কে উনি দায়িত্বভার অর্পণ করছেন, ততক্ষণ আমার ঘুম নেই।

মা বললেন – এটা কিরকম কথা! আপনারা সকল দিগগজরা থাকতে , উনি তো শুধুই আপনাদের পেটেলদার, তাই না।

রথিনকাকা হেসে উঠে বললেন – ২০ বছর হয়ে গেল সংসার করছো মাধবি , এখনও এই মানুষটাকে চিনলে না! ... তোমার মনে হয় , এই মানুষটা যেখানে থাকবেন, সেখানে উনি পেটেলদার হতে পারেন। ... আমি তো বাজি রেখে বলতে পারি, যদি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উনার সাথে কাজ করেন, তবে মুখ্যমন্ত্রীই উনার পেটেলদার হয়ে যাবেন। ... কি বলো অতনু।

সকলের উচ্চৈঃস্বরে হাসির শেষে অতনু আঙ্কেল বললেন – ওর বুদ্ধি আর তার থেকেও সেই বুদ্ধির গতিটাই এমন যে , আমাদের মত পেশাদার ক্রিমিনাল স্পেশালিষ্টরাও ওর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই।

দাশগুপ্ত আঙ্কেল বললেন – একজ্যাক্টলি, সেইটাই তো স্যান্যালকে বললাম।

স্যান্যাল মানে মুখ্যমন্ত্রী। উনি নাকি দাশগুপ্ত আঙ্কেলের কলেজের ব্যাচমেট ছিলেন। দাশগুপ্ত আঙ্কেল আবার বললেন – বৌদি, এই কেসটেঁস সল্ভ হয়ে গেলে কিন্তু আমি আর রথিন এসে একদিন জমিয়ে ডিনার করে যাবো। ... আসলে আপনার হাতের রান্নাকে আমি না বলতে পারিনা। ... কিন্তু হ্যাঁ বেচারা রথিন সত্যিই খুব চাপে আছে। ... তাই আজ না , আজ খাওয়াটা ঠিক এন্জয় করা যাবে না। ... কি বলো রথিন।

সেদিনের মত অতনু আঙ্কেল ছাড়া সকলে উঠে পরলেন। অতনু আঙ্কেল আজকে আমাদের বাড়িতেই ডিনার করবেন। বাবা যে এই কেসটা নিলেন , তাতে অতনু আঙ্কেলের খুব আনন্দ হয়েছিল । আমার আনন্দের কথা তো ছেড়েই দিলাম। আমার আনন্দ তো যেই রোমাঞ্চ হবে, তার জন্য। তবে অতনু আঙ্কেল বাবার উদ্দেশ্যে বললেন – বিজয়, তোমার এমন একটা কেস পাওয়াটা খুব দরকার ছিল।

বাবা বললেন – কেন? এমন কেন বললে ? ... না, এই কেস খুবই জটিল , বুঝতেই পারছি। ... তবে , তোমার ইঙ্গিত যেন অন্যদিকে।

অতনু আঙ্কেল হেসে বললেন – তোমার মত ট্যালেন্টের পাবলিসিটি না হলে না, মনটা কেমন খচ খচ করে বুঝলে।

বাবা একটা হাল্কা জোরে নিশ্বাস ছেড়ে হেসে বললেন – কিন্তু আমাদের কাজে পাবলিসিটি হলে, কাজ করা যে অসুবিধা হয়ে যায় অতনু! ... যত লোকে আমাদের না চেনে , ততই আমাদের কাজ করা সহজ হয়ে ওঠে, কি তাই না!

অতনু আঙ্কেল – হ্যাঁ কথাটা ঠিকই, কিন্তু তাও বিজয়, লোকের জানা উচিত, ব্রিলিয়ান্সি কত প্রকার হয়। তুমি তার একটা অনবদ্য নিদর্শন, ... আমি জানি, তুমি মানবে না, কিন্তু এটাই সত্যি।

কেউ যখন বাবার প্রশংসা করেন, তখন মায়ের চোখের দিকে আমি তাকালে দেখি একটা চমক দেখা যায়। ... বুঝতে পারি, উনার খুব গর্ব হয় তখন। কিন্তু বাবার এই জিনিসটা ভালো লাগেনা। প্রশংসা করলে , উনি সেগুলোতে যেন গা-ই করেন না। লোকে নিজের মার্কেটিং করে করে প্রশংসা কেনে, আর ইনি ফ্রিতে প্রশংসা পান, তাও পাত্তা দেন না। ... মা মাঝে মাঝে রেগেও যান এই প্রশংসা থেকে দূরে থাকার মনোভাবে আর তখন ঠিকই বলেন - যাচা অন্নের দাম নেই। ... তোমাকে সকলে যেচে প্রশংসা দেয় তো , তাই তোমার কাছে তার কদর নেই।

যাই হোক, অতনু আঙ্কেল গেলেন তখন রাত্রি ৯.৩০। বাবা কি একটা পড়াশুনা করতে যাচ্ছিলেন ; মা যেন উনারও মা। যেমন আমাকে দাবরে ঘুম পারিয়ে দেন, তেমন বাবাকেও দাবরে ঘুম পারিয়ে দিলেন। আমার কাছে এসে বললেন – তুইও ঘুমিয়ে পর। তোরও তো আগের কেসের সময়ে ভালো ঘুম নেই। দেখতে না দেখতেই পরের কেস এসে গেল। আবার তো ঘুম হবেনা। নে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পর। ... শুয়ে পরলাম। ঘুম আসার আগে একটাই কথা মনে হচ্ছিল। মা কি করে জানলেন , কেসের সময়ে ভালো ঘুম হয়না! ... বোধহয় মায়েরা সব জেনে ফেলেন, তাই জন্যই মা।

পরের দিন সকালে, বাবার সাথে প্রথমে চিংড়িহাটা, তারপর সেখান থেকে বাস ধরে রাসবিহারী এভিনিউ। বাবা অত্যন্ত পাঞ্চুয়াল। ঠিক ৮.০০ তেই নামলাম রাসবিহারী এভিনিউ মোড়ে। রথিন আঙ্কেল এলেন আরো ১০ মিনিট পর। আমি বাবাকে মাঝে জিজ্ঞাস করলাম — আচ্ছা, তুমি আমাকে ওই মহারাজের সামনে বাইরে আস্তে দিলে না কেন ? বাবা উত্তরে হেসে বললেন — ছেলেরা সহজেই গোঁপ দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশ ধরে নিতে পারে, মেয়েদের ওটা অতটা সহজ হয়না। ... তাই যাতে তোকে ছদ্মবেশ না ধরিয়েই কাজ করা যায়, সেই জন্যই তোর মুখটা দেখালাম না।

বাবার এই কথাগুলো শুনে মাঝে মাঝে ভাবি , একটা মানুষের কি সব সময়ে এমন উপস্থিত বুদ্ধি চলতে পারে? কি করে চলে এমন ভাবে বুদ্ধি! আমার কবে এমন ভাবে বুদ্ধি চলবে ? সময় থাকলে হয়তো, আরো বেশ কিছুক্ষণ এই সব নিয়ে ভাবতাম। কিন্তু রথিনকাকা এসে পরায় ভাবনার ইতি সেখানেই হলো।

আমি, বাবার সাথে আর রথিনকাকার সাথে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি গেলাম। পৌঁছে একটু অবাকই লাগলো। একদাম আমাদের বাড়ির মতই। অত্যন্ত সাধারণ একটা ঘর। ... বাবা ও রথিনকাকা সামনে যেতে, একটা সিকিউরিটি কাকু ছিলেন, বেশ ষণ্ডামার্কা, হাতে ভালোধরনের আগ্নেয়অস্ত্র। তিনি পাশের একজন বেয়ারা গোচের লোককে ভিতরে বোধহয় অনুমতি নেবার জন্য পাঠালেন।

তিনি ফিরে আস্তে আমরা ভিতরে গেলাম। ... ভিতরে গিয়ে দেখি , মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্ত্রীর উপর চেঁচাচ্ছেন। বলছেন — বলছি না সময় নেই। মুরিতে জল ঢেলে দাও। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেড়তে হবে। ... আমি আবার অবাক হলাম, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মতনই যে।

বাবাদের সাথে আমি ঘরে প্রবেশ করতে, আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন — মেয়েটি কে?

বাবা উত্তর দিলেন — সংবাদপ্রয়োজকদের নাছোড়বান্দা আবদারের কারণে নেওয়া আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট , আমার একমাত্র কন্যাও, মিলি সিংহ।

একবার চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখে বললেন — এখনো বেশ কাঁচাই মনে হচ্ছে। ... তবে তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, মনে হচ্ছে কমই শুনেছি। ইয়োর আইজ আর ভেরি মাচ ব্রাইট। ... বসো।

আমরা তিনজনে বসলাম। ... ঘরটা খুব ছোটই , অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর ঘর বললে তো , অত্যন্তই ছোট ঘরটা। ...

মুখ্যমন্ত্রী বললেন – কত নেবে কেসের জন্য?

বাবা বললেন – আমার কোন দাবি নেই। ... লোকমুখ থেকে শুনে হলেও , আপনি যে আমাকে বিশ্বাস করেছেন, এটাই আমার পারিশ্রমিক।... তবে একটাই কথা।

মুখ্যমন্ত্রী – বলো।

বাবা – আমাকে আমার মত করে কাজ করতে দিতে হবে। ... খুব বেশী সময় নেবোনা। ... তবে কাজ করার ধরন আমার অন্য রকম। ... তথাকথিত রিপোর্টারদের মত নয়।

মুখ্যমন্ত্রী – একটু ক্লিয়ার করে বলো।

বাবা – আমি ছদ্মবেশে কাজ করতে পছন্দ করি। ...ঢাকঢোল পিটিয়ে , লোকজানাজানি করাটা পছন্দ করিনা। এতে কেস আরো জটিল হয়ে যায়। যিনি আসামী , তিনি সতর্ক হয়ে যান। ... ছদ্মবেশে থাকলে , আসামী টেরও পায়না, তার শিকার হতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এবার রথিনকাকার দিকে তাকিয়ে – বাবা রথিন, এতো জাত শিকারি!

রথিনকাকা বাবার প্রশংসা করার সুযোগ পেলে ছাড়েন না, ঠিক অতনু আঙ্কেলের মতনই। তিনি বললেন – হ্যাঁ স্যার, আমি তো আগেই বলেছিলাম, ও সম্পূর্ণ অন্য ধারার, ওর কম্পোজিশনটাই অন্য রকমের।

মুখ্যমন্ত্রী – হুম তো বিজয়... বেশী সময় দিতেও পারবো না তোমায়। ... কারণ একমাসের উপর সময়ব্যাপী এই কেস ঝুলছে। এখনও এর কোন কুলকিনারা হয়নি। ... তবে হ্যাঁ , রথিন এই কেশের ইন-চার্জ, আর তুমি যা চাইবে, সেটাই ও করবে। ... এটা আমার নির্দেশ। ... আমি একটা প্যাডে এটা লিখে দিয়েছি রথিন। ... (এই নাও) ...

এই বলে একটা প্যাডের কাগজ ছিরে , খামে ভরে দিয়ে দিলেন। ... বললেন – দেখে নাও, এতে লেখা আছে, এই কেসের ইন-চার্জ তুমি , আর এই কেসের দেখভাল করবে বিজয় সিংহ। বিজয় সিংহের সমস্ত নির্দেশ মানতে তাঁরা বাধ্য, আর তোমার নির্দেশ মানতে ডিপার্টমেন্ট এই কেসে বাধ্য।

আবার বললেন – বিজয়, আমি এখনই কিছু দিচ্ছিনা তোমাকে। ... বাট ইয়েস , তুমি সরকারি কর্মী নও, তাই তোমাকে আমি স্যালারির কথা তো বলতে পারিনা। ... সো , এই কেসের নিষ্পত্তি করলে , আমি তোমাকে একটা ১০ লাখ টাকার সরকারি চেক দেবো। ... ইট উইল বি ইউর রেমুনারেশন। ... চলবে?

বাবা – স্যার, আমি আগেই বলেছি। আপনি এই কেসের দায়িত্ব বিশ্বাস করে আমার উপর দিচ্ছেন, আমার কাছে সেটাই পারিশ্রমিক। ... এরপর যা আপনি দিচ্ছেন , সেটা আমার কাছে পারিশ্রমিক হবেনা , বলতে পারেন পুরস্কার হবে।

মুখ্যমন্ত্রী – কিছু অগ্রিম লাগবে?

বাবা – না স্যার। ... যদি লাগে, তখন কি করে চাইবো, সেটা বলে দিন।

মুখ্যমন্ত্রী – আমার ল্যান্ডলাইন নাম্বার নিয়ে রাখো। ... এই বংশী! সেই বেয়ারাটি একটু তড়িঘড়ি করে এলে, উনাকে বললেন – উনাকে আমার ল্যান্ডলাইন নাম্বার দিয়ে দে। ... আর শোন , উনার নাম বিজয় সিংহ। ... উনার যা আপডেট আসবে , আমায় তা দিবি, কোন ভুল না করে। ... মনে থাকে যেন নামটা , বিজয় সিংহ। ...

সেই ভদ্রলোককে দেখলাম, নিজের পকেটের একটা ছোট্ট ডায়েরিতে নামটা নোট করে নিলেন। ... বাবা আর রথিনকাকা আমাকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন।

রথিনকাকা বললেন – প্রথম স্টেপ কি হবে তোমার?

বাবা – একটু হিসেব করতে হবে। ... হিসেবটা করে নিয়ে , তোমায় আজ রাত্রের মধ্যে বলছি , কি হবে আমার প্ল্যান অফ এক্সান।

রথিনকাকা বললেন – আর কিছু লাগবে?

বাবা প্রশ্ন করলেন – মহারাজ গোবিন্দসখি কি নিজে থেকেই এসেছিলেন তোমার কাছে?

রথিনকাকা – আমার কাছে নিজের থেকেই এসেছিলেন , তবে মুখ্যমন্ত্রী স্যান্যাল মহাশয়ের থেকে শুনেছি , উনার গোঁতা খেয়েই আমার কাছে এসেছিলেন উনি।

বাবা বললেন – ঠিক আছে, আপাতত আর কিছু জানার নেই। ... সন্ধ্যা রাত্রে তোমাকে ফোন করছি।

আমি আর বাবা বাড়ি চলে এসে , স্নানটান করার পর, বাবা রোজ ধ্যানে বসেন। আর এখন আমাকেও নিয়মিত ধ্যানে বসাতেন। ... আমার ধ্যান হতে ১০ মিনিট লাগে, আর তারপর ১-২ মিনিটের ধ্যান হয়।... বাবার ঠিক উলটো। ১-২ মিনিট লাগে উনার ধ্যান হতে , আর ১০-১৫ মিনিট ধ্যান হয়। গভীর ধ্যান। ... সেই সমস্ত করে, লাঞ্চ করলাম। মায়ের হাতে তৈরি জমাটি রেওয়াজি খাসির মাংস আর ভাত। ... খেয়ে দেয়ে, মায়ের পাশে খানিক শুলাম।

একরকম মা জোর করেই আমাকে পাশে নিয়ে শুইয়েছিলেন। ... তাই মা ঘুমিয়ে পরতে, আমি পাশে বাবার কাছে গিয়ে দেখি, বাবা ঘরে পায়চারি করছেন।

প্রথম পদক্ষেপ

বাবার পাশ দিয়ে, বাবার ছোট্ট সিঙ্গিল বেডটায় গিয়ে বসলাম। সিঙ্গিল বেড হলেও, একটু সাইজে চওড়া। ... ছোটবেলায়, আমি বাবার কাছে এসে এই বিছনায় শুতাম। ... আমি নাকি মায়ের পেটে আসার পর থেকেই, বাবা এই পাশের ঘরে , নিজের সিঙ্গিল বেডে আশ্রয় নিয়েছেন। ... আসলে বাবার নিয়মকানুন পুরো আলাদা।

ঘুমান রাত্রি ১২টার মধ্যে, আর উঠে পরেন সকাল ৫টায়। ... দুপুরেও কোন বিশ্রাম করেন না। ... মায়ের এতে অসুবিধা হয় কিনা জানিনা। ... তবে বাবা বলেন , উনি মানে মা সারাদিন পরিশ্রম করেন। তাই দুপুরে একটু বিশ্রাম প্রয়োজন উনার। আর সাথে সাথে রাত্রেও উনার ঘুম বেশিই দরকার। ... বাবার মতে সংসারের কাজ গায়েগতরের কাজ, তাই পরিশ্রম খুব হয়। ...

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন , বাবা আর মায়ের সম্পর্কটা যেন অদ্ভুত ভাবেই মধুর। ... বাবার থেকে রামকৃষ্ণকথামৃত নিয়ে পাঠ করেছিলাম , ওখানে পরেছিলাম, একটা আধটা সন্তান হয়ে গেলাম , স্বামীস্ত্রী ভাইবোনের মতন থাকবে। ... সেটা পরার ফলে কিনা জানিনা , আমার কিন্তু বাবামায়ের সম্পর্ক দেখে সেরকমই মনে হয়। ... একে অপরকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করেন। দুজনেই দুজনকে সমস্ত মনের কথা বলেন , কিন্তু তথাকথিত যাকে স্বামীস্ত্রীর রোমান্স বলে , সেটা নেই এঁদের মধ্যে। ... বাইরে যখন ঘুরতে যাই , বেরাতে যাই, তখনও এঁদেরকে দেখে মনে হয়, ভাইবোন। ...

আমি আবার মায়ের প্রতি আকর্ষিত হলেও , বাবার বরাবরই নেওটা। ... বাবার পাশে এসে শুতাম ছোটবেলায়। তাই বাবা এই সিঙ্গিল বেডটা চওড়া করিয়েছিলেন। ... বড় হবার পর মায়ের কাছেই শুই।

কিন্তু যেদিনই ঘুম আসেনা , বাবার সিঙ্গিল বেডে এসে , বাবাকে একটু গোত্তা দিয়ে সরিয়ে , বাবার পাশে শুয়ে পরি।

আমি এসে বসতে, বাবা বললেন – কি বুঝঝিস কেসটাতে?

আমি সরাসরি বললাম – কিচ্ছু বুঝতে পারিনি এখনও। ... শুধু এটুকু বুঝলাম, ইরার উপর কারুর কুনজর পরেছে। হয় , ট্রাফিকিং-এর র্যা কেট ঢুকে পরেছে ইরাতে , দিয়ে মেয়ে পাচার চলছে , যার জন্য ইরা নাজেহাল। ... আবার এমনও হতে পারে যে , কেউ ইরার বদনাম করার জন্য এমন করছে। ... এই মঠসংস্থাগুলোরও তো এখন বেশ ভালোই কম্পিটিশন চলে।

আমি আবার থেমে বললাম – তবে আমার মনে হয়, ট্রাফিকিংটাই বেশি জোরালো।

বাবা – কেন?

আমি – কারণ, ইরাতে দেশবিদেশের সমস্ত সুন্দরি অবিবাহিতা মেয়েরা যায়, আর থাকে। ... ট্রাফিকিং-এর জন্য যেই কোয়ালিটির মেয়ে লাগে, সবই তো আছে ওখানে। ... তাই না!

বাবা – গুড। আর কিছু?

আমি বললাম – আর তো কিছু ভেবে পাচ্ছিনা!

বাবা – তোকে অপহরণের ডেট গুলো বলেছিলাম। মনে আছে?

আমি – হুম... টু ইচ, উজ্জয়েন, নাগপুর অ্যান্ড বাঙ্গালুরু ... ডেটটা হলো ২২শে ফেব্রুয়ারি, পয়লা মার্চ, ৮ই মার্চ, আর রিসেন্টলি, ১৫ই মার্চ। ... অন্যদিকে , ... টু ইচ ফ্রম চণ্ডীগড় , দিল্লি, আর আগ্রা, অন ডি ডেট অফ ২৩রড ফেব্রুয়ারি, ২ন্ড মার্চ, ১০থ মার্চ, আর ১৭থ মার্চ।

বাবা – এই ডেটগুলোতে কোন কানেকশান পাচ্ছিস!

আমি – একই দিনে তো হয়নি জিনিসগুলো। একিদিনে ডায়েরি করা হয়েছে শুধু!

বাবা – তার প্রমাণ! ... আর যদি প্রমাণ ছাড়াও সেটাই ঠিক ধরে নি, তবে একটা জিনিস খেয়াল করেছিস, ডায়েরি করার ডেটগুলো একটা ছন্দে রয়েছে – এই ছয় থেকে সাত দিনে গ্যাপ।

আমি – কিন্তু এর থেকে কি বুঝবো?

বাবা – একটা কাজ করতো। গুগুল ম্যাপটা খুলে ডাইরেক্টশনের জায়গাটা খোলতো। ... আমি কোথা থেকে কোথায় যাবো বলছি, চারচাকার গাড়িতে কত সময় লাগে বলতো।

আমি অ্যাপ খুলতে বাবা বলতে থাকলেন আর আমি উত্তর দিতে থাকলাম।

বাবা – উজ্জয়েন টু ভুবনেশ্বর

আমি – ২৮ ঘণ্টা, কিন্তু ভুবনেশ্বর কেন?

বাবা – বলছি, আগে দ্যাখ। এবার বল ব্যাঙ্গালুরু থেকে ভুবনেশ্বর।

আমি – ২৭ ঘণ্টা।

বাবা – নাগপুর টু ভুবনেশ্বর

আমি – ১৮ ঘণ্টা।

বাবা – আর চণ্ডীগড়, দিল্লি আর আগ্রা, এই তিনটেই হরিদ্বারের থেকে ম্যাক্সিমাম ১২ ঘণ্টার দূরত্বে, অর্থাৎ একদিনের দূরত্বে স্থিত। ... যদি ধরে নিই , এই গাড়ি বাংলাদেশে যাচ্ছে , কারণ ওটাই সেফেস্ট ওয়ে দেশের বাইরে যাবার, তবে একদিন আগে পরে ... দ্যাখ ডেট গুলো দেখ। ... হরিদ্বার টু বাংলাদেশ বর্ডার লাগে দেড় দিন। আর ভুবনেশ্বর থেকে লাগে আধা দিন। ... আর ডেট গুলোতেও দেখ , ওই একদিনেরই পার্থক্য রয়েছে। ২২-২৩, পয়লা – দোষরা, ৮-১০ , ১৫-১৭।

আমি – তারমানে বলছো, ওই গাড়ি এখানেই আসছে? ... কিন্তু ভুবনেশ্বর বা হরিদ্বার কেন?

বাবা – কারণ ইরার এই দুটো বড় সেন্টার। ... বলতে পারিস, সাউথের গুলোকে কন্ট্রোল করে ভুবনেশ্বর, আর নর্থের গুলকে হরিদ্বার।

আমি – তারমানে, যে বা যারা করছে, তারা ইরার মধ্যেই রয়েছে, এমন বলছো।

বাবা – সেতো আলবাত, নাহলে ইরার মধ্যের মেম্বারদের কাছে ওরা পউচাচ্ছে কি করে ? ... সন্ন্যাসিনীরা তো বাইরে ঘুরে বেরায় না!

আমি – তাহলে এর অনুসন্ধান করবো কি করে?

বাবা – সমস্ত কিছুর হেডকোয়ার্টার হলো নয়াভূমির ইরা। তাই সেখানে না গেলে কিছু বুঝতে পারছিনা। ... সেখানে গেলেই বা কত বুঝবো জানিনা। ... তবে হতে পারে , কিছু একটা ধারনা করতে পারবো , বা কোন ওয়াইল্ড গেশ্ করতেও পারবো। ... এখানে বসে বসে গেশিং, জাস্ট একটা গ্যাম্বলিং, তাছাড়া কিচ্ছু নয়। ... চল রথিনকে একটা ফোন করে কিছু এরেঞ্জমেন্ট করার কথা বলে দিই। ... তুই যাবি তো?

আমি – অফ কোর্স। ... আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট না!

বাবা হাল্কা করে হেসে বললেন – একটু চরা সেজে যাবি, গালে লুসটুস, চুলে ল্যাকার ম্যাকার। ... চোখের কাজল পুরো চাইনিজ স্পেশাল। ... যত পারিস বেশী সেজে যাবি।

আমি – ওটাই কি আমার ছদ্মবেশ।

বাবা সিগারেট ধরিয়ে, রথিনকাকাকে ফোন মেলাতে মেলাতে বললেন – হুম, কাইন্ড অফ।

ফোন মেলাতে, ওদিক থেকে রথিনকাকা বললেন – হ্যাঁ বলো, কি প্ল্যান অফ এক্সান ঠিক করলে।

বাবা – একটা নৌকার ব্যবস্থা করো , একবার গঙ্গার দিক থেকে নয়াভূমির ইরা মঠটাকে দেখতে চাই। একদাম সকাল সকাল। ওই দিনকেই বেলার দিকে, একবার পর্যটকের মতন মঠটা দেখবো।

রথিনকাকা – মিলি থাকবে তো?

বাবা – হ্যাঁ, বাট, আমাদেরকে তোমায় চিনে নিতে হবে।

রথিনকাকা – ও, তারমানে ছদ্মবেশে থাকবে? কিন্তু ... ওকে, এখন কিছু প্রশ্ন করবো না তোমায়।

বাবা – আচ্ছা, কবে আর কোথা থেকে গঙ্গাবিহার হবে, সেটা আমাকে কবে জানাবে?

রথিনকাকা – কালকে সকাল সকাল ঠিক করে, বেলার দিকে তোমায় ফোন করছি। ওকে?

বাবা – ওকে, তাহলে কাল কথা হচ্ছে।

বাবা ফোন রেখে দিলেন। আমি কোন মন্তব্য করলাম না। একটা কেসে বাবার সাথে থেকে বুঝে গেছি , কেসের সময়ে বাবার সাথে খালি তাল মিলিয়ে যেতে হয়। বাবার বুদ্ধি আর ভাবনার সাথে তাল মেলানোর ক্ষমতা আমার নেই। ... অতনুকাকু বা রথিনকাকুরই নেই। তাঁদের মত হাইর্যাঙ্ক সিবিয়াই আর সিয়াইডি অফিসারের যদি সেই মেধা না থাকে , তবে আমি কোন ছার। তাই চুপচাপ বাবার সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলতে থাকলাম আমি।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেলে , বাবাকে দেখলাম বেশ কিছু ফোন করলেন। কোন ফোনে ইংরাজিতে কথা বললেন, তো কোনটাতে হিন্দিতে, আর কোনটাতে বাংলায়। কথা শুনে বুঝতে পারলাম , সেই সমস্ত মেয়ে, যাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা, তাঁদের ঘরের লোকের সাথে কথা বললেন। ... জেরা নয়, সামান্যই কথা। ... এই শেষ কবে কথা হয়েছিল। কিছু বিশেষ বলেছিল কিনা, এই সমস্ত।

সমস্ত ফোন শেষ করে , বাবা প্রায় ১২টা নাগাদ স্নানাদি ও ধ্যানট্যান করলেন। ... ফ্রি হয়ে বসলে , আমি বাবার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, কোন সমীকরণসূত্র পেলে?

বাবা – হুম, প্রায় সকলেই ভ্যানিস হয়ে যাবার আগের কিছুদিন একটু টেনশনে ছিলেন।

আমি – এর মানে , অকস্মাৎ কিছু হয়নি। ... আগে থেকেই , থ্রেট বলো বা চাপ বলো , সেটার সৃষ্টি হয়েছে। ... এই তো?

বাবা হাসি হাসি মুখ করে , হাল্কা করে ঘার নাড়িয়ে সম্মতি দিলে , আমি বললাম – আচ্ছা, আর কি বোঝা গেল, এই তথ্য থেকে?

বাবা – এই বোঝা গেল যে সরষের মধ্যেই ভুত।

আমি – মানে যা কিছু হচ্ছে , তা মঠের মধ্যেই হচ্ছে। ... যদি কোন র্যা□কেটও থেকে থাকে , তাও মঠের মধ্যেই?

বাবা – র্যাকেট তো আর মঠের মধ্যে থাকবে না মিলি , র্যাকেটের যোগাযোগটা থাকতে পারে। মানে, যারা র্যায়কেটের হাতে এই মেয়েগুলোকে তুলে দেবে।

আমি – কিন্তু এই মেয়েদের নিয়ে কি করা হবে?

বাবা – বিদেশে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বড়লোক দেশগুলোতে এঁদেরকে সেক্স স্লেভ করে রেখে দেওয়া হয়। বড়লোকের বড়লোকিআনা আর কি।

আমি – কিন্তু শুনেছি, ইরাতে সমস্ত বড়লোকেরাই যান?

বাবা – ঠিকই শুনেছিস। কিন্তু যতগুলো ভ্যানিস হয়েছে , তাদের কারুর সাথেই প্রায় সম্পত্তি ছিলনা। ... হয়তো, এই সম্পত্তি না থাকার কারণেই, তাদের সাথে এমন পরিণতি।

আমি – মানে, যারা কিছু দিতে পারলো না, তাদের থেকে ইনকাম করার রাস্তা বলছো।

বাবা – হতে পারে , আবার ভুলও হতে পারে। ... এমনও হতে পারে যে , সত্যিই কোন র্যাকেট চোরাগোপ্তা কাজ করছে।

ঘরে হঠাৎ মা ঢুকে এলেন। এসে বললেন – তুমি যতই ধ্যান ধারনা করো, তোমার মধ্যে ভক্তিভাব কিচ্ছু নেই। ... অমন তীর্থস্থানের ব্যাপারে, অমন ভাবতে একবার বুক কাঁপল না!

বাবা ঠোঁটের কোনে একটা ব্যাঙ্গাত্মক মুচকি হাসি হেসে বললেন – মাধবি, তীর্থক্ষেত্রেই তো যতরাজ্যের র্যাকেটের আনাগোনা বেড়েছে আজকাল। ... ধর্মের নাম ভাঙিয়ে সাম্প্রদায়িকতা , সেন্টিমেন্ট; সেই সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে আকর্ষণ, ভালোমানুষের মুখোস, আর সেই মুখোসের আড়ালে নোংরামো, এই তো এখনকার পপুলার ক্রাইম। ... রথিন , বা অতনু আসলে, একবার ওঁদেরকে প্রশ্ন করে দেখো মাধবি , সারা পৃথিবীর যত ট্র্যাফিকিং র্যাকেট্ অল অফ ডেম আর অপারেটিং থ্রু মনাস্ট্রিজ।

মায়ের নাম মাধবি , মাধবিলতা সিংহ। মা বললেন – তাহলে, এই মঠগুলোকে সরকার গজাতে দিচ্ছে কেন? ...

বাবা হেসে বললেন – গুড কয়েসচেন। ... ভেরি গুড কয়েসচেন। ... ওই যে বললাম , সেন্টিমেন্ট। ভোটনির্ভর সরকার, তাই যেখানেই জনসমাগম, সেখানেই সরকারের ইন্টারেস্ট, বা বলতে পারো দুর্বলতা।

মোটামুটি, যদি ভারতের কথাই ধর , তবে সমস্ত মনাসট্রি , মঠ, সাম্প্রদায়িক আশ্রম, ইসলামিক উনিয়ন, চার্চ, এই সমস্ত মেলালে, প্রায় পুরো মিডিলক্লাস ভোটার, মানে ধরে নাও, সমস্ত ভোটারের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ ভোটার একত্রিত হয়। ... তাহলে ভাবো মাধবি , যদি ওই সেক্টরটাকে তোষামোদ করে, এঁদেরকে ইন্ধন দেওয়া যায়, তাহলে এই মঠ-মনাস্ট্রি-চার্চ-ইউনিয়নে যাতায়াত করা, সকলে সেই পার্টির সমর্থক হয়ে যাবে, যেই পার্টি ওই মঠকে সহযোগ প্রদান করছে।

বাবা আবার বললেন, মাধবি, টু ভেরিফাই মাই ওয়ার্ডস্, আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে, তিন তিনবার এমন ফ্যেস করেছি যেখানে, সাম্প্রদায়িকতাকে দূরে সরিয়ে, সুদ্ধ ধর্মের স্থাপনা করতে কিছু ব্যক্তি এগিয়ে চলেছিল। ... মাধবি, ইদার দে অয়ের থ্রেটেনড্, ওর মার্ডারড্। ...

মা আবার প্রতিবাদী হয়ে বললেন – তাবলে, এই মঠগুলোর সম্বধে এমন সন্দেহ করবে ? সন্দেহ করাটা তোমার একটা বাতিকে পরিণত হয়ে গেছে।

বাবা হেসে – সন্দেহ করাটাই তো আমার পেশা মাধবি। ডিটেকশন জাতিয় কাজ করার পদ্ধতি কি জানো? ... সন্দেহের ভিত্তিতে সাস্পেক্টলিস্ট তৈরি করো, তারপর সেই সাস্পেক্টলিস্টের একজন একজনকে ধরে ধরে, তার গতিবিধির উপর নজর রেখে , সিদ্ধান্ত নাও, কে সন্দেহের তালিকায় থাকবে , আর কে সন্দেহের তালিকায় থাকবেনা। ... অবশিষ্ট সাস্পেক্টের গতিবিধির এবার চুলচেরা বিশ্লেষণ করো , জল ফেলে রেখে, দুধ বেড়িয়ে আসবে।

বাবা আবার হেসে বললেন – এটাই সত্য উদ্ঘাটনের টেকনিক মাধবি। সেটা রহস্যের হোক , বা আধ্যাত্মের হোক।

মা বাবার পাশে বসতে বসতে বললেন – হ্যাঁ সব এক, যে রহস্যের কিনারা করতে পারে, সেই রাজশেখর বসু হয়ে যান!

বাবা মায়ের এই তর্কের ধারার খুব প্রশংসক। ... আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন , তোর মায়ের ওই এঁরে তর্ককে হেলাফেলা করিস না। ওই এঁরে তর্কের থেকে অনেক সময়ে মস্তিষ্কের এমন জায়গায় আঘাত লাগে না, সমস্ত জটিলতা তখন গলে জল হয়ে যায়। তাই হয়তো বাবা আবার হেসে বললেন – তা কানেকশন আছে বইকি। ... ভৌতিক রহস্য, যা আমি সমাধান করি, এতে খালি ইন্দ্রিয় সহিত বুদ্ধি কাজে লাগে। ... অতিজাগতিক রহস্য সমাধান , যেগুলোর সমাধান সাহিত্যিকরা করেন , তাতে ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির সাথে সাথে মনও ক্রিয়াশীল থাকে। ... আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দের মত আধ্যাত্মিক রহস্যের সমাধান

যারা করেন, তাঁরা এই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির তালে তালে রেখে, চেতনার দ্বারা সেই সমাধান করেন। ... বাট বেসিক প্রসেস ঈশ অলওয়েজ সেম মধু (মাঝে মাঝে বাবা মাকে মধু ডাকেন)।

হ্যাঁ আমাকে যদি বলো এবার মহাভারতের ব্যাখ্যা করতে, আমি থোরাই পারবো? আমার চেতনা তো কোন নিম্নস্তরে পরে রয়েছে। ... তবে হ্যাঁ , যদি কোনদিন ইচ্ছা হয় , তবে আধ্যাত্মিক মুলতত্ত্ব জেনে , সেই তত্ত্ব দিয়ে যেই ভাবে আজকে রহস্যসমাধান করি, সেই ভাবেই বিচার করতে করতে দেখবে, ঠিক হয়ে গেছে।

কি বিশয়ে জানিনা, মা যেন একটু রেগে রয়েছেন। ... তিনি বললেন – বেশ তো, ওটাই করো না, কাজে দেবে।

বাবা একটু টিপ্পনী কাটার মত করে বললেন – মিলি, রথিনকাকাকে ফোন কর। বল, তোর মা বলছে, এই রিপোর্টারের কাজ ছেড়ে দিতে। ... এসব রহস্য মহস্যের সমাধান করে কাজ চলছে না , মহাভারতের রহস্যের সমাধান করতে হবে। ... হোমমিনিস্টারের আদেশ।

মা এবার তেড়েফুঁড়ে উঠলেন – আমি কি তাই বললাম! ... যতসব... একটাই কথা বলছি , এই তীর্থক্ষেত্রের পুণ্যাত্মাদের ছেড়ে, আসল আসামীকে ধর।

বাবা হেসে বললেন – পাপাত্মার কাছে যে পুণ্যাত্মাই পাপী। ... মাধবি , আমি যে এক পাপাত্মা। তাই আমার নজরে পুণ্যাত্মাদের মধ্যেই যে পাপী লুকিয়ে রয়েছে।

বাবাকে বলে কাজ হচ্ছে না বলে এবার আমাকে বললেন মা – তোর বাবাকে কি একটা কথাও সহজ ভাবে বললে শুনবে না! ... আমি বললাম , উনি পাপাত্মা! ... ঝগড়া করাচ্ছে আমাকে দিয়ে। ... ধুর ... ভালো লাগেনা।

মা উঠে চলে গেলেন। ... আমি বাবার কাছে গিয়ে বললাম, মাকে চটিয়ে ভাগিয়ে দিলে না! ... বাবা হেসে বললেন – সাম্প্রদায়িক সেনাপতিগুলো কেমন সাধারণ ভোটারদের কাছে ধর্মের বর্ম পরে থাকে , দেখতে পেলি!... আমি কেবলই হাসলাম। ... বাবার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝেছি। মা যাতে তাড়াতাড়ি খাবার দেয় , তাই মা যখন দুপুরের খাবার বারার আগে , এমন একটু উতপটাং মন্তব্য করেন , তখন মায়ের পিছনে এই ভাবেই বাবা লাগেন। ... কিন্তু এখন তো খালি দুপুর ১টা। বাবা এইভাবে মাকে দুপুরের ভাত বারার তারা দিলেন কেন?

আমি বললাম – কোথাও বেরুবে বাবা?

বাবা – হ্যাঁ, মঠের বাইরেটা নৌকাবিহার করে বা পর্যটকের মত বিহার করে দেখা যাবে। কিন্তু একবার ভিতরটা দেখতে হবে।... তোর মা বলে গেল শুনলি না!

আমি অবাক হয়ে বললাম – মা আবার কি বললেন? ... মা তো, তোমাকে বাঁধা দিচ্ছিলেন!

বাবা মুচকি হেসে বললেন – এমনি এমনি কি আর বাঁধা দিচ্ছিলেন তোর মা! উনি বললেন , ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মনে আটকে না থেকে, একটু চেতনা দিয়ে খতিয়ে দেখতে। ... বললেন দেখলিনা , মহাভারতটাই বিচার করতে। ... মানে কি ? মানে এই যে , একটু গভীরে যেতে বললেন তোর মা। খালি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম কি না। তাই মার্গ দর্শন করে গেলেন দেবী।

আবার বললেন বাবা – তোর মায়ের কথা শুনেই তো অতনুকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবার কথা মেসেজে বললাম। ... তাই দুপুরে একটু অতনুর কাছে যাবো। একজনের সাথে একটু দেখা করার আছে।

আমি বললাম – মা কি এই কথাই তোমায় বললেন?

বাবা – আজ্ঞে হ্যাঁ। ... উনাকে দেখে মনে হয় অন্যরকম তাই না! ... কিন্তু তোর মা-ই যে এই সিনের সীধু জ্যাঠা।

অদ্ভুত লাগলো, মা আর বাবার এই অদ্ভুত কম্বিনেশনের কথা আমি যতই ভাবি , ততই অবাক হয়ে যাই। ... আচ্ছা মা কি বুঝেছেন যে বাবা বুঝেছেন, উনি কি বলতে চেয়েছিলেন? আচ্ছা মা কি বাবাকে এই কথাই বলতে চাইছিলেন, নাকি বাবা মায়ের কথার এমন মানে করলেন?

আমি মায়ের কাছে এই তত্ত্বের ভেরিফিকেশনের জন্য রান্নাঘরে গেলাম। ... স্যালাড কাটতে থাকলাম, আর মাকে বললাম – বাবাকে তুমি ঠিক কি বলতে চাইলে বলতো মা?

মাও হাসের ডিমের ঝালটা বাটিতে বাটিতে ঢালতে ঢালতে বললেন – কেন, তোর বাবা তো বুঝে গেছেন, কি বললাম উনাকে।

আমি বললাম – সেটাই জানতে চাইছি, কি বললে তুমি উনাকে?

মা কাজ করতে করতেই বললেন – একটু গভীরে যেতে হয়। ... উপুর উপুর দেখে কি আর জলের মধ্যে মাছেরা কি করছে, তা বোঝা যায়! ডুবুরি নামাতে হয়, তবে বোঝা যায়।

আমি আর কিছু বললাম না, আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। ... সত্যিই মা যে বাবাকে মার্গ দর্শন করতে গেছিলেন, আমি বুঝতেই পারিনি। ... কিন্তু বাবা কি করে! ... বোধহয় , একেই স্বামীস্ত্রীর কম্বিনেশন বলে।

মা বললেন – লাঞ্চ করে বাবা বেরুবেন তো? তুইও সঙ্গে যাবি, নাকি উনি একাই যাবেন?

আমি – আমাকে বোধহয় নিয়ে যাবেন না উনি। ... অতনুআঙ্কেলের কাছে যাবেন।

মা – না না, অতনুদা ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে।

আমি – কোথায়?

মা – এস্কোর্ট সার্ভিসের মেয়েদের সম্বন্ধে জানিস! সেখানে।

আমি – মানে? ওরা তো ...!

মা – ওরা ছাড়া, ডুবুরির কাজ কে করবে?

না, আজ আমার ধারনা সত্যিই পাল্টে গেল। ... আমি আমার মাকে এক সামান্য গৃহবধূ ভাবতাম , আর তারজন্য বাবার থেকে অনেকবার বকা খেয়েছি। ... বাবা , বার বার আমাকে বলতেন, তোর মায়ের মত দ্বিতীয় বিদুষী স্ত্রী, সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাবি কিনা সন্দেহ। ... আজ যে বাবার কথা ১০০ শতাংশ সত্য , তার প্রমাণ পেলাম। ... রথিনকাকা ঠিকই বলেছিলেন আমাকে – তোর মা একটা খাটি হিরে, আর তাকে কেউ যদি চিনে থাকে, তা হলো আমার দেখা সেরা জহুরি, তোর বাবা। ...

নয়াভূমিতে ভ্রমণ

বাবা লাঞ্চ করে বেড়িয়ে গেলেন। সন্ধ্যায় ফিরে এলেন , ঠিক চা খাওয়ার সময়ে। ... এসেই প্রথম কথা আমাকে বললেন – তোর রথিনকাকা এরেঞ্জমেন্ট করে নিয়েছে। ... কাল ভোর ৩টের সময়ে , গাড়ি নিয়ে

আসবে সে। ... ৪টের মধ্যে হাজারদুয়ারির ধারে গঙ্গায় গমন। সেখান থেকে নৌকা বিহার করে , অম্বিকা কালনা। ... ওখান থেকে গাড়ি করে নয়াভূমির মঠ। ... পর্যটকের বেশে , আমি আর তুই একটু ঘুরে দেখে আসবো।

মা বললেন – পেলে কারুকে?

বাবা – হুম, বহু কষ্টে। তবে লিথারজি নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে একবার।

মা – টেস্টিং না ইন্সটলেশন?

বাবা – ইন্সটলেশন।

এই সব কথার মানে কি? ... একি কোন কোডওয়ার্ড! সত্যি বলছি, আগে আমার কাছে শুধু বাবাই একটা রহস্য ছিলেন, এখন আস্তে আস্তে মাও রহস্য হয়ে যাচ্ছেন। ... এই ধরনের কথা মা আগেও বলতেন। কিন্তু আমি যেহেতু কেসের সাথে ইনভলভড় থাকতাম না, তাই বুঝতে পারতাম না। এখনও বুঝতে পারছি না, তবে কেসের সাথে ইনভলভড়, তাই বুঝতে পারছি যে কেসের ব্যাপারেই কথা হচ্ছে।

মনের মধ্যে আমার পরমাসুন্দরি মা-কে নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন জাগছিল। তাই মা চা করার জন্য রান্নাঘরে থাকা অবস্থাতেই, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম – আচ্ছা মা! ... কেসের মধ্যে বাবা তোমাকে কখনো ফোন করেন?

মা হেসে বললেন – আপডেট দেন। তবে রাস্তা খুঁজে না পেলে , আমার সাথে প্রায় এক ঘণ্টা মতন কথা বলেন। উনি বলেন, আমার সাথে কথা বললে নাকি, উনার মাথা খুলে যায়।

কি মনে হলো, মাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম। ... মা বললেন – কি হলো আবার ... সর , গরম চা, গায়ে পরে গেলে, ফোস্কা পরে যাবে।

আমি বললাম – আমার না খালি বাবাকে নিয়েই গর্ব হতো, এখন তোমাকে নিয়েও হচ্ছে।

মা হেসে বললেন – স্বামীস্ত্রীর যতই আলাদা আলাদা আধার কার্ড হোক , তাঁরা কখনোই দুই নন। তাঁরা ফুল আর ফুলের ডাটি।

মা চা নিয়ে চলে গেলেন , আমি নোনতা বিস্কুটের কৌটো নিয়ে টি-টেবিলে পৌছাতে পৌছাতে অনুভব করলাম, এমন পিতামাতার সন্তান হয়ে, আমি সত্যিই প্রচণ্ড লাকি।

সেদিনে, আমাকে আর বাবাকে মা সন্ধ্যে ৮টার মধ্যে ডিনার করিয়ে, নটার মধ্যে ঘুম পারিয়ে দিলেন। ঠিক মধ্যরাত ২টোর সময়ে, মা আমাকে আর বাবাকে ডেকে দিলেন। ... আমরা উঠে ড্রেস করে রেডি হতেই , রথিনকাকা একটা স্করপিও গাড়ি নিয়ে হাজির। ... মাকে দুর্গা দুর্গা বলতে শুনে, গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে উঠে বাবাকে বললাম – তুমি বাইরে কেস সমাধান করো, তো মা ঘরে।

রথিনকাকা হেসে বললেন – তাহলে মিলি, বাইরে বেড়তে, মা-কে চিনতে পারলো। ... বিজয় , ইউ আর রাইট হেয়ার টু।

বাবা হেসে বললেন – যার সাথে থাকা হয় , তার প্রতিভা বোঝা বড়ই কঠিন হয় রথিন। ... আমাকে ও বাইরে বাইরে দেখতো , তাই ভাবতো আমি একজন ব্রিলিয়ান্ট , কিন্তু ওর মা একজন অবোধ। ... আজ মাকে দূর থেকে দেখছে, তাই ও মায়ের ব্রিলিয়ান্সিটা বুঝতে পারছে।

রথিনকাকা বললেন – তোমার বুদ্ধির স্পিড না হয় বুঝলাম , সেটা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ... কিন্তু এই মনকে বুঝে নেবার ক্ষমতা কি এক গোয়েন্দা বা এক রিপোর্টারের গুনের মধ্যে পরে ? ব্যোমকেশকেও দেখেছি সত্যবতী বা শকুন্তলার মন পরতে হিমসিম খেতে হয়েছে। আবার প্রদোষচন্দ্র মিটারকেও দেখেছি, মনের ভাষা পরতে , উনাকেও বেশ ঘুরপাক খেতে হয়েছে বইকি। ... ইউ আর এন এক্সেপ্সন ইন ডিস কেস।

বাবা বললেন – তুমি আমাকে রিপোর্টার হবার আগে থেকে চেন। ... ইনফ্যাক্ট , তুমিই আমাকে রিপোর্টার হতে বলেছিলে, আর রাস্তা দেখিয়েছিলে। ... আমি তো একজন আন-কেরিয়ারিস্টিক আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারনায় মত্ত যুবক ছিলাম। মনে আছে সেই কথা!

রথিনকাকা বললেন – এখানে মাধবিলতার ভূমিকাও কম নয়। ... ওর তোমাকে খুব পছন্দ ছিল, আর তুমি কিছু করতেই না, তাই বাড়িতেও বলতে পারছিল না। ... সে আমাকে এসে বলতো , রথিনদা, কিছু করো না। ... আমি বলেছিলাম , একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ... তো মাধবিলতা আমাকে বলল , না উনাকে কিছু চ্যালেঞ্জিং কাজ দাও। ... উনি সবসময়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উদ্ঘাটনে মন রাখেন। ... যার মন এতো গভীরে চলে গেছে, তার মন ১০টা ৫টার কাজে বসবে না। ... অদ্ভুত চেনে তোমাকে ও, জানো?

বাবা – শুধু চেনেন না, আমি যেমন, তেমনটাকেই ভালোবাসেন। ... কটা মেয়ে, একটা আধ্যাত্মিক উন্মাদে মন রাখতে পারে বলো। ... ও শুধু আমাকে চেনেই না , আমার সমস্তটাকে স্নেহ করে, সম্মান করে, আর ভালোবাসে।

রথিনকাকা একটা তৃপ্তির হাসি নিয়ে বসলেন। মাঝে আমরা রানাঘাটে , এনএইচ ৩৪এ দাঁড়িয়ে চা খেয়েছিলাম, তখন রথিনকাকাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মা-বাবার ব্যাপারে। ... উনি একটাই কথা বললেন, আ হেভেন মেড কম্বিনেশন। নাহলে, কামনাবাসনা ছাড়া, এমন গভীর সম্পর্ক হয়!

আর কথা বারাইনি। শুধু ভেবে কূলকিনারা না করতে পারার যে কি আনন্দ , সেটা উপভোগ করছিলাম। জানলার দিকে তাকিয়ে , ভোরের হাওয়া খেতে খেতে , সেই আনন্দ উপভোগ করতে করতে , এসে পৌঁছলাম হাজারদুয়ারির পিছনে গঙ্গার ঘাটে। নৌকা রেডি। ... বাবার কথামত , মা আমাকে চরা – মেকআপ করিয়ে দিয়েছেন। ... দেখে মনে হচ্ছে, পুরো ছটপুজোর সময়ের বিহারি মেয়ে। ... বাবা একটা চাপ লালচে দাড়ি লাগিয়েছেন। মাথায় ফিশিং হ্যাট। গলায় ক্যাননের ক্যামেরা। ফুলস্লিভ জামা , আর জিন্সের প্যান্ট। ... দেখে মনে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডট্যুর করা একজন ফটোগ্রাফার। ... চোখে গগলস্।

রথিনকাকাকে প্রশ্ন করেছিলাম – বাবা চোখটা সবসময়ে ঢেকে রাখেন কেন?

রথিনকাকা বলেছিলেন – দাড়িগোঁফ দিয়ে ও সব ঢাকতে পারলেও, ওর ব্রাইট আইজকে না ঢাকলে, ওর ব্রিলিয়ান্সি যেকেউ ধরে ফেলবে। তাই এই চশমা।

যাইহোক। এখন অসব ভাবনা টাবনার নয়। ... নৌকায় গঙ্গাবিহারে চুটিয়ে আনন্দ। ... ভোরের ফুরফুরে হাওয়া। ... গঙ্গার পবিত্রতা। ... সব মিশিয়ে , মন-শরীর, সর্বত্র একটা শিহরন খেলে যাচ্ছিল । ... ইরার পাঁচিল পেলাম এই আধঘণ্টা নৌকা চলার পর। ... বাবার দৃষ্টি দেখলাম স্থির , চোখের পাতাও পরছেনা। ... বিশাল বড় মঠ। প্রায় ২০ মিনিট লাগলো , মঠের পাঁচিল শেষ করতে। বাবা শুধু দর্শক। মাঝে খালি মাঝিকে একটু পারের কাছাকাছি নিয়ে আস্তে বলেছিলেন এক জায়গায়। ... যেন কিছু নিরীক্ষণ করে নিলেন। তারপর আবার সেই দর্শক। ...

ইরার পাঁচিল পেরোনোর প্রায় আধঘণ্টা পরে অম্বিকা কালনায় আমাদের নৌকা থামলো। ... রথিনকাকা ঘাটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ... আমরা যেতে, আমাদেরকে রিসিভ করলেন। ... আমার নিজের কাকা নেই , কিন্তু রথিনকাকা আমার নিজের কাকার মতই। ... ছোট থেকে উনাকে চিনি। ... বাবার ছোট ভাইয়ের মত

উনি। ... আর মাও উনাকে দেওয়রের মতই স্নেহ করেন। ... তাই , অতনুআঙ্কেলের ক্ষেত্রে আঙ্কেল শব্দটা এলেও, রথিন কাকার ক্ষেত্রে, আমার কাকা ছাড়া অন্য কথা বেরোয় না। ...

রথিন কাকার স্ত্রী, একটু অন্য গোচের, আর উনার দুটি ছেলেও মায়ের দিকেই হয়েছেন। ... ডিস্ক , পাবে নিত্য যাতায়াত উনার। ... যাইহোক , তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ... রথিনকাকা আর বাবা আমার দুই হাত ধরে টেনে তুললেন। ... পায়ে একটু কাদা লেগে গেছিল , বাবা ধুইয়ে দিলেন। ... এবার আমরা একটু চা বিস্কুট আর তারপর ডিম-পাউরুটি খেয়ে, গাড়িতে করে ইরার গেটে পৌঁছলাম।

রথিনকাকা এখানে ঢুকলেন, তবে তিনিও এবার এক ছদ্মবেশে , অবশ্যই বাবার নির্দেশে। ছদ্মবেশ ধারণ আমাদেরকে সাধারণ পর্যটক দেখাচ্ছিল। ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ। তাই বাবা গাড়িতেই ক্যামারা রেখে এসেছেন। খালি হাতে আমরা মন্দির দর্শন করে , বাইরের দিকের বেশ চওারা পিচ ফেলা রাস্তা ধরে হাঁটছি। ... বাবার চোখ নিশ্চয়ই ঘুরছে, রথিনকাকুরও। তবে বাবারটা দেখা যাচ্ছেনা, কারণ বাবা সানগ্লাস লাগিয়ে রেখেছেন।

রাস্তার বাদিকে একের পর এক ফুল বাগান , যেখানে সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি , আর দয়েল, ফিঙে, চড়াই, সালিকরা উরে উরে রোদ পোয়াচ্ছে , আর ফুলের রসও খাচ্ছে। আর ডানদিক বরাবর মহারাজদের কোয়ার্টারস। জানলাগুলো দেখা যাচ্ছিল, সেই কোয়ার্টারে বাইরের লোক মানে পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। দুটি দরজা সেই প্যাভিলিয়নে প্রবেশ করার। একটা রাস্তা যেখান থেকে বাদিকে ঘুরেছিল , তার পরে পরেই। আর দ্বিতীয়টা একদাম শেষের দিকে । সিকিউরিটি ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করে বাবা জানলেন , দশজন সব থেকে প্রবীণ মহারাজের ঘর প্রথমে , আর একদাম শেষের সবথেকে বড় ঘরটা প্রধান মহারাজের, মানে যিনি আমাদের বাড়িতে গেছিলেন, সেই মহারাজ গোবিন্দসখির।

বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন , আর মুখে এমন হাবভাব করলেন যেন , এই বিশাল এরেঞ্জমেন্ট দেখে উনি পর্যটকবেশে স্তম্ভিত। মহারাজের ঘরের পিছনেই বাউন্ডারি পাঁচিল। তবে সেইদিকটা আমাদের ওই সিকিউরিটি কাকু আর যেতে দিলেন না। বাধ্য হয়েই আমরা এবার ফেরার পথ ধরলাম। মানে সেই রাস্তাটাই, যাবার সময়ে ডানদিকে চেপে যাচ্ছিলাম , যাতে কোয়ার্টারস্‌গুলো দেখা যায় আর ফেরার সময়ে , বাঁদিক দিয়ে এলাম, মানে ফুলবাগান গুলো দেখতে দেখতে এলাম। ...

ফুলবাগানের প্রথমটাই, অর্থাৎ মহারাজের কোয়ার্টারের ঠিক উল্টো দিকের বাগানটার সামনে , বাবা গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। ... কি দেখলেন , কে জানে? কিন্তু উনি যে কিছু দেখলেন , তা আমার কাছে অন্তত স্পষ্ট। তিনতিনবার উনি বাকি বাগানগুলো দেখলেন , আর ওই বাগানটী দেখলেন। ...

একবার তো বাবা খুব কাছে চলে গেছিলেন ওই বাগানের , বোধহয় ঢুকেই যেতেন। ওই সিকিউরিটি কাকুটা আবার এসে বললেন, বাগানে প্রবেশ নিষেধ, কিছুতে হাতও দেবেন না। ...

বাবা একটু মুচকি হেসে সম্মতি জানালেন , কিন্তু ভালোভাবে কিছু নিরীক্ষণ করলেন। ... আর তারপর থেকে, প্রতিটি বাগানকেই তিনি একই ভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। কি দেখলেন জানিনা , তবে বিশেষকিছু যে তিনি দেখেছেন , সেটা আমার মনেই হয়েছিল , আর সেই ব্যাপারে কনফার্ম হলাম , যখন বাইরে বেড়িয়ে, গাড়িতে বসে রথিনকাকাকে বললেন – রথিন, আমার ওই শেষ বাগানটার দেওয়ালের বাইরে, একটা ঘুমটি লাগবে, দিন দশেকের জন্য।

রথিনকাকা – ঘুমটি ওদের দেওয়ালের বাইরে এলাউড নয়। ... দেখো না, একটাও ঘুমটি নেই।

বাবা – পাঁচিলের গা দিয়ে যেই রাস্তা যাচ্ছে, সেটা কি কর্পোরেশনের?

রথিনকাকা – হ্যাঁ।

বাবা – তাহলে, কর্পোরেশনের কাছে গোপনে খবর পাঠিয়ে , ওই পাঁচিল ঘেঁসে একটা তির্পল খাটাও। মঠকর্তৃপক্ষ জানবে, মাটি খোরা হচ্ছে, মাটির তলায় কেবিলের কাজ হচ্ছে।

রথিনকাকা – চলো তাহলে, আজই বিডিওর সাথে দেখা করি। ... এখনি।

বাবা – আমার উপস্থিতি জানাতে হবেনা। তুমি তোমার কথা বলবে , আমি আর মিলি গাড়িতেই অপেক্ষা করবো।

রথিনকাকার গাড়ি মিনিট দশেক এগিয়ে একজায়গায় থামলো। মেকআপ ছেরে ফেলেছেন রথিনকাকা। বিডিও অফিসের ভিতরে চলে গেলেন। ...

খানিকপরে, রথিনকাকা বিডিওকে নিয়ে বেড়িয়ে এলেন। আমরা ব্যাকসিটে বসলাম , আর বাবার সাথে বিডিও স্যার সামনে বসলেন। আমাদের পরিচয়, রথিনকাকার শ্বশুরবাড়ির সম্বন্ধী।

গাড়ি খানিক গিয়ে থামলো এসডিপিও অফিসে। ... রথিনকাকা , আর বিডিও স্যার ভিতরে গেলেন , আর ব্যাজার মুখে ফিরে এলেন। ... ফিরে আস্তে , বাবা ভাঙা গলায় বললেন – রথিনদা, মিনার বড্ড বাথরুম পেয়েছে। তোমার তো চেনা। একটু ব্যবস্থা করো না। অনেকটা পথ ফিরতে হবে। মিনা চাপতে পারবে না। ...

বাবা আর রথিনকাকার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দারুণ। তাই বোধহয় রথিনকাকা বুঝে গেলেন, বাবার মতলব কি। ... আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই, আমার আবার বাথরুম কোথায় পেলো!

বিডিও স্যার গাড়িতে বসলেন, রথিনকাকা ঘুরে এসে বাবা আর আমাকে ডাকলেন। ... বাবা আমাকে নিয়ে যেতে যেতেই, দেখলাম নিজের সানগ্লাসটা খুলে নিলেন। সোজাসুজি এসডিপিও মেড্যামের সামনে গিয়ে বললেন – বাসন্তীদি, চিনতে পাচ্ছেন?

বেঁটেখাটো দেখতে, ছাপাশাড়ি পরা ভদ্রমহিলাটাকে দেখলাম, মুখ তুলে তাকালেন। খানিক বাবার চোখের দিকে তাকালেন, তারপরে বললেন – বিজয়! ... এখানে! ... কি ব্যাপার ঘুরতে?

বাবা রথিনকাকুর দিকে হাতটা বাড়ালেন। রথিনকাকু মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিটা বাবার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বাবা চিঠিটা এসডিপিও ম্যামকে দিলেন। উনি পুরোটা পরে বললেন , তারমানে তোমার ওই তির্পলের ছাউনির প্রয়োজন। ... ওকে। ইটস ইউ , সো আই ওয়িল এরেঞ্জ ড্যাট বাই টুমরো। তুমি কাল রাতে এসে পেয়ে যাবে। ... কে কে থাকবে, ওতে?

বাবা – দিদি, ক্যাম্পটা, আর সাথে কিছু মাটি, বোঝানোর জন্য এখানে মাটি খোরা হয়েছে। এটা যদি এঁরা বাইরে থেকে এনে কালকে রাতের অন্ধকারে রাখতো, ভালো হতো না! ... আসলে এখানের লোকের সাথে মঠের মহারাজদের তো আলাপ আছেই। ওদের সরল মন, বলে দিতে কতক্ষণ!

ম্যাডাম দেখলাম হাসলেন খালি, আর বললেন – তোমার বিচক্ষণতা আগের থেকেও বেড়ে গেছে দেখছি। ... তা বললে না, থাকবে কয়জন। ...

বাবা আমাকে দেখিয়ে বললেন – আমার কন্যা আমার সাথে থাকবে।

ম্যাডাম অবাক হয়ে বললেন – মিলি! ... এতো বড় হয়ে গেছে ? ... তোমাকে এখন ও অ্যাসিস্ট্ করে নাকি? ...

বাবা বললেন – হ্যাঁ এই তো আঠেরো হলো।

ভদ্রমহিলা বললেন – মানে, আই মেট ইউ ১৫ ইয়ার্স ব্যাক! ... মিলি তখন ৩ বছরের ছিল। ... গ্রেট । ... ছদ্মবেশে থাকবে নিশ্চয়ই।

বাবা – আমি খালি, আর মিলি সামান্য ময়লা ধরনের জামাকাপড় পরবে , আর একটু ব্ল্যাকিশ মেকআপ নেবে। ব্যাস।

ম্যাডাম – বাকি উটকো ঝামেলা, তুমি সামলে নেবে তো!

বাবা – নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনি পর্যন্ত মহারাজরা পৌছবেন না।

এবার রথিনকাকার দিকে তাকিয়ে ম্যাডাম বললেন – কাল রাত্রি ২টোর আগে আসবে না , আর সকাল ৬টার মধ্যে তাঁবুখাটিয়ে মাটি ফেলে, রেডি করে দেবে। ... (বাবার দিকে তাকিয়ে) ১০ দিন?

বাবা – ম্যাক্সিমাম।

ম্যাডাম বললেন – ওকে ডান।

বাবা আবার সানগ্লাস পরে নিয়ে , আমাকে নিয়ে চলে আসছিলেন। ... ম্যাডাম বললেন – কেস সলভড হয়ে গেলে, মিটিংটা আমার কোয়ার্টারে হবে। ... মাধবিকেও নিয়ে আসবে সেদিনকে।

বাবা হেসে সম্মতি দিলেন। ... রথিনকাকা হেসে বললেন – কি কনফিডেন্স হ্যাঁ , তুমি কেস হ্যান্ডেল করছো শুনে সরাসরি কেস মীমাংসার নেমন্তন্ন! ... কি ফিগার তৈরি করেছ গুরু হ্যাঁ!

কাল রাত ১টায় যাত্রা করবো , আমি আর বাবা ঠিক ৩টের সময়ে ঢুকে যাবো। সেদিন বাড়ি ফিরলাম এই দুটো নাগাদ। রথিনকাকা আমাদের বাড়িতেই লাঞ্চ সারলো। বাবাও রথিনকাকার সাথে বেড়ালেন। খালি মাকে বলে গেলেন – অতনু, লিথারজি, ফিরতে দেরি হবে।

লিথারজি নার্সিংহোমে বাবার খুব যাতায়াত। বাবার কোন এক বন্ধুর নার্সিংহোম। কিন্তু কি কারণে সেখানে বারেবারে যান, তা বলতে পারবো না। বাবা ফিরলেন যখন, আমি তখন ঘুমিয়ে পরেছি। তাই বাবার সাথে সকালে চা খাবার সময়েই দেখা হলো। আমি ওঠার আগেই বাবা উঠে পরেছেন। যখন টি-টেবিলে পৌঁছলাম, তখন শুনলাম বাবা মাকে বলছেন, ডারকিস মেকআপ আছে তো, না আনতে হবে?

মা বললেন – মিলিকে না নিয়ে গেলেই হতো না! ... ৭-১০দিন মেয়েটা স্নান কোথায় করবে?

বাবা – রাজি করাও মেয়েকে। সে তো নাছোড়বান্দা। ... ওর এখন পিরিয়ডের সময় নয়তো! তাহলে কিন্তু খুব অসুবিধা হবে।

মা – না, ওসব হয়ে গেছে। ... তুমি এতো ভুলে যাও কেন বলো তো ? ... চেন্নাইতে থাকার সময়ে, তুমি তো ওকে প্যাড কিনে দিলে।

বাবা – ওহ, হ্যাঁ তাই তো! মাথায় নেই আসলে।

আমি এবার মাঝে ফোড়ন কাটলাম – ৭-১০দিন নয় স্নান করলাম না। কি এসে যাবে! ... কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং মা, যাই না!

মা মুখটা একটু বিকৃত করে গম্ভীর ভাবে বললেন – সাবধানে থাকবে, আর বাবা যেমন বলবে , আগে ভালো করে শুনবে, তারপর তেমন ভাবে থাকবে।

দুপুরে মা , তাড়াতাড়ি লাঞ্চ করিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে আর বাবাকে , দুইজনকেই ঘুমপারিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা থেকে দেখলাম, বাবা কি যেন একটা ভিডিও দেখছেন ফোনে। এতক্ষণ ধরে বাবা তো কোন কিছু দেখেন না। ... যাই হোক। কেসের মধ্যেই আছেন। হয়তো কেস রিলেটেড কিছু ভিডিও হবে।

সন্ধ্যা থেকে মা মেকআপ করিয়ে দিলেন , আর বাবাকেও দেখলাম মাটিটাটি গায়ে মেখে , ডার্ক মেকআপ নিয়ে, পুরো ভোলই পাল্টে দিয়েছেন। রাত্রি একটার সময়ে আমরা রথিনকাকুর নয় , এবার অতনুকাকুর অন্য একটা গাড়িতে গেলাম। গাড়ি ইরা থেকে একটু দূরে দাঁড়ালো। বাবাকে দেখলাম চোখে একটা চশমা পরে নিয়েছেন। চশমা তো নয় , পুরো আতশকাঁচ। বাবার চোখগুলো এই বড় বড় লাগছিল। ... মনে পরলো রথিনকাকার কথা- চোখ দেখানো যাবেনা।

পৌঁছে গেলাম তাঁবুতে। ... দেখলে বুঝতেই পারা যাবেনা , ওটা একটা ফলস মাটির তলায় লাইনের কাজের তাঁবু। পারফেক্ট এরেঞ্জমেন্ট। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে দেখলাম , বেশ বড় তাঁবুটা। বাইরের মত , ভিতরেও কিছু মাটি ফেলা , আর এমন ভাবে মাটিটা ফেলা যেন , ওই মাটির আড়ালে ফুটপাত খোরা রয়েছে। ... তারপাসে, একটা ছোট্ট চৌকি। বুঝলাম, এতেই আমি আর বাবা, ৭-১০দিন কাটাবো।

সকলে চলে গেল। বাবা বলে দিলেন , পরের আপডেট রথিনকাকুকে জানিয়ে দেবেন উনি। সেই মত নেক্সট প্ল্যান।

দেওয়ালে কেরামতি

বাবা বললেন - এখনও রাত বাকি আছে , এই স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে পর। ব্যাগের মধ্যে পাখা আছে। নিশ্বাস ছাড়লে, সেই গতিতে চলবে পাখা। পায়ের দিকে হাওয়া পাবিনা। ... একটু ঘুমিয়ে পর।

বাবা আছেন পাশে , আমি তাই দিব্যি ঘুমিয়ে নিলাম একচোট। ঘুম ভাঙতে বাবা বললেন – চা নিয়ে এসেছি। উঠে পর। ... আমি বললাম – কটা বাজে?

বাবা – ৭টা।

আমি – কেউ কিছু প্রশ্ন করেছে! ...

বাবা – না, ভাবতে পারেনি, পুরোটা সাজানো।

একটা তারের দিকে তাকিয়ে বললাম – এটা কিসের তার বাবা! ... এই তারটা দেখেই তোমার কিছু সন্দেহ হয়?

বাবা – ধুর বোকা, এই তার ছিল এখানে! ... এটা আমার ক্যামেরার তার। পাঁচিলের ওইপারে কি হচ্ছে , সেটা দেখার জন্য তার।

আমি – কিন্তু বাবা, কি হচ্ছে বলো তো! আমার মনে হচ্ছে , তুমি অনেকদূর এগিয়ে গেছ। কিন্তু কি ভাবে এগিয়েছ, কিছু তো বুঝতে পারছিনা! ... একটা সূত্র টুত্র অন্তত দাও।

বাবা – সূত্র নিবি, তবে একটাই কথা বলবো, সূত্র অনেক আছে। তারিখগুলোতে সূত্র আছে, যদি মেলাতে পারিস। ... নৌকাকে যখন পারের কাছে নিয়ে যেতে বলেছিলাম , সেইখান থেকে যেই দৃশ্য দেখেছিলাম , তাতেও সূত্র আছে, আবার মহারাজদের কোয়ার্টারসের ম্যাপেও সূত্র আছে। আর সব থেকে বড় সূত্র , এই দেওয়ালের ওই পারে আছে। ... বুঝতে পারিসনি এখনো, তবে শীঘ্রই বুঝতে পারবি।

আমি – কোন সূত্র দিলে না আমাকে। যেই যেই জায়গায় সূত্র আছে বললে , সেখানের কোন সূত্রই তো আমার মাথায় ঢুকছে না! ... কিন্তু তারিখের ব্যাপারে! ...

বাবা – একটা ভুল করছিলাম জানিস। ভাবছিলাম বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে মেয়েগুলো। ... তবে তেমনটা নয়। তবে এটার ক্রেডিট কিন্তু তোর মায়ের। মহাভারতের মর্মার্থ খোঁজো। ... ওই একটা কথাতেই সমস্ত সূত্র দিয়ে দিলেন ওই মহীয়সী ভদ্রমহিলা।

আমি – আচ্ছা বাবা, এখানে কতদিন এক্যাক্টলি থাকতে হবে?

বাবা – থাকতে কষ্ট হচ্ছে? ব্যবস্থা করে দেব, বাড়ি যাবি?

আমি রেগে গিয়ে বললাম – ধুত, আমি সেই কথা বললাম! ... কেসের জন্য জিজ্ঞেস করছি।

বাবা – তারিখগুলো বল একবার।

আমি - টু ইচ, উজ্জয়েন, নাগপুর অ্যান্ড বাঙ্গালুরু ... ডেটটা হলো ২২শে ফেব্রুয়ারি , পয়লা মার্চ, ৮ই মার্চ, আর রিসেন্টলি, ১৫ই মার্চ। ... অন্যদিকে , ... টু ইচ ফ্রম চণ্ডীগড় , দিল্লি, আর আগ্রা, অন ডি ডেট অফ ২৩রড ফেব্রুয়ারি, ২ন্ড মার্চ, ১০থ মার্চ, আর ১৭থ মার্চ।

বাবা – ২৪, ৩, ১০, ১৭ তারমানে ২৪। আজ কত তারিখ?

আমি – ২৩শে মার্চ। ...

বাবা – হ্যাঁ তারমানে, আজ আর কাল থাকবো। পরশু সকালে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে, বাড়ি।

আমি – ব্যাস! ... তুমি যে বললে, ৭-১০ দিন।

বাবা – তোর মা জানেন, দুদিনের ব্যাপার।

বুঝলাম না কিছুই। সত্যি বলতে কি যে বুঝতে হবে , তাই বুঝলাম না। ... বাবা ক্যামেরা রেখেছে , কিন্তু এই দেওয়ালেই, আর এইখানেই কেন সেটা, আমি সেটাও বুঝলাম না। সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, গায়ে অডমশ

মেখে দুইজনে বসে ছিলাম । ফোনেই একটা বই পরছিলাম। আর বাবাও বোধহয় তেমনই কিছু করছিলেন।

খালি ৮টা নাগাদ, বাবার কানগুলো দেখলাম লাল হয়ে উঠলো, আর ভ্রুটা খুব কুঁচকে গেল। ...

আমি বললাম – কোন থ্রিলার দেখছো?

বাবা বললেন – হুম, রিয়েল টাইম ক্রাইম দেখছি।

২৪ তারিখও যথারীতি দিন চলল । খুব বিরক্ত লাগছিল। কোন কাজ নেই। সারাদিন কত গল্পের বই পরবো। পাশেই গঙ্গা, কিন্তু যাবার জো নেই। স্নান নেই , গঙ্গার ঘাটে খোলায় গিয়ে বাথরুম। সারাদিনে কিচ্ছু ঘটেনি। সন্ধ্যার সময়ে খালি কিছু গেরুয়া টাকমাথা লোক এলেন। বাবা বাঁকুড়ার ভাষায় বললেন – এই আজকে হলেই শেষ হয়ে যাবে। একটা কেবেল ফেঁসে গেছিল, টানা যাচ্ছিল না।

লোকগুলো চলে গেল, রাত্রে বাবা কালকের মতই ডিমতড়কা আর রুটি এনে খাওয়ালেন। স্বাদ ভালো না। লঙ্কা আর পিয়াজ দিয়ে কোনরকমে খেয়ে নিলাম। ... খেতে খেতেই বাবা বললেন , দুটো গাড়ি আসবে, গাড়িগুলো ঢুকলেই এই স্ক্রিনে চোখ রাখবি, গাড়ির নম্বরগুলো এসেন্সিয়াল।

এবার আমার ভ্রু কুঁচকে গেল , তবে সন্দেহে নয়, কিচ্ছু না বুঝতে পারার জন্য। ... তবে বাবা একদমই সঠিক বলেছিলেন। ঠিক রাত ১.৩০টা নাগাদ , পরপর দুটো কালো বলেরো গাড়ি এসে ইরার গেটে দাঁড়ালো। আমি বাবার দিকে তাকাতেই , বাবা ঈসারা করে স্ক্রিনে দেখতে বললেন। ... গাড়িগুলো ঠিক আমাদের পাঁচিলের পিছনের বাগানের মাঝে গিয়েই দাঁড়ালো। নম্বর নোট করলাম – ইউকে০৮টিএ৬৭৯১ আর ওডি২৮জি৯৭৩৪।

কিন্তু গাড়ির নম্বর দেখার পর যা দেখলাম , তা দেখে আমি হতবম্ব হয়ে গেলাম। দেখলাম গাড়িগুলো আপনাআপনি মাটির নিচে নেমে গেল। আর বাগানটা আবার আগের মত হয়ে গেল। আমি যে কি ভাববো, আর কি বলবো, কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। ... বাবা এরই মধ্যে , এই দিকে যেন অমনোযোগী। উনি আবার কি যেন ফোনে দেখছেন। ... শুধু আমি যেই স্ক্রিনটায় দেখছিলাম, সেটার রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু আমি দেখলাম বাবা যেন নিজের ফোনের স্ক্রিনে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছেন। এমন কি দেখছেন, যা এই কেসের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমন গুরুত্বপূর্ণ যে , একবারও এই অদ্ভুত দৃশ্য , যা দেখে আমি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলাম, সেটার দিকে তাকালেনও না!

আমি এতটাই হতবম্ব হয়ে গেছিলাম যে , কিচ্ছু ভাবতে পারছিলাম না। খানিক পরে , বাবারই ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে ঘুম ভাঙলো। রথিনকাকাকে ফোন করছেন। যেখানে আমাদেরকে ছেড়েছিল গাড়ি , সেখানে ঠিক ৩.৪৫এ দাঁড়াতে বললেন। আমি বোধহয় বসে বসেই খানিক ঘুমিয়ে পরেছিলাম। ... নাহলে ১.৩০টার সময়ে ঘড়ি দেখেছিলাম, আর এখন ৩.১৫, এতো সময় কখন কিভাবে চলে গেল।

ব্যাগ গছানো। বাবা আমাকে নিয়ে সটাং হাটা দিলেন। তবে যেই পথে এসেছিলাম, সেই পথে নয়। গঙ্গার ধারের দিকে হাঁটলেন। গঙ্গার জল দেখতে পাচ্ছি , সেই সময়ে বাঁদিকের একটা গলিতে ঘুরে গেলেন। তারপর তস্যগলি তস্যগলি করে , আমরা পৌঁছলাম রথিনকাকুর গাড়ির সামনে। ... একটাও কথা নয়। গাড়ি ছুটে চললো কলকাতার দিকে। ...

রানাঘাট ছেরে যাবার পর, রথিনকাকা প্রথম কথা বললেন – তুমি যা ধারনা করেছিলে, তাই তাই হয়েছে নিশ্চয়ই।

বাবা – হ্যাঁ। এখানে কোন কথা নয়। বাড়ি চলো। বসে কথা হবে। ...

আমরা বাড়ি ঢুকলাম এই ৬টা নাগাদ। মা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। বাবা ফোন করে দিয়েছিলেন রাস্তা থেকেই। বাড়িতে ঢুকতেই, মা বললেন – যাও একজন একজন করে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেস হয়ে স্নান করে এসো। ... বাবা প্রথম আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। সমস্ত ক্রিয়াকলাপ করে , আমি আসার পর, বাবা ঢুকলেন বাথরুমে। ঠিক ১০ মিনিটের মধ্যে বাবা ফ্রেস হয়ে চলে এলেন। লুঙ্গির মত করে , মায়ের সেলাই করা ধুতিটা গলিয়ে, চুল আঁচরে, ভিজে গায়ে, যেমন বাবা বসেন, তেমন ভাবেই বসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মা, আমাকে আর বাবাকে আর সঙ্গে নিজের ও রথিনকাকুর জন্য গরমগরম চা নিয়ে এলেন। চা খেতে খেতে বাবা আমাকে বললেন – রথিনকাকুকে গাড়ির নম্বরগুলো দে।

আমি দিয়ে দিলাম - ইউকে০৮টিএ৬৭৯১ আর ওডি২৮জি৯৭৩৪।

বাবা বললেন, কোন চেকপোস্ট দিয়ে মুর্শিদাবাদ ঢুকেছে গারিগুলো , তাড়াতাড়ি খবর নাও রথিন। আর চেক করো, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ৩রা মার্চ, ১০ই মার্চ আর ১৭মার্চ, এই একই গাড়ি ওই চেকপোস্ট দিয়েই ঢুকেছে কিনা। ... বলো, এই খবর কবে দেবে আমাকে?

রথিন কাকা – আমার টিম ওখানেই আছে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি, আজকের মধ্যেই খবর চলে আসবে।

বাবা বললেন – ভেরি গুড।

রথিন কাকা বললেন – কিছু বলবে আর কেসের ব্যাপারে ? ...মানে জানতে ইচ্ছা করছে ? ... মানে, কি ভাবে বুঝলে, ডেটগুলোই বা কি করে! ... আর ...

বাবা – সব জেনে যাবে সময় হলে রথিন। ... সকলকে সব বলবো। ... মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও কথা হয়েছে। ... উনাকেও ভিডিও কলে নিয়ে সমস্ত কিছু ডিস্‌ক্লোজ করবো। ... চিন্তা করো না। ... হাতে না হাতে ধরতে হবে। ... প্রমাণ তো এখনই পেয়েগেছি, একবারে সাজা দেবার মতন প্রমাণ। তবে যেই প্রমাণগুলো আছে, সেগুলো যে সত্যপ্রমাণ, মানে মানিপুলেটেড প্রমাণ নয়, সেটা প্রমাণ করতে গেলে, আদালত থেকে, আসামী গ্যাঁটের জোরে বেড়িয়ে যাবে। ... তাই হাতেনাহাতে প্রমাণ দরকার। ... আগে তুমি আমাকে ডিটেলস্‌, যেটা চাইলাম, সেটা দাও। ... পরের প্ল্যান অফ একশন বলছি।

রথিনকাকু – মনে হচ্ছে টিম লাগবে, এবারে তাই না?

বাবা – শুধু টিমে হবেনা। এবার প্রচুর অস্ত্রও লাগবে। ... আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমাকে জেনে জানাও , ওই ছটা জায়গায়, আর কোন মিসিং ডায়েরি হয়েছে কিনা, সেটাও জানাও।

রথিনকাকু উঠে পরলেন। আমি তোমাকে সন্ধ্যার মধ্যে জানাচ্ছি সমস্ত কিছু। ...

বাবা – যদি মিসিং ডায়েরি হয়ে থাকে , তবে তোমার পুরো টিমকে আজ ভিডিও কনফারেন্সে রাখবে সন্ধ্যায়, আর কনফারেন্সটা হবে, তোমার বোন, সুমনার বাড়িতে। ...

রথিনকাকু সেই কথা শুনে ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালে , আমিও ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে দিলাম , আমি কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছিনা।

বাবা সেই দিকে উপেক্ষা করে মাকে বললেন – দুদিনে বাড়ির আশেপাশে কোন মাথাকামানো লোক দেখলে?

মা বললেন – দুজন, আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে।

বাবা – রথিন, মুখ্যমন্ত্রীর বেয়ারার নাম কি?

রথিনকাকু বলার আগেই আমি বললাম – বংশী

বাবা – হুম। সে ব্যাটার মহারাজ গোবিন্দসখির সাথে খুব দহরমমহরম। ওর বাড়িতে খবর নিয়ে জেনেছি। ... আর ও এটুকু খবর দিয়ে দিয়েছে যে , আমাকে এই কেসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই আমার উপর নজরদারি করার জন্য, ওই দুই মাথাকামানো মঠের লোক।

রথিন কাকু – কিন্তু খবর সে দিল কখন, আর কতটা খবর দিয়েছে? সেখানে তো ছদ্মবেশ ইত্যাদি, অনেক কথাই হয়েছে। ...

বাবা – না, অতো কথা ও বলেনি। ... তুমি কোন কেস নিয়ে এসেছ , সে জানে। ... আর তোমার সাথে আমি। আমার নাম আর পেশা জানার পরই , খবর চলে যায়। ... যখন স্যান্যাল মহাশয় উনাকে ডাকেন , উনি তড়িঘড়ি করে ঢোকেন ঘরে , আর একটু দেরি করেই ঢোকেন। ... মানে , পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খবর দিয়েছে। ওর মাথায় নতুন যুক্ত হওয়া ঘাম ইঙ্গিত করে যে ওর মাথায় কাঁচা রোদ পরেছে।

বাবা বলতে থাকলেন - আর ওর দুইদুইবার যেই পকেটে ফোন, সেই পকেটে খোঁচা মারা বলে দিল, সেই মাত্র ও ফোনটা পকেটে ঢুকিয়েছে। ... মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের ঠিক সামনেই বাঁদিকে একটা বাগানে যাবার দরজা, যেটা আমরা প্রবেশ করার সময়ে দেখেছিলাম বন্ধ। কিন্তু আসবার সময়ে দেখি একটা পাল্লা খোলা। ... ও তাড়াতাড়ি করে আসার সময়ে, কাঁধে ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ওর জামার কাঁধের দিকে একটা ঘষা দাগ যোগ হয়েছিল। আর মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের ঠিক বাঁদিকটাই পূর্বদিক। তারমানে , ওখানে দাঁড়িয়েই ও ফোনে কথা বলছিল।

শেষ করলেন বাবা – অন্য কোন ফোন করতেও যেতে পারেন উনি। তাই আগে বলিনি। মাথাকামানো লোক ঘোরাফেরা করছে কনফার্ম হয়ে নিয়ে বললাম। ...

রথিন কাকা – কিন্তু তোমার কি মনে হয় ? শুধু এইখানেই মঠের চর থাকবে ? এখান থেকে গাড়ি নিয়ে কোথায় গেলে, তার খবর থাকবে না?

বাবা – নৌকাবিহারে যাবার আগে , ওদের চর নির্বাচন হয়নি। ... তাই ওটা ওরা জানেনা। ... তবে , যেদিন তাঁবুতে গেলাম , সেদিন আমার উপর নজর রাখা হয়েছিল। ... কিন্তু চিন্তা করো না। ... আমরা এখান থেকে বারাসাত পেরিয়ে, সন্ডালিয়া পর্যন্ত অতনুর ইউজ না করা গাড়িতে যাই।

রথিনকাকু – ওই জন্য তুমি সন্ডালিয়া থেকে তোমাকে তুলতে বলেছিলে?

বাবা হেসে বললেন – হ্যাঁ। ওই গাড়ি , ওখান থেকে ফিরে আসে দুপুর বেলায়। আমাদের বাড়ির গেটে গাড়ি ঢোকে, তারপর অতনুর বাড়ি যায়। গাড়ির ড্রাইভার অতনু নিজে ছিল।

রথিনকাকু – এক্সিলেন্ট লাগে তোমার প্ল্যানিং। ... কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো। এখানে যেই মাথাকামানো গুলো আছে, ওদের থেকে কোন তোমার বা তোমার পরিবারের অসুবিধা নেই তো?

বাবা – না, ওরা অতো ডেঞ্জারাস নয়। ওরা ইনফ্লুয়েন্সিং খুব , কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ওরা সকলে ভিতু। ... তবে, হ্যাঁ, নেক্সট যেদিন যাবো। সেদিন আমি, মিলি আর মাধবি ট্রেনে বনগাঁ যাবো। ওখান থেকে অতনুর ওই গাড়ি আমাদের পিকাপ করে , সোজাসুজি বাসন্তীদির কোয়ার্টারে। সেখানে মিলি আর মাধবিকে ড্রপ করে, আমি তোমাদের জয়েন করবো চেকপোস্টে।

আমি বললাম – আমি যাবো না?

বাবা – সেদিন অস্ত্র চলবে। ... হাতাপায়িও হবে। দুর্বল কেউ থাকলে , আমরা ফেঁসে যেতে পারি মিলি। শো, সেই শেষ সময়ে কি হয়, তার গল্প রথিনকাকুই তোকে বলে দেবে।

আমি আর বেগরবাই করলাম না। আমার উপস্থিতিতে যদি কেস গরবর হয়ে যায় , তাহলে, আমার সরে থাকাটাই সঠিক।

রথিনকাকু সেই সময়ের মত চলে গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় আমি , মা আর বাবা গেলাম সুমনাপিসির বাড়ি। সুমনাপিসি রথিনকাকুর বোন। উনি মায়ের ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন । উনিও একজন রিপোর্টার। পেজ থ্রি রিপোর্টার। উনার মাধ্যমেই বাবাকে রিপোর্টারের কাজে রথিনকাকু ঢুকিয়েছিলেন। ... মাকে খুব স্নেহ করেন উনি, আর বাবার একজন গুনমুগ্ধকর ফ্যান বললেও ভুল বলা হয়না।

রাতের ডিনারটা ওখানেই হবে। ... রথিনকাকুও সঠিক সময়ে এসে গেলেন। ... বাবার উদ্দেশ্যে , ব্রিটিশদের স্টাইলে বাঁ-বুকে ডানহাতের তালু রেখে , কোমর ভেঙে বললেন – ইউওর হাইনেস। তুমি একদম সঠিক ছিলে। যেই যেই ডেট বলেছ, সেই সেই ডেটে, একই সময়ে, অর্থাৎ রাত্রি ১টা নাগাদ, ওই গাড়িগুলো মুর্শিদাবাদ রামপুরহাট চেকপোস্ট দিয়ে প্রবেশ করেছে। ... আর হ্যাঁ , পরশু ৬টা জায়গাতেই ডায়রি করা হয়েছে। ... বস্ , তোমায় ভাগ্যিস সিয়াইডিতে ঢোকাইনি , নাহলে নির্ঘাত আমাদের চাকরি মারা যেত, ১০০ পারসেন্ট।

বাবা হেসে – তোমার টিমকে বলেছ?

রথিন কাকু – হ্যাঁ, ডে আর রেডি। এখনই করবে।

বাবা – হ্যাঁ শুভ কাজে দেরি কেন?

রথিনকাকু ভিডিও কল করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কল ধরে নেওয়া হলো। বোধহয় অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। কল লাগতেই বাবা বললেন – হ্যালো অফিসারস্, আমার নাম আপনারা জানেন , বিজয় সিংহ। আমি একজন রিপোর্টার, কোন অফিসার নই। বাট , মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিস, তাই আমাকে এই কেসের চার্জ দেওয়া হয়েছে। তাই, আনফচুনেটলি, বাট অফিসিয়ালি আমি এই কেসে, আপনাদের বস্। কিন্তু আমাকে বস্ মনে করার কোন কারণ নেই, কারণ আপনারা সকলেই যথাযথ অভিজ্ঞ।

অন্যদিকের কিছু লোক বললেন – স্যার সিন, আমরা প্রায় সকলেই আপনার ফ্যান ছিলাম কমবেশি , আর যেই ভাবে আপনি এই কেসটা হ্যান্ডেল করেছেন, আমরা ফুল ফ্লেজেড ফ্যান হয়ে গেছি আপনার। ... সো, ওয়িদআউট হেসিটেশন, আমাদের নেক্সট প্ল্যান বলুন।

বাবা – আপনারা সংখ্যা কজন আছেন।

উত্তর রথিনকাকু দিলেন – ১২ জন।

বাবা বললেন – আরো ৬ জন অফিসার হবেন? নাকি এটাই এসাইনড্?

রথিন কাকু বললেন – স্যাংশন ২০ জনের আছে। ... বললেই করে নেওয়া যাবে।

বাবা – বলেরোতে কজন ধরে?

উত্তর ভিডিওকল থেকে এলো – ১০ জন।

বাবা – তাহলে ডেকে নাও ২০ জনকে। তবে অনলী ফর ৩১স্ট এর অপরেশনের জন্য।

রথিনকাউ বললেন – ওকে তাহলে ২৯থ-এ, ৩০থ-এ আর ৩১স্ট-এ তিনজন তিনজন করে ডেকে নেব।

বাবা এবার বললেন – ওকে, গাড়ির নম্বর, রথিন তোমাদের বলে দিয়েছে। চেকপোস্ট ক্রস করার পরেই, আমাদের ওই গাড়িদুটোকে হামলা করতে হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি , যাতে ওরা কোন রকম কোন ইনফরমেশন দিতে না পারে। সেই অবস্থায় , ওদের মারধর করে, বন্দি করে, ওদের দুটো বলেরো চলে যাবে সিয়াইডি কাস্টডিতে। ... তারপর , সেখান থেকেই ৪জন এফিসিয়েন্ট অফিসার থাকবে , ওদের গার্ড করার জন্য। আর অন্য ১২ জন , আমি আর রথিন সন্ন্যাসী সেজে , নয়াভূমির মঠে চলে যাবো। সামনের গাড়িতে আমি থাকবো। যেমন যেমন সামনের গাড়ি যাবে, তেমন তেমন পিছনের গাড়িও যাবে।

সেখান থেকে যেখানে পউছাবো আমরা, সেখানে গিয়ে, কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু রথিনকে আমি গঙ্গার দিকের দরজা দেখিয়ে দিয়েছি, সেই দরজার সামনে ও দুজন অফিসারকে পুলিশ-ব্যাটিলিয়ান সমেত দাঁড় করিয়ে রাখবে, তারা সেই লোকগুলোকে ধরে নিয়ে কাস্টডিতে নেবে। আর আমাদেরকে উইথ হিউজ ব্যাটিলিয়ান অফ পুলিশ , ওখান থেকে প্রায় ৬০টা মত মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে। ব্যাস , এই আমাদের এক্সন হবে।

ভিডিও-কল সমাপ্ত হলো। সেদিন রাত্রে আমরা সকলে দারুণ ডিনার করলাম। মা আর সুমনাপিসি একসঙ্গে ডিনার রেডি করলেন। ইন্ডিয়ান স্টাইল ফ্রায়েড রাইস , আর মুরগী কষা। জমিয়ে খেলাম , আর সাথে রথিনকাকার থেকে বিভিন্ন বাবার কীর্তি জানলাম। ... মা-কে দেখলাম , প্রায় সবই জানেন। সুমনাপিসিও অনেকগুলিই জানেন। কেবল একটিই কথা বারবার বললেন – বিজয়দা, একটা কেসে আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই। ... কাছ থেকে দেখতে চাই , তোমার কাজ করার ধরন কেমন। ... কিন্তু আনফরচ্যুনেটলি, আমার ফিল্ডে তুমি কাজই করবে না। যেই এডভেঞ্চারাস কাজ তুমি করো , তার কাছে আমাদের কাজটা পুরো স্তিডিও টাইপ।

বাবা শেষে হেসে বললেন – রেইকি বলে একটা থেরাপি হয় জানো ?... পিসি হ্যাঁ বলতে, বাবা আবার বললেন – রেইকিতে বলা হয়, ল’ অফ এট্রাকশন। ... মানে তুমি যা নিয়ে দিনরাত ভাববে, সেটাই হবে।

... আমাদের ঋষিরাও একই কথা বলতেন । তাঁরা বলতেন, সকলে নিজের নিজের ব্রহ্মাণ্ডে বাস করেন। তাই যে যেমন ভাববেন, তার ব্রহ্মাণ্ডে তেমনই ঘটবে। ... তাই সুমনা , হওয়াই ডোন্ট ইউ থিংক ডেডলি আবউট আ কেস উইথ মি। ... দেখ করে , হলেও হয়ে যেতে পারে। কে বলতে পারে , সময়ের গর্ভে কি আছে।

সিনেমাটিক একৃসন

গত তিনচারদিন বেশ কয়েকবার ভিডিও কল হয়ে গেছে। ... পুরো প্ল্যান সকলের মাথায় ছেপে গেছে। ... শুধু ৩১ তারিখের অপেক্ষা। বাবা , রথিনকাকু, সকলের গতিবিধি শান্ত হয়ে গেছে। তাই , মাথাকামানো লোকগুলোও আজ দুদিন হয়েছে, আর দেখা যাচ্ছেনা। ...

আজ ৩১ তারিখ, ট্রেন ধরবো শিয়ালদা থেকে, বনগাঁ লোকাল। আমি, মা আর বাবা রেডি যাবার জন্য। উবার বুক করলেন বাবা। আমি মা আর বাবা গাড়িতে উঠে পরে , সাউথ শিয়ালদাতে নামলাম। অনলাইন পেমেন্ট করে। শিয়ালদা মেইনে স্টেশনের ভিতর দিয়েই গেলাম। টিকিটও অনলাইনই কাটা , ইউটিএস অ্যাপের মাধ্যমে। ট্রেনে করে বনগাঁ পৌছাতে বেশ অনেকটাই সময় লাগলো। বাবা দেখলাম অন্যান্য বিশয় নিয়ে মায়ের সাথে আলোচনা করছেন।

মায়ের সম্প্রতি আলোচ্য বিশয় হলো এক ধর্মগ্রন্থ। মা এমন বললেন যে, এই ধর্মগ্রন্থে নাকি সমস্ত পুরাণের সার কথা আছে। আমাদের সূক্ষ্ম জগতের , অর্থাৎ মন, বুদ্ধি আর অন্য পঞ্চভূতের মধ্যে কেমিস্ট্রি , আর কেমিক্যাল রিয়াকশনগুলির সূত্র স্পষ্ট ভাবে বলা আছে । আর তারপর এমনও নাকি বলা আছে যে , কোন কেমিক্যাল রিয়াকশনটা সম্ভাব্য আর কোন রিয়াকশনটা কাম্য। ... যেই রিয়াকশনটা কাম্য , তার ভৌতিক ফলশ্রুতি কি হয়, সেই নিয়ে বিস্তারে বলেছে এই ধর্মগ্রন্থ।

বাবাকেও দেখলাম, সেই কথাতে খুব উদ্বুদ্ধ। তিনি সমস্ত শুনে বললেন – এর মানে তো, মানবজাতি এক শ্রেষ্ঠমার্গদর্শনের দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ... কিন্তু কথা হচ্ছে যে কুকুরের পেটে কি ঘি হজম হয়!

মা – মানে?

বাবা – আসলে ঘিয়ের শিশিটা মানুষের হাতে থাকাই ভালো। মানুষের হাতে থাকলে কি হয় , যে মানুষ হচ্ছে, ঘিটা সেই মানুষকেই উনি দেবেন। কুকুরের সামনে থাকলে কি হবে, কুকুর সব ঘি খেয়ে তো নেবে, কিন্তু ওর পেটে তো ঘি সহ্য হবেনা, তাই ঘিটা খালি নষ্ট হবে।

মা – তারমানে, তুমি বলছ, এই সমস্ত গ্রন্থ পাবলিশ না হওয়াই ভালো?

বাবা সেই কথার উত্তর না দিয়ে বললেন – কোথা থেকে এই গ্রন্থের ব্যাপারে তুমি জানলে?

মা – আমার এক বান্ধবী ছিল, কলেজের। ... ওই এই সমস্ত ঐতিহাসিক বইয়ের রিসার্চ করে। ... তা সে নাকি, হিমালয়ের এক গুহায় এক বাঙালী সাধিকার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি নাকি এই গ্রন্থের কথা বলেছেন।

বাবা – সাধিকাই কি বই পাবলিশ করতে চলেছেন?

মা – না, সাধিকাটি বলেছেন, এই বইয়ের আরো ৫টা কপি আছে। সেখান থেকে , তুমি যেই কথা বললে, তেমনই কিছু বলেছেন উনি। পাবলিশ হতে হতেও হবেনা।

বাবা চোখ বন্ধ করলেন কথাটা শুনে। তারপর বললেন – সেই সাধিকা বলেছেন , তাঁর গুরু বইটির লেখক?

মা – না, গুরুর বাবা।

বাবা – হুম, বুঝেছি। ১-৩-৬-১২-২৪ ... বুঝলাম। ...

মা – কি বুঝলে?

বাবা – বই পাবলিশ হবেনা। ... তবে একটা পাবলিসিটি হয়ে যাবে বইটার। ...

মা – মানে?

বাবা – দেখতে পাবে, আই থিংক খুব তাড়াতাড়িই দেখতে পাবে।

এই বিশয়ে আর কথা হলো না। মায়ের যেন বাবার কথাটা শুনে ভালো লাগেনা। ... তাই এই বিশয়ে আর কিছুই বললেন না উনি। তবে আমার কাজ ছিল, চুটিয়ে ট্রেনের খাবার খাওয়া। ঝালমুড়ি, তেঁতুলজল দিয়ে করা ছোলামাখা, ঘুগনি, সমস্ত মুখরোচক খাবার খেতে থাকলাম।

অনেকক্ষণ পরে মা বাবার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন – আজকে কি গুলিগোলা চলবে?

বাবা – আশা করা যায়, না। ... তবে হ্যাঁ, যদি কোন ভুলচুক হয়ে যায়, তবে চলতেও পারে।

মা – পুলিশকে ইনভলভ করা হচ্ছেনা কেন?

বাবা – ওদের ইনভলভ করার মানে, যাদেরকে অতর্কিত আক্রমণের প্ল্যান করা হচ্ছে, তাদেরকে সমস্ত খবর অগ্রিম পৌঁছে দেওয়া।

মা – ফোর্সটা পাওয়া যেত।

বাবা – হ্যাঁ, পেলে সুবিধাই হতো, কিন্তু কাজ ভেস্তে যাবার সম্ভাবনা বেশি। তাই, দুষ্টগরুর চেয়ে শূন্যগোয়ালই ভালো।

মা – ওরাও কি মিলেমিশে আছে নাকি এতে?

বাবা – কুকুর বেড়াল একবাড়িতে থাকলে, মিলেমিশেই থাকে মধু। তাই কুকুরকে দিয়ে বিড়ালের গলায় ঘণ্টি পরানো যায়না। সেটার জন্য দরকার, আমাদের মতন কিছু বাঁদর।

এই সব অনেক কুকুর, বেড়াল, বাঁদরের আলোচনার মধ্যে দিয়েই আমরা পৌঁছলাম বনগাঁ স্টেশন। বাবার আর মায়ের মুখ চলল কথা বলার জন্য, আর আমার মুখ চলল, ট্রেনের হকারপরিবেশিত চটপটা খাবার চেবাতে। মুখ চালানো বন্ধ করে এবার আমরা স্টেশন থেকে বেড়িয়ে, একবার আশেপাশে দেখে নিলাম, কোন মাথামোরানো লোক রয়েছে কিনা। তারপর অতনুকাকুর ড্রাইভার এঙ্গেজ থাকবে বলে, রথিনকাকার এরেঞ্জ করা সুমনাপিসির গাড়িতে চেপে বসতে, সুমনাপিসির ড্রাইভার আমাদেরকে নয়াভূমির এসডিপিওর অফিস, অর্থাৎ মিসেস বাসন্তী ভূঁইয়ার কোয়ার্টারে পৌঁছে বিদায় নিল।

সেখানে মাকে দেখে ওই বেঁটেখাটো মহিলার খুব আনন্দ। ... গল্পের তাঁর কোন শেষই নেই। ... মায়ের নিজের গল্প, আমাকে নিয়ে গল্প, বাবাকে নিয়ে গল্প, বাবার পেশা নিয়ে গল্প। আরো কতকি। লাঞ্চ সেরে

বাবা সামান্য বিশ্রাম নিয়ে চলে গেলেন সিয়াইডি ক্যাম্পে । আমাকে বাবা বলে দিলেন , রাত্রি যখন ১টা , তখন একটা সিয়াইডি কাকু আসবেন। তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে , গঙ্গার কাছাকাছি একটা বিশেষ জায়গা বলে দিলেন, সেখানে কিছু শুকনো পাতাকে পিন মারা আছে , পিনগুলো সরিয়ে নিলে, মাটি খোরা আছে। সেই মাটিটা হাতড়ালেই, একটা সাদা পেনড্রাইভ পাবো, সেটা উদ্ধার করে আনতে বললেন।

বুঝলাম, বাড়িতে রাখলে বিপদ হতে পারতো। সেই জন্য , এখানেই মাটিচাপা রেখে চলে গেছিলেন বাবা , এই কেস-রিলেটেড সমস্ত প্রমাণসমূহকে। ... বাবা এটা প্রায়ই বলে থাকেন। ... লুকোতে হয় , চোরের নজরের সামনে। ... আসলে লুকনোটা একটা সাইকোলজিক্যাল গেম। ... যেখানে ভাবা যায়না , সেটিই লুকোনোর বেস্ট প্লেস। ... যে খুঁজবে , সে জানে যিনি লুকিয়েছেন , তাঁর কাছে সেটি খুব মূল্যবান , তাই গোপন স্থানেই রাখবেন। কিন্তু এমন চোখের সামনে সেটা রাখতে হয় , যেদিকে যিনি লুকোনো জিনিস খুঁজছেন, তাঁর মনেও আসবেনা।

রাত্রে, বাবা যেমন বলেছিলেন, তেমন ভাবেই পিন দিয়ে আটকানো পাতা সরিয়ে , মাটি ঠেলে পেনড্রাইভ উদ্ধার করে আনলাম। প্রকৃতি সহায় ছিলেন , নাহলে উদ্ধার করা কঠিন হতো। ... জোরে একটা হাওয়া দিতে দেখলাম, একটা জায়গার পাতা উড়তে চেয়েও উড়তে পারলো না , বুঝলাম, পিনগুলো সেখানেই মারা। ... তারপর তো বাবার ইন্সট্রাকশন ফলো করা। ... সেদিন আমি অত্যন্ত বোর হচ্ছিলাম। আসলে বাবা একটা এডভেঞ্চারে গেছেন, আর আমি যেতে পারিনি। তাই।

সেই কারণেই আমি, মা, বাসন্তীপিসি, আর সেই সিয়াডিকাকু এই পেনড্রাইভকে ল্যাপটপে লাগিয়ে সমস্ত প্রমাণগুলো দেখলাম। ... দেখলাম বাবা ওই গাড়ির নম্বর সহ , গাড়িগুলো যে বাগানের মাঝে এসে থামলো, আর সেটা নিচে চলে গেল , সেই পুরো ভিডিওটা করেছেন। ... বাবাকে না পেয়ে , আমাকেই বাসন্তীপিসি প্রশ্ন করলেন – এই ভিডিও ফুটেজ বিজয় পেল কি করে?

আমি বললাম – যেই পাঁচিলটায় আমরা ছিলাম , তারই উপর দিকে একটা পাতলা তারদিয়ে , বাবা ক্যামেরাটা লাগিয়ে, একটা মোবাইল স্ক্রিনের সাথে কানেক্ট করে রেখেছিলেন। ... সেইখান থেকেই এই ভিডিওটা তোলা।

সিয়াইডি কাকু বললেন – এর মানে, বিজয় বাবু, ওই গার্ডেনেই যত কেলেঙ্কারি, সেটা আগে থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন। ...

আমি বললাম – শুধু তাই নয়, কোন দিন যে এই গাড়িগুলো আসবে, তাও বাবা জানতেন।

আমারই মত, কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না, কি করে বাবা এই সমস্ত কিছু জানলেন। তাই বাবার ব্যাখ্যার জন্য সকলকেই অপেক্ষা করতে হলো। আর এছাড়া , সেদিন রাত্রে বাবাদের যেই এডভেঞ্চার হয়েছিল , সেই কথা পরেরদিন সকালে রথিনকাকুর থেকে শুনি আমরা সকলে। সেই কথা এখানে বললাম –

রথিনকাকা বললেন – প্ল্যান মতই, চেকপোস্টের থেকে ঠিক ১০০ মিটারের মধ্যে , আমরা প্রস্তুত ছিলাম। সামনে বড় গাছের ডাল ফেলে , দুটো গাড়িকেই আটক করা হলো। ... তারপর , ওদের গাড়ি থেকে বেড়িয়ে ডাল সরানোর আগেই, আমাদের হামলা হয়। আর ড্রাইভার সহ সবাইকে চড়া ক্লরোফর্ম দিয়ে ঘুম পারিয়ে, আমরা ওদেরকে অন্যগাড়িতে শিফট করে , ওদের গাড়ির থেকে , ছয়জন মেয়েকে উদ্ধার করি , আর তাদেরকেও সেফ কাস্টডিতে রেখে দিয়ে, সেখান থেকেই ওদের দুটো বলেরো নিয়ে, আমরা গেরুয়া কাপর পরে, মাথাকামানোর উইগ চাপিয়ে, ইরার গেটে যাই।

সেখানের সিকিউরিটি আমাদেরকে গেট খুলতেই , বিজয় আমাদের প্রথম গাড়িতে ছিল। ও আমাদেরকে একটা বাগানের গেটের সামনে নিয়ে যায়। ... সেখানের সিকিউরিটিও গেট খুলে দিলে , বিজয়ের ইন্সট্রাকশনে, আমাদের গাড়িকে ঠিক বাগানের মাঝে দাঁড় করালাম। আর ওমনি গাড়িটা নিচের আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেল। ...

আমরা গাড়ি থেকে বেড়িয়ে , মাথা নিচু করে , গাড়ির সিট সরাচ্ছিলাম , যেখানে প্রথমে সন্ন্যাসীগুলো মেয়েগুলোকে প্যাক করে রেখেছিল, সেই খানটাতে। ... তারপরেই আমাদের পরের গাড়ি ঢুকল। ... আর আমরা এবার পুরো টিম হয়ে যাবার পর , পিছন ফিরে দেখি, মহারাজ গোবিন্দসখি আরো ছয়জনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ...

আমাদেরকে দেখে প্রথমে একটু নজর দিলো , তারপর বিজয় আর আমাকে চিনতে পেরেই , চম্পট লাগানোর চেষ্টা করলো। ... এই আন্ডারগ্রাউন্ডের থেকে একটা রাস্তা , গোবিন্দসখির ঘরে উঠছে। সেদিক দিয়েই ওরা এসেছিল, কিন্তু সেইদিক দিয়ে ওরা পালালো না। ... ওরা আরো একটা রাস্তা নিলো। আমরা পিছন নিলাম। ... ওরা দেখলাম , একটা দরজা দিয়ে পালাতে গেল , কিন্তু সেখানে সামনেই আমাদের দুইজন অফিসার আর বিশাল পুলিশ বাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল , যারা ওদের সবকটাকে গ্রেফতার করে। ৬৪টা মেয়ে উদ্ধার হয়েছে। আর তাদের মধ্যে, একজনকে নিয়ে বিজয় আসছে।

বাবা কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হলেন , একজন অল্পবয়সী মেয়েকে নিয়ে। ... মেয়েটির হাতে দেখলাম একটা স্যালাইনের পাউচ , আর হাতের মাঝে স্যালাইনের সিরিঞ্জ ঢোকানো। সমস্ত উদ্ধার হওয়া

মেয়েকেই, এমন দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁদের শরীরে এই একমাস বা তার বেশি সময় ধরে যে ঘাটতি হয়েছে, তা পুড়ন করা যায়, আর সোডিয়াম লেভেল, পটাসিয়াম লেভেল, সব হাই করা যায়।

মেয়েটিকে নিয়ে এসে বাবা একটি সোফাতে বসালেন। এরপর সকলে সেখানে উপস্থিত... মানে, আমি, মা, বাসন্তীপিসি, রথিনকাকা, বিডিও স্যার , সিয়াইডিটিমের অন্য সদস্যরা , এমনকি নয়াভূমি থানার ওসি , সকলকে দেখে নিয়ে , বাবা এবার মুখ্যমন্ত্রীকে ভিডিও কল করলেন। কলে কথা হতে , বুঝলাম, আগে থেকেই সমস্ত কথা বলা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে কল করে বাবা প্রনবেশ লাহিড়ীকেও কল করে , কল মার্জ করলেন আর তারপর, বাবা যেখানে দাঁড়িয়ে, সকলকে সমস্ত কথা বলবেন, ঠিক তার সামনে ফোনটাকে রাখলেন, যাতে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী ও লাহিড়ী মহাশয় শুনতে ও দেখতে পান।

এবার বাবা বলতে শুরু করলেন –

আমার বাড়িতে মহারাজ গবিন্দসখি আসেন সিয়াইডি অফিসার রথিন ব্যানার্জিকে নিয়ে। উনি আমাকে এই কেসের ব্যাপারে সূচনা দিতে আসেন, এমনই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি সূচনা বা কেসের কথা বলতে আসেন নি। তিনি আগে থেকেই জেনে গেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী , এই কেস আমাকে দিচ্ছেন, আর তাই উনি আমার সাথে আলাপটা সেরে নিয়ে, আমাকে দেখে নিতে আসেন।

এবার কথা হলো খবর উনি পেলেন কি করে, আর কিই বা প্রমাণ করে যে তিনি এই খবর পেয়েই আমার সাথে দেখা করতে আসেন! ... খবর দেন উনাকে, মুখ্যমন্ত্রীর অলক্ষ্যে, মুখ্যমন্ত্রীরই বিশ্বাসনীয় পাত্র বংশী, অর্থাৎ হ্যাঁ স্যার, আপনার বেয়ারা বংশী। কি করে বোঝা গেল ? প্রথমত, আমি ও রথিন যেদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাই, সেদিন আমরা সেখানে যেতেই , আমরাই যে কেসটা হ্যান্ডেল করছি , সেই বার্তা দিতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী যেই ঘরে বসে আমাদের সাথে কথা বলছিলেন, ঠিক তার পাশে, বাগানের দিকে চলে যান।

পূর্ব দিকে রোদ্দুর থাকায়, তাঁর মাথা ঘেমে যায়, মুখ্যমন্ত্রী ডাকার ফলে, হন্তদন্ত হয়ে আসার সময়ে, বাগানে যাবার আধখোলা দরজায় কাঁধ ধাক্কা লাগার কারণে , ছাপ যোগ হয় তাঁর জামার বাকাঁধে , আর ফোনটা সবে, হয় কেটে বা না কেটে, সে পকেটে বারবার ঢোকানো আছে কিনা, সেই দিকে নজর দিতে থাকেন। ... যদিও এটা শুধুই সন্দেহ ছিল। কিন্তু রথিন গোবিন্দসখি এবং বংশীর কল্ রেকর্ড চেক করে , আমার সন্দেহটা কনফার্ম করে।

আমি কেসটা হ্যান্ডেল করছি, কনফার্ম খবর পাবার পরে, আমার বাড়ির কাছাকাছি, আর কলকাতা থেকে এনএইচ ৩৪ এ ঢোকার আগে , যশর রোডের মাথায়, মঠকর্তৃপক্ষ নিজেদের চর লাগিয়ে রেখে , আমাকে এই বিশয়ে ভাবতে বাধ্য করেন। ... আর সেই দেখেই , আমার স্ত্রীর দ্বারা কথিত একটি কথায় মনোযোগ

গেল। তিনি আমাকে বলেছিলেন , খালি ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা মন দিয়ে বিচার না করে , একটু চেতনা দিয়ে বিচার করতে।

আসলে আমি সমানে এমন ভেবে যাচ্ছিলাম যে নিশ্চয়ই বর্ডারের ওই পারে এই সমস্ত চালান হচ্ছে। কিন্তু আমি যেটা দেখছিলাম না, সেটা হলো ভিতরের ব্যাপারটা। উনার কথাকে গুরুত্ব দিয়েই , আমি নয়াভূমির মঠকে দেখতে যাবো এমন ঠিক করি। ... আর সেই যাত্রাপথে , এই চরদের দেখে, আমার কাছে অঙ্ক মেলানোর জন্য কোন দিশায় যেতে হবে, তা বুঝতে শুরু করি।

নয়াভুমির এই মঠে প্রবেশের মুখ্যদ্বার অবশ্যই রাস্তা থেকে , কিন্তু এর প্রাচীরের ঠিক পিছনেই গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সেখানে কিছু দেখার মত থাকলেও থাকতে পারে। তাই রথিনকে বলাতে , সে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা করে। আর সেখান থেকে আমি সেই দরজাটি দেখতে পাই , যেই দরজা দিয়ে পালানোর সময়ে , কালরাত্রে সাঙ্গপাঙ্গ সমেত গোবিন্দসখি ধরা পরেন। ... তবে তখন দেখে কিছু বুঝিনি বলাই ঠিক হবে , তবে হ্যাঁ দেখেছিলাম সেই দরজাটা , আর এও দেখেছিলাম যে দরজাটার রঙ একদমই পাঁচিলের রঙের সাথে মেলানো, মানে যাতে দেখতে না পাওয়া যায়, তেমন করেই করা।

(ঈষৎ মনের খেয়ালে হেসে) শিল রূপী অষ্টপাশের একটি , অর্থাৎ গোপন করার ইচ্ছা যেখানে আছে , সেখানে অবশ্যই গোপন করারও কিছু থাকতে হবে । দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে কাজে লাগতে পারে, এই ভেবে, সেই দৃশ্যকে স্মৃতিতে রেখে দিই। ... এবার মুল মঠে , পর্যটকের মত আমি, রথিন ও আমার কন্যা আসি। আমার কন্যাকে গোবিন্দসখির সামনে বেরুতে দিইনি , তাই সে সকলের কাছে অপরিচিত, আর আমি এবং রথিন ছদ্মবেশে ছিলাম , তাই সকলের অলক্ষ্যেই ছিলাম। তবে সেখানে যা দেখি, তাতে আমার অঙ্ক মিলতে শুরু করে দেয়। ... সেখানে দেখি , যেই জায়গায় গোবিন্দসখির কোয়ার্টার, ঠিক সেই জায়গারই পিছনে ওই গঙ্গার ধারে দরজাটা। ... অর্থাৎ , সেই দরজা গোবিন্দসখির ঘরের সাথে কানেকটেড়, এটা তো নিশ্চিত হলাম। ...

সঙ্গে সঙ্গে, কোয়ার্টারের পাসে রাস্তা , আর সেই রাস্তার পাস বরাবর ফুলের বাগান। ... মজার জিনিস দেখলাম সেখানে। সমস্ত বাগানের সমস্ত ফুলগাছে প্রচুর প্রজাপতি , কিন্তু মহারাজ গোবিন্দসখির কোয়ার্টারের ঠিক উল্টোদিকে যেই বাগান , সেখানে একটিও প্রজাপতি নেই। ... বুঝলাম যে সেখানের সমস্ত গাছ প্লাস্টিকের, সেগুলো গাছ নয়। ... কিন্তু এই বিশেষত্ব কেন? সেটা খতিয়ে দেখতে একটু আগের দিকে এগোতেই নজরে এলো , সেখানে বেশ কিছু মোটা চাকার গাড়ির ছাপ রয়েছে , আরো খতিয়ে

দেখতে, দেখলাম, একটা বৃত্তাকার লেয়ার মাটি, সেখানে যেন একটা নির্দিষ্ট আকারে সাজানো, যেটা বারে বারে ওঠা নামা হবার কারণে, সেই ধার বরাবর কিছু মাটি লেগে রয়েছে।

সন্দেহ এবার আমার কাছে দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছিল। ... কিন্তু শুধুই অনুমানের ভিত্তিতে কিচ্ছু করা যাবেনা। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি আছে আমার কাছে। সেটা দেখালেই ভিতরে যেতে পারবো , আশ্রমেও থাকতে পারবো, কিন্তু আমার উপস্থিতি ওদের কাছে রেড এলার্ট হয়ে যাবে। ... তাই সিদ্ধান্ত নিই , এক সাঁড়াশী আক্রমণ করবো। ... বাইরে থেকে ভিতরে কি ঢুকছে , সেটাও দেখবো। আর ভিতরে কি হচ্ছে সেটাও দেখবো। ...

ভিতরের জিনিস দেখার জন্য, আমাকে কিছু গেম সাজাতে হতো। ... তাই আমি সমস্ত সেই কন্যা , যাদের অপহরণ হয়ে গেছিল, তাদের সাথে জড়িত, যাদের যাদেরকে পেয়েছি, তাদের সাথে যোগাযোগ করে এটা জানি যে, যতজনকে অপহরণ করা হয়েছে, সকলেরই মঠ-এস্টেটে দেওয়ার মত কিছু ছিলনা। ... আমি আমার গেমের ধারা পেয়ে যাই। তাই অতনু , আমার সিবিয়াই বন্ধুর সাথে কথা বলে , একটি এস্কর্ট সার্ভিসের মেয়ে যোগার করি। এই মেয়ের কথা আমি , অতনু অর্থাৎ সিবিয়াই অফিসার, আর আমার স্ত্রী, যাকে কিছু না বললেও, সে বুঝে গেছিল, এঁরা ছাড়া কেউ জানতেন না।

এই মেয়ে, নাম এমিলিকে টাকা দিয়ে , আমি ৪-৫ দিনের জন্য নিয়ে আসি আমার সাথে। আর এর ডানপায়ের বুড়োআঙুলের নখের উপরে আমার পরিচিত নার্সিং হোম থেকে একটি ক্যেমেরা ফিট করে , একটা এক্সট্রা নখ লাগিয়ে দিই। এবং একে এই মঠে শিখিয়ে পরিয়ে পাঠিয়ে দিই , আর ওর পায়ের ক্যামেরা থেকে যা কিছু রেকর্ড হয় , যা আমি সমানে আমার মোবাইলে দেখছিলাম , তা আমি এই পেনড্রাইভে আদালতে দেবার প্রমাণের মত করে আপলোড করে দিয়েছি। ... এর কাছেও কিচ্ছু মঠকর্তৃপক্ষকে দেবার মত ছিলনা। তাই এর সাথেও তাই তাই হয় , যা অন্য ৬৩টি উদ্ধার করা মেয়ের সাথে হয়েছে। অর্থাৎ, এঁর কাছে এসে কেউ বলেন যে এই খানে যারা কিচ্ছু না দিয়ে থাকে , তাদের থাকতে গেলে, মহারাজের কাছে গিয়ে সেই কথা বলে নিতে হয়, নাহলে পরে এঁদের খুব অসুবিধা হয়।... মহারাজকে বলা থাকলে, আর কোন ধরনের অসুবিধা হবেনা।

সেই কথা বলার পর, সে মহারাজের কাছে যায়। আর মহারাজ নিজের ঘরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে বলেন, আর সেখানে দাঁড়ানোর পরেই, মহারাজের একটা টেকনিকাল কারিগুরি, আর সেই মেয়ে সোজা আন্ডারগ্রাউন্ডে পৌঁছে যায়, যেই খান থেকে আমরা কাল সকলকে উদ্ধার করি। কিন্তু এই স্থানে যাবার একটিই রাস্তা ছিল না। এই স্থানে যাবার দ্বিতীয় রাস্তাটি হলো , মহারাজের সামনের বাগানের ওই স্থান , যেটা দেখে আমার সন্দেহ হয়। ...

কিন্তু আমার অনুমানকে এবার নিখুঁত করতে হবে , প্রমাণসাপেক্ষ করতে হবে, তাই ওই পাঁচিলের পাশেই তাঁবু খাটাই। ইরার পাঁচিলের বাইরে দোকানের তাঁবু দেওয়া যাবেনা , রথিন আমায় জানায়। তাই আমি মাটিখুরে লাইনের কাজ হচ্ছে, দেখানোর কথা বলে, একটি তাঁবু আর তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু মাটি এরেঞ্জ করতে বলি। সমস্ত এরেঞ্জমেন্ট হয়ে যেতে একটু বেগ পেতে হয়। বিডিও স্যার সাহায্য করতে রেডি থাকলেও, এসডিপিও ম্যাম রাজি হননা।

কিন্তু বাসন্তীদি, আমার অত্যন্ত পরিচিত একজন অফিসার । ... নিজের পরিচয় দিতে , উনি রাজি হয়ে গেলেন। আর আমি আমার কন্যাসহ সেখানে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই।

কেসের সমাপ্তি

ভিতরের প্রমাণ পাবার জন্য এমিলিকে পাঠিয়ে , আমি আমার কাজ করে দিয়েছিলাম, যদিও সেই পাঠানো যে সার্থক হয়েছে, তা ওই তাঁবুতে বসে বসে, তার নখের উপর লাগানো ক্যামেরার দৃশ্য, এই স্ক্রিনে (হাতে একটি মোবাইল স্ক্রিন দেখিয়ে) দেখে নিশ্চিত হই। ... কিন্তু এখনো একটা অঙ্ক বাকি ছিল।

হ্যাঁ ধরে নিয়েছিলাম অঙ্কটা , কিন্তু শিওর ছিলাম না। ... অঙ্কটা হলো তারিখের। ... টু ইচ , উজ্জয়েন, নাগপুর অ্যান্ড বাঙ্গালুরু ... ডেটটা হলো ২২শে ফেব্রুয়ারি , পয়লা মার্চ, ৮ই মার্চ, আর রিসেন্টলি, ১৫ই মার্চ। ... অন্যদিকে, ... টু ইচ ফ্রম চণ্ডীগড় , দিল্লি, আর আগ্রা, অন ডি ডেট অফ ২৩রড ফেব্রুয়ারি , ২ন্ড মার্চ, ১০থ মার্চ, আর ১৭থ মার্চ।

যখনই শিওর হয়ে গেলাম যে সরষের মধ্যেই ভুত , তখনই এই অঙ্ক মিলে গেল। ... উজ্জয়েন , নাগপুর আর ব্যাঙ্গালুরু, এই তিনটের নিকটবর্তী ইরার সব থেকে বড় সেন্টার হলো, ভুবনেশ্বর, আর এই তিন স্থান থেকেই ভুবনেশ্বর আস্তে একদিনের উপর লাগে। অর্থাৎ ২২টা হলো ২৩, ১লা টা ২রা হলো, ৮টা হলো ৯, ১৫ই হলো ১৬ই। ... আর ভুবনেশ্বর থেকে নয়াভূমি হলো আধদিন। অর্থাৎ পরের দিন শুরু করলেই , এখানে পৌঁছাবে ২৪শে, ৩রা, ১০এ, আর ১৭ই। ...

একই ভাবে, চণ্ডীগড়, দিল্লি, আর আগ্রা তিনটেরই নিকটবর্তী বড় ইরা সেন্টার হলো হরিদ্বারে। আর এদের দূরত্ব সবই ১২ ঘণ্টার আশেপাশে। অর্থাৎ ২৩টা ২৩ই , ২টা ২ই, ১০ আর ১৭ যে তারিখগুলো পরের এসাইনমেন্টের, আর ওগুলো সাকেস্ফুল ডেলেভারির পরে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ যদি সমস্ত কিছু মিলিয়ে নিই, তবে এই দাঁড়ায় যে , যেই যেই তারিখে এই নয়াভূমিতে গাড়িদুটি এসে পৌছায় , সেগুলো হলো,

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ৩রা মার্চ, ১০ই মার্চ, ১৭ই মার্চ। ... তারপর তো রিসিনিং-এর অঙ্ক। অর্থাৎ নেক্সট ডেট হতে চলেছে ২৪শে মার্চ।

সমস্তটাই অনুমান ভিত্তিক ছিল , তাই সেই কিডন্যাপিংটা হতে দিতে হয়েছে স্যার (মুখ্যমন্ত্রীর) উদ্দেশ্যে , নাহলে এঁদেরকে হাতেনাহাতে ধরতে পারতাম না। ... আর হাতেনাহাতে না ধরলে , যতই তথ্যপ্রমাণ রাখো, এরা ঠিক পয়সার জোরে ছাড়া পেয়ে যেত। তাই একটা কিডন্যাপকে হতে দিতে হয়েছে স্যার। ... আই এপোলোজাইজ ফর ড্যাট স্যার।

২৪শের রাত্রে গাড়ি এলো, গাড়ির নম্বরগুলো পেলাম। আর আমার অনুমান মতই, গাড়িগুলো বাগানের ঠিক সেই জায়গাতেই গেল, যেখানে গাড়ির চাকার ছাপ দেখেছিলাম। ... সেই স্থানে মাটি নেই , আছে একটা মেকানাইজড় পুলি, যেমন বড় বড় পারকিং স্লটে থাকে। ... গাড়ি দাঁড়াতেই নিচে চলে গেল , আর গাড়ির মধ্যে থাকা সমস্ত মেয়েদের ওই ঘরে ফেলে চলে আসা হলো। ...

স্যার, এমিলির পায়ে লাগানো ক্যামেরা থেকে গোবিন্দসখি ছাড়াও কারা কারা যুক্ত ছিলেন , তা সমস্তই দেখানো আছে। ... আর এই গাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবার ভিডিওও আমি করি , এও তাঁবুতে বসে, একটা কেবিল দিয়ে ক্যামারাটা পাঁচিলের ঠিক উপরে রেখে। ...

আর কি? রথিন গাড়ির নম্বরের থেকে চেকপোস্টের সাথে মিলিয়ে, আমার করা হিসেব, মানে ২৪, ৩, ১০, ১৭ এই তারিখগুলো মিলিয়ে নিলো , আর তাই সেই সিকুয়েন্স অনুসারেই , নেক্সটবার গাড়িগুলোর আসার কথা ছিল ৩১ তারিখ, মানে কাল। ... রাত বারোটার পরে এসেই গাড়িটা ভুল করলো। ১স্ট এপ্রিল হয়ে গেল, আর ওরা এপ্রিল ফুল হয়ে গেল। ...

সমস্ত ঘরে একটা নিস্তব্ধতা ভরে গেছিল। বাবার এই কথা সকলকে হাসিয়ে দিল। ... মুখ্যমন্ত্রীকেও । ... বাবা আবার বললেন – আমরা চেক পোস্টেই ধরতে পারতাম। কিন্তু সেখানে ধরলে , ওরা সরাসরি গোবিন্দসখিকে ফোন করে এলার্ট করে দিতো। ... তাই আমরা ওদের চেকপোস্ট পেরতে দিয়ে , ১০০ মিটারের মধ্যে ওদের গাড়ির সামনে গাছ ফেলে, গাড়ি থামাতে বাধ্য করি। ... তারপর আমাদের অতর্কিত আক্রমণ। ... কিছু ইঞ্জুয়র হয়েছে ওরা , তবে সেটা ততক্ষণের জন্যই , যতক্ষণ না ক্লরোফর্ম ওদেরকে অজ্ঞান করে দেয়। ... উদ্দেশ্য, যাতে ওরা গোবিন্দসখিকে কিচ্ছু জানাতে না পারে।

তারপর, ওদের গাড়ির থেকে ৬টা মেয়েকে উদ্ধার করি আমরা। ... আর তারপর, আমরা আগে থেকে ঠিক করা মতই, গেরুয়া পোশাক আর মাথায় ন্যাড়া হবার ওয়িগ পরে, সেখান থেকে চলে যাই ইরার গেটে। ...

গাড়ির নম্বর ওই একই, ভিতরে গেরুয়া মাথা মোড়ানো লোকজন দেখা যাচ্ছে। তাই সিকিউরিটি আটকালো না। ... গাড়ি নিয়ে সেই বাগানে গেলাম , যেটা আদপে একটা বাগানই নয়। ... সেখান থেকে নিচে। তারপর আমাদের দেখেই , বিশেষ করে আমাকে আর রথিনকে দেখেই চিনতে পারে গোবিন্দসখি। ... পালাবার জন্য ও দ্বিতীয় রাস্তা নেয় , যেটা ওর ঘরে নয় , গঙ্গার দিকে যেই পাঁচিলের সাথে মিশে থাকা দরজা দেখেছিলাম, সেটার দিকে।

কিন্তু সেই দরজার বাইরে , দুইজন সিয়াইডি অফিসারসহ , পুলিশের বাহিনী ছিল , যারা ওদেরকে হাতেনাহাতে ধরে নেয়। ... আর শেষে , আমরা এমিলিকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে ৬৪জন মেয়েকে উদ্ধার করেছি। ... এঁদের মধ্যে , ৪৮জনের এফআইআর আগে হয়েছিল । ২৪শে মার্চ ৬টি মেয়েকে রাখা হয় , কালকের ৬টি মেয়ে আছে , আর ৩ জনকে পাচার করা হয়নি , কারণ এমিলির মতই , তাদেরকে এখান থেকেই আন্ডারগ্রাউন্ডে পাঠানো হয়। ...

লাহিড়ী মশাই, আপনার পরিচিতকেও, এই ৬৩ জনের মধ্যে পাওয়া গেছে। উনি সুস্থ আছেন। ... সেখানে ওদেরকে সবসময়ে অজ্ঞান করে রাখা হতো। ... তাই তাঁরা একটু দুর্বল। এখানের হাসপাতালের প্রধান মহাশয়কে এসডিপিও ম্যাম ডেকে নিয়ে , সমস্ত মেয়েদের স্যালাইন আর স্যালাইনের সাথে পটাসিয়াম , সোডিয়াম সমস্ত দিয়ে , সুস্থ করা হচ্ছে। ... তারপর , মিস্টার স্যান্যাল, আপনি ওদেরকে নিজের নিজের বাড়ি ফিরিয়ে দেবেন। ... আমার এখানেই ছুটি। খালি লাহিড়ী মশাইয়ের কাছে , উনার পরিচিতকে পৌঁছে দিতে হবে। ...

মুখ্যমন্ত্রী বললেন – সত্যি বলতে, আমার কাছে ভাষা নেই বিজয়। ... তোমার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখে বুঝলাম, তুমি একজন জাত শিকারি। ... আর এমন শিকারি তুমি, যাকে চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়। ... তুমি আমার অফিসে এসে , তোমার প্রাইজ মানিটা অবশ্যই কাল-পরশুর মধ্যে নিয়ে যাবে।

বাবা বললেন – আরেকটা তথ্য স্যার। ... সিবিয়াই-সূত্রে জেনেছি , প্রতি বছর, একটা ১০০ মহিলার এসাইন্মেন্ট ভারত থেকে দুবাই যায়। ... মোস্ট প্রব্যাব্লি , এই সংখ্যাটাও ৬৪ থেকে ১০০ হয়ে গেলে , মনেহয় ওখানেই যেত।

লাহিড়ী মশাই বললেন – ওকে, আমি এই ইনফরমেশনটা হোমমিনিস্ট্রি কে দিচ্ছি। এটা নিয়ে তারাই কিছু করুক।

বাবা শেষ করলেন – থ্যাঙ্ক ইউ বলে।

সকলে নড়ে চরে বসলেন। আর সিয়াইডি টিম বাবাকে আলিঙ্গন করে বললেন – আমরা সকলে মুগ্ধ। সিম্পলি বাকরোহিত হয়ে গেছি।

বাসন্তীপিসি কাছে এসে বললেন – ওয়ান ইন আ মিলিয়ান ব্রিলিয়ান্ট বিকাম লাইক ইউ , মাই চাইল্ড। বেঁচে থাকো।

বাবা অফিসিয়ালি এবার একটা চিঠি করে , রথিনকাকুকে দিলেন, যেখানে বাবা অফিসিয়ালি নিজের উপর প্রদত্ত দায়িত্ব হ্যান্ডওভার করলেন রথিনকাকুকে। রথিনকাকু এখনই ফিরলেন না। ... কারণ উনাকে এই সমস্ত মেয়েদের হ্যান্ডওভার করতে হবে তাদের তাদের পরিবারের কাছে। আর ওই দুষ্টু মহারাজ আর ওর সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে যেতে হবে , কলকাতায়। ... বাবা বললেন – কোর্টে আমাকে ওদের কেসের সময়ে যেতে হবে। ... প্রমাণ তোমাদের হ্যান্ডওভার করে দিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে একটা করে কপি আছে। ...

এই বলে, সকলকে বিদায় জানিয়ে , আমি, বাবা, মা, এমিলি আর শ্যামলী রথিনকাকুরই দেওয়া একটি গাড়ি করে ফিরে এলাম। ... বাসায় এসে, মা সকলকে রান্না করে খাওয়ালেন। ... এমিলি একটু লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ছিল। ... মা উনাকে বললেন – তিনি কত দিয়েছেন?

এমিলি – এক লাখ।

মা – আর ওই দেহব্যবসায় না ফিরে গিয়ে , এই ১ লাখ টাকা নিয়ে , একটা বিউটিসিয়ানের কোর্স করে , জীবনটা পাল্টে নাও। ...

এমিলি মায়ের কথাতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মাকে আর বাবাকে, পায়ে হাতদিয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

বাবা বললেন – আমি শ্যামলীকে মিস্টার লাহিড়ীর কাছে দিয়ে আসি। ... তারপর একটা ঘুম মেরে, একটা ছোট্ট ট্রিপ এরেঞ্জ করো। ... পরপর দুটো কেস করে, শরীরটরির এলে গেছে পুরো।

মা মিষ্টি হেসে সম্মতি দিলেন। ... বাবা শ্যামলীকে নিয়ে, আর আমাকে নিয়ে চলে গেলেন। ...

লাহিড়ী আবাসনে পৌঁছে, শ্যামলীকে দেখে লাহিড়ীমশাই খুব আনন্দিত হলেন। ... শ্যামলী উনাকে প্রণাম করলেন। ... বাবাকে লাহিড়ী মশাই কথা মত , আরো চার লাখ টাকা দিলেন। ... শ্যামলী সেখানে ছিল

না। ... তাই বাবা বললেন – আপনার কন্যাকে দিয়ে গেলাম লাহিড়ীমশাই। ... নিজের আশ্রিত করেও , নিজের কন্যাকে নিজের কাছেই রেখে দিন। ... এদিক সেদিকে যেতে দিচ্ছেন কেন ? কালকে উদ্ধার করার পর, আমি ওর সাথে কথা বলেছি। ... সুন্দর স্বভাবের মেয়ে আপনার।

লাহিড়ী মশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাবা হেসে বললেন , খোঁজ নিয়ে জেনে নিয়েছি আমি । লক্ষ্মীরানি দেবীর গর্ভে, আপনার এই সন্তান জন্ম নিয়েছিলেন আজ থেকে ২৪ বছর আগে। ... আপনার দুই ছেলেও তো জানেন, এই কন্যার ব্যাপারে। ... কিন্তু চিন্তা করবেন না। আপনার স্বার্থে না হলেও , শ্যামলীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, এই কথা কেবল আপনার আর আমার মধ্যেই থাকবে।

লাহিড়ী মশাই এবার একটু ভেঙে পরলেন, আর বললেন – বিজয়, আমি তোমার গুলাম হয়ে গেলাম। ... যখন যা প্রয়োজন পরে , এই জ্যাঠাকে একবার বলতে ভুলে যেও না । আমরা ফিরে এলাম। দেখলাম , মায়ের অঙ্ক কষা শেষ। ... আমরা সিমলা , কুলু, মানালি যাবো। ... টিকিট বুকিং , হোটেল বুকিং সমস্ত শেষ। ... বাবা, কাল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে দেখা করে , ১০ লাখ টাকার প্রাইজ মানিটা নিয়ে আসবেন। আর আমরা পরশু বাদ দিয়ে, তারপরের দিন সকালে প্লেনে চাপছি। প্লেন টু সিমলা। ... আ ট্রিপ ফর , ১০ ডেজ।

বৎসনাভ

সিমলা থেকে ঘুরে এসেছি, প্রায় দুইমাস হয়ে গেছে। ... শুধুই বাড়িতে বসে রয়েছি। বাবাও কনো কেস নিচ্ছেন না, আর তাই আমারও কনো জায়গায় যাওয়া হচ্ছে না । আসলে বাবাকে সামান্য কেসে কেউ ডাকেন না; উনার সম্বন্ধে ইম্প্রেসানটাই এমন হয়ে গেছে সবার যে , দাসগুপ্তকাকু বা ঘটককাকু কেউই বাবাকে আর সামান্য কেস দিতে চান না। পয়সার চিন্তা নেই , আগের দুই কেসে বাবা যা অর্থ রোজগার করেছেন, তা সমস্ত কেরিয়ার মিলিয়েও নাকি তিনি রোজগার করেন নি, এমনই তাঁর দাবি।

হ্যাঁ, মায়ের সাথে একদিন চা খেতে খেতে বাবা বলছিলেন আমি আড়াল থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন , মিলি তো পুরো মা লক্ষ্মী হয়ে অবতরণ করেছে আমার প্রফেসানে। ও যেই কেস থেকে আমার সাথে লেগেছে, তবে থেকে আমার খালি উপার্জনই হচ্ছে। কোচির কেসে এক লাখের উপর উপার্জন হয়েছে , আর আশ্রমের কেসে তো ১৬ লাখ টাকা। একটা কেসে ১৬ লাখ টাকা উপার্জন ভাবা যায়!

কথাটা শুনে ভালোও লাগে, একটু গর্বও হয়, তারপর মনে হয়, বাবা এই পারিশ্রমিক ডিসার্ভ করেন। উনি নিজের মুল্যয়ন নিজে করতে পারেন না বলেই, এতো কম টাকায় কাজ করেন উনি। যাইহোক, আপাতত দুই মাস ধরে আমি প্রচণ্ড বোর হচ্ছিলাম। আর বাবা একটা কথা বলেন না , 'যাহা তোমার মনের মধ্যে চলিবে, তাহাই বাহিরে হইবে'। ঠিক তেমনই হলো।

বাবার কাছে এবার এলো একটা বোরিং কেস। কি! না একটা লেখক মারা গেছেন , সেটার কভারেজ করতে হবে। রহস্যজনক মৃত্যু হতো, তাও মানা যেত, স্বাভাবিক মৃত্যু। দিন সাতেক ধরে বমি পায়খানা হচ্ছিল, ডাক্তার দেখায়নি, তাই মারা গেছেন। ... ধুর, মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল।

যাই হোক, মজুমদার কাকু এসে বেল বাজিয়ে চা খেয়ে, ১০ হাজার টাকা এডভান্স দিয়ে, আর ওই বোরিং কেসটা বাবার হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেলেন। ... আমি বাবাকে বললাম – এই কেসটা করবে তুমি! এতে তো কনো তদন্তই নেই!

বাবা হেসে বললেন – চল দেখি, হতেও তো পারে, তদন্তের আছে, কিন্তু তদন্ত হচ্ছে না।

আমি – মানে? ... আর যদি থাকেও, তদন্ত না করতে চাইলে, তোমাকে তদন্ত করতে দেবে নাকি?

বাবা – তেমন বুঝলে, মজুমদারকে কনভিন্স করতে হবে। ভাব তো, সবাই যেখানে বলছে সাধারণ মৃত্যু, প্রভাতসন্দেশ যদি ছাপে যে, এটা একটি রহস্যজনক মৃত্যু, তবে পেপারটার সেল কি ভাবে বেড়ে যাবে!

আমি মাথা নেড়ে বললাম – এই কেসের মধ্যে তোমার মনে হয় কিছু রহস্য থাকতে পারে!

বাবা – শীর্ষদা, মানে শীর্ষ দাস একজন প্রখ্যাত লেখক ছিলেন। পর পর তিনবছর বাংলার বেষ্ট সেলার ছিলেন উনি। আর উনার বয়সই বা কতো? ৪৪-৪৫ এর বেশি নয়। ... একবার ভেবে দ্যাখ, একটা মানুষ কতটা ফ্রাস্ট্রেটেড হলে তবে ৭ দিন ধরে এমন ভুগেও ডাক্তার না দেখিয়ে থাকেন । ... হতেও তো পারে যে, উনি কনো একটা বিশয়ের কারণে , জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে , জেনেশুনে মৃত্যুকে নিজের কাছে আস্তে দিয়েছিলেন। কি পারে না!

আমি এত খতিয়ে ভাবিনি আসলে। যাই হোক , আশার কিরণ না থাকলে হয়তো বাবাকে বলেই দিতাম , তুমি যাও আমি যাবো না। ... কিন্তু বাবা ওই যে আশার কিরণ দেখালেন , তারপরেই সিদ্ধান্ত নিলাম, না যাই বাবার সাথে, কে জানে, হয়তো কিছু ইন্টারেস্টিং রয়েছে। পরে ইন্টারেস্টিং বেরুলে , আমি কেসের প্রথমটা মিশ করে যাবার কারণে, পুরো থ্রিলটাই হারিয়ে ফেলবো। ... এমন ভেবে, বাবার সাথে গেলাম।

জায়গাটা পর্ণশ্রী, বেহালা। তাই পৌছাতে আমাদেরকেও বেশ একটু বেহাল হতে হলো। পৌঁছে দেখলাম , লোকসমাগম রয়েছে, বেশ কিছুটা। ... সাংবাদিক রয়েছেন , জনা ছয়েক। চৌরাস্তা থানার ওসি রয়েছেন , যদিও চিনতাম না , বাবা কথা বললেন বলে জানলাম। আর দেখলাম , একটা বচসা চলছে। একটু পর্যবেক্ষণ করে জানলাম, শীর্ষবাবুর ছেলেকে কিছু একটা কনভিন্স করার চেষ্টা করছেন, থানার ওসি।

বাবাকে অন্য রিপোর্টাররাও চেনেন, আর দেখলাম বেশ মান্য করেন। তাঁরা বাবার উদ্দেশ্যে বললেন , এই সামান্য কেসে তুমি! কি ব্যাপার!

বাবা হেসে বললেন – মজুমদারের বায়নাক্কা, কিচ্ছু করার নেই।

থানার ওসির সামনে যেতে , মিস্টার গাঙ্গুলি বাবার উদ্দেশ্যে বললেন – আরে বিজয়! ... কি সৌভাগ্য , এখন তো তুমি একজন আমাদের কাছে এফিসিয়েন্সির ম্যাসকট হয়ে গেছো। ... কিন্তু এখানে ? কি ব্যাপার। উনাকে চিনতে নাকি?

বাবা – চিনতাম তো অবশ্যই। ... দু-দুবার ইন্টার্ভিউও নিয়েছি আগে। ... কিন্তু শেষ একটি বছর ধরে , উনি কেমন যেন একটা গাঢাকা দিয়ে দিয়েছিলেন , তাই না! ...যাই হোক , আমি এখানে ফান্ডেড , মানে প্রভাতসন্দেশের মজুমদারের রিপোর্টার হয়ে এসেছি।

ওসি স্যার এবার শীর্ষবাবুর ছেলে, বিশিষ্টকে মাধ্যম করে বাবাকে বললেন – আরে কি করে বোঝাই বলো তো ইনাকে বিজয়! ... একা মানুষ, সাতদিন ধরে নাকি ভুগছিলেন, তাই মারা গেছেন। ... কিছু কিছু উনার সহকর্মী লেখকের থেকে এই তথ্য জানলাম। কিন্তু এর কনো প্রত্যক্ষদর্শীই তো নেই। ... এবার একজন সাক্সেসফুল লেখক, উনার তো শত্রুর , মানে কম্পিটিটারের অভাব নেই। ... তাই একটু খতিয়ে দেখতে হবেনা! ... বলছি উনাকে পোস্ট মর্টামের কথা, উনি কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না!

বাবা – ডাক্তার কি ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন!

ওসি স্যার কিছু বলার আগেই, বিশিষ্টবাবু বললেন – হ্যাঁ, উনি তো সকালে এসেই দিয়ে গেছেন।

বাবা – উনি কি আপনাকে ফোন করেছিলেন? মানে, না হলে আপনি জানলেন কি করে উনি মারা গেছেন! না কি আপনি রোজ আসতেন, বাবার সাথে দেখা করতে?

বিশিষ্ট বাবু বললেন – আমি মাসে একদিনের বেশি আস্তে পারতাম না। আমার প্রাইভেট ফার্মে চাকরি। ওর থেকে বেশি সময় আমি পেতাম না । ... কাল সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বাবার একটা কল এসেছিল , যদিও মিটিংএ ছিলাম, তাই ধরতে পারিনি। ... ফোন ব্যাক করলাম তখন রাত্রি ন'টা হবে। ফোন রিং হয়ে গেল, কেউ ধরলেন না। ... আজ সকালেও একবার ট্রাই করি, তখনও কলে পাইনি। তাই চাকরির জন্য বেড়িয়ে প্রথম বাবার কাছে আসি । দেখি দরজায় তালা দেওয়া নেই। ভিতরে গিয়ে দেখি বাবা মাটিতে বিছনায় ঠেসান দিয়ে, চোখ উলটে পরে রয়েছেন।

বিশিষ্টবাবু বলতে থাকলেন, আমার হাউজ ফিসিসিয়ানকে ডাকলাম। সে আস্তে বললো , কাল রাত্রেই মৃত্যু হয়ে গেছে, এই ৮টা নাগাদ। ... ডেথ সার্টিফিকেটেও তেমনটাই লিখেছেন, এই দেখুন।

এই বলে বাবার হাতে ডেথ সার্টিফিকেটটা ধরিয়ে দিলেন।

বাবা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন , কিন্তু বিশিষ্টবাবু! হয় ডাক্তার আপনার সময় বাঁচানোর চক্করে , নয় নিজের বুদ্ধিতেই মিথ্যে কথা বলেছেন যে!

বিশিষ্ট বাবু – মানে!

বাবা – মানেটা এই যে, শীর্ষদার মৃত্যু বিষক্রিয়ায় হয়েছে। ভালো করে দেখুন গাঙ্গুলিদা, উনার দেহে হাল্কা হাল্কা নীলাভাব এবার প্রকাশ পাচ্ছে। ... আর দ্বিতীয়কথা এই যে , উনার মৃত্যু আজকে সকালেই হয়েছে। ... এই ঘণ্টা দুই-তিন আগে। ... বিষের প্রভাবে মৃত্যু , তাই শরীর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ... সরি টু সে, মিস্টার বিশিষ্ট দাস, বাট ইওর ফাদারস্ ডেথ ঈশ নট আ ন্যাচারাল ডেথ।

ওসি, মিস্টার গাঙ্গুলি এবার মরদেহকে একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখে বাবার উদ্দেশ্যে বললেন – বিজয়, ইট মিনস্, আওয়ার ডিপার্টমেন্ট ওয়াজ রাইট। ... তুমি যদি ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে হতে, তবে তো ভাই, আচ্ছা আচ্ছা দুধে অফিসারকে ধুল চাটিয়ে দিতে! ... আমি এতক্ষণ এখানে রয়েছি , আমার নজরেই আসেনি!

বাবা – সরকারি ডাক্তার দিয়ে প্রথম চেক করিয়ে নাও গাঙ্গুলি । ... আমার নজরে যা এসেছে , তাই বললাম। একবার সরকারি ডাক্তার আমার কথাকে সম্মতি দিলে, তবেই পোস্ট মর্টামের চিন্তা করো।

ওসি স্যার কিছু ফোন কল করলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো , তারপর একটি মেডিকাল টিম এলো। বাবা মুখটা একটু বেজার করেই বললেন – বললাম, আগে ডাক্তার দেখিয়ে নিতে , সোজা ফরেনসিক টিম নিয়ে হাজির!

তবে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। এই ফরেনসিক টিমে , বাবার একজন গুনমুগ্ধ ফ্যান ছিলেন। উনার নাম ডক্টর প্রতিভা সিং। বয়স বেশি হবে না , এই আমাদের থেকে বছর ৬একের বড় হবেন। উনিই ফরেনসিক টিমটার নেতৃত্ব করছিলেন । বাবাকে দেখেই উনি চিনতে পেরে সামনে এসে , নিজের মাস্কটা সরিয়ে হিন্দিতে বললেন – স্যার! ... স্যার বিজয় সিন হে না আপ!

বাবা ভ্রুটা কুঁচকে বললেন – স্যার! ... আমায় আবার কবে নাইট উপাধি দেওয়া হলো!

মিশ সিং হেসে বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বললেন – স্যার, এখন তো ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট , ফরেনসিক, সারে জায়গা পে, আপনার হি চর্চা হচ্ছে। আমি পার্সোনালি স্যার , আপনার কাজ করার তারিখা দেখকে , যাকে বলে ইয়ে স্পেলবাউন্ড। ...

ওসি স্যার মাঝে একটু গদগদ হয়ে বলে উঠলেন – আরে বিজয়ই তো প্রথম বলল , কেসটা নর্মাল ডেথ নয়। ... হাই, আমি চৌরাস্তা থানার ওসি, অখিলেশ গাঙ্গুলি।

মিস সিং একটা মুচকি হেসে , সরকারি ডাক্তারের দিকে তাকালেন। সরকারি ডাক্তার দেখে বললেন , মিস্টার গাঙ্গুলি, ইউ আর রাইট। হি হ্যাজ বিন পয়েজেনড্। আর হ্যাঁ, ওর মৃত্যু আজ সকাল ৭টার দিকে হয়েছে।

বিশিষ্ট বাবু, এখানে এতক্ষণ কি যে হচ্ছিল , সেই নিয়ে বেশ চাপে ছিলেন। ... এবার হতবম্ব হয়ে গিয়ে বললেন – বাবাকে বিষ দেওয়া হয়েছে! ... কে দেবে! কেন দেবে! ... বাবার তো কনো শত্রু নেই। বাবার স্বভাবই শত্রুতা করা নয়। ... তবে?

বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আর এবার ওসি গাঙ্গুলি স্যার বললেন – তাহলে মিস্টার দাস, এবার তো পোস্ট মর্টাম করতে দেবেন, কি দেবেন তো?

বিশিষ্ট বাবু একটু সকড় ছিলেন। সেই ভাবেই বললেন – হ্যাঁ, সে তো করতেই হবে। কিন্তু কে?

ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট নিজেদের সমস্ত স্যাম্পেল কালেক্ট করে নিয়ে চলে গেলেন , বিভিন্ন স্থান থেকে। বাবাকেও দেখলাম, ফরেনসিকের সাথে পিছনে পিছনে ঘুরছিলেন। কি কালেক্ট করছেন , শুধুই দেখছেন। একটিও প্রশ্ন করছেন না।

শুধু সমস্ত স্যাম্পেল কালেক্ট করার পরে বললেন ওই মিশ সিংকে – আচ্ছা ম্যাডাম, আপনাদের তো সমস্ত স্যাম্পেল কালেক্ট করা হয়ে গেছে। এবার আমি কি কিছু দেখতে পারি এখানে! ...

মিশ সিংকে কিছু বলতে না দিয়ে , গাঙ্গুলি স্যার বললেন – বিজয়, তুমি যেকোনো সময়ে এসেই, এখানে নিজের কাজ করতে পারো, আই গিভ ইউ ডা পারমিশন। বাট হ্যাঁ, যখন আসবে, আর যখন বেরুবে, তখন আমাকে একটা করে হয়াটস্অ্যাপ মেসেজ দিয়ে রাখবে। জাস্ট ফর ফর্মালিটি।

মিশ সিং এবার বাবার কাছে এসে আবার নিজের মাস্ক খুলে বললেন – স্যার, আপনার সাথে এককাপ কফি পি শাকতে হে! ... নেহি মাতলাব। আপ কো ইতনা পাস সে দেখ রাহা হু , তো যদি একটু আলাপ করে রাখতে পারতাম। ...

বাবা হেসে বললেন – মিট মাই ডটার অ্যান্ড মাই এসিস্ট্যান্ট , মিলি। ... আপনি তো এখন ডিউটিতে। টাইম আর প্লেস বলুন। ... ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড , আপনি আমার বাড়িতেও অফিস শেষে চলে আস্তে পারেন। ... আমার পেশার অন্তরালে আরো এক কারিগর আছেন , আমার স্ত্রী। তাঁর সাথেও আলাপ করে নিতে পারবেন, আর কফিটাও হয়ে যাবে।

মিশ সিংকে দেখলাম, খুব উত্তেজিত। বাবার কাছ থেকে ফোন নম্বর নিলেন। বাবাও উনার ফোন নম্বর শেভ করে নিলেন নিজের ফোনে। ... সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় আসবেন , এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। আর শেষে, বডিটা পোস্ট মর্টামে পাঠানোর পুরো ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, আমাদের বেলেঘাটার বাড়িতে এক নয় , দুই-দুইটি অতিথির আগমন ঘটে। এঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই মিশ সিং , যিনি পরবর্তীতে আমার খুব কাছের বন্ধু হয়ে ওঠেন , এখনও আছেন। তবে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় অতিথি। প্রথম অতিথি ছিলেন মিস্টার দাস, অর্থাৎ মিস্টার বিশিষ্ট দাস।

দরজা খুললেন মা। আসলে মা ভেবেছিলেন, মিশ সিং এসেছেন। ... বাবাকে কতবার মা বলেছেন, একটা আইহোল লাগাতে। বাবার আর সেটা লাগিয়ে দেওয়ার সময় হয়না । মা সেইদিনই রাত্রে বাবাকে বিরক্ত হয়ে বলছিলেন , এমন সমস্ত ব্যাপারে ডিলে করো না , যেন মনে হয় , কারিগর নয় , তুমি নিজেও আইহোলটা লাগাবে। ... কাজ হয়েছিল , মায়ের কথাতে। পরের দিন সকালেই কাঠের লোক এসে , আইহল লাগিয়ে দিয়ে যান।

কিন্তু সেই দিন তো আইহোল ছিলনা। তাই মা-ই মিস্টার বিশিষ্ট দাসকে দরজা খুলে দিলেন। মা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে চিনতে পারেন নি। তাই বাবা এগিয়ে গেছিলেন । একদেখায় বাবা চিনতে পেরে, নিজে থেকেই বললেন – আসুন মিস্টার দাস। ভিতরে আসুন।

মা বুঝতে পারলেন, বাবার ক্লায়েন্ট। তাই চা চাপাতে চলে গেলেন। বাবার সামনের বড় সোফায় বসলেন মিস্টার দাস, আর আমি আর বাবা, সোফার দুটি সিঙ্গেল চেয়ারে বসলাম। কথা পারলেন, বিশিষ্ট বাবুই।

বিশিষ্টবাবু – ওসি গাঙ্গুলিবাবুর থেকে আপনার নাম, এড্রেস আর আপনার বিশয়ে জেনে এসেছি। ... আমি চাই, আপনি আমার বাবার কেসটা হ্যান্ডেল করুন।

বাবা – আপনার ডাক্তারকি আপনারই কথা মত , কনোরকম পরীক্ষা না করেই , ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন?

বিশিষ্টবাবু – পুরোটা আমার কথায় নয়। ... প্রথমে উনিই বললেন , যে বাবা আর নেই, তারপর বললেন, শরীর যেই ভাবে ঠাণ্ডা হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, উনি রাত্রেই মারা গেছেন। ... আমি তারপর উনাকে বলি , আমি রাত্রে আর সকালে ফোন করেছি, কেউ ওঠায়নি। ... তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, কি হয়েছিল। উনি বললেন, ভুগছিলেন তো উনি বেশ কিছুদিন ধরে। ডাক্তার দেখান নি নাকি! ... আমি বললাম, এই ব্যাপারে আমি তো কিছু জানিই না! ... তো উনি বললেন স্বভাবিক মৃত্যু। তাই আমি বললাম , ডেথ সার্টিফিকেট করে দিতে, যাতে ফালতু ঝামেলা না হয় , আর আমাকে অফিস থেকে ছুটি নিতে না হয়। তাই উনি করেন। এতে উনার কনো দোষ নেই স্যার। ... আর আমিও যদি জানতাম যে স্বভাবিক মৃত্যু নয় , তবে আমি নিজেই পুলিশ ডাকতাম।

বাবা একটা গম্ভীর মুখ করে বললেন – ডাক্তারের সাথে একবার তো দেখা করতেই হয়। ... একটা ডাক্তার হয়ে, উনি কি করে বুঝলেন না যে এটি বিষক্রিয়া! ... এনি অয়েজ। এবার আমাকে আপনার বাবার ব্যাপারে কিছু বলুন।

বিশিষ্টবাবু – স্যার, আমার বাবা বরাবরই একটু চুপচাপ। কম কথা বলেন । মায়ের দেহান্ত হয়েছে পাঁচ বছর আগে। তারপর থেকে বাবা সম্পূর্ণ ভাবেই চুপ হয়ে গেছিলেন। ... আমি সপ্তাহে একবার যেতাম বাবার কাছে। তবে ইদানীং , মানে মাস চারেক আগে , আমাকে একটা কেম্পেনের চিফ করে দেওয়ায় অত্যন্ত কাজের চাপ বেড়ে গেছে। তাই মাসে একদিনের বেশি সময় করতে পারতাম না।

মা চা-বিস্কুট, আর মিষ্টি-জল দিতে, ভদ্রলোক একটু জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলতে থাকলেন। ... বাবার আগের বই পাবলিশ হয়েছে অক্টোবরে, পুজোর ঠিক আগে আগে। গল্পের নাম ছিল ... কি যেন!

বাবা – বঙ্গে দুর্গাপূজার প্রবর্তন।

ভদ্রলোক চোখ উঠিয়ে বললেন – হ্যাঁ, হ্যাঁ। ... আসলে বইটই একদমই পড়া হয়না। ... সেই বইটা এবারে বইমেলাতে মার্কেটিং করে , দিশা পাবলিকেশন। দিশা থেকে প্রতিবারই আমাকেও যেতে বলে। এবারেও বলেছিল। বাবা প্রতিদিন থাকেন বইমেলার সময়টাতে। আমি এবারে একদিনই কনোভাবে যেতে পেরেছিলাম। ... বইমেলা ঘুরিও নি। শুধু দিশা পাবলিকেশনের স্টলেই গেছিলাম। উনারা আমার খাতিরযত্ন ভালোই করলেন। আসলে বাবার থেকে ওরা কম ব্যাবসা করেছে! ... কিন্তু বাবা ছিলেন না।

এবার চায়ে একচুমুক দিয়ে, হাতে কাপের ডিশ সমেত কাপ ধরে বললেন – আমি প্রশ্ন করেছিলাম বাবা নেই কিনা। উনারা বললেন , হ্যাঁ আসলে উনি একটা বইয়ের কাজে খুব ব্যস্ত। তাই একদিনই মাত্র

এসেছিলেন। বুঝলাম যে সেই বইটারও পাবলিকেশন হাউজ ওরাই হবে , তাই এতো আগ্রহ ওদের । আর সত্যি জানেন, বাবা যেন অক্টোবরের পর থেকে কেমন একটা একঘরে করে নিয়েছেন নিজেকে। কোথাও যাননা, কারুর সাথে বিশেষ যোগাযোগও রাখেন না। ...

বাবা – উনার কনো কো-রাইটারের সাথে আপনার যোগাযোগ আছে!

বিশিষ্টবাবু – উমম্, তেমন তিন চার জন আছেন। ... মানে, আমি ভুলেই গেছিলাম। আজকে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমাকে ফোন করেন তাঁরা | তাই মনে পরে। সুন্দর স্যন্যাল আছেন , পবিত্র দাসগুপ্ত আছেন, আর আছেন ভবানী দেবী। ... ইনারা আমাকে আজ দুপুরে ফোন করে বাবার মৃত্যুর জন্য শোক জ্ঞাপন করার সময়ে বলেন, শেষ এক সপ্তাহ ধরে বাবা নাকি অসুস্থ ছিলেন। আর বাবার সাথে শেষ উনাদের কথা হয় তিনদিন আগে। সেদিন তিনি বলেন , তাঁর এই শরীরের অবস্থায় , তাঁর সেবা করার জন্য ঈশ্বর নাকি কারুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ... তবে , তেমন কারুর তো কনো দেখাসাখ্যাত পেলাম না। হয়তো বাবারই মনের ভুল হবে!

বাবা – ঠিক আছে। আপনি আজকে আসুন। আপনার ফোন নম্বর আর এড্রেসটা দিয়ে যান। ... আপনার অফিসেরটাও দেবেন। খুব আর্জেন্ট হলে , আপনাকে এমনি ফোনে নাও পেতে পারি। তখন আপনার অফিসের নম্বরে ডায়াল করে নেব।

বিশিষ্টবাবু – স্যার, আপনার ফিজটা কতো। ... আর কতো অগ্রিম দেব?

বাবা – ফিজ! ... আমি তো কনো প্রফেশনাল টিকটিকি নই দাদা। ... তাই আমার ফিজ কি করে থাকতে পারে! ... রিপোর্টার আমি। ... সেই সূত্রে দুচারটে কেস আমার হাত দিয়ে সলভড্ হয়ে যায়। যখন হয়ে যায়, তখন কেসটাতে যার ইন্টারেস্ট ছিল, সে খুশী হয়ে যা দেয়, সেটাই আমার উপার্জন।

বিশিষ্টবাবু এবার ব্যাগ থেকে একটা খাম বারকরে বললেন – এতে একটা ৫০০টাকার বান্ডেল আছে। কেস শেষ হলে, আপনি বলবেন, আর কত দেব।

বাবা টাকাটা নিতে একটু ইতস্তত করছিলেন। তাই আমি সেই টাকাটার দিকে হাত বারিয়ে বললাম – আমি উনার এসিস্ট্যেন্ট। আমায় দিন টাকাটা। উনি আমার হাতে দিয়ে দিলেন। বাবা যে আমার এই কীর্তিতে খুব খুশী হয়েছিলেন, তা নয়, তবে মা খুশী হয়েছিলেন।

বিশিষ্টবাবু চলে গেলে, মা-ই সেই ব্যাপারে কথা পারলেন – সবাই টাকার কথা আগে বলে। আর তোমাকে টাকা দিতে এলেও নাও না! ... ফ্রি সার্ভিস দাও না গিয়ে। ... সংসার চালাবেও কি ফ্রি সার্ভিসিং দিয়েই!

বাবা একটা গভীর নিশ্বাস ছেরে বললেন – মধু, সমস্ত ব্যাপারকে একটু খতিয়ে দেখতে শেখো এবার। একটা লেখকও একটা রিপোর্টারের মত , অনেক সময়েই কনো সত্য উদ্ঘাটনে নেমে পরেন । যদি এমন দেখা যায় কেস সলভ করার সময়ে যে, যেই সত্যকে উনি উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছিলেন, সেই সত্যকে আমিও প্রকাশ করতে পারবো না। ... তখন! ... তখন এতো পয়সা নিয়ে , আমি কি উত্তর দেব? আসামি ফসকে গেছে, তাই বলবো? ...

আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন – যতক্ষণ না কেসের সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ ওই টাকার খামটা যত্ন করে তুলে রেখে দিবি। ... সমাধান হয়ে গেলে, তারপর মায়ের হাতে তুলে দিবি।

আমি আজ্ঞা পালন করতে, আমার আলমারিতে টাকাটা ঢুকিয়ে রাখলাম। সেটা রেখে ফিরে আস্তে যাবো , তখনই কলিং বেলটা বেজে উঠতে, আমি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললাম। সামনে দেখলাম, একটা ফরসা লম্বা আর একটু রোগাটে চেহারার একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখের দিখে তাকাতে বুঝলাম, মিশ সিং। সকালে গ্রাউন পরে ছিলেন, তাই এখন দেখে চিনতে পারিনি। ভিতরে নিয়ে এনে বসালাম সোফায়।

বাবাই প্রথম কথা বললেন – ডাইরেক্ট অফিস থেকে?

মিশ সিং – না স্যার, বাড়ি গিয়ে ফ্রেস হয়ে এসেছি। ... আসলে মরার শরীর নিয়ে ঘাটাঘাটি তো। তাই ওই ড্রেসে কোথাও যাইনা; জীবাণু প্রচুর থাকে। ...

বাবা এবার মায়ের দিকে ঈসারা করে প্রতিভা সিংকে বললেন – উনি আমার স্ত্রী , এবং আমার সমস্ত কাজের নেপথ্যে থাকা কারিগর , মাধবি সিংহ। ... আর মাধবি , উনি হলেন ফরেনসিক অফিসার , মিশ প্রতিভা সিং। ... শীর্ষবাবুর কেসটা উনিই হ্যান্ডেল করছেন, মানে মেডিকাল দিকটা।

মাকে দেখলাম মিষ্টি করেই আলাপ করলেন , যেমন তিনি সব সময়ে করেন। কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা কথা বারবার আসছিল। ... এমন অনেকেই বাবার সাথে আলাপ করেন , কিন্তু বাবা তো কারুকে বাড়িতে আস্তে বলেন না! ... এই মেয়েকে আস্তে বললেন কেন? ... এতটা গুরুত্ব তো বাবা কনো মেয়েকে দেন না!

কেস মনে হয় শেষ

আমার প্রশ্নের উত্তর দুটি। তার প্রথমটি হলো এই যে , বাবা আমার পরবর্তী জীবনের সব থেকে কাছের বন্ধুটিকে নিয়ে এসেছিলেন সেদিন বাড়িতে। ... হ্যাঁ , প্রতিভার সাথে আমার বন্ধুত্ব এই কেসের থেকেই বাড়তে শুরু করে, আর তা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে , ও আর আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাই। ... আজ আমরা দুজনে অন্তত সপ্তাহে একদিন মিট করিই । আর সেখানে মিট করে, গল্প, আড্ডা, কেসের ব্যপারে কথা থাকে আর শেষে বাবার প্রসঙ্গ ওঠেই।

কিন্তু আমার প্রশ্নের যেই দ্বিতীয় উত্তর ছিল , তা পেলাম বাবার পরবর্তী কথা থেকে। বাবা বললেন – কিছু রিপোর্ট পেলে, পোস্ট মর্টাম থেকে?

প্রতিভা – হ্যাঁ স্যার, এক কানেকশন তো মিলা হে, কিন্তু সেই কানেকশন থেকে এটা বলা খুব কঠিন যে , এটা সুইসাইড না মার্ডার।

বাবা – মানে ডেথ ইন্সট্রুমেন্ট এমন যে , সেটা অন্যকেউও ব্যবহার করতে পারে , আবার ব্যক্তি নিজের উপরেও ব্যবহার করতে পারেন, তাই তো? ... তো কি সেটা? ... আমি কেসটা রিপোর্টার হিসাবে শুধু নয়, মৃতের ছেলে আমাকে এই কেসটা তদন্ত করতে বলেছেন। তাই আমাকে বলতে পারো, তোমার ফাইন্ডিং। আই উইল নট ডিশক্লোজ ডেম, বাট হ্যাঁ, আমার তদন্তে সাহায্য হবে।

প্রতিভা – নো প্রবলেম স্যার। আই নো , আই ক্যান ট্রাস্ট ইউ। ... স্যার অয়েপনটা কি সেটা তো ফরেনসিক বলতে পারবেনা। তবে রানানকালসি নামক পদার্থ পায়া গেছে, ভিক্টিমের বডি থেকে।

বাবা – শুধু শরীরের ভিতরেই পেয়েছেন, নাকি শরীরের বাইরে বা অন্যত্রও?

প্রতিভা – নেহি, শরীরকা বাহার মে, কিছু নেই। ... নো ক্লু।

বাবা – হাতে বা নখে?

প্রতিভা – না স্যার, ওসব বিলকুল সাফ । তবে রসুই মে , মানে কিচেন থেকে একটা ফিমেল হেয়ার পেয়েছি। ঘরে কেউ ফিমেল থাকেনা , তাই আই কালেক্টেড দ্যাট। ওই হেয়ারেও , আমরা রানানকালসির ট্রেস পেয়েছি। ... বাট নোহয়ের এলস্।

বাবা – এবার তারমানে ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডেল করবে কেসটা?

প্রতিভা – দ্যাট, আই ডোন্ট নো স্যার। ... আমি যা কিছু পেয়েছি , তা মিস্টার গাঙ্গুলিকে আর আমার বস্‌কে মেইল করে দিয়েছি। এবার তাঁরা ডিসাইড করবে, নেক্সট প্রসিডিওর কি হবে।

বাবা এই ব্যাপারে আর কিছু বললেন না। ... তবে অনেক বিশয়েই কথা হলো। মায়ের সাথেও কথা বললো প্রতিভা, আর আমার সাথেও অনেককষন কথা হলো। ... ওর সাথে কথা বলে , প্রথম দিনই খুব ভালো লাগে। তবে তখন জানতাম না , আমাদের সম্পর্ক এতো গভীর হয়ে যাবে পরবর্তীতে। কিন্তু তাও আমরা সেদিনই নিজেদের ফোন নম্বর চালাচালি করে নিয়েছিলাম , এবং প্রায়শই ওর সাথে বিস্তর কথা হতো। আমি আর ও, যখন বাবার কনো কেস থাকতো না, তখন একসাথে কফি বা ডিনারেও যেতাম।

কিন্তু সেদিনে, যখন প্রতিভা চলে গেল , তখন বাবাকে দেখলাম মোবাইল ফোন নিয়ে , কিসব পড়াশুনা করতে বসে গেছেন। ... রাত্রে ডিনার করে, বাবা লাইট অফ করে, নিজের ছোট বিছানায় শুইয়ে রইলেন। আমি বাবার কাছে যাবো, মা বারণ করলেন; বললেন – উমম্ বিরক্ত করিসনা বাবাকে। ... উনি ভাবছেন, ভাবতে দে।

মা আমার থেকে বাবাকে অনেক অনেক গুন বেশি চেনেন। তাই আর কথা বাড়ালাম না। তবে সত্যি বলতে, বাবা কোন দিশায় ভাবছেন , সেটাই জানার ছিল। ... সকালে ঘুম ভাঙলো যখন তখন বাবা-মা টিটেবিলে। আমি ব্রাশ করে, সেখানে জয়েন করে প্রথম কথা বললাম – বাবা, কেসটাকি সত্যিই সিরিয়াস, নাকি..

বাবা – খুন না সুইসাইড বোঝা যাচ্ছে না।

আমি – খুন হতে পারে এইটা?

বাবা – শরীরের মধ্যে রানানকালসির ট্রেস পাওয়া গেছে। কিন্তু হাতে বা নখে তার চিহ্ন নেই। অর্থাৎ যদি নিজে হাতেও খান , তবে তরল খাবারের সাথে মিশিয়ে খেয়েছেন। এবার কথা হলো , যেটা তিনি খেয়েছেন, সেটাকি তিনি স্বেচ্ছায় খেয়েছেন , মানে তিনি খেতে চেয়েছেন বলে , তাঁর কাজের মেয়ে দিয়েছেন, নাকি কাজের মেয়েই সেই বিষ দিয়েছিলেন। ...

বাবা বলতে থাকলেন – প্রশ্ন অনেক, উত্তর নেই। ... যদি কাজের মেয়ে নিজের থেকে দিয়ে থাকে , তবে তো বোঝাই যাচ্ছে , এটা খুন; কিন্তু সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন করলেন যে এই কাজের লোক কার হয়ে কাজ

করছিলেন! কার হয়ে এই বিষ দিলেন শীর্ষদাকে!... আর যার হয়ে কাজ করছিলেন , তার ইন্টেন্সান বা মটিভ কি! ... আর এই সমস্ত কিছু যদি না হয়, যদি শীর্ষদার আদেশ পালন করার জন্যই, এই বিষ দেওয়া হয়, তবে প্রশ্ন এই যে শীর্ষদা কেন বিষ খেতে চাইবেন! ... উনার সাথে উনার ছেলের সম্পর্কই বা কেমন! ... সেই সম্পর্কের জন্যই নয়তো যে ছেলে তড়িঘড়ি করে বাবার ডেথ সার্টিফিকেট করিয়ে নিলেন!

মা – মানে তুমি বলছো, ছেলেই বাবার খুন করিয়েছে? ... আর যাতে ফেঁসে না যায়, তাই তোমার শরণে এসেছে!

বাবা – হতে তো অনেক কিছুই পারে মধু, কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন? যদি ছেলেই মারতে চায় বাবাকে, তবে কেন? কি কারণে বাবার সাথে ছেলের বনিবনা হচ্ছিল না! ... একটু ছেলের ব্যাপারেও খবর নিয়ে জানতে হবে। ... মিলি, অফিসের নাম কি?

আমি – মিলিনিয়াম টেক বাইট।

বাবা – হুম, তারমানে বিদেশে মেমরি বিক্রি করে। ... হুম , একটা এপয়েন্টমেন্ট নে , বিশিষ্টের কনো একটা কলিগের সাথে। ... আর কালকে যেই যেই লেখকের নাম বলেছিলেন বিশিষ্টবাবু, তাঁদের নাম মনে আছে?

আমি হ্যাঁ বলতে , বাবা বললেন – ওদের সকলের সাথে একটা করে এপয়েন্টমেন্ট নে। সমস্ত জেরা , আজই শেষ করতে হবে।

আমি ১০টা বাজতেই কাজে লেগে পরলাম। মিলিনিয়াম টেকে এপয়েন্টমেন্ট হলো , মিস রিমা ব্যানার্জির সাথে। বিশিষ্টবাবু উনার বস্, আর উনার সাথে বিশিষ্টবাবুর সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। ... উনার নাইট শিফটের কাজ। বাড়ি শ্রীরামপুরে। অফিসে জয়েনিং রাত্রি ৮টার মধ্যে। ... তাই ওর সাথে এপয়েন্টমেন্ট রাখা হলো সন্ধ্যা ৬টায়, বিধাননগর স্টেশনে উনি নামবেন। তাই কাছাকাছি সৌরভস্ বলে একটা স্ন্যাক্সের দোকানেই এপয়েন্টমেন্ট করলাম।

এপয়েন্টমেন্ট করার সময়ে বুদ্ধি ঠিকঠাক ভাবে খাটিয়েছি , তাই বাবার থেকে তারিফ পেলাম। আর দুপুর ১২টায়, ২টোয়, আর চারটেতে এপয়েন্টমেন্ট পেলাম সুন্দর স্যন্যালের সাথে, পবিত্র দাসগুপ্ত'র সাথে, আর ভবানী দেবীর সাথে। ...

সুন্দরবাবুর বাড়ি সল্টলেকে। পবিত্রবাবুর বাড়ি দানেশসেখ লেনে মানে হাওড়ায় আর ভবানী দেবীর বাড়ি বিডন স্ট্রিটে। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে , আমি আর বাবা বেরোলাম। ১২টার সময়ে দেখা করলাম সুন্দর সান্যালের সাথে।

বাবা প্রশ্ন করলেন – শেষ কবে কথা হয়েছিল শীর্ষবাবুর সাথে?

সুন্দরবাবু – তিনদিন আগে হবে।

বাবা – উনি তো খুবই অসুস্থ ছিলেন?

সুন্দরবাবু – হমম্, খুবই ... ভালো করে ফোনে কথাও বলতে পারছিল না ও। ... তবে হি অয়াজ ইন সাম ডিফারেন্ট ট্রোমা। ... বলে কি, একজন দেবদূত এসে গেছেন, তাঁর এই অবস্থায় সেবা করার জন্য।

বাবা – সেই দেবদূতের ব্যাপারে আপনি আর কিছু জানতে চাননি?

সুন্দরবাবু – না, ইচ্ছা ছিল জানার। বাট , ও ঠিক করে কথা বলতেও পারছিল না। তাই আই লেফট দা কল।

বাবা – উনার ছেলের সাথে উনার সম্পর্ক কেমন ছিল জানেন?

সুন্দরবাবু – কুলাঙ্গার একটা। ... অমন বাপের অমন ছেলে কি করে হয়! ... হাজার একটা মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক। ... মহিলাদের পিছনে টাকা উড়িয়ে উড়িয়ে সমস্ত শেষ। এখন বাপের থেকে টাকা চায়। ... বাবা স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, উইল না করলেও, একটিই সন্তান হবার জন্য সমস্ত সম্পত্তি সে এমনিই পাবে। কিন্তু উনার দেহ রাখার আগে , একটি আনাও উনি দেবেন না। উনার দেহাবসানে সমস্ত উপার্জন ছেলেরই। তারপর সেই টাকা নিয়ে কি করবে , না করবে, সে ছেলেই বুঝে নেবে। ... তাই ছেলে আর বাবার সাথে কনো যোগাযোগই রাখেনা। ...

বাবা – ফোনেও নয়!

সুন্দরবাবু – নো ওয়ে, শীর্ষ স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, আই উইল নট কল হিম, ইফ আই ডাই ইভিন।

বাবা – খুনটা ছেলে করতে পারে?

সুন্দরবাবু একটু ভেবে বললেন – না ... হ্যাঁ মটিভ তো ওর ছিল , কিন্তু খুন করার জন্য একটা অন্য রকম ইয়ে লাগে... ওটা সবার থাকে না। ... কিন্তু আর ইউ শিওর, ওটা খুনই?

বাবা – কাইন্ড অফ, বাট নট অফিসিয়ালি। .... আচ্ছা উনার আর কনো শত্রু ছিল , এই ব্যাপারে জানেন কিছু?

সুন্দরবাবু – একজন লেখকের আবার শত্রু কে হবে? রাইভাল থাকতে পারে। যেমন আমিই ওর রাইভাল। ... কিন্তু শত্রু কি বলা যায় রাইভাল কে? আর না তো আমরা কেউ বিদেশিদের মত বেষ্ট সেলার হয়ে কটি কটি টাকা কামাই যে রাইভাল একবারে শত্রু হয়ে যাবে। ...

বাবা – আর কিছু জানেন উনার সম্বন্ধে।

সুন্দরবাবু – জানি বলা ভুল, বরং বলা উচিত জানিনা। ... ও একটা কিছুর মধ্যে ছিল এখন , বাট সেটা প্রচণ্ড কনফিডেন্সিয়াল, আই থিংক। কারণ সেটার ব্যাপারে, আমার কাছে ও কিচ্ছু ডিশক্লোজ করেনি। ... ইনফ্যাক্ট, একবার কথা প্রসঙ্গে ও আমাকে বলে ফেলেছিল , ও এমন একটা কাজ করছে , সেই কাজটা করার পরে, আর অন্য কনো কাজ করার মত আর ওর মেন্টালিটি থাকবেনা। ... কিন্তু যাই প্রশ্ন করি যে সেটা কি, অমনি ও কথা ঘুরিয়ে দেয়। বলেনা সেই ব্যাপারে।

বাবা – ধন্যবাদ। ... অনেক কিছুই আপনি বলেছেন। আশা করি, তার ভিত্তিতে আর বিরক্ত করতে হবেনা আপনাকে।

সুন্দরবাবু – আরে, তুমি আমার কন্ট্যাক্ট নম্বর নিয়ে যাওনা। আর তোমারটাও দিয়ে যাও। ... আমার যদি আরো কিছু মনে পরে, বা তোমার কিছু জানতে হয়, ফোন করে নেবে। ... আরে বিজয়, তোমার নাম আমি শুনেছি। তোমার সাথে সাখ্যাত করে খুবই ভালো লাগলো। কিন্তু কাজের মধ্যে এইসব এপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদিতে প্রচুর সময় যায়। ... আর আমি! ... আমরা এতটাও ব্যস্ত লোক নই যে , আমাদের থেকে এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। ... ফোন করে নিও, ব্যাস।

ভদ্রলোকের ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। ... বাবাকে বলতে , বাবা বললেন, ইনারা সকলে জাত লেখক। লেখকদের ব্যবহার এমনই হয়। ... প্রতিটি ব্যক্তির সাথে উনারা দেখা করেন, উনাদের মাথায় নতুন গল্পের

প্লট চলে আসে। বাবাকে দেখলাম, বাবার মন যেন রহস্যের সমুদ্রে স্নান করতে যাচ্ছে। তাই বাবা একদম চুপ। শুধু কাজের কথা, অন্য সমস্ত কথাতে ফুলস্টপ।

আমরা এবার পৌঁছলাম দানেশসেখলেন , পবিত্রবাবুর বাসা। ... ভদ্রলোক বিয়েথাওয়া করেন নি। ... আমাদেরকে ঘরে এনে বসাতে, উনি বাবার উদ্দেশ্যে বললেন – তাহলে বিজয়, তোমার আমার বাড়ি আসা হলো, বাট একটা সিচুয়েশনে, যেটা আমি-তুমি কেউই চাইনি।

বাবা হেসে বললেন – পবিত্রদা, শীর্ষদাকে আমি খুবই সমীহ করতাম, আর উনি চলে যেতে, আপনিও তো খুব একা হয়ে গেলেন, তাই না!

পবিত্রবাবু – জানো বিজয়, শীর্ষের সাথে আমার আলাপ কলেজ লাইফ থেকে। ... স্কটিশচার্চে , আমি সায়েন্সে, আর শীর্ষ আর্টসে... সেম ইয়ার। ... কলেজ ম্যাগাজিনে , দুজনেই লিখলাম, দুজনেই দুজনের লেখা পরলাম, দুজনেরই দারুণ লাগলো, আর তাই দেখা। ... সেই আমাদের প্রথম আলাপ , আর সেই আলাপের পর থেকে, আমরা একটি দিনও যায়নি, যেদিন ১০ মিনিটও কথা বলিনি। শুধু মৃত্যুর তিনদিন আগে, ওর আর ক্ষমতা ছিলনা কথা বলার । তাই ... (একটা জোরে নিশ্বাস) ... যেদিন মৃত্যুর সংবাদ কাগজে পাবলিশ হলো, সেদিন একটা গাড়ি ঠিক করেছিলাম , ওর কাছে যাবো বলে। ... আর যাওয়া হলোনা।

বাবা – উনার কাছে একজন এসেছিলেন না, মহিলা সেবিকা?

পবিত্রবাবু – ধুস... কে এসেছিল ? ... হ্যাঁ ও বলেছে, কিন্তু কোথায় কি ? আমার মনে হয়, ওর মনের খেয়াল। মনের খেয়ালেই ও বলেছিল, একটা দেবদূত এসেছে ওর সেবা করতে। ... (বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পবিত্র বাবু বলছেন দেখে থেমে গেলেন , আর পবিত্রবাবু বলতে থাকলেন) দেখ, ওঁর স্ত্রী তো পাঁচ বছর হয়ে গেছে, চলে গেছেন। সেই স্ত্রীও একটিমাত্র কন্যাছিলেন বাবামায়ের। ব্রেন ক্যান্সার। চেষ্টা করে খুবই শীর্ষ। কিন্তু বাঁচে নাকি! ... আর ওঁর ছেলে। ... কি করে যে অমন মাটির মানুষের এমন ছেলে হয় কে জানে ? ... তোমার মনে হয়, যেই ছেলে ওঁর বাপ কবে মরবে , তারপর সম্পত্তি হাতাবে, এমন মানসিকতা রাখে, সে বাবার সেবার জন্য কনো কাজের লোক রাখবে! ... তবে সেই কাজের লোক আসবে কি করে? দেবদূত!

বাবা – যদি সেবা করার জন্য না পাঠিয়ে, খুন করার জন্য ছেলে কারুকে পাঠায়!

পবিত্রবাবু – হুমম্ পসিবিল... বাট, যদি আজ থেকে একটি বছর আগের কথা হতো , তবে ঠিক ছিল। ... কিন্তু এই একটি বছরে বিশিষ্ট, মানে শীর্ষের ছেলের জীবন অনেক পাল্টে গেছে। ... একটি মেয়ে, রিমা না কি নাম। তার জন্য বিশিষ্টকে জেল খাটতে হয়। ... তারপর, একটু শুধরেছে বিশিষ্ট। ... শেষ ওঁর বাবা যা বলেন, তা অনুসারে সেই রিমা মেয়েটিকে শীঘ্রই বিয়ে করবে বিশিষ্ট।

বাবা – রিমা! শ্রীরামপুরের মেয়ে কি?

পবিত্রবাবু – হ্যাঁ! তুমি কি করে?

বাবা – কি হয়েছিল বিশিষ্টবাবুর সাথে উনার!

পবিত্রবাবু – মদ, মেয়েছিলে, বার, পাব, এই তো ছিল বিশিষ্টের একসময়ের কারবার। ... এই রিমা ওঁর আগের কোম্পানির সহকর্মী ছিল । ... এই মেয়েকে একদিন পাবে নিয়ে গিয়ে , তার উপর মদ্যপ হয়ে অত্যাচার করে, ... কি আর বলবো কেচ্ছার কথা। ... তারপর মেয়েটা বিশিষ্টকে জেলে দেয়। ... কে জানে তারপর বিশিষ্ট কেমন একটা শুধরে যায়। ... কোম্পানি চেঞ্জ করে। শীর্ষই বলেছিল , ওই মেয়ের সাথে যা কেচ্ছা হয়েছে, তারজন্য নাকি আগের কোম্পানি ওকে ছেরে দিয়েছে। তারপর বিশিষ্ট ওকে নিজে এখন যেই নতুন কোম্পানিতে চাকরি করছে, সেখানেই চাকরি দেয় , আর এখন অরা নাকি বিয়ে করতে চলেছিল।

বাবা আর কিছু প্রশ্নই করলেন না। ... সরাসরি উনাকে ধন্যবাদ প্রদান করে উঠে গেলেন। ... তারমানে কি বাবা কনো ক্লু পেয়ে গেলেন!

বাবা সেখান থেকে বেড়িয়ে ফোন লাগালেন প্রতিভাকে। বাবা বললেন – আচ্ছা প্রতিভা, গিভ মি ওয়ান ইনফরমেশন। যেই মহিলার চুলের সেম্পেল তুমি কালেক্ট করেছিলে, ওটা কি কালো না সাদা!

প্রতিভা যা বলল, তার উত্তরে বাবা বললেন – ওকে, থ্যাংকস, থ্যাংকস আ লট।

বাবার চোখেমুখে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। ... আমি বাবাকে প্রশ্ন করলাম , কিছু উত্তর পেলে? বাবা হেসে বললেন, কুকুরের লেজ কি অত সহজে সোজা হয়!... আচ্ছা ঠিক আছে। এবারে চল , ভবানী দেবীর কাছে। ... অল্প বয়সী মহিলা। সেরোগেসি করে মা হয়েছেন, আগের বছর।

আমরা গেলাম সেখানে আর দেখলাম , এই ৩২ বছরের একটি মহিলা দরজা খুললেন। ... বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন – ভালো আছেন বিজয়দা। ... এই কি আপনার মেয়ে, মিলি!

বাবা হাসতে, আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ভাবে বললেন – হ্যালো।

আমিও সদাচার করতে, ভবানী দেবী বললেন – চা খাবে না কফি, বিজয়দা!

বাবা – বাড়িতে কোল্ডড্রিঙ্কস আছে? ... থাকলে ওটা দে... জায়গায় জায়গায় গিয়ে মিষ্টি, আর খাস্তা কচুরি খেয়ে খেয়ে না, এসিডিটি হবো হবো করছে।

ভবানী দেবীকে দেখলাম বাবাকে বেশ চেনেন। ভবানী দেবী আমার উদ্দেশ্যে বললেন – তোমার বাবার কারণেই আমি আজ লেখক। ... আমি একটা কাগজের এডিটর ছিলাম। ... তোমার বাবা একটা কেস সলভ করে এনেছিলেন। আর আমাকে ঘটক স্যার যেমন কেস সাজাতে বলেছেন , আমি তেমনই সাজিয়েছি। ... তোমার বাবার পরের দিন সকালে ফোন আসে। ... উনি আমাকে বলেন , আমি যেন এডিটরের কাজ ছেড়ে, প্রেমের গল্প লিখি। ওটা আমি ভালোই লিখতে পারবো।

আমি যেই ভাবে উনার কেসটাকে বিকৃত করে দিয়েছিলাম , তার কারণে রেগে গিয়ে আমাকে কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু আমি সিরিয়াসলি কথাটা নিয়ে , একটা পেমের উপন্যাস লিখি। (উনি হেসে বললেন) প্রথম পাঠক, তোমার বাবাই। ... তবে উনি গল্পবই পড়ে আমাকে একদিন শীর্ষবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন , আর আমার লেখা বইটা উনাকে দিলেন। ...

এরপর, শীর্ষবাবু আমাকে আরো দুটো তিনটে সেরকমই গল্প এক মাসের মধ্যে লিখতে বললেন । ... আমি লিখলাম। তারপর উনি দিশা প্রকাশনীর সাথে কথা বলে , আমাকে একজন লেখিকা করে দেন। ... পরে পরে উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আর একবার মনের দুঃখে বলেছিলেন , উনার ছেলে যদি ভালো মানুষ হতেন, তাহলে আমাকে তিনি পুত্রবধূও করে নিতেন। ... কিন্তু মানুষটা কেমন হঠাৎ চলে গেলেন না!

বাবা এবার মুখ খুললেন কোল্ডড্রিঙ্কস্ খেতে খেতে – ওঁর বাড়িতে একটা দেবদূত এসেছিলেন জানিস?

ভবানী দেবী – হ্যাঁ একজন মহিলা। আমাকে তিনি নিজে থেকে বলেন নি। ... গলা পেয়েছিলাম ওই মহিলার, শীর্ষবাউর সাথে কথা হওয়া শেষ ফোনে। তো প্রশ্ন করি , কার গলা এটি মেশমশাই ? তো উনি বললেন, তিনি অসুস্থ, তাই একজন দেবদূত এসেছেন।

বাবা – মজা করেছিলেন, তাই না। আসলে তো কাজের লোকই।

ভবানী দেবী – না বিজয়দা, বেশ কিছু মাস ধরেই, বিশেষ করে, এই নতুন বছরের শুরু থেকে তো, উনার মধ্যে কেমন একটা স্পিরিচুয়াল চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছিলাম। ... সমস্ত কিছুতেই একটা কেমন মায়ের কৃপা , এমন একটা অনুভব। ... এমন ছিলেন না উনি। তুমি তো জানো। কিন্তু আমার মনে হয় , উনি শেষের দিকে একটা যে কনফিডেন্সিয়াল কাজ করছিলেন , সেটা একটা স্পিরিচুয়াল স্ক্রিপ্ট। নাহলে এই পরিবর্তন কেন? আর উনি বলতেনও, এই যে কাজ করছেন উনি , এরপর উনি রিটায়ারমেন্ট নেবেন। এবার নাকি উনি তপস্যা করবেন। সাডেন চেঞ্জ জানো বিজয়দা। ... আগের বছর কালীপূজোর পর থেকেই উনার পরিবর্তনটা অব্সারভ্ করছি।

বাবা – আচ্ছা, ওই যে মহিলা উনার কাছে ছিলেন , আমি যদি উনার ভয়েস রেকর্ডিং দিই , তুই আইডেন্টিফাই করতে পারবি! ... মানে, বলতে পারবি, দুটো গলা এক কিনা!

ভবানীদেবী – হ্যাঁ পারবো, কারণ ওই ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর আমার মনে আছে । ... সত্যিই যেন কনো দেবদূত। এমন কণ্ঠস্বর আমি এর আগে বা পরে কনোদিনও শুনিনি। যেন দেবতার কণ্ঠস্বর।

বাবা বললেন – ওকে ঠিক আছে ডেন। আমি রাত্রের মধ্যেই পাঠাচ্ছি তোকে একটা ভয়েস রেকর্ড। আমাকে যতটা তাড়াতাড়ি পাড়বি বলবি।

বাবার মনে হয় কেস সমাধান করা হয়ে গেছে। এবার বোধহয় শুধুই তথ্য সংগ্রহ বাকি। আমার তো অন্তত তাই মনে হলো। এবার আমি আর বাবা গেলাম বিধাননগর স্টেশনের দিকে। কথা বলবো রিমা ব্যানার্জির সাথে।

ইউ টার্ন

সৌরভস্-এ পৌছতে আমি রিমাকে একটা ফোন করলাম । বাবা তাড়াতাড়ি আমার ফোনটা হাতে নিয়ে রেকর্ডিংটা অণ করে আবার আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি ফোনে জানলাম , ও এসে গেছে। আমি হাত তুলতে, সৌরভস্ থেকে একজন মেয়ে হাত নাড়লো , সেই দেখে আমরা বুঝতে পারলাম , কে রিমা। বাবাকে অমনি দেখি ফোন লাগাতে।

ফোন করলেন প্রতিভাকে। বাবা বললেন , একটু জোরে শব্দ করেই টেবিলে বসতে বসতে বললেন – আচ্ছা একটা কথা বলো প্রতিভা , শীর্ষদাসের পেটে যেই ট্রেস পাওয়া গেছে , তাতে কি আলুপোস্ত খেয়েছিলেন উনি, এমন বোঝা যাচ্ছিল।

প্রতিভা কি বললেন জানিনা , আর বাবা কেন এমন কথা এখানে বলছিলেন , তাও জানিনা। তবে বাবা উত্তরে বললেন – হুম্‌, আমি আমার রিসার্চ করে দেখেছি। তাতে জানলাম রানানকুলাসি গোত্রের দুটি পদার্থ হয়, একটা একোনিটাম ফেরক্স , আর আরেকটা একোনিটাম নেপেলস্‌। এঁদের মধ্যে নেপেলস্‌ও বিষ ধরে, তবে মানুষ মারার মত বিষ ধরে না। কিন্তু ফেরক্স ভয়ানক বিষ ধরে , আর ওটা বাংলায় যাকে বলে কাঠবিষ তার ফুলের রেণুতে থাকে।

অর্থাৎ যিনি খাইয়েছেন শীর্ষবাবুকে এই বিষ , তিনি যে আলুপোস্ত করে , তার মধ্যে এই বিষ দিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ধারনা করতে হয় আমাকে।

প্রতিভা আবার কিছু বলল নিশ্চয়। বাবা উত্তরে বললেন – কাঠবিষ, এটা সেই বিষ যেটি আদিবাসীরা তীরের ডগায় লাগিয়ে শিকার করতো। ... আর এই বিষ আধুনিক বিষ নয়, এর সংস্কৃত নামও আছে। এর নাম বৎসনাভ। আর এর ইংরাজি নাম হলো ইন্ডিয়ান একোনিট। ...

আবার উত্তরে বাবা বললেন – ওকে মেনি মেনি থ্যাংকস। এটাই জানার ছিল। তারমানে খুনের অস্ত্র ছিল আলুপোস্ত। সো, হাফ ডি ওয়ার্ক ইজ ডান। ... থ্যাংকস।

বাবা ফোন রেখে দিলো। এবার রিমা বলতে শুরু করলেন। তিনি বলেন , বিশিষ্ট দাসের সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করবেন, তাই তো?

বাবা শুধুই তাকালেন। আমিই উত্তরে হ্যাঁ বলতে , রিমা বললেন – বিশিষ্ট বাবু আজ থেকে বছর দুইয়েক আগেও, অত্যন্ত একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া পুরুষমানুষের মত ছিলেন। ... মদ , জুয়া, মেয়েমানুষ, সমস্ত নেশায় ছিল তাঁর। ... সেই নেশার শিকার আমি নিজেও হই । আমার আগের অফিস, ডি টেক হাউজ-এ আমার সিনিয়ার ছিলেন উনি। আমাকে একপ্রকার ব্ল্যাক মেল করেই পাবে নিয়ে যান , আর সেখান থেকে নিজের গাড়িতে করে , আমাকে বাড়িতে ছেড়ে দেবার নাম করে , গারির মধ্যেই আমার উপর দেহবল প্রয়োগ করে, আমাকে এবিউস করেন।

আমি কনো প্রকারে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে, গাড়ির নম্বর নিয়ে, সোজা থানায় চলে যাই, আর উনার নামে এফ-আই-আর করি। ... উনাকে পুলিশ লকআপে নেন, আর উনার বাবা, বিশিষ্ট লেখক, প্রয়াত শীর্ষদাস

উনাকে ছাড়ান। ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালোমানুষ। উনি আমার কাছে হাতজোর করে ক্ষমা চান , নিজের ছেলের এমন ব্যবহারের জন্য, এবং কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন।

সেই দেখে আমিও একটু দুর্বল হয়ে যাই। আর তাই এই কেস নিয়ে তেমন দূরে আর এগোই নি। ... কিন্তু এই পুলিশ কেস হওয়াতে, বিশিষ্ট বাবু, মানে যার এগেন্সটে এই কেস, তাঁর কিছু হলো না, কিন্তু আমাকে অফিস থেকে রিজাইন করতে বাধ্য করা হয়।

এই ঘটনার প্রায় চার মাস পরে , আমি একদিন বাড়ির থেকে সামান্য দূরে একটা পার্লারে যেতাম , সেখান থেকে বেরিয়েছিলাম। অমনি বিশিষ্ট দাস আমার সামনে গাড়ি দার করিয়ে, গাড়ি থেকে নামলেন। ... আমি উনাকে দেখে একটু ভয় এবং একটু বিরক্তই হয়ে যাই। ... উনি ভালো ভাবেই বলেন , গাড়িতে উঠতে। আমি আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখে, গাড়িতে উঠতে অরাজি হই। ...

তাই দেখে বিশিষ্ট বাবু বলেন , জেলের লকআপে একদিন পুলিশের মার খেয়ে , উনার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। এখন উনি মদ, জুয়া, সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। ... উনি বললেন, উনি অনেক মেয়েদের পিছনে লেগেছেন, কিন্তু কারুর উপর বল প্রয়োগের ইচ্ছা থাকলেও , সেটা করার সাহস জুটিয়ে নিতে উনি পারেন নি। সেইদিন রাত্রে , উনি মদ্যপ ছিলেন , তাই নিজেকে সামলাতে পারেননি। নিজের সুপ্ত ইচ্ছা সেদিন প্রকাশ্যে এসে গেছিলো।

উনি আরো বলেন, উনি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন , এবং এও বলেন যে উনি আমার সাথে যেই অশালীনতা করেছেন , তার প্রায়শ্চিত্ত করতে , আমাকে উনি বিয়ে করতে চান। আমি সমস্ত কথাতে একটু থতমত খেয়ে যাই। তবে মনে মনে ভাবি , এমন মানুষ কি সত্যিই কোনদিন ঠিক হন! হয়তো, উনার এই পাল্টে যাওয়াটা একটা অভিনয় মাত্র। তাই আমি পাস কাটিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করলে, উনি পুনরায় আমার সামনে এসে বললেন – তিনি জানেন আমার চাকরি চলে গেছে। কিন্তু সেই চাকরি চলে যাবার পিছনে উনার কনো হাত নেই। ...

উনি আরো বলেন যে তিনিও সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আর একটা নতুন চাকরি ধরেছেন , যেখানে আমরা এখন রয়েছি, মিলিনিয়াম টেক বাইটে। উনি আমাকে সেখানে নিতে চান, উনার জুনিয়ার হিসাবে। ... আমার চাকরিটা খুবই দরকার ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না , আবার ওই মানুষটার সাথে নিজেকে জুড়বো না জুড়বো না। শেষে যখন অন্য কনো ইন্টার্ভিউতেই লাভ হলো না, ওখানেই গেলাম।

তারপর থেকে ওখানেই আছি। হ্যাঁ বিশিষ্ট বাবু পুরোপুরি পাল্টে গেছেন। আমি খুব তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্তে আস্তে পারিনি। তবে মাস চারেক আগে , উনাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখে বুঝেছি, উনি নিজের সমস্ত নেশাকে পরিবর্তন করে এখন কেরিয়ারের নেশা করছেন। তাই আমি উনার পঞ্চম বারের প্রস্তাবে সম্মত হই, উনাকে বিয়ে করতে।

স্যার (বাবার দিকে তাকিয়ে) , এই সানডে আমাকে নিয়ে উনি , উনার বাবার কাছে যেতেন , বিয়ের কথা পাকাপাকি ভাবে বলতে। কিন্তু সেটা আর হলো না।

বাবা – আপনি মাঝে শীর্ষবাবু, মানে আপনার হবু শ্বশুরের কাছে গেছিলেন?

রিমা – দুবার স্যার, তবে সেই ব্যাপারে বিশিষ্ট জানে না। ... আমি উনার বাবার সাথে দেখা করে , উনার ছেলের ব্যাপারে বলি। উনি আমাকে বলেন, কনো এক লেখিকা, কিছু একটা দেবী বলে নাম করেছিলেন, তার সাথেই বিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন ছেলের। কিন্তু উনার ছেলেই এমন যে সেই স্ত্রীর হাতে উনি উনার ছেলের হাত দিতে ভয় পান। ...

বাবা – শেষ কবে গেছিলেন?

রিমা – আগের মাসে। ... সেদিনই উনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন। যাক সমস্ত নেশা থেকে না বেড়োলেও, প্রত্যক্ষ ভাবে যেই নেশাদের নোংরা বলে সনাক্ত করা যায় , তার থেকে উনার ছেলে বেড়িয়ে এসেছেন, তা জেনে উনি খুশী হয়েছেন।

বাবা – বিশিষ্ট বাবুর উনার বাবার প্রতি ধারনা কেমন ছিল?

রিমা – আগের অফিসে চাকরি করতে , বিভিন্ন কথা বলতেন। বলতেন , কি মনে করেন উনি নিজেকে , দুচার কলম লিখে ফেলে! এই জাতীয়। কিন্তু পরের অফিসে জয়েন করার পরে , অফিসের শেষে, যখন ক্লান্ত শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিতেন , তখন আমাকে বেশ কয়েক বার বলেছিলেন , আমার বাবা অনেক ফূর্তি করতে পারতেন। কিন্তু উনি তা করেন নি। ... আসলে আমি ভাবতাম যে উনি ফূর্তি করেন নি , তাই আমি ফূর্তি করি, সেটা উনি পছন্দ করতেন না। ... এখন বুঝি, ফূর্তি করতে গিয়ে, আমি নিজের চরিত্রটাই নষ্ট করে দিচ্ছিলাম। আর ফূর্তি করার সুযোগ থাকতেও বাবা ফূর্তি না করার কারণে , এমন একজন নামজাদা ব্যক্তি হয়েছেন।

উনি আরো বলতেন , কি করেন উনি! একজন লেখক। এই বাংলায় উনার থেকে অনেক অনেক ভালো লেখক এসেছে, আর আসবেও। ... কিন্তু শুধু লেখক হবার জন্য , উনি নামজাদা হননি। ... প্রতিটা সাংবাদিক উনাকে শ্রদ্ধা করে, প্রতিটি পাবলিশার, প্রতিটি কো-রাইটারও উনাকে স্নেহ করেন। এই সবের কারণ হলো উনার চরিত্র।

স্যার, উনি শেষে আমাকে বলেন, একটা বয়সের পর উনি আর চাকরি করবেন না। এখন খুব খুব উপার্জন করবেন। শেষে উনি শুধু নিজের চরিত্রকেই ঠিক রাখবেন। ... উনি , শেষমেশ উনার বাবার থেকে শেখেন যে চরিত্র এমন হওয়া উচিত যাতে , আমার সামনে সকল ধূর্ত এসে থতমত খেয়ে যায় , আর সকল সরল এসে যেন শান্তি পায়। ... উনি পুরো পাল্টে গেছিলেন এখন।

বাবা – শীর্ষবাবুর মৃত্যুর পর উনার সাথে কথা হয়েছে?

রিমা – হ্যাঁ, আমিই ফোন করেছিলাম।

বাবা – উনি কি ভেঙে পরেছেন?

রিমা – না ভেঙে পরেন নি , তবে আক্ষেপ করছিলেন। ভালো ছেলে হয়ে বাবাকে দেখাবো ভেবেছিলাম , তা আর করতে পারলাম না।

বাবা হেসে বললেন – আলুপোস্ত খেতে ভালো লাগে?

রিমা একটু অবাক হয়ে গেল কথাতে। তারপর একটা ম্লান হাসি হেসে বললেন – মন্দ নয় স্যার। ... তবে নিজে রান্না করে, খেয়ে অফিস যাইতো, তাই আর করার সময় পাইনা।

বাবা – উইকেন্ডে?

রিমা – রেস্টুরেন্টেই বেশিরভাগ হয়। বাড়ি থাকলে, একসাপটা মাংস চাপিয়ে দিই। ... একদিন ছুটি, আর বেশি খাটতে ইচ্ছা করেনা।

বাবা হেসে উঠে পরলেন টেবিল থেকে , দিয়ে কাউন্টারে চলে গিয়ে কফি আর সিঙ্গারার পয়সা মিটিয়ে দিলেন। এসে বললেন – ওকে থ্যাঙ্ক ইউ রিমা। তুমি শীর্ষবাবুর ব্যাপারে কিছু আর বলতে চাও , আমাদের হেল্প করার জন্য।

রিমা – একটাই কথা স্যার। উনার সাথে আমার প্রথম সাখ্যাত যখন হয় , তখন উনার ছেলে লকআপে। তখনও উনি খুব ভলো মানুষ ছিলেন , তবে তখন উনি আধ্যাত্মিক মোটেই ছিলেন না । ... লাস্ট দুইবার আমি যখন দেখা করেছি , প্রথমবারও দেখেছি, দ্বিতীয়বার আরো স্পষ্ট করে দেখলাম , যেন উনি কনো আধ্যাত্মিক চর্চার মধ্যে রয়েছেন। যতই বেশি চর্চা করছেন , ততই অধিক উনার আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ বারে আমি উনাকে প্রশ্নও করি , উনি কনো মঠে টঠে যাচ্ছেন না কি। উত্তরে উনি হেসে বলেছিলেন, সরাসরি তাঁর চরণ পেলে, আর মঠে কেন যাবো বলোতো মা!

বাবা হেসে গুড বাই বলে আমাকে নিয়ে চলে এলেন। একটা উবার বুক করে বাড়ি। গাড়িতে বসে বসেই বাবা বললেন , রিমার ভয়েস রেকর্ডটা আমায় দে , যেটা ওকে যখন ফোন করেছিলিস , সেটা রেকর্ড করেছিলাম।

আমিও দিলাম, আর দেবার সাথে সাথে বললাম – রিমাই কি সেই বাড়ির কাজের লোক!

বাবা – মাইট বি, বা হয়তো মোস্ট প্রবাবলি। দেখি ভবানী কি বলে।

এই বলে আমার থেকে ওই রেকর্ডিংটা নিয়ে ভবানী দেবীকে বাবা পাঠিয়ে দিয়ে ফোন করলেন – ভবানী, দ্যাখ তোকে একটা ভয়েস পাঠিয়েছি। শুনে বলতো, এই গলাটাই কি শুনেছিলিস সেদিন?

ফোন রেখে দিলেন বাবা। এক মিনিটের মধ্যে ফোন আসে বাবার কাছে , ভবানী দেবীরই ফোন। বাবার মুখের রঙ পাল্টে গেল ফোনের কথা শুনে।

বাবা বললেন – আর ইউ শিওর!

বাবা আবার বললেন – ওকে। দ্যাখ, তোর কথার উপর ভরসা করে , আমি কিন্তু আমার চিন্তাভাবনার গতিমুখ পাল্টে দেব। ... ওকে, ঠিক আছে।

বাবা ফোন রেখে দিয়ে, গাড়ির সিটে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। আমি বললাম, রিমা নয়তো!

বাবা বললেন – হুম্ ... কেরিয়ারিস্টিকরা বাটপারি করেনা। তবুও কেমন যেন সমস্ত মিলে যাচ্ছিল। বিশিষ্টের সম্পতির উপর চোখ , যেই মেয়ে ওঁর উপর আগে ক্ষিপ্ত ছিল , সেই মেয়ের সাথে নতুন করে রিলেশন, বাড়িতে মহিলার চুল পাওয়া আর তাতে বিষ পাওয়া। ... আর ভবানী ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর পেয়েছে। ... সব যেন মিলে যাচ্ছিল। ... (খানিক থেমে বাবা আবার বললেন) আবার নতুন করে সমস্ত কিছু ভাবতে হবে বুঝলি। কেসটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা সহজ নয়। একটা অন্যদিক আছে কেসটাতে, যেটার দিকে আমরা তাকাচ্ছি না।

সিয়াইটি রোড দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটছিল। সেই অবস্থায় বাবা আবার বললেন – আচ্ছা, এমন কি কথা আছে বলতো, যা সমস্ত জেরার মধ্যে কমন অথচ সকলের কাছেই বড্ড আনকমন কথা ছিল!

আমি প্রশ্নটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। এ আবার কেমন ধরনের প্রশ্ন! সবার কথায় কমন , অথচ সবার কাছেই জিনিসটা আনকমন! ... উত্তর আমি দিতে পারিনি। বাবাই খানিক পরে বললেন – আধ্যাত্মিক ছাপ। ... হুম।

আমি সেই কথার পৃষ্ঠে বললাম – হ্যাঁ, এই কথাটা সবাই বলেছেন, আর সবাই বেশ অবাক হয়েই কথাটা বলেছেন, মানে সবার কাছেই যেন এটা একটা অদ্ভুত ধরনের কথা।

বাবা মাথা নেড়ে বললেন – অবাক হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। শীর্ষদাকে আমিও যেটুকু জানি , সেই অনুসারে, উনি সম্পূর্ণভাবে নাস্তিক না হলেও , ওই ধাঁচেরই। সেই মানুষ আধ্যাত্মিক হয়েছেন শুনে সকলেই যে একটু অবাক হবেন , সেটাই তো স্বাভাবিক। ... যাই হোক , আমাকে বলতে পাড়বি, কি কি ইনফরমেশন কালেক্ট করা যাচ্ছে, উনার আধ্যাত্মিক হবার ব্যাপারে?

আমি বলতে শুরু করলাম – আগের বছর অক্টোবরের পর থেকে উনার মধ্যে এই পরিবর্তন আসে, যা প্রতি মাসে মাসে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ... আর ... আর... আর হ্যাঁ... রিমা কি বলল , উনি কনো মঠে যাননা, কারণ উনি বলেছেন সরাসরি তাঁর চরণ পেয়ে গেছেন। ... এর মানে কি?

বাবা – এর মানে এই যে , যা নিয়ে তিনি কাজ করছেন , তা অত্যদ্ভুত এক কাজ। ... কিন্তু ... কিন্তু ... মিলি, সামথিং ঈশ মিসিং। ... একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতেন , কারণ তাঁর কাছে ঈশ্বরবাদী যারা রয়েছেন, তাঁরা সমস্ত ভেল্কিবাজি করেন, তিনি এমন কি পেলেন, যার কারণে এমন পাল্টে

গেলেন যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হয়ে গেলেন! এমন কি পেলেন যে তিনি বললেন যে তাঁর চরণ পেয়ে গেছেন! ... যদি এমন কিছু পানও, তার সোর্সটা কি? ...

খানিক পরে নিজেই বলতে শুরু করলেন – উনি যদি আধ্যাত্মিকতার প্রতি ইন্টারেস্টেড হতেন , তবে না মানতাম, উনি কনো মঠে বা মহারাজের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড্ হয়েছেন। তা নয়। ... তার মানে সোর্স ঈশ সামথিং হুইচ ইজ আননোন টু অল। ...

খানিক পরে আবার বাবা বললেন – দেবদূত! ... একটা লেখক কি আনতাব্রি কথা বলেন! ... উম্হুম্ কিছুতেই নয়। ... তারমানে কি এমন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে , যেই জিনিস উনাকে আধ্যাত্মিক করে তুলেছিল, এই দেবদূতও তার সাথেই যুক্ত কেউ! ... কি করে জানবো এই প্রশ্নের উত্তর!

আমি এখানে বেফাঁস ভাবেই বলে ফেললাম, আর বলে ভাবলাম এবার বাবার থেকে বকুনি খাবো নিশ্চয়ই – আচ্ছা, উনার সাথে কার কথা হতো , বা কি নিয়ে উনি পড়াশুনা করতেন মোবাইলে , সেটা থেকে জানা যাবে না!

বাবা – ভেরি গুড। ... হুম্, মানে প্রতিভার হেল্প নিতে হবে।

কথাটা বলেই প্রতিভাকে ফোন করলেন বাবা। ফোনে বাবা বললেন – প্রতিভা, আই নিড ইওর হেল্প। আই নিড এক্সেস ওভার ভিক্টিমস্ ফোন। ... সম্ভব কি এটা!

প্রতিভা কি বলেছে বাবার থেকেই শুনেছিলাম , সেটাই বললাম – হ্যাঁ স্যার, তবে আজকে আমি অফিস থেকে এই বেরচ্ছি। এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি ফোনটা , আর আমি কালকে অফিসে আসার সময়ে নিয়ে ঢুকবো। এইটুকু সময় আপনাকে দিতে পারি। যদি আপনি বলেন, তো রেগুলারলি আমি এটা করতে পারি, তবে অফিসটাইমটা ওটা এখানেই রাখতে হবে , কারণ যদি গাঙ্গুলির রিকুয়েস্টে ক্রাইম ব্র্যাঞ্চ-এর কাছে কেসটা যায়, তবে ওরা অফিসটাইমে এসেই আমার থেকে সমস্ত কেসের এভিডেন্স চাইবে , আর আমাকে তখন হ্যান্ডওভার করতেই হবে।

বাবা রাজি হলে, আমরা বাড়িতে পৌঁছানোর আধঘন্টার মধ্যেই প্রতিভা আমাদের বাড়ি আসে। মা ওকে ভিতরে ঢুকতে বললে, ও বলল – না মাসিমা, আজ আমি সোজা অফিস থেকেই আসছি। ... কাল সকালে ফোনটা নিতে আসবো, তখন ফ্রেস থাকবো। তাই তখন একটু বসে, চা খেয়ে অফিসে যাবো।

বাবা নিজের হাতে গ্লাপ্স গলিয়ে নিয়ে , ফোনটা নিয়ে ঘাটা ঘাটি শুরু করে দিলেন। ... আমারও গ্লাপ্স আছে। তাই আমিও সেটা কাছেই রেখেছি। বাবা ফোন ছাড়ার পর আমিও একটু ঘাটাঘাটি করবো। করে কি পাবো জানি না, কিন্তু ওই বাচ্চাদের হয় এমন। বাবা যা করে , বাচ্চাও তাই করতে চায়। সেই জন্যই আর কি।

আমি বাবার গায়ে গা লাগিয়ে বসলাম। বাবাও আপত্তি করলেন না। আমি বলতে থাকলাম – কোথায় দেখবে!

বাবা – প্রথম কললিস্টটা দেখা যাক হ্যাঁ... কি বল্।

বাবা কললিস্ট খুলতে আমি গ্লাপ্স পরে নিলাম। বাবাকে বললাম , হিস্ট্রি চেক করো। বাবা পারলেন না। আমি বললাম – আমাকে দাও।

ফোনটা হাতে নিয়ে, আমি একটা একটা নাম দিয়ে শেভ করা কলের হিস্ট্রি চেক করতে থাকলাম। আর এঁদের মধ্যে বাবা মেলালেন যে , যারা যারা যাকিছু বলেছেন , সকলেই ঠিক ঠিক বলেছেন। মানে যারা বলেছেন এক সপ্তাহ আগে কথা হয়েছে, সেটাও সত্যি, আবার যারা বলেছেন এক মাস আগে কল হয়েছে, সেটাও সত্যি।

কিন্তু একটা অপরিচিত নাম, পবিত্রা** এই নম্বরটি থেকে প্রায় রোজ কল এসেছে আর কল গেছে। বাবা বললেন – ইনি কে? ... পবিত্রা ... পবিত্রা! ... না এই নামে তো কনো লেখক নেই। ... তবে এ কে ? এই কি সেই দেবদূত!

আমাকে বাবা বললেন – কতদিন ধরে কথা হচ্ছে, দেখে বলতে পারবি!

আমি দেখে বললাম – অনেক দিন ধরে, ... আগের বছর, অক্টোবর থেকে।

বাবা বিড়বিড় করে বললেন – তারমানে যবে থেকে আধ্যাত্মিকতার শুরু , তবে থেকে। তারমানে এই পবিত্রাই হলো উনার আধ্যাত্মিক জীবনের কাণ্ডারি।

আমার উদ্দেশ্যে বাবা বললেন – দেখতো, এর সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছে কিনা।

আমি দেখে বললাম – শুধু কিছু ফাইল পাঠিয়েছেন, কিন্তু খুলছে না। মানে ডিলিট করা হয়েছে সব।

আমি আবার বললাম – দাঁড়াও। এই বলে, হওাটস্অ্যাপের ডকুমেন্টগুলোকে ক্লিক করে করে দেখতে থাকলাম। অনেক পুরানো একটা ফাইল খুলে গেল। সেটা বাবাকে দেখালাম। বাবা দেখে আমার ভালো স্মার্টফোন থেকে সেই বইয়ের পাতাটার একটা ছবি তুলে নিলেন । তারপর সেই পাতাটাকে মন দিয়ে পরলেন। আর পরে একটা গম্ভীর নিশ্বাস ছেড়ে বললেন – হুম্ এতো সত্যিই তাঁর চরণই। ... এই পবিত্রার সাথে দেখা করতে হবে। ... ফোন নম্বরটা নোট করে নে তো। আমি নোট করে নিতে , বাবা ফোন নম্বরটা নিয়ে, একটা ফোন করলেন সেই পবিত্রাকে।

ভদ্রমহিলার নাম, পবিত্রা চক্রবর্তী। লাউডস্পিকারে রেখেছিলেন বাবা। গলা শুনে মনে হলো এই ৩০-এর মধ্যে বয়স হবে। বাবা কাল সকালে একটা এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিলেন। যেতে হবে সিএ ব্লক সল্টলেক। সময় সকাল ৯টা। বাবা ফোন রেখে দিলেন। ফোন রেখে বললেন, মহীয়সী মহিলা। কণ্ঠস্বরই অন্যরকম।

বাবা এবার মায়ের কাছে গিয়ে বললেন – মধু, তোমার বন্ধু আছেন না যিনি কনো ঐতিহাসিক গ্রন্থের ব্যাপারে কথা বলছিলেন, ধর্মগ্রন্থ!

মা রান্না করছিলেন। রুটি বেলতে বেলতে বললেন – হুম। কেন?

বাবা – ফোন নম্বর আছে?

মা – হ্যাঁ আছে।

বাবা – একটা ফোন করে বলো তো , একটা বইএর ছবি দিচ্ছ ওকে হোয়াটস্অ্যাপে , সেটা চেক করে বলতে বলোনা, এই বইটার কথাই বলছিল কিনা সে।

মা – কানে ব্লুটুথ হেডফোনটা লাগিয়ে, ফোনটা নিয়ে এসো।

বাবা তাই করলেন। মায়ের কানে ব্লুটুথ হেডফোনের একটা ইয়ার বাড গুঁজে দিয়ে অপেক্ষা করলেন , ফোনের সাথে ওটা কানেক্ট হওয়া পর্যন্ত। তারপর মা বললেন , কন্ট্যাক্টস্-এ গিয়ে, সর্মিলা বলে শেভ করা আছে, কল করো ওকে।

বাবা নম্বর খুঁজে পেলে , তাতে দুটো নম্বর দেখাচ্ছিল। বাবাকে কিছু প্রশ্ন করতে হলো না , মা বললেন – প্রথম নম্বরটা। বাবা কল করে দিলেন। ...

মা ফোনে কথা বললেন – হ্যাঁ সর্মিলা। আমাকে একটা হেল্প করে দিবি। ... আমি তোকে একটা বইয়ের (বাবা পাস থেকে বলে দিলে) পাতার ছবি দিচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে। ওটা দেখে বলতে পারবি , ওই বইটাই হিমালয়ের সাধিকার কাছে দেখেছিলি কিনা!

উত্তর নিশ্চয়ই পজিটিভ কিছু আসে। তাই বাবা ছবিটা মাকে হোয়াটসঅ্যাপে আগে দিয়ে রেখেছিলেন , সেটাই ফরওয়ার্ড করে দিলেন।

মা কান থেকে হেডফোন খুলে নিয়েছিলেন , আর তখনই ফোন আসে। মা বাবাকে বললেন – লাউডস্পিকারে দাও।

বাবা কল রিসিভ করে লাউডস্পিকারে দিলেন। সর্মিলা বললেন – হ্যাঁ, এই বইটাই তো, কৃতান্ত। ... কিন্তু তুই কোথা থেকে পেলি এটা! ...

মা বললেন – আরে আমি নই , আমার হাসব্যান্ড পেয়েছেন কোথা থেকে । আমি তোর কথা গল্প করেছিলাম। তাই উনি আমাকে তোর কাছ থেকে ওটা ভেরিফাই করে নিতে বললেন। ... যদি দরকার পরে, আমার হাসব্যান্ড-এর সাথে একবার কথা বলিয়ে দেব কালকে। ঠিক আছে। ... ওকে।

মা ফোন রেখে দিলেন। বাবা মায়ের ফোনটা বসার টেবিলে রেখে , নিজের ছোট্ট বিছানায় গিয়ে শুয়ে পরলেন। আমি পাসে গিয়ে বসতে, উনি বললেন – কি বুঝলি?

আমি – ওই কৃতান্ত-এর উপরই কাজ করছিলেন শীর্ষ দাস। আর পবিত্রা সেই কৃতান্ত-এর পাতা সোর্স করছিলেন। কিন্তু খুনটা! ...

বাবা – এখনই কিছু বলা যাচ্ছেনা। ... তবে একটা জিনিস শিওর , পবিত্রা খুন করেনি। প্রথম কারণ পবিত্রাই সেই যিনি বইটা পাবলিশ করার কথা বলছিলেন , আর তিনি পাবলিশ করতেনই এই শীর্ষবাবুর মাধ্যমে। তাই শীর্ষ উনার কাছে অন্ধের জ্যোতি। আর দ্বিতীয়তো , যদি পবিত্রাই উনার সেবিকা হতেন , তবে উনি বলতেন না যে দেবদূত এসেছেন। তিনি বলতেন উনার একজন পরিচিত এসে উনার সেবা করছেন।

আমি – কিন্তু বাবা, দেবদূত যদি বলেন , আর কৃতান্ত যদি উনার কাছে তাঁর চরণ হয় , তবে তো এটা নিশ্চিত যে যিনি এসেছিলেন, তিনিও কৃতান্তের সাথেও যুক্ত ছিলেন। ...

বাবা – হুম ভেরি গুড। ... চল দেখি , কাল সকালে পবিত্রার সাথে কথা বলি । কিছু সূত্র পেলেও পেতে পারি। চল্।

হিমের গন্ধ

সকালে ব্রেকফাস্ট দিয়ে ফাস্টিংকে ব্রেক করে, আমি আর বাবা চলে গেলাম সিএ ব্লক, সল্টলেক। ছোটোর উপর, সুন্দর বাড়িটা। কলিংবেলে হাত দিতে , একজন অপরূপা সুন্দরি মহিলা বেরিয়ে এলেন। পরনে বাড়িতে সাধারণ ভাবে পরা একটা কটনের সাদা শাড়ী , তাদের সামান্য ছাপ দেওয়া। মুখ দেখলে মনে হবে, আমার থেকেও বয়স কম। বাবা আর আমাকে বসালেন উনি, আর বললেন – চা করবো?

বাবা বললেন – আমার নাম বিজয় সিংহ।

ভদ্রমহিলা হাতজোড় করে বললেন – আপনার নাম শুনেছি। ইরার কেসটা আপনি অসাধারণ ভাবে করেছিলেন, এবং সকলের চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন , ধর্ম কখনোই অন্ধবিশ্বাস হতে পারেনা। ... ঈশ্বরের আশীর্বাদে একজন সাধিকা হবার সুবাদে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

বাবাকে যেন মনে হলো একটু অপস্তুত হয়ে গেছেন। যেন উনি ঠিক করে এসেছিলেন কি বলবেন , কিন্তু সেটা আর বলা হলো না। ... যাইহোক বাবা খুব তাড়াতাড়িই সামলে নিলেন নিজেকে , আর বললেন আপনার কৃতান্ত ছাপা তো বিশবাঁও জলে চলে গেল!

ভদ্রমহিলা একটা মিষ্টি হেসে বললেন – ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিলনা। তা কেন যে ঝোঁকের মাথায় ওটা পাবলিশ করার চিন্তা করলাম। শীর্ষবাবু একটা ভালো মানুষ ছিলেন। অঘোরে প্রাণটা দিতে হলো উনাকে।

বাবা একটু সিরিয়াস হয়েই বললেন – মানে আপনিও মানেন যে কৃতান্তের কারণেই তাঁর মৃত্যু!

ভদ্রমহিলা – অন্য কারণও থাকতে পারে , কিন্তু চোরের মন বোচকার দিকে। আমার চোখে তো আমারই কৃতকর্ম ধরা পরছে। অন্যের দোষ ধরে কি হবে , নিজের দোষকে মানুষের কাছে ঢাকতে পারবো , ঈশ্বরের কাছে পারবো! ... আমার চোখে আমি একজন অপরাধী হয়ে রয়েগেলাম।

বাবা – বইটা সম্বন্ধে আপনিই কি বলেন উনাকে!

প্রতিভাদেবী – সবটাই আকস্মিক ভাবে ঘটে জানেন। ... গতবছর অক্টোবর মাসে , উনি দুর্গাপূজা নিয়ে একটি বই পাবলিশ করেছিলেন দিশা পাবলিকেশন থেকে। দিশা পাবলিকেশনের সাথে আমার অনেক দিনের সম্পর্ক। তাই আমাকেও সেই অনুষ্ঠানে ডাকা হয়। আমি যেতে উনার সাথে আলাপ হয়। তো উনি সরাসরি ঈশ্বর বিদ্বেষী মনোভাব দেখালে , আমি উনাকে বলি , আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানেনেই না। লোকমুখের কথা শুনে কি ঈশ্বরকে জানা যায়! আমার কাছে একটি অবতার-রচিত গ্রন্থ আছে। আপনাকে দেব। আপনি পরলে বুঝতে পারবেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার ধারনা কতটা মিছে।

বাবা – তারপর! আপনি দিয়েছিলেন উনাকে কৃতান্ত!

প্রতিভাদেবী – না, আমাদের, মানে আমাদের গুরুভাই-বোনদেরকে এই নির্দেশ দেওয়া আছে যে , কেউ যদি তোমার সম্মুখে ঈশ্বরজ্ঞান আহরণের জন্য ব্যকুল ব্যক্তি আসেন, তাঁকেই এই গ্রন্থ দেওয়া যেতে পারে, তাও তাঁকে প্রথমে এই গ্রন্থ ধারণ করার জন্য যথাযথ শিক্ষা প্রদান করার উপরান্তেই এই গ্রন্থ দেওয়া যেতে পারে। তাই তাঁকে দিইনি। তবে তিনি নিজেই দিশার থেকে আমার এড্রেস জেনে এখানে আসেন। আমার কাছে এসে, রোজ দুইঘণ্টা করে, এই বসার জায়গার সোফাতে বসে উনি পড়তেন কৃতান্ত।

বাবা – তারপর কি উনি ইনফ্লুয়েন্সড় হন?

প্রতিভাদেবী – হ্যাঁ, আর উনি নাছোড়বান্দা করেন এই বই পাবলিশ করার জন্য। আমি বলি, আমার কাছে এর ওয়ার্ড ফাইল নেই , প্রিন্টিং-এর জন্য আবশ্যক ওটা। উনি বলেন , কনো সমস্যা নেই। উনি পুরো বইকে ওয়ার্ডে লিখবেন আর তারপর ছাপাবেন দিশার মাধ্যমে। ... উনি দিশার কাছেই এই বইয়ের কথা বলেন, আর তাতে দিশাও খুব উৎসাহী হয়ে ওঠে। যদিও আমি না বলতে বলার কারণে , শীর্ষবাবু আমার নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। ...

বাবা – কেউ কি জানতেন, আপনি এমন করছেন, মানে পাবলিশ করতে দেবার জন্য এগচ্ছেন?

প্রতিভাদেবী – হ্যাঁ জানতেন , আমার ৫ গুরুভাই আর ভগিনী আছে , সকলেই জানতেন। ... আর জানতেন, আমারই গুরুর গুরুভগিনী।

বাবা – যার পিতা এই কথা লিখেছেন, তাই তো?

প্রতিভাদেবী বললেন – না না, যিনি লিখেছেন, তিনি নিজের নাম গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ করেন নি , কিন্তু গ্রন্থ পাঠ করলেই জানা যায় যে তিনি পূর্ণ-অবতার ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা এই গ্রন্থের শিক্ষা প্রদান করেন তিনজনকে। ইনারা হলেন দেবী মিরা , দেবী কৃতা এবং দেবী বিদিপ্তা। ... ইনাদের মধ্যে , দেবী মিরার তিন শিষ্যা, আমি, সঞ্চয়িতা এবং অপর্ণা। ... দেবী কৃতার একটি শিষ্য এবং একটি শিষ্যা , তনয় ও সুহাগী। এবং দেবী বিদিপ্তার একটি শিষ্য, সমরেশ। ... এঁদের সকলের মধ্যে আমি হলাম, দেবী সমর্পিতা, অর্থাৎ দেবী মিরা, বিদিপ্তা এবং কৃতার গুরু যিনি, তাঁর গর্ভজাত সন্তান।

বাবা – তারমানে, আপনার দাদু এই গ্রন্থ লিখেছেন?

প্রতিভাদেবী – হ্যাঁ। ... আমাদের গুরুদের মধ্যে , একমাত্র দেবী বিদিপ্তাই এখনো দেহী , অর্থাৎ দেহে অবস্থান করছেন। বাকি দুইজনে সমাধি অবস্থায় দেহত্যাগ করেছেন।

বাবা – দেবী বিদিপ্তার সাথে সাখ্যাত সম্ভব?

প্রতিভাদেবী – না। ... উনার শিষ্য , সমরেশের থেকে শুনেছি, উনি হিমালয়ে চলে গেছেন। ... তবে হ্যাঁ , প্রতিবছর আমাদের নিউটাউনের ধাম , যেটাকেই আমাদের কার্যালয় বলতে পারেন , সেখানে দেবীর আরাধনা হয়, আশ্বিনের চতুর্থী থেকে আমাবস্যা। ... সেই সময়ে মাতা বিদিপ্তা অবশ্যই আসেন। ... অর্থাৎ তাঁর সাখ্যাত পেতে হলে, যেমন আমাদেরকে ওই আশ্বিন মাসের অপেক্ষা করতে হয় , তেমন আপনাকেও সেই অপেক্ষাই করতে হবে।

বাবা – তা আপনি শীর্ষবাবুর বাসায় কবে প্রথম যান।

প্রতিভাদেবী – কনোদিনও যাইনি। ... উনি যেতেও বলেন নি। আর আমি উনাকে উনার এড্রেস জিজেসও করিনি কনোদিন। উনার মৃত্যুর পর, কাগজে খবর পড়ার সময়ে জানলাম, উনার বেহালায় বাড়ি ছিল।

বাবা – আপনার কারুকে সন্দেহ হয়?

প্রতিভাদেবী – উনি তো খুন হননি! তবে সন্দেহ কেন?

বাবা – আচ্ছা ভালো কথা, আপনি জানতেন উনি খুব ভুগছিলেন?

প্রতিভাদেবী – হ্যাঁ, শেষ সাতদিন ধরে। ... আমার থেকে উনি রোজ একটি করে কৃতান্তের পাতা নিতেন হোয়াটসঅ্যাপে। আমার কথা মত উনি সেগুলোকে ডিলিট করে দিতেন , কিন্তু আগে সেটা নিজের খাতায় লিখে নেবার পর। ... কিন্তু শেষ কিছুদিন উনি লিখতে পারছিলেন না। ... আমি দুইবার ফোনও করেছিলাম মাঝে। প্রথমবার শরীর কেমন আছে জানতে , আর দ্বিতীয়বার বলতে যে আপনি কৃতান্ত নিয়ে কাজ করা বন্ধ করে দিন।

বাবা – উনি কি বললেন?

প্রতিভাদেবী – উনি মনে হয় কৃতান্তের মধ্যে খুবই গভীর ভাবে ডুবে গেছিলেন। তাই উনি আমাকে শেষ দিন বললেন, একটা দেবদূত উনার শরীর খারাপ হবার আগে থেকেই উনার কাছে আছেন। তাই কনো চিন্তা নেই। কৃতান্তই উনার রক্ষা করবেন। আমি আর কিছু কথা বাড়াতে পারলাম না।... তারপর তো পেপারে নিউজ শুনে, নিজেকেই অপরাধী মনে হতে থাকলো।

বাবা – আচ্ছা, আপনি কি সেই দেবদূতের গলা পেয়েছিলেন, এই দুইদিনের মধ্যে একদিনও?

প্রতিভাদেবী – প্রথমদিন উনি দেবদূতের কথা আমাকে বলেন নি। তবে উনার সাথে তো রোজই কথা হতো; আজ পর্যন্ত কনোদিনও উনার সাথে কথা বলার সময়ে , দ্বিতীয় একটি শব্দও পাইনি , বাইরের কোলাহল ছাড়া।

বাবা – হুম্, আচ্ছা আপনাকে কি কেউ কৃতান্ত পাবলিশ করা নিয়ে থ্রেট করে ছিলেন ? বা শীর্ষবাবুও কি তেমন কিছু পেয়েছিলেন?

প্রতিভাদেবী – আমাকেও সকল গুরুভাইবোনরা বারং করেছিলেন, আর শীর্ষবাবুর কাছে আমি না গেলেও, এঁরা সকলেই একবার একবার করে গিয়ে উনাকে কৃতান্ত নিয়ে কাজ না করার কথা বলে আসেন। কিন্তু প্রতিবারই উনাকে কেউ বলে আসতেন , আর প্রতিবারই উনার জেদ বেড়ে যেত। শেষে আমিও উনাকে অনেকবার বলি – দাদা, আপনি নিজে পরুন। আপনার কাছে তা গেছে , আপনার পড়ার সময় হয়েছে বলেই। কিন্তু ছাপাবার কথা ভুলে যান। এই বইয়ের মধ্যে অসীমিত শক্তি রয়েছে , যা অযোগ্য হাতে পরলে, সেই মানুষেরই ক্ষতি করে দেবে।

বাবা – মানে আপনি বলছেন, সেই দৈবাৎ ভাবেই শীর্ষবাবুর হত্যা হয়, কনো মানুষের কাজ নয় এটা!

প্রতিভাদেবী হেসে বললেন – আপনিও সেই একই ধারায় কথা বলছেন , যেমন ভাবে শীর্ষবাবু প্রথমদিন কথা বলেছিলেন। ... বিজয়বাবু, ঈশ্বর না চমৎকার করেন, আর না চমৎকার করা তিনি পছন্দ করেন। ... হ্যাঁ, সমস্ত কিছু, যা সারা পৃথিবীতে ঘটছে , তা দৈবাৎই। ভেবে দেখুন না , পৃথিবীতে কত মানুষ সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌছাতে পারছেনা বলে মারা যাচ্ছেন , কিন্তু কারুকে শুনেছেন যে লেবার পেনে , গর্ভবতী অবস্থাতেই, সন্তানের জন্ম না দিয়েই, গর্ভে সন্তানকে ধারণ করেই মা মারা গেছেন! ... না শোনেন নি, কারণ কেউ না কেউ তাঁর কাছে সেই সময়ে পৌঁছেই যান। ... কি বলবেন এটাকে ? দৈবাৎ ঘটনা নয় সেটা!

আবার হেসে বললেন – কিন্তু দৈবাৎ আর চমৎকারের মধ্যে বিপুল ভেদ রয়েছে বিজয়বাবু। ... আপনি শেষ ট্রেনে এসে শেষ অটোর শেষ সিটটা পেলেন। এটা কি দৈবাৎ ঘটনা নয় ? ... অবশ্যই দৈবাৎ। সমস্ত যোগাযোগই দৈবাৎ। কিন্তু চমৎকার নয়। ... চমৎকার না তো ভগবান করেন , আর না ভগবান পছন্দ করেন। ওটা ভগবানের নয় , শয়তানের প্রচেষ্টা নিজেকে ভগবান বলে দাবি করার। ... তাই বিজয়বাবু , এমন নয় যে যদি শীর্ষবাবুর হত্যা হয়ে থাকেন , কনো চমৎকার সেটা , কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই সেটা দৈবাৎ , কারণ দৈবাৎ না হলে যে কারুকে ছুরির দ্বারা আঘাত করলেও , তিনি মরবেন না ; সুইসাইড করার চেষ্টা করেও তিনি মরবেন না, যদি না তাঁর মৃত্যুর ক্ষণরূপে সেইক্ষণটিকে দৈবাৎভাবে চিহ্নিত করা হতো।

বাবা – আপনার কনো গুরুভাইবোনদের দ্বারা কি এই কাজ করা যেতে পারে, আপনার কি মনে হয়?

প্রতিভাদেবী একটু ভ্রুকুঁচকে বললেন – অসম্ভব নয়। কৃতান্ত সাধারণের জন্য নয় , শুধুমাত্র সেই মানুষদের জন্যই কৃতান্ত, যারা জীবনচক্র থেকে মুক্ত হতে ব্যকুল। ... তাই যদি তাঁদের মনে হয়ে থাকে যে , কৃতান্ত পাবলিশ হয়ে গেলে , কৃতান্তের গুরুত্বই নাশ হয়ে যাবে , তাহলে তাঁদের পক্ষে, এমন কি আমার পক্ষেও এই কাজ করা অসম্ভব নয়। আমরা সাধক বিজয়বাবু , আর সাধকের কাজে জন্ম-মৃত্যু সমস্তই কল্পনার ফের। তাই কল্পনাথেকে মুক্ত হবার চাবিকাঠি , অর্থাৎ কৃতান্তকে রক্ষা করার জন্য আমরা নিজেদের সমস্ত কল্পনারই মৃত্যু দিয়েছি। তাই অন্যের কল্পনার মৃত্যু দেওয়া আমাদের কাছে কনো বড় ব্যাপার নয়। জীবনের দাম সাধকের কাছে থাকেনা , জীবনের দাম থাকে তাঁদের কাছে, যারা এই পঞ্চভুতের শরীরকেই সর্বস্ব মনে করেন।

বাবা একটু ব্যাঙ্গের হাসি হেসে – এই কথা বলে , আপনি আমার সন্দেহকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিচ্ছেন, সেটা কি আপনি বুঝতে পারছেন?

প্রতিভাদেবী আবার একটু হেসে বললেন – শারীরিক ভাবে আমি খুন করি আর না করি , শীর্ষবাবুর মৃত্যুর জন্য, আমি ইতিমধ্যেই নিজেকে দায়ী করে ফেলেছি , আর সেটা আমার সাথে চিরকাল চলবে , আমার কর্মফলরূপে। আইন আমাকে সাজা দিন আর না দিন, আমি আমার এই কর্মের ফল নিজেকে ঠিক সময়েই প্রদান করবো, কারণ যতক্ষণ না তা করবো , ততক্ষণ আমার মুক্তি নেই। এই ভাবনার থেকে মুক্তি নেই। যাই হোক, এই সমস্ত অনেক গভীর তত্ত্ব। আমি এইসমস্ত কথা আপনাকে বলতে চাই না। ন্যাড়া একবার বেলতলায় যায়। আমি একবার বেলতলায় গিয়ে, শীর্ষবাবুকে এইসমস্ত কথা বলে উনার মাথা খেয়ে, একটা কর্মফল কুড়িয়েছি। আর দ্বিতীয়বার সেই একই কাজ আমি করতে চাইনা।

বাবা বললেন , আপনার সাথে কথা বলে সত্যিই খুব ভালো লাগলো প্রতিভাদেবী। এই প্রথম কনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সাথে কথা বললাম , যিনি প্রকৃত অর্থে সত্যের পূজারি। ... হ্যাঁ মাথা নষ্ট করার ইচ্ছা আমার রয়েই গেল এই কৃতান্ত নিয়ে। কারণ আমার আধ্যাত্মের ব্যাপারে বরাবরই আকর্ষণ সব থেকে বেশি, তবে যেই ভাবে আপনি বললেন , অর্থাৎ দৈবাৎতত্ত্ব, এই ভাবে কারুর থেকে আমি শুনিনি , তবে শুনতে চেয়েছিলাম। ... তাই যদি আসি আপনার কাছে , কৃতান্ত শ্রবণ করার জন্য , আপনি কি আমাকে সেই কৃপা প্রদান করবেন?

প্রতিভা দেবী হেসে বললেন – স্বয়ং অবতার বলে গেছেন যে তিনি ঈশ্বরের বাহন , তো আমি কে বিজয়বাবু। তোমার শুনতে ইচ্ছা হলে , সেও তোমার অন্তরে নিবাস করা তাঁর ইচ্ছা , আর আমাকে বলতে বাধ্য করলে, আমার অন্তরে নিবাস করা তাঁরই আমাকে কৃতান্ত কথা বলার নির্দেশ প্রদান। আমরা সকলেই মাধ্যম মাত্র বিজয়।

এবার বাবা হাতজর করে ধন্যবাদ বলে উঠে পরলে , প্রতিভাদেবীর উদ্দেশ্যে বাবা বললেন – আপনাকে দিশা পাবলিকেশন কি করে চেনে?

প্রতিভা দেবী – আমার মা, মানে দেবী সমর্পিতা তাঁর পিতার , মানে কৃতান্তের রচয়িতার অন্য সমস্ত লেখা গ্রন্থকে দিশা পাবলিকেশনের মাধ্যমে পাবলিশ করতেন। সেই বই পড়েই , মিরাদেবী, বিদিপ্তা দেবী আর কৃতাদেবী উনার কাছে আসেন। আমি তাঁর কন্যা, তাই রয়ালটি পাই। সেই সূত্রেই দিশা আমাকে চেনে।

বাবা – চলে যায় রয়ালটিতে?

প্রতিভাদেবী – যা আসে, সমস্তই আমাদের ট্রাস্টেই দিই। মা প্রচুর পয়সা করেছিলেন সেই বই বিক্রি করে। সেই পয়সায় উনি তিনটি বাড়ি করেছিলেন। এঁদের একটা এই বাড়িটি , আর এছাড়াও সল্টলেকেই

দুটি বাড়ি আছে। বাড়ি ভাড়ার পয়সার পর আমার আর কিছু লাগেনা। তবে রয়ালটির টাকার উপর আমার একার অধিকার থাকতে পারেনা। উনার সমস্ত শিষ্যের সন্তানদেরই তার উপর অধিকার আছে। ... সেই পয়সাতেই প্রতিবছর মাতৃআরাধনা হয় আমাদের, মায়ের আর দাদুর নিউটাউনের ভিটেতেই।

বাবা এবার হেসে আমাকে নিয়ে বেড়িয়ে চলে আসছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন – আপনারা কেউ সন্ন্যাসিনী নন, তাই না!

প্রতিভাদেবী হেসে বললেন – সংসার হলো কুরুক্ষেত্র, যেখানে রিপুপাশদের সাথে প্রত্যক্ষ লড়াই করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন গাণ্ডিব ধরো , যুদ্ধ করো। আর আমরা কি করে , রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাই বলুন তো!

বাবা এবার হেসে বললেন – আপনাকে প্রণাম করতে পারি!

প্রতিভাদেবী হেসে বললেন – আমার ভিতরে তাঁকে অনুভব করলে, আর নিজের ভিতরের তাঁকে অসম্মান করবে! ... তিনি তো তোমার অন্তরেও রয়েছেন , তাই না! ... আমাকে প্রণাম করার অর্থ , আমার অন্তরে তাঁকে সম্মান করলে, আর তোমার অন্তরে তাঁকেই অসম্মান করলে, তাই না!

বাবা হেসে বললেন – আজ আসি দিদি। আবার আস্তে পারি তো?

প্রতিভাদেবী হেসে বললেন – তিনি চাইলে, তুমি না চাইলেও আসবে। ...

বাবা – একটা প্রশ্ন করবো, মানে স্রেফ কৌতূহল।

প্রতিভাদেবী বললেন – ৩৫

বাবা – আপনার বয়স?

প্রতিভাদেবী – সেটাই তো জানতে চাইছিলে, তাই না!

বাবা – আপনাকে দেখে কিছুতেই বোঝার উপায় নেই। ২০-২২ লাগে।

প্রতিভাদেবী হেসে বললেন – আমাদের মাতাতুল্যা দেবী বিদিপ্তা এখন ৫৫। তাঁকে দেখেও বুঝবে না। না তাঁর চুলে পাক ধরেছে, আর না চামড়ায় টান পরেছে।

বাবা এবার হাতজোর করে আমাকে নিয়ে বেড়িয়ে এলেন। মোরের মাথায় একটা চায়ের দোকানে চা আর সিগারেট খেতে খেতে বাবা বললেন – সাধিকা কাকে বলে দেখলি মিলি?

আমি বললাম – উনার তো প্রতিটি শব্দে শব্দে ঈশ্বরের ধারনা বিদ্যমান বাবা! ... এমন হন সাধক!

বাবা – ঠিক এমনই হন। ১০০% খাটি তপস্বিনী। যেই কৃতান্তের উপর ভর করে , ইনারা এমন হয়েছেন, সেটি যে তাঁর চরণ , সেই ব্যাপারে শীর্ষদা একদমই ভুল করেন নি। তবে একটি ভুল উনি করেছিলেন। সেটি হলো, ধর্মগ্রন্থ সকলের জন্য নয় , ধর্মগ্রন্থ শুধুমাত্র সাধকের সম্বল , সাধারণ মানুষ না তাঁর মানে বোঝেন আর না তাঁর ধারনা করতে পারেন। মাঝখান থেকে কেবলই বইপাঠ করে নেবার দম্ভ আসে, আর সেই দম্ভ থেকে একটা নতুন ভেদভাবের সৃষ্টি হয়। ...

আমি – তারমানে এই বই ছাপাতে যাবার জন্যই উনার মৃত্যু হয়?

বাবা – হুম, এবার এই কেস নিয়ে এগোবো না এগবোনা, সেটাই বুঝতে পারছি না।

আমি – কেন এগবে না কেন? খুনির তো সাজা পাওয়া উচিত, তাই না!

বাবা একটা ধিক্কারের হাসি হেসে বললেন – ঈশ্বরের বই যদি ঈশ্বরের পথযাত্রী ছাড়া কেউ পড়েন , তবে কি হয় জানিস?

আমি – কি হয়?

বাবা – ঈশ্বর নিজের সেই যাত্রাপথকেই চিরতরে বন্ধ করে দেন। ... তাই ঈশ্বরের পথে যাত্রার পথকে উন্মুক্ত রাখার জন্য, যিনি সেই দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন , তাঁর হত্যা কি করে অপরাধ হতে পারে মিলি! ... আইনের চোখে সে অপরাধী , কিন্তু মানবজাতির চোখে , তিনি একজন মহামানুষ , যদিও মানবজাতির মধ্যে, সেই ব্যক্তিই এই কথা বোঝেন , যিনি ঈশ্বরের পথের যাত্রী , অন্যেরা বুঝতেও পারেন না। ... তাই ... (একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে) ... দেখি তোর মা কি বলেন। ... চল বাড়ি চল।

অদ্ভুত কেস

মায়ের সাথে কি কথা হলো কে জানে , মায়ের সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ হাঁটকানো বন্ধুটি আমাদের বাড়িতে মায়েরই কলের উত্তরে এলেন।

আলাপ আলোচনার পর, আমি যখন থেকে কথা শুনলাম, সেটাই বলছি –

বাবা বললেন – আপনি যেতে পারেন আমার সাথে, কিন্তু ওখানে যেটা হবে, বা যেটা আপনি দেখবেন বা জানবেন, তার সমস্ত কথা আপনাকে চিরজীবনের জন্য হজম করে নিতে হবে। ... যদি পারেন , তবেই আপনাকে উনার কাছে নিয়ে যাবো, নয়তো আমি একা আমার কন্যাকে নিয়ে যাবো।

ভদ্রমহিলা বললেন – আমি যাবো না উনার কাছে। উনি আমাকে দেখে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। বড় তাচ্ছিল্যস্বরে কথা বলেছিলেন। আমার ভালো লাগেনি। ... আমি জায়গা দেখিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করবো। ফিরে এলে একসাথে চলে আসবো।

কথা শেষ হতে, আমি বাবা, আর সেই মহিলা অর্থাৎ সর্মিলা ধর্মতলা থেকে শিলিগুড়ির বাস ধরলাম। আজ সন্ধ্যায় উঠলাম, পরের দিন সকালে নামলাম। নেমে গ্যাংটকের জিপ ভারা করলাম। গ্যাংটক পৌছাতে প্রায় ৫ ঘণ্টা লেগে গেল। সেখানে রেস্ট না নিয়ে , আমরা চলে গেলাম পেংলঙ । ধুধু প্রান্তর, কনো জনমানুষ নেই, খালি পাহার আর বরফ, আর মাঝে মাঝে একটু একটু করে ঝোপ। সেখানে গিয়ে আমরা তাঁবু ফেললাম। রাত্রিটা সেখানে কাটিয়ে, পরের দিন আমরা ট্রেক করতে আরম্ভ করলাম ইখাবূ বলে একটি জায়গার উদ্দেশ্যে। ... বিস্তর পথ। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ড্রাইভার তেঞ্জিং ছেত্রির ফোন নম্বর রাখা ছিল। সে বলে দিয়েছিল, ফেরার আগের দিন ফোন করে দিতে। ও চলে আসবে।

আমরা তিনদিন ধরে ট্রেক করেছিলাম। সর্মিলা আনটি আর শেষের দিকে হাঁটতে পারছিলেন না। আমিও হাঁপিয়ে গেছিলাম। বাবাকে আমাদের বিশ্রামের জন্যই অযথা অপেক্ষা করতে হয় । ... রাত্রিটা আগুন জ্বালিয়ে, তাঁবু খাটিয়ে থাকা , আবার দিনের বেলায় হাঁটা। তিননম্বর দিন দুপুর বেলায় , আমরা ইখাবু পাহারের নিচে এসে পৌঁছলাম। আমাদের পাহাড়টি ছোট, কিন্তু পিছনে বরফের মালা পুরো। ...

বাবা একটা তাঁবু খাটিয়ে দিলেন সর্মিলা আনটির জন্য; রাত্রিটা সেখানেই উনি থাকবেন। বন্য জন্তুর তেমন ভয় নেই এইদিকটায়। তাও আগুন জ্বালিয়ে থাকতে বললেন। আমাকেও থাকতে বলছিলেন। কিন্তু আমি বাবার সাথে যাবার জন্য জেদাজেদি করতে , বাধ্য হয়েই নিয়ে গেলেন আমাকে। তবে আমার থেকে

গেলেই ভালো হতো। আমাকে দেখে , ওই মহিলা, যিনি এই তাঁবু থেকে ২০ মিটারের মধ্যে থাকা একটি গুহায় ছিলেন, তিনি ভয়ানক ক্ষেপে যান।

বাবা উনাকে শান্ত করতে বলেন – কিছু মনে করবেন না দেবী, আমার কন্যা। একা পাহাড়ের মধ্যে ছেড়ে আসি কি করে, তাই নিয়ে এলাম। ... সেই শুনে উনি শান্ত হলেন।

বাবাকে নিজের পরিচয় দিতে হয়না। দেবী বিদিপ্তা , বাবাকে সরাসরি বিজয় বলেই ডাকলেন। আমি ভেবেছিলাম বাবাকে উনি চেনেন আগে থেকে। কিন্তু দেখলাম বাবাও চমকে গেলেন। বাবা বললেন – আপনি আমাকে চেনেন!

দেবী বিদিপ্তা একটু মুচকি হেসে বললেন – আমার হাতে হাতকড়া পরাতে এসেছ তো?

বাবা – আজ্ঞে না। ... আমি জানি আপনি যা কিছু করেছেন, তা নবনির্মিত আধ্যাত্মিক পথকে নির্মল রাখার জন্যই করেছেন। আর তা যে করতে পেরেছেন, তার কারণ সেটি দৈবাৎ তাই। ... অর্থাৎ সেটি হবার ছিল, তাই আপনার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। না হবার হলে , আপনি ব্যর্থ হতেন। আমার এখানে আসার হেতু , পুরো ঘটনাটা জানা অবশ্যই, কিন্তু তার থেকেও বেশি, আপনাকে দেখা।

দেবী বিদিপ্তা – যদি হাতকড়া না পরাও , তবে এই পুজোতে গিয়ে , তোমাকে ডেকে নেব। তোমাকে যা শিক্ষা দেবার দিয়ে দেব। ... আমি আর ৩ বছর আছি। এই তিনবছর আমার খাওয়াপড়ার ভার নিতে পারবে বিজয়?

বাবা – আপনি চাইলে, নিশ্চয়ই পারবো।

দেবী বিদিপ্তা – তাহলে, আমাকে তোমার বাড়িতে এই তিনবছর রাখবে। আমি তোমাকে আর তোমার স্ত্রী আর এই কন্যাকে যা শিক্ষা দেবার তা দিয়ে , আবার এখানে চলে আসবো। এখানে আসার পর আমার হাতে আর একটি মাস সময় থাকবে। আমি মহাশূন্যে নিজের অস্তিত্ব লীন করবো , যেখানে আমার দুই গুরুভগিনী এবং গুরু স্বয়ং বিলীন হয়েছেন। ... আর আমার চলে যাবার পর , যদি কিছু জানার থাকে , প্রতিভা আছে। ... খুব ভালো মেয়ে ও। আমার গুরুর নিজের গর্ভজাত কন্যা। অবতারের রক্ত বইছে , ওঁর মধ্যে দিয়ে। ... তবে এসব প্রকাশ করো না বাবা। ... গয়না লকারেই রাখতে হয় , সামনে ফেলে রাখতে নেই। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হলো মহামূল্যবান রত্ন। এঁদেরকে বাইরে রাখতে নেই।

বাবা বললেন – আমি আসি তাহলে মা।

দেবী বিদিপ্তা – পাহারে সন্ধ্যা নামতে দেরি আছে। তোমার স্ত্রীর বান্ধবিকে একা রেখো না। ... সে আগুনে ভয় পায়, তোমাকে বলে নি। ...

বাবা এবার প্রশ্ন করলেন – আপনিও কি প্রণাম নেন না!

দেবী বিদিপ্তা হেসে বললেন – এক তিনিই প্রনম্য। তিনি সর্বত্র আছেন , তাই সমস্ত কিছুই প্রনম্য। বাকি সমস্ত কাজ ছেড়ে, তবে কি খালি প্রণামই করতে থাকবে বাবা!

বাবা হেসে বললেন – কিছু প্রশ্ন ছিল মা।

দেবী বিদিপ্তা – প্রতিভা এসেছিল আমার কাছে। সাহায্য চাইতে। ... আমি শীর্ষের কাছে যাই। ওকে বলিও কৃতান্ত পাবলিশ করার হট ছেড়ে দাও , নাহলে আমি তোমায় হত্যা করতেই এসেছি। ... সে বলে , আমাকে মেরে ফেলুন। আমি বুঝে গেছি কৃতান্ত পাবলিশ করা কেন অনুচিত। তারপরেও আমার বিকারে গ্রস্ত হয়ে যাওয়া শয়তান বুদ্ধি আমাকে কিছুতেই এই বই পাবলিশ করা থেকে দূরে সরতে দিচ্ছে না। ...

বাবা হেসে – আর কিছু বলেছিলেন উনি শেষকালে?

দেবী বিদিপ্তা – হ্যাঁ, প্রশ্ন করেছিল সে। পরের জন্মে নিজেকে কৃতান্তের কাছে উৎসর্গ করতে পারবে কিনা। ... শেষ সাতদিন ও নিজেকে অসুস্থ বলে ঘোষণা করে। আর আমার থেকে কৃতান্ত কথা অবিরাম শুনতে থাকে। ... শেষ দিন আমাকে ও বলে , মৃত্যুকে সে একাকী উপভোগ করতে চায়। ... তাই আলুপোস্ততে বৎসনাভ বা কাঠবিষ মিশিয়ে দিই। এবং আমি দরজা খুলেই চলে আসি। ...

বাবা হেসে বললেন – উনি পরের দিন সকালে দেহ ছাড়েন।

দেবী বিদিপ্তা বললেন – না, ও রাত্রেই দেহ ছেড়ে দেয়। আমি ওকে কুম্ভক করতে শিখিয়ে এসেছিলাম। ও রাত্রের মধ্যে নিজের দেহ ছেড়ে দেয়। বিষ ওঁর শরীরে ক্রিয়া করে , রাত থেকে। ... কিন্তু ও মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করার আগেই দেহত্যাগ করে দেয়।

বাবার চোখ ছলছল করে এলো। উনি বলে উঠলেন – প্রণাম করতে ইচ্ছা করছে মা বড়।

দেবী বিদিপ্তা বাবাকে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করে বললেন – তুই তো আমাদেরই একজন রে। ... আমাদের গুরু ছিলেন এক, তার থেকে আমরা হলাম ৩, আমাদের থেকে হলো ৬, আর তাঁদের থেকে হবে ১২। আর সেই ১২-র প্রথম জনই তুই। ... তুই তো তোর স্ত্রীকে ট্রেনে বসেই এই ছক বলে দিয়েছিলিস। ১-৩-৬-১২-২৪।

বাবা চলে এলেন আমাকে নিয়ে। যেই পথে গেছিলাম, সেই পথেই ফিরলাম। পথে বাবা একটিও কথা বললেন না। ... সর্মিলা আনটি আর পারছিলেন না। ... বাবা ছেত্রিকে ফোন করে দেন ঠিক সময়ে। আর সে এসে আমাদেরকে নিয়ে যায়। গ্যাংটকে পৌঁছে সর্মিলা আনটির খুব বমি পায়খানা হয়। দুদিন সেখানেই থাকতে হয়। তারপর আমরা ফিরে আসি। বাবা এসে মাকে সমস্ত কথা বলেন। মাও মাতা বিদিপ্তাকে বাড়িতে তিনবছর পাবেন, তাই খুব আনন্দ পান।

আমাকে নিয়ে এবার বাবা বিশিষ্টবাবুর কাছে গেলেন এবং উনার ৫০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিতে চেয়ে বললেন, আপনার বাবা খুন হননি। দৈবাৎ কারণেই উনার উপর বিষপ্রয়োগ হয়, তাও উনার সজ্ঞানে। আর উনি কুম্ভক করে, মৃত্যু উনার কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই দেহত্যাগ করে দেন। তাই উনার খুন হয়নি। তাই এই টাকা আমি নিতে পারবো না বিশিষ্ট বাবু।

বিশিষ্টবাবু এবার বাবার হাতধরেই বললেন – জীবনে আমি বাবার হাতে কিচ্ছু দিতে পারিনি স্যার। ... শেষে ইচ্ছা হয়েছিল উনাকে দিই, কারণ উনার শেষ বয়সে উনার প্রতি সম্মান আমার ঠিকঠাক ভাবে জন্মায়। ... কিন্তু তা দিতে পারিনি। ... আপনি উনার সমস্ত মৃত্যুরহস্য জেনেছেন। তাই প্লিজ এটা আমার তরফ থেকে নিন। আমি মনে করবো, বাবাকেই দিয়েছি টাকাটা।

বাবা আর কিছু বললেন না। চলে এলেন। পথে আমি বললাম – আমি না এই কেসটার কিচ্ছু বুঝলাম না।

বাবা বললেন – বুদ্ধি আমাদের পঞ্চভুতের একটি। পঞ্চভূত হল আকাশ মানে মন, জল মানে বুদ্ধি, পবন মানে প্রাণবায়ু, প্রগতি শক্তি মানে অগ্নি আর দেহ মানে মাটি। এই বুদ্ধি বিকারের প্রভাবে এসে শয়তান হয়ে ওঠে। শীর্ষবাবুও কৃতান্তের স্পর্শে আস্তে জীবনকে জানতে থেকেছিলেন। কিন্তু উনার বিকার উনাকে বলে, সবাইকে এই কৃতান্ত কথা বলতে হবে, তাই পাবলিশ করতে হবে। পরে সকল দেবী সমর্পিতার শিষ্যকুল বোঝাতে উনি বুঝে যান যে এটা পাবলিশ করা ঠিক নয়। তারপরেও উনার বিকার উনাকে ছেড়ে দিচ্ছিল না।

বাবা বলতে থাকলেন – শেষে দেবী বিদিপ্তার হস্তক্ষেপ কামনা করেন দেবী প্রতিভা , যার কারণেই এই বিকারগ্রস্তের হাতে এই গ্রন্থ উঠে আসে। আর তাই দেবী বিদিপ্তা নিজে এসে শীর্ষদাকে বোঝান। শীর্ষদাকে বলেন, হয় তাঁকে বুঝতে হবে, নয় তাঁকে মরতে হবে। ... শীর্ষদা বুঝে গেছিলেন , তিনি তাঁর বিকারের কাছে বন্দি হয়ে গেছেন। তাই বলেন, তাঁকে মৃত্যু দিতে, এবং উদ্ধারের পথ দেখাতে। ... তাই দেবী বিদিপ্তা তাঁকে সাতদিন ধরে কৃতান্ত কথার শ্রবণ করিয়ে , আর কুম্ভক শিখিয়ে, শীর্ষদাকে উদ্ধার করেন। তবুও উনার বিকার উনাকে ছাড়ছিলেন না। তাই উনাকে জানিয়েই উনাকে বিষ দেন। বৎসনাভ ভয়ানক বিষ, যা হিমালয়ের সেই অঞ্চলে পাওয়া যায় , যেখানে দেবী বিদিপ্তার গুহা। আর বিষ প্রয়োগের আগে আগে একটা ছেলেকে কল, শেষ বার ছেলের গলা শোনার ইচ্ছা। (হাসি)

কিন্তু শীর্ষদা মানসিক ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হয়ে গেছিলেন। তাই উনি মৃত্যুর আগেই দেহ ছেড়ে দেন কুম্ভক করে। তবে উনার দেহকে পরীক্ষা করে বিষপ্রয়োগেই উনার মৃত্যু হয় , এমনই ধারনা হয়, আমাদের মত ভৌতিক জগতই সমস্ত কিছু, এই ধারনা রাখা মানুষদের।

অর্থাৎ কৃতান্তের সুরক্ষার জন্যই এই সমস্ত কিছু অনুষ্ঠিত হয় । ... ধর্মগ্রন্থ হলো শ্রেষ্ঠ ধন মানবজাতির জন্য। কিন্তু মানবজাতি সার্বিক ভাবে ধর্মগ্রন্থের অন্তরে বলা সূক্ষ্ম এবং কারণ তত্ত্বের ধারনা করতেও অক্ষম, কারণ তাঁরা স্থূল জগতকেই, মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকেই সর্বস্ব কিছু মনে করে। তাই ধর্মগ্রন্থ তাঁর জন্যই উপযোগী, যিনি মোক্ষের দ্বারের সন্ধান করছেন, অর্থাৎ সমস্ত যোনির থেকে মুক্তির সন্ধান করছেন। ... তাই ধর্মগ্রন্থ আগেকার দিনে কেবল ঋষিদের কাছেই থাকতো।

যেই যেই ধর্মগ্রন্থ ঋষিদের থেকে সমস্ত মানুষের কাছে ছড়িয়ে গেছে, সেই সেই ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে অপব্যাখ্যাও শুরু হয়ে যায়। মনে করা হয় যেন সেখানে বর্ণিত সমস্ত কথা ভৌতিক জগতের ইতিহাসের কথা। ... তাই এই নবধর্মগ্রন্থ, যা সত্যই ভগবানের চরণের সমান , তাঁকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই, এবং মানবের মুক্তির সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখার কারণেই এই কেস। একটা সম্পূর্ণ দিব্য কেস এটি।

আমি আর কিছু বললাম না, তবে বুঝলাম অনেক কিছুই। বুঝলাম, ধর্মের রক্ষার প্রশ্ন যখন আসে, তখন জাতি, জীবন, মৃত্যু, এসব কনো কিছুরই কনো দাম থাকেনা। ... ধর্ম তাই যা মানুষকে মোক্ষের পথ দেখায়। আর যার মোক্ষ লাভের সময় হয়েছে , তাঁরই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা উচিত , কারণ তিনিই ধর্মগ্রন্থের থেকে যেই ধারনা করা প্রয়োজন তা করতে সক্ষম। সেই সময়ের আগে যিনি গায়েরজোয়ারি করবেন, যদি ধর্মগ্রন্থ কৃতান্তের মতই শক্তিশালী হয় , তবে তাঁর এমন অকালমৃত্যু হবে , আর যদি ধর্মগ্রন্থের শক্তি হ্রাস পেয়ে থাকে, তবে ধর্মগ্রন্থেরই ধর্মত্যাগ হবে। ... সত্যিই একটা দৈবাৎ কেস। বোধহয় , পৃথিবীর প্রথম দৈবাৎ কেস এটি।

ছায়াছবি

সুমনা পিসির কথা মনে আছে? রথিনকাকার বোন? যিনি বাবার সাথে একটা কেসে একসাথে কাজ করতে চেয়েছিলেন বলে বাবা তাঁকে রেইকি করতে বলেছিলেন। রেইকি উনি করেছেন কিনা জানিনা, তবে উনার স্বপ্নপুড়ন হয়। আমরা সিকিম থেকে ফেরার প্রায় ৪ মাস পরে , মানে সেই বছরের শেষের দিকে। সময়টা শীতকাল ছিল, যদিও সেটা বলাও যা না বলাও তাই।

ছোটবেলায় শীতকাল দেখেছি। সকাল সকাল প্রাইভেট পড়তে যেতাম , সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত ঠেকলেই হাত ঝনঝনিয়ে যেত। গরমজল মেশানো জল গায়ে ঢাললেও , যেন হারকেঁপে উঠতো। সেই বেলা বাড়লেই ছাদে মাদুর পেতে বসে পড়ার বই , গল্পের বই পড়া আর দুপুরে রোদে বসে বসে কমলালেবু খাওয়া, রাত্রিবেলা চাদর থেকে হাত বের করে রুটি খাওয়ার কষ্ট আর শুতে যাবার সময়ে বিছানায় গা ঠেকলেই , কেউ বিছানায় জল ঢেলে দিয়েছে মনে করে আঁতকে ওঠা , ওসব ইতিহাস হয়ে গেছে।

এরপরেও দেখি, জ্যাকেট, মাফলার, ইত্যাদি সব চাপিয়ে রাস্তাঘাটে চলছে। বয়স্কমানুষের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, তাঁদের কথা না বোঝা যায়, কিন্তু অল্পবয়সের লোকজনের এমন আচরণে যেমন হাসি পায়, তেমন বিরক্তও লাগে। কি করে অতো ভারিভারি জিনিসগুলো শরীরে চাপায় কে জানে! ... একটাই বাঁচোয়া। অই দুই তিনটে মাস পাখা চালাতে হয়না, আর ঘাম মুছতে হয়না, এই যা।

যাইহোক, সেই আধুনিক শীতকালই ছিল , যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বোঝায় কিনা জানিনা , কিন্তু হ্যাঁ ভুগলের পাতায় যে পরেছিলাম ৩০ বছর পরপর ওয়েদার পাল্টায় , সেটার বেশ জমিয়ে প্রমাণ দেয়। সেই শীত না পরা শীতের এক সকালে , আমার ঘুম ভাঙল একটা কলিংবেলের আওয়াজে। ... বাবা পিছনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন বোধহয়, তাই মা আইহোল দিয়ে দেখে দরজা খুললেন।

শেষ তিনচারটে কেস বড়ই সামান্য , তাই তাতে শরীরের কনো কসরত হয়নি। সেই জন্যেই বোধহয় একটু আলসে হয়ে উঠেছিলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম , দেখলাম ৮টা। বাবাকে দেখলাম ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি আসলেন। সিগারেট ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু কথা বলার সময়ে নাকদিয়ে তখনও ধুয়া বেরচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - তাড়াতাড়ি ব্রাশ করে বসার ঘরে আয়। বড় কেস এসেছে।

কথাটা শুনে যেন শরীরে , মনে, বুদ্ধিতে সর্বত্র একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিসের যেন একটা উত্তেজনা আমাকে ঘিরে ধরলো। যেই মেয়ে, বিছনায় ঘুম ছেড়ে উঠে বসার পর ১৫ মিনিট সময় নেয় বিছনা থেকে

নিজের গতরকে ভূমিতে ল্যান্ড করাতে , সে ৫ মিনিটের মধ্যে ব্রাশ করে , ফ্রেস হয়ে বসার জায়গায় চলে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখলাম সুমনাপিসি। দেখে কেমন যেন মেজাজটা চটকে গেল । বুঝলাম, বাবা আমাকে তাড়াতাড়ি বিছনা থেকে ওঠানোর জন্য , এমন একটা সিন ক্রিয়েট করে দিলেন। কথাটা ভাবতেই যেন বিশ্বের সমস্ত আলসেমো আমাকে আবার ঘিরে ধরলো। যাই হোক , সুমনা পিসি এখন ব্যস্ত হয়ে গেছেন রিপোর্টারের কাজে, কারণ পেজ থ্রির প্রাইম রিপোর্টার এখন তিনি সুখহাট পেপারের। তবে আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন উনার আমাদের বাড়িতে খুব আসাযাওয়া ছিল, আর সেই আসাযাওয়ার উদ্দেশ্য ছিলাম আমি। তাই তাঁকে দেখেও অবজ্ঞা করতে পারিনা।

দরজা দিয়ে বেরোতেই, সুমনা পিসির চোখ পরলো আমার দিকে। একমুখ হাসি নিয়ে বললেন – কি রে মিলি, ঘুম ভাঙল? ... আরে কেসের কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তোর বাবা বলল, মিলি আসছে ব্রাশটা করে। তাই অপেক্ষা করছি। ... মাঝে মাঝে যেতে পারিস তো? তোর মুখটা দেখতে পাই।

আমিও হেসে, ঘুম থেকে সবে ওঠার কারণে ধরে যাওয়া গলা নিয়ে বললাম – তুমি তো সানডেতেও বাড়ি থাকো না!

পিসি আবার বলল – তা অবশ্য ঠিক, আমি যে কখন খালি হবো, তা আমিই জানিনা। ... নিজে একজন কেরানী, কিন্তু সেলিব্রিটিদের পিছনে পিছনে ঘুরতে ঘুরতে এই কেরানীর লাইফস্টাইলটা হয়ে গেছে সেলিব্রিটিদের মতই।

আমি সেই কথায় আমার ঘুমিয়ে ফুলে যাওয়া চোখ নিয়ে হেসে সোফায় মায়ের পাসে বসলাম। ঘুম থেকে ওঠার পর, মায়ের গায়ের গন্ধটা আর উষ্মাটা না পেলে যেন দিন শুরুই হতে চায় না। আর অন্যদিকে সুমনা পিসি বলতে শুরু করলেন – বিজয়, তোমার মেয়েকে নিয়ে আমার সাথে মহিমা মিত্রের বাড়ি যেতে হবে এখনই।

বাবা – কাল রাত্রে মারা গেছেন তো উনি। নিউজে চোখ বোলানোর সময় দেখলাম।

পিসি – হ্যাঁ, স্বাভাবিক হৃদাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, এমনটাই বলা হচ্ছে। তবে আমার সিক্সথ্ সেন্স বলছে, এতে অন্য গন্ধ আছে। একমাস আগেও আমি উনাকে দেখেছি , সম্পূর্ণ সুস্থ। আর একমাসের মধ্যে কি

এমন হয়ে গেল যে একজন ৩২ বছরের মেয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল! একবার চলো বিজয়। তোমার দেখার দৃষ্টি আলাদা। তুমি খালিচোখে দেখলেও, অনেক কিছু বুঝতে পারো।

বাবা – কিন্তু আমি বুঝলেই বা আমাকে এন্টারটেন করবে কেন?

পিসি – সব পুলিশরাই জানে, আমি রথিনের বোন। তাই আমাকে কেউ ঘাটায় না। আমি যদি বলি যে এই কেসের তদন্ত হোক, তবে কেউ আমাকে বাঁধা দেবে না।

বাবা – ওকে, ড্রেস করে নে। সাদা জাতীয় সালওয়ার পরবি।

আদেশের পালন হলো। বাবাকেও দেখলাম , একটা খয়েরি প্যান্টের উপর , একটা সাদা পাঞ্জাবি চাপিয়ে নিলেন। সুমনাপিসি গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আমরা তিনজন সুমনাপিসির গাড়িতেই চলে গেলাম প্রখ্যাত অভিনেত্রী, মহিমা মিত্রের বাড়ি।

বালিগঞ্জ সার্কুলারে হাভেলি কারটিং বিশাল বাড়ি। বাড়ির সামনে ভিড় অনেকের। সেলিব্রিটি বলে কথা। ভীরের মধ্যে সমস্ত সেলিব্রিটিই রয়েছেন প্রায় । ভদ্রমহিলা শুধু সিনেমা করতেন না। টিভি সিরিয়ালও করতেন, ওয়েব সিরিজও করতেন , আবার অ্যাডও করতেন , সঙ্গে পুরনো অভ্যাস অর্থাৎ নাটকও করতেন। তাই বিভিন্ন ধরনের অভিনেতা , অভিনেত্রী, প্রযোজক, আর নির্দেশক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারসাথে ছিলেন পুলিশকর্মীরা, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ আর রিপোর্টার।

সুমনাপিসি সেখানে ভিড় ঠেলে ভিতরে গেলেন। আমি আর বাবা উনার পিছুপিছু গেলাম। মৃতদেহকে এখনো স্থানচ্যুত করা হয়নি। মহিমা মিত্রের ভাই হলেন সিয়াইডি অফিসার , রথিনকাকুর জুনিয়ার, বাদল মিত্র। উনার কম্যান্ডে, উনি যতক্ষণ না এসে পৌঁছচ্ছেন, ততক্ষণ মৃতদেহকে সরানো হবেনা। তাই পুলিশ বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কেউই মৃতদেহে হাত দেন নি।

এতে আমাদের সুবিধাই হলো। বাবাকে দেখে , পুলিস অফিসার, বালিগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর, সুব্রত সাঁতরা প্রশ্ন করলেন – সুমনা, ইনি কে? ইনাকে তো ঠিক চিনলাম না!

সুমনা পিসি – বিজয় সিংহ, ওরফে সিন। যিনি ইরার কেসে সিয়াইডিকে গাইড করেছিলেন।

বাবার নাম শুনেই যেন ভুত দেখার মত তটস্থ হয়ে গেলেন মিস্টার সাঁতরা। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন – স্যার, সাধারণ মৃত্যু, এখানে তদন্তের কিছু আছে কি?

বাবা – আছে তো বটেই মিস্টার সাঁতরা। ... উনার মৃত্যুর সময়ে সিটিং পসচারটা একবার দেখুন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, উনি কিছু দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন। আর উনার চোখের তলায় মোটা কালো দাগ বলছে যে, উনি বেশ কিছুদিন যাবত নিদ্রাহীন ভাবে রাত কাটাচ্ছিলেন। ... অর্থাৎ মিস্টার সাঁতরা , স্ট্রোক হয়ে, মানে হার্ট অ্যাটাকে উনি যে দেহত্যাগ করেছেন, তা হতেই পারে, কিন্তু হার্ট অ্যাটাকটা কি রোগের কারণে হয়েছে? যদি তা না হয়, তবে কি এটা সাধারণ মৃত্যু না মার্ডার!

মিস্টার সাঁতরা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাবার পিছনে তাকিয়ে, একটা স্যালুট মেরে দাঁড়িয়ে পরলেন। সেই দেখে বাবা পিছন ঘুরতে দেখলাম রথিনকাকুর জুনিয়ার , বাদল মিত্র দাঁড়িয়ে। ... বাবার দিকে চোখ পরতেই উনি বললেন – আরে বিজয়দা! ... এখানে?

বাবা – রথিন আমার বাল্যবন্ধু, তাই সুমনাও আমার বাল্যভগিনী। ওর সুত্রেই আসা হয়েছে।

বাদল মিত্র – হুম, দিদি বেশ কিছুদিন ধরেই কেমন একটা আনন্যাচারাল বিহেভ করছিলেন। আজ নয়তো কাল, একটা সাইক্রিয়াটিস্টের কাছেও দিদির যাবার কথা ছিল। তাই, আমারও তোমারই মত মনে হয় যে এই কেস সাধারণ মৃত্যু নয়। ... তাই একবার মৃতদেহকে মৃত্যুঅবস্থাতেই দেখতে চেয়েছিলাম।

বাবা – একবার ঘরের তল্লাসি নিলে হয়তো কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারতো। কি বলো বাদল!

বাদল স্যার – বিজয়দা, তুমি এই কেসটা হ্যান্ডেল করো। আমি , আমার ডিপার্টমেন্ট, আর ইন্সপেক্টর সাঁতরা তোমাকে এসিস্ট করবো। দিদি আমার খুব প্রিয়জন ছিলেন। সেই ১৫ বছর বয়সে একটা এক্সিডেন্টে বাবা-মা হারিয়েছিলাম। তারপর থেকে দিদিই সব । তাই আমি এই কেস হ্যান্ডেল করতে গেলে, ইমোসানাল হয়ে পরবো। ... তাই তুমিই কেসটা হ্যান্ডেল করো। যা লাগবে আমি দেব। এটা আমার কেস। আর আমি তোমাকে ইরার কেসে সামনে থেকে দেখেছি। তাই আমি বিশ্বাস করি, যদি কেউ সত্য উদঘাটন করতে পারে, তবে সেটা তুমিই। ডোন্ট ওয়ারী এবউট ফিজ।

বাবা – আরে না না, সত্য উদ্ঘাটন আমার পেশা অবশ্যই, তবে পেশার থেকেও বেশি, ওটা আমার নেশা। তাই ফিজ নিয়ে চিন্তা কখনোই করিনা আমি। ... যাইহোক , আমি একটু খতিয়েই দেখছি তাহলে , যখন তুমি পারমিশন দিয়েই দিয়েছ। ... ইনচার্জ অফিসার, মিস্টার সাঁতরা, আপনার আপত্তি নেই তো?

সাঁতরা যেন একটু আনমোনা ছিলেন। তাই একটু এদিক সেদিক করেই তড়িঘড়ি করে উত্তর দিলেন – না...না...না স্যার। ... স্যার যখন বলে দিয়েছেন, এরপর আমার আর কথাই থাকতে পারেনা।

বাবা আর কথা বাড়ালেন না। তবে সার্চ করার আগে , উনি মহিমা মিত্রের এসিস্ট্যান্ট , কাবেরি দেবীকে ডাকলেন।

কাবেরি দেবী – স্যার, আমি তেমন কিছুই জানিনা। তবে হ্যাঁ , মাড্যাম বেশ কিছুদিন ধরে খুব একটা আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। ... আর সেই কথাটা আমিই বাদল স্যারকে জানাই। তারপর উনি সাইক্রিয়াটিস্ট-এর সাথে যোগাযোগ করেন।

বাবা – হুম, আপনি কতক্ষণ থাকতেন ম্যাডামের কাছে?

কাবেরি দেবী – স্যার, সকাল ৯টার মধ্যে চলে আসতাম। ... কিছু এপয়েন্টমেন্ট থাকলে , সেটার টাইম ঠিক করতাম, উনার সিডিউল অনুসারে, আর তারপর ব্যাঙ্কট্যাঙ্কের কাজ করতে যেতাম। সেখান থেকে ফিরে, উনার সিডিউল ম্যানেজ করতাম।

বাবা – উনার সাথে কোথাও যেতেন?

কাবেরি দেবী – হ্যাঁ স্যার। প্রায় সব জায়গাতেই যেতাম , যদি তিনি আলাদা করে বারং না করতেন। ... মানে শুটিং-এর সেটে যেতাম, নাটকের মঞ্চে যেতাম, এমনকি উনার যখন কেউ ইন্টার্ভিউ নিতে আসতেন, তখনও ক্যামেরার বাইরে থাকতাম।

বাবা – বাড়ি যেতেন কটায়?

কাবেরি দেবী – তেমন কনো ফিক্সড টাইম নেই স্যার। ... নর্মাল দিনে, ৮টার মধ্যে চলে যেতাম। আমিও যেতাম, আর আমার সাথে সাথে রান্নার মেয়েটাও যেত। রাত্রিটা উনি বাড়িতে কাউকে রাখতে চাইতেন না। একা থাকতেই পছন্দ করতেন। ... তবে আলে কালে , যখন শুটিং-এর সেট থেকে খুব রাত্রি করে ফিরতেন, তখন আমাকে আর একা একা বাড়ি ফিরতে দিতেন না। ... খুব কেয়ারিং ছিলেন স্যার। এতো ব্যস্ততার মধ্যেও আমার বলুন , সারাদিনের কাজের মেয়েটার কথা বলুন বা রান্নার মেয়েটার কথা বলুন , আমাদের পার্সোনাল লাইফের উপর খুঁটিনাটি বিশয়ে নজর রখতেন স্যার।

বাবা – সবসময়ের কাজের মেয়েও কি রাত্রে চলে যেতো? ...

কাবেরি দেবী - না স্যার, ওর সারভেন্ট কওয়ারটার আছে। ... ওখানেই ও থাকে।

বাবা – দাঁড়ান একটুখানি কাবেরি দেবী। ... আপনার থেকে অনেক কিছু জানার আছে মহিমাদেবী সম্বন্ধে। আপনার এসিস্ট ছাড়া , উনার লাইফ অ্যান্ড সিডিউল সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে সহজ ভাবে জানা অসম্ভব। ... তবে, আগে একটু সবসময়ের কাজের মেয়েটার সাথে কথা বলে নি। কি নাম ওর?

সামনে একটা অল্পবয়সী ছিপছিপে দেখতে মেয়ে এগিয়ে এলেন। নিজে থেকেই বললেন – মিষ্টি।

বাবা – বাড়ি কোথায়?

মিষ্টি – কুচবিহারে। সেখানে দিদি শুটিং-এ গেছিলেন। ... আমার উপর কিছু মরদ জোর খাটাচ্ছিল। সেই দেখে, ড্রাইভারকে নিয়ে দিদি ওদের দিকে এগিয়ে আস্তে , তারা দিদিকে দেখেই ভয়ে পালায়। ... আমি দিদিকে বলি আমার কেউ নেই। অন্যবস্তির মেয়েদের থেকে গায়ের রঙ ভালো বলে, আমাকে প্রায়ই কনো না কনো মরদ এমন তারা করে। সেই শুনে দিদি আমাকে সোজা গাড়িতে উঠিয়ে এখানে নিয়ে আসেন। ... উনি মানুষ ছিলেন না, দেবতা ছিলেন স্যার, দেবতা।

বাবা – হুম... তো তুমি কিছুদিন যাবত তোমার দিদিকে একটু চেঁচামেচি করতে দেখছিলে কি?

মিষ্টি – হ্যাঁ দাদাবাবু। রাত্রের দিক হলেই চেঁচাতেন। এমনি দিদি অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের। কারুর উপর রেগে না রেগে গেলে, উনি কখনোই চেঁচান না। ... প্রথম দিকে আমি ভাবতাম, কারুর উপর রেগে গেছেন তিনি। ... কিন্তু এই চারপাঁচ দিন আগে , সেই চিৎকার খুব ভয়ানক লাগে। ... আমি ঘুমিয়ে পরেছিলাম। ঘুম ভেঙে যায় সেই চিৎকারে। ... কিন্তু সেই চিন্তকার শুনে কেমন যেন মনে হয় , দিদি ভয় পাচ্ছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে দিদির কাছে ছুটে আসি।

বাবা – হুম, তারপর কি দেখলে?

মিষ্টি – দাদাবাবু, দেখলাম, ওই, ওই রাস্তার দিকের জানলার নিচের দেওয়ালে দিদি গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছেন। ... আমি দরজা খুলতেই , আমাকে দেখে, উঠে না দাঁড়িয়ে হামাগরি দেওয়ার মত হেঁটে এসে

আমাকে জরিয়ে ধরলেন। ... আমিও কিছু বুঝতে পাইনি। ... দিদিকে বেশ কিছুবার জিজ্ঞেস করলাম , কি হয়েছে দিদি... দিদি কেবলই দেওয়ালের দিকে হাত দেখালেন, আর কিছুই বলতে পারলেন না। বড্ড ভয় পেয়েছিলেন, সেই জন্যই বোধহয়, কথা বলতে পারছিলেন না।

বাবা – আর তুমি কি করলে?

মিষ্টি – তাড়াতাড়ি ফ্রিজে দুধ রাখাছিল। একগ্লাস দুধ গরম করে এনে দিদিকে খাওয়ালাম। ... দিদি দেখলাম দুধ খেয়ে শান্তি পেয়ে ঘুমিয়ে পরলেন।

বাবা – পরের দিন এই বিশয়ে প্রশ্ন করো নি?

মিষ্টি – না দাদাবাবু, দেখলাম উনি দিব্যি রয়েছেন, তাই আর উনাকে সেই কথা মনে করিয়ে দিই নি। ... তবে হ্যাঁ, আমি কাবেরিদিকে কথাখানা বলেছিলাম।

বাবা এবার কাবেরি দেবীর দিকে তাকিয়ে – তারপরেই কি আপনি বাদলের সাথে যোগাযোগ করেন?

কাবেরিদেবী – হ্যাঁ, মিষ্টি বলার পরেপরেই।

বাবা এবার মিষ্টির দিকে তাকিয়ে – যেই দেওয়ালের দিকে তোমার দিদি দেখাচ্ছিলেন , সেই দেওয়ালে কিছু দেখেছিলে?

মিষ্টি – না দাদাবাবু, সেখানে তো কিছুই নেই। ... একটা বড় ছবি ছিল। সেটাও তো দিদি সরিয়ে দিয়েছিলেন, এই দু সপ্তাহ আগে।

বাবা – হুম... আচ্ছা, কাল রাত্রে কনো তেমন আওয়াজ পাওনি?

মিষ্টি – হ্যাঁ পেয়েছিলাম। তবে একবার সেই চিৎকার শোনার পরেই চুপ হয়ে যায় , কনো সাড়াশব্দ নেই। তাই ঘুমিয়ে পরি। ...

বাবা – কি হতে পারে, এই চিৎকারের কারণ, ধারণা আছে?

মিষ্টি – দিদি টিকটিকি খুব ভয় পেতেন। আর টিকটিকি দেখে খুব চেঁচাতেন। ... দিদির ঘরে পরশু একটা টিকটিকি দেখেছিলাম। দিদিকে বলিনি , কিন্তু কাল যখন দিদি স্নানে গেছিলেন , তখন তাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। ... আমি ভেবেছিলাম , সেই টিকটিকি দেখেই দিদি চিৎকার করে ওঠেন। তারপর চেঁচানি শুনে টিকটিকি ভয় পেয়ে চলে যায়, তাই দিদিও শান্ত হয়ে যান।

বাবা – হুম, ঠিক আছে তুমি এসো এখন। কিছু মনে পরলে , কাবেরিদির কাছে আমার নম্বর থাকবে , আমাকে ফোন করে দেবে। আর আমার যদি কিছু আর জানার থাকে , আমি তোমাকে এসে জিজ্ঞেস করে নেব।

বাবা এবার কাবেরিদেবীকে বললেন – আপনার পরিবারে কে আছে?

কাবেরিদেবী – আমি আর আমার ছোট একটা ছেলে। স্বামী ডিভোর্স দিয়েদিয়েছেন।... ম্যাডামের এই সাপ্তাহ খানেক ধরে দেখছিলাম , রাত্রি হলেই , কেমন যেন একটু বেশি মদ্যপান করছেন। বুঝতে পারছিলাম, কনো টেনশনে রয়েছেন। তাই বলেছিলাম, আমি এসে কদিন থেকে যাবো ? ... ছেলেকে ওর দাদুদিদার কাছে কদিন রেখে দেব ? ... দিদি বললেন, না তোর ছেলের এখন ক্লাস ওয়ানে এডমিশনের চেষ্টা করছিস। এই সময়ে মাকে কাছে পাওয়া বাচ্চার খুব প্রয়োজন। তুই বাড়ি যা।

বাবা – হুম, ঠিক কবে থেকে এই টেনশন দেখতে পাচ্ছিলেন, বলতে পারবেন?

কাবেরিদেবী – দিন ১০ কি ১২ হবে, তার বেশি নয়।

বাবা – কনো আন্দাজ, সেই টেনশনের কারণ কি হতে পারে?

কাবেরিদেবী – সিন্দিয়া গ্রুপের সাথে একটা ঝামেলা চলছিল, বেশ কিছুদিন ধরেই। ... একটা প্রোজেক্টে, ওরা সুনন্দা রায়কে অভিনেত্রী করে নিয়েছিলেন। আর মধ্যে থেকে উনারা ম্যাডামকে নিতে চাইছিলেন। ... ম্যাডাম এতে আপত্তি করেন। উনি বলেন , উনি একজন স্টার। একজন স্টার কখনোই কনো অভিনয়ে মাঝখান থেকে ঢুকতে পারেন না , অন্য একজনকে রিপ্লেস করে। ... ম্যাডাম এমনও বলেছিলেন যে আপনার স্ক্রিপ্টরাইটারকে নতুন করে গল্প সাজাতে বলুন। ... আমি একটা অন্য চরিত্রে ঢুকে , আস্তে আস্তে মুখ্য চরিত্র হয়ে যাবো। ... নির্দেশক ভাস্কর মজুমদার রাজিও ছিলেন তাতে , কিন্তু গুলশান সিন্দিয়া, মানে সিন্দিয়া গ্রুপের মালিক এতে ম্যাডামকে বলতে থাকেন যে উনি আর কনো প্রযোজনায় ম্যাডামকে নেবেন না। ... সেই নিয়ে একটা টেনশন চলছিল। ...

বাবা – আর সুনন্দা রায়-এর এই বিশয়ে কি মতামত ছিল?

কাবেরিদেবী – উনি ম্যাডামকে ফোন করে শাসিয়েছিলেন। ম্যাডাম উনাকে যদিও বুঝিয়েছিলেন যে , উনি এমন মাঝখান থেকে কিছুতেই করবেন না সেই চরিত্র। উনি বলেছেন স্ক্রিপ্ট পালটাতে , যদি পালটায়, তবেই করবেন। ... তাতে মনে হয় সুনন্দা রায় শান্ত হয়েছিলেন।

বাবা – হুম, আর কনো টেনশন-এর কারণ কি ছিল ম্যাডামের?

কাবেরিদেবী – না, আর তো কনো তেমন কিছু ঘটেনি , আর যদি ঘটেও, তাহলে সেটা অভিনয়ের সাথে জড়িত নয়। ... উনি ব্যক্তিগত ভাবে বন্ধুদের সাথে মিশতেন বা ঘুরতে যেতেন, সেগুলি আমাকে জানাতেন না। ... আমাকে শুধুই প্রফেশন রিলেটেড ব্যাপারগুলিই জানাতেন , এপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করাতেন, অনেক ক্ষেত্রে ফোনে কথাও আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতেন। তবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শুধুই ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা রেখে আসা ব্যাস।

বাবা – উনার খুব কাছের বন্ধু বলে কেউ ছিলেন?

কাবেরিদেবী – দেবজিত সুর, মানে সুরদা; সুদেশ্না হালদার; আর ববি মানে মীনাক্ষী বাজপেয়ী। ইনারা উনার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দিদি মদ্যপান করলেও, বাড়ির বাইরে করতেন না, এমনকি কনো পার্টিতে গিয়েও নয়। তাই ইনারা তিনজন মাসে প্রায় দুই থেকে তিনদিন একসাথে এখানেই গেটটুগেদার করতেন, একটা ছোট মদ্যপানের পার্টির মত করে । ... সেদিন আমাকেও থাকতে হতো , কারণ দিদি চার পেকের বেশি খেলেই, আর নড়তে পারতেন না ; তখন আমি আর মিষ্টি উনাকে শুইয়ে দিতাম , আর ববি, সুরদা আর সুদেশ্নাদিকে গাড়িতে তুলে আসতাম।

বাবা – আর কনো নেশা করতেন মহিমাদি?

কাবেরিদেবী – না সিগারেট খেতেন আর একসঙ্গে হলে মদ্যপান । ... তবে ইদানীং, এই ৭ দিন হলো দিদি রোজ মদ্যপান করছিলেন, একাএকা।

বাবা – এই প্রথমবার?

কাবেরিদেবী – না, আগে নিয়ম করে খেতেন। মিষ্টি উনার হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করার পর , উনি বন্ধ করে দেন নিয়মিত খাওয়া। ... আসলে , মিষ্টিকে উনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমাকে আর আমার ছেলেকেও করতেন, আর করতেন উনার ভাইকে।

বাবা – ঠিক আছে, বাদল, একটা কাজ করো। এখানে তো আশা করা যায় , আজকে সকলেই আছেন। গুলশান সিন্দিয়া, সুনন্দা রায়, ববি, সুদেষ্ণা আর সুরকে নিজেদের সমস্ত সিডিউল ক্যান্সেল করে থাকতে বলো। ... আমি, তুমি আর সাঁতরা মিলে ওদেরকে একটু জেরা করে নেব। ... এদেরকে অপেক্ষা করাও , আমি একটু বাড়িটার তল্লাসি নিয়ে আসি আমার এসিস্ট্যান্টকে নিয়ে , চল মিলি। আমি বাবার সাথে এবার বাড়ির বিভিন্ন ঘরে যেতে থাকলাম, বাবা সঙ্গে নিলেন কাবেরি আর মিষ্টিকে।

জেরাপর্ব

বাড়ির প্রথম যেই জায়গায় বাবা গেলেন , তা হলো মহিমা মিত্রের ট্রফি কালেকশনের ঘর। ট্রফি , মেডেল এবং বিভিন্ন কৃতিত্ব অর্জনের ছবিতে ঘরটি ঠাঁসা। বাবা মিষ্টিকে প্রশ্ন করলেন – দিদি কি ডায়রি লিখতেন, মানে কিছু লেখা ঝোঁকা করতেন।

মিষ্টি প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না , উত্তর এলো কাবেরির থেকে। উনি বললেন – দিদির সাথে পাঠ্যের একটিই সম্পর্ক থাকতো , আর তা হলো উনার স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করা। এছাড়া বইখাতার সাথে দিদির কনো সম্পর্কই থাকতো না।

বাবা বিভিন্ন বইখাতা পালটে পালটে দেখতে থাকলেন। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু এল্ব্যামও ছিল, তাতে প্রচুর ছবি। বেশীর ভাগ ছবিই ভ্রমণের ছবি। সিঙ্গিল ছবি , বা ছবিতে ববি, সুদেষ্ণা আর সুরের ছবি , এই ছিল এল্ব্যামগুলিতে।

বাবা প্রশ্ন করলেন – মহিমাদেবী ভ্রমণে খুব রুচি রাখতেন?

কামিনীদেবী – খুব একটা নয় , তবে বছরে একবার অন্তত একটা বন্ধুদের সাথে , মানে সুর, ববি আর সুদেষ্ণার সাথে ট্যুরে যেতেন। ... এই তো দিন ১৫ আগেও তো মধ্যপ্রদেশে ঘুরতে গেছিলেন।

বাবা – হুম, এই ছবিগুলো না (কিছু ছবি এল্ব্যামে দেখিয়ে) ... একদমই রিসেন্ট ছবিগুলো।

মিষ্টি – হ্যাঁ দাদাবাবু, খুব আনন্দ করে এসেছিলেন। আমার আর কাবেরিদির জন্য একটা করে শাড়ী আর কাবেরিদির ছেলের জন্য একটা খেলনা কিনে আনেন। ... দিদি এসে বলেছিলেন, কাবেরিদির ছেলে এবার ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়ে গেলে , আমাদের দুইজন আর কাবেরিদের ছেলেকে নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে একটা পাহারের দেশে ঘুরতে নিয়ে যাবেন।

বাবা একটি কথাও বললেন না। শুধু উনার চোখ ঘুরতে থাকছিলো। বসার ঘর , সাজের ঘর, নাচের ঘর, সব ঘুরে এসে, যেই ঘরে মহিমাদেবীর লাশ ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করলেন বাবা। বাবা যাদেরকে জেরা করবেন বলে একসঙ্গে করতে বলেছিলেন , তাদেরকে বসার ঘরে একত্রিত করা হয়ে গেছে। ... বাবার আবার জেরা করার ধরন অন্যরকম। বাবা একজন একজন করে জেরা করেন না। সকলকে একসঙ্গে বসিয়ে জেরা করেন।

বাবার এই ধারাকে দেখে প্রশ্ন করতে , বাবা বলেছিলেন, একসঙ্গে বসালে কি হয় জানিস! কেউ যখন মিথ্যে বলেন, তখন সেই কথাকে মিথ্যে বলে যারা যারা জানেন , তাঁদের মুখচোখের ধারা পালটে যায় , কারণ তাঁদেরকেও তো এবার সেই একই মিথ্যে বলতে হবে , আর তাঁরা মনে মনে যা বলবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন, সেটা পালটে ফেলতে হয়। ...

এখানেও তাই করলেন বাবা। গুলশান সিন্দিয়া, সুনন্দা রায়, ববি, সুদেশ্না আর সুর একসঙ্গে বসেছিলেন। তাদের মধ্যে বাবা, বাদলস্যারকে, ইন্সপেক্টর সাঁতরাকে, মিষ্টি আর কামিনীদেবীকে নিয়ে একত্রে বসলেন। এমন ভাবেই বসলেন যাতে সকলে সকলের মুখ দেখতে পারেন , আর বাবাও সকলের মুখ দেখতে পারেন।

কথা শুরু করলেন বাবাই। আর সেটা শুরু করলেন গুলশন সিন্দিয়াকে দিয়ে। বাবা বললেন – আপনি তো মহিমাদেবীকে হুমকি দিয়েছিলেন, অন্য কনো কাজ দেবেন না বলে। কথাটা কি সত্যি?

সিন্দিয়া একটু গলা খাকরে বললেন – হ্যাঁ, উনি স্টার ছিলেন, কিন্তু স্টার বলে সমস্ত আবদার তো পুড়ন করা যায়না। ... আমাকে আমার ব্যবসার চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ উনার স্টারডম নিয়ে উনি চিন্তা করবেন , আর আমাকেও সেটা দেখতে হবে, কিন্তু নিজের ব্যবসার লস্ করে নিশ্চয়ই নয়।

বাবা – থ্রেটনিং দেবার সময়ে শুধুই কি আর কাজ দেবেন না বলেছিলেন , না তার সাথে খুনের হুমকিও ছিল?

সিন্দিয়া – ডা ডগ ড্যাট বারক্স, ওন্ট বাইট। যে খুনের হুমকি দেয়, সে খুন করেনা মিস্টার সিন। যে খুন করে, সে খুন করে দেয়, হুমকি দিয়ে খাল কেটে কুমির আনেনা। ... এজ এ বিজনেস ম্যান , আমাকেও কিছু গুণ্ডা পুষতে হয়, তাই যদি খুন করতেই হত, তবে কি খুনের হুমকি দিতাম! ... বাট না, আমি না তো এমন আওয়াজ মেরেছিলাম, আর না খুন করেছি বা করিয়েছি। ... মোরওভার, মহিমা ওয়াজ আ হার্মলেস লেডি। ...

কথাটা যখন সিন্দিয়া বলছিলেন, তখন সুনন্দা রায়কে একটু অস্থির লাগছিল। বাবা তাই উনাকে বললেন – আপনি তো খুনের হুমকি দিয়ে দিয়েছিলেন, তাই না সুনন্দা দেবী?

সুনন্দা দেবী একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন – হট অফ ডা মোমেন্টে মুখ থেকে এমন অনেক কথাই বেরিয়ে যায়, তার মানে কি আমি খুন করে দেব মহিমাকে। ... দেখুন বিজয়, মহিমা আর আমি অনেকদিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে একসঙ্গে কাজ করছি। হ্যাঁ, ও নাটক করে, তাই আমার থেকে অনেক বেটার এক্ট্রেস। রূপ বা নাচেও আমার থেকে ভালো। বাট আমার আর ওর ইম্প্রেশনটা আলাদা। ... আমি একজন হট এক্ট্রেস আর মহিমা একজন সেলিব্রিটি।

বাবা – তাহলে আপনার পথের কাঁটা ছিলেন উনি, তাই তো?

সুনন্দাদেবী – একদমই নয়। ওর আর আমার ফিল্ডটাই আলাদা। ... মহিমা আজ নেই , তাতে আমার স্ট্রাগেল একদমই কমবে না। ... আমার স্ট্রাগেল হট এক্ট্রেসদের সাথে , মানে জুহিন, সামিনা আর বনির সাথে। ... আর মহিমার কম্পিটিশন ছিল নয়না , লাবনির সাথে। ... কিন্তু হ্যাঁ , আমার জন্য হাটেহাড়ি সিরিয়াল ফ্লপ খাচ্ছিল, তাই সিন্দিয়াজি আমার জায়গায় মহিমাকে নিতে চেয়েছিল । ... আমি তাতে খুব আপ্সেট হয়ে গেছিলাম, কারণ সেটা আমার কেরিয়ারে খুব বাজে ইমপ্যাক্ট ফেলতো। ... এই যে সুমনার মত টপ রিপোর্টাররা আছে, ওরা আমাকে ছেড়ে দিতো, আমার এই ফেলিওর দেখিয়ে আমার তুলোধোনা করতো না।

বাবা – কিন্তু মহিমাদেবীর এতে কি কনো হাত ছিল?

সুনন্দাদেবী – না ছিল না বলেই তো উনার উপর চাপ সৃষ্টি করি। ... উনি যদি না করেন রোলটা , তাহলে আমাকেও সরানো হবে না। ... কারণ সিন্দিয়াজিকে বলে কনো লাভ নেই। আমি উনাকে চিনি। উনি যদি একবার কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তারপর কিছুতেই সরেন না সেখান থেকে।

বাবা – আর সেই কথোপকথনেই আপনি উত্তেজিত হয়ে যান?

সুনন্দাদেবী – মহিমাদি আমার থেকে সিনিয়ার। আর আমি নিজে উনার একজন ভক্ত। তাই আমি কি করে উনাকে এই সমস্ত কথা বলবো , কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। ... একদিন রিকুয়েস্ট করেছিলাম , উনি আমার কথাকে এড়িয়ে যান। ... তাই আমাকে একদিন রেগেমেগে কিছু বলতেই হতো। সেই কারণে আমি একদিন ফুল ড্রিঙ্ক করে , উনাকে কল করি , আর খুব অভদ্র ভাবে কথা বলি। ... পরে একদিন এসেওছিলাম দিদির কাছে। ... কারণ আমি জানতাম আমি নিশ্চয় মাত্রাতিরিক্ত বাজে ব্যবহার করেছি।

বাবা এবার কাবেরির দিকে তাকাতে , কাবেরি চোখের ইশারায় বলে দিলেন কথাটা সত্যি। বাবা আবার বললেন – সুরাহা হলো না, পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায়। ...

সুনন্দাদেবী – মহিমাদি এতটা ইমসানাল আমি জানতাম না। ... আমি ক্ষমা চাইতে উনি কান্নায় ভেঙে পরলেন, আর বললেন আমার থেকে এমন ব্যবহার উনি কিছুতেই ভাবতে পারছেন না। ... আমি উনার হাতেপায়ে ধরি, সমস্ত কথা বলি যে ড্রিঙ্ক করেছিলাম যাতে রুড বিহেভ করতে পারি। কিন্তু তারপরেও উনি শুনছিলেন না। আমি তারপর হটটেম্পারড় হয়ে গিয়ে কিছু গালাগালিও দিয়ে দিই , আর বলি ইচ্ছা করছে সত্যি সত্যিই তোমাকে খুন করে ফেলতে। ... এক তো আমি নিজের জ্বালায় জ্বলেপুরে মরছি , তারপর তুমি আমাকে সমানে গিলটি ফিল করাচ্ছ। ... শেষে রেগে মেগে বলি, বোঝো তুমি, যার ফ্যান তুমি, তাকে কটুকথা বলতে কিরকম লাগে! ... ইরিটেটিং। ... এই বলে আমি বেরিয়ে যাই। ... বাইরে গাড়িতে উঠে যখন গেটের বাইরে যাচ্ছিলাম , তখন মহিমাদির চেঁচানো শুনেছিলাম। তারস্বরে উনি কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাচ্ছিলেন, আমি শুনে খুব ডিপ্রেসড় হয়ে যাই। আর মনে মনে একটা দ্বন্ধে ফেঁসে যাই যে , কি ভাবে দিদিকে আবার মুখ দেখাবো। ... আই গট ইনটু আ টোটাল ট্রমা। ... ডিসগাস্টিং হয়ে উঠেছে লাইফ আমার।

বাবা – সেই ডিসগাস্টিং অবস্থা থেকে বেরনোর জন্য মহিমাদেবীর উপর মানসিক চাপ বৃদ্ধি করা নয় তো?

সুনন্দাদেবী – কি বলছেন আপনি? আপনি জানেন, আমি যখন স্টার হইনি , তখন একমাস রোজ আমি দিদির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম , একবার দিদিকে ছোঁবো বলে! ... আমি সিনেমা করার পরেও , মাঝে মাঝে দিদির কাছে আসতাম , শুধুই দিদির নরম হাতগুলো একবার ছোঁবো বলে। ... আই এম আ হিউজ ফ্যান অফ হার। ... শি ঈশ মাই লাইফস্ ওনলি লাভ।

কথাগুলো বলার সময়ে সুনন্দার চোখ ভরে এলো। বাবা অভিনেত্রীদের চোখের জলে ভিজবেন না জানি। উনারা যখন তখন চোখে জল নিয়ে আস্তে পারেন। তাই বললেন – কারুকে সাস্পেক্ট হয়?

সুনন্দাদেবী – হ্যাঁ এই সিন্দিয়াকে। ... সিন্দিয়া যে বলছে, আর কনো সিনেমাতে উনি দিদিকে নেবেন না। উনাকে প্রশ্ন করুন তো , কটা মুভিতে দিদিকে উনি নিয়েছেন ? ... আরে কি নেবেন উনি ? সিনেমার কি বোঝেন উনি? উনি নিজের ব্যবসা বোঝেন খালি। ... উনি কমার্শিয়াল মুভি বানান খালি , আর দিদি! ... দিদি ক্লাসিক মুভি করতেন। ... বুঝতে পারছেন, আর বাংলা মুভিজের সেই গোল্ডেন টাইম নেই, তারপরও দিদি ভারতরত্ন পেয়েছেন, নিজের অভিনয় দিয়ে।

সিন্দিয়া গর্জিয়ে উঠলেন – আপ কেহেনা কেয়া চাতি হে? মেইনে মহিমাজি কি কাতিল কিয়া!

সুনন্দাদেবীও গর্জে উঠলেন – হ্যাঁ, ওর নেইতো কেয়া? ... যেই মহিমা মিত্র কনোদিন কমার্শিয়াল মুভিই করেন না, তিনি কমার্শিয়াল মামাসিদের খোরাক সিরিয়াল করবেন ? ... কি করে ভাবতে পারেন আপনি! ... আসলে, আপনি মহিমাদির কেরিয়ারকে নষ্ট করতে চাইছিলেন। ... উনার সাক্সেস আর ফেমের উপর আপনার কম নজর তো নেই। ... এই ফেমের কারণেই তো আপনি উনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাই না! ... শেষে যখন দেখলেন সেই সাক্সেস আর ফেমের শেয়ার উনি আপনাকে দেবেন না , তখন উনাকেই রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। ... প্রতিটি বিগ-বাজেটের সিনেমা করেন , আর সেই সময়ে দিদির একটা কম-বাজেটের সিনেমা বক্স অফিস কাঁপিয়ে দিয়ে আপনার লস্ করে চলে যায়। ... রাগ তো আপনার থাকবেই, তাই না!

সিন্দিয়া – হোয়াট ননসেন্স, আপনাকে সিরিয়াল থেকে সরিয়ে দিয়েছি বলে, এই ভাবে আমার উপর বদলা নেবেন! আমিও সিন্দিয়া, দেখবো আপনাকে কে কাজ দেয়! আপনার কেরিয়ার আমি শেষ করে দেব!

প্রখ্যাত অভিনেতা সুর এবার বললেন – আঃ! কি হচ্ছেটাকি। এমন সময়ে সকলেরই মাথা একটু আধটু খারাপ হয়ে আছে। সিন্দিয়াজি, এই সময়ে এই ভাবে রিয়েক্ট করবেন না।

সিন্দিয়া – আমি বিজনেস ম্যান আছি। আমি মুখে শুধু বলতে পারিনা যে খুন করে দেব। প্র্যাক্টিকালিও করতে পারি।

এবার বাদল স্যার একটু উত্তেজিত হয়ে গিয়ে বললেন – আর সেই কথাটা আপনি সিয়াইডি অফিসারের সামনে বলছেন, সেটা কি জন্য! নিজের বিপদ বাড়াবার জন্য!

সিন্দিয়া – হাম দিখা দেঙ্গে হাম কেয়া কার শাকতে হে। ... দিখা দেঙ্গে হাম!

এই কথা বলে কারুর দিকে না তাকিয়ে সরাসরি উঠে চলে গেলেন সিন্দিয়াজি। রাগে গোমরালেও , উঠে গেলেন না সুনন্দা। তবে রাগে উনার ধবধবে ফরসা মুখ পুরো লাল হয়ে গেল।

বাবা পরিস্থিতিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবার সুরকে বললেন – তাহলে, লাস্ট ট্রিপে আপনারা খুব আনন্দ করেছেন, তাই তো?

সুর একটু অস্থির হয়েছিলেন, এই সমস্ত বাক্যালাপের কারণে। এবার একটু সিরিয়াস হয়ে বসে বললেন – হ্যাঁ, বছরে একটা করে এমন ট্রিপ হতো। ... উদ্যোক্তা আমরা হলেও , উত্তেজনা বা স্পিরিট আমাদের যোগাতো মহিমাই। ... সেই যখন রইলো না, আর আমাদের ট্রিপ হবে কিনা, সেটাই এখন আনসারটেন।

বাবা – তো মধ্যপ্রদেশে কি নতুন কনো লোকেশন করেছে, যেখানে হন্টেড ব্যাপার স্যাপার রেখেছে।

বাবার এ কথাটা শুনে , সুদেষ্ণা, ববি আর সুর , তিনজনেই কেমন যেন একটা ভুত দেখার মত তাকালো বাবার দিকে। বাবা ব্যাপারটাকে একটু হাল্কা করে দেবার জন্য বললেন – না অনেক আপনাদের বেড়াতে যাবার ছবি দেখছিলাম তো। তাই বললাম। ... এনি ওয়েজ , আপনারা শুনলাম রাত পর্যন্ত পার্টি করতেন , এখানে এসে।

সুর – আসলে মহিমা বাইরে ড্রিঙ্ক করতো না। আর আমরা চারজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ... তাই অন্য সবদিন আমরা তিনজন পার্টি করলেও , মাসে একটা দিন মহিমার কাছে এসেই পার্টি করতাম। ... তবে এই ব্যাপারটা ওই আমাদেরকে করতে বলে।

ববি মাঝখান থেকে বললেন – কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত তো আমরা এখানে পার্টি করতাম না। ... এই ১০টা ১১টার মধ্যেই মহিমা লাট খেয়ে যেত। তারপর আমরা চলে যেতাম।

বাবা – কোথায় যেতেন? নিজের নিজের বাড়ি নাকি , বাকি থেকে যাওয়া পার্টিটা সম্পূর্ণ করতে অন্য কোথাও?

ববি একটু আমতা আমতা করছিলেন বাবার প্রশ্নের উত্তর দিতে। তাই সুর মাঝখান থেকে বললেন – মাঝে মাঝে আমরা আমাদেরই কারুর বাড়িতে পার্টিটা কমপ্লিট করতে যেতাম ঠিকই, তবে রোজ নয়। ... আসলে যেদিন ঠিক করে ট্রিপটা হতো না, সেদিনই।

সুদেষ্ণা – আসলে কি বলুন তো, আমাদের প্রচুর চাপে কাজ করতে হয়। ... সারাদিনে ২০-২৫ জন এসে বলছেন ম্যাডাম একটা কাজ দিন না। তাদের মধ্যে আবার ৩-৪ জন আমাদের সেক্রেটারিদের কাছে হুমকিও দিয়ে যেত, তো কেউ কেউ সেক্রেটারিকে পয়সাও খাইয়ে যায়, আমাদেরকে কনভিন্স করানোর জন্য। ... তার সাথে ডিরাক্টারের বকাবকি তো থাকতোই, যদিও সুরদা আর মহিমার সেইসব গল্প থাকতো না। সুরদা তো দ্বিতীয় টেক নিতই না, আর মহিমা সুদক্ষ অভিনেত্রী, ওকে নিতে হতো না।

ববি যোগ দিলো কথাতে – এছাড়াও ফ্যানদের আবদার, মাচা করতে যাবার আব্দার, আর প্রডিউসারদের প্রমোশন তো লেগেই থাকে। ... অত্যন্ত হেক্টিক শিডিউল আমাদের বুঝলেন তো। ... সারাদিনে কম সে কম, ৩০-৪০জন চেনা মুখের সাথে কথাবার্তা, আর ৫০-৬০জন অপরিচিতের সাথে কথা। তাছাড়া মেকআপ টেকআপের, জিম-টিমের, আর রিহার্সালের গল্প তো লেগেই থাকে।

সুর কথার সমাপ্তি করলো এবার – আর সেই কারণেই আমাদের সহজে ঘুম আসেনা বুঝলেন তো। শান্ত হয়ে বসলেই, হাজার একটা চিন্তা, দশদিক থেকে চেপে ধরে। তাই একটু ভালো মত ড্রিঙ্কস করে, ঘুম আনতে হয়। ডিল করার থাকলে, পাব-টাবে গিয়ে ড্রিঙ্কস, নাহলে এই একে অপরের বাড়িতে বসে।

মাঝে ফোড়ন কাটলেন সুনন্দা। তিনি বললেন – দিদি তো নিজের বাড়িতেই ড্রিঙ্ক করতেন!

সুদেষ্ণা – ওর ব্যাপারটাই অন্যরকম ছিল। ও ড্রিঙ্ক করে, অভিনয় করা চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে নিতো। ... মানে ও আমাদের মত রিল্যাক্স হবার জন্য আমাদের সাথেই খালি ড্রিঙ্ক করতো, তাছাড়া ও নিজের অভিনয়কে ঠিক করে করার জন্যই ড্রিঙ্ক করতো।

ববি – নন্দা, দিদি একটা অন্য জাত ছিল, জানিস তো তুই। ... উনি অভিনয় ছাড়া কনো কিছু নিয়ে মাথাই ঘামাতেন না। (বাবার দিকে তাকিয়ে) আমরা যখন একসাথে ড্রিঙ্ক করতাম বা ট্রিপে যেতাম, জানেন বেশীর ভাগ সময়ে, মহি বিভিন্ন এক্সপ্রেশনের পিছনে থাকা ইমোশনগুলো দেখাতো। আর আমরা অবাক হয়ে দেখতাম।

সুর – অবাক হয়ে ওরা দেখতো না। অবাক হয়ে দেখতাম আমি। ... ওরা তো পয়সা রোজগারের জন্য অভিনয় করে। আমি একটু চেষ্টা করতাম অভিনয়তা প্যাসানেট ভাবে করার জন্য। আর যখন মহিকে দেখতাম, তখন অবাক হয়ে যেতাম যে , অভিনয়ও কতবড় বিজ্ঞান। ... হ্যাঁ , মহি আমাদেরকে একটা এক্সপ্রেশন দেখাতো, তার পিছনে থাকা ইমোশনকে এক্সপ্লেন করতো , আর আমাদেরকে বোঝাতো যে কখন কখন সেই ইমশন জাগে। ... আমরা তো অবাক হয়ে মাঝে মাঝে বলতাম , অভিনয় করতে গেলে কি সাইক্রিয়াটিস্ট হতে হয় নাকি!

সুনন্দা – দিদি একজন জিনিয়াস ছিলেন। হয়তো অভিনয় জগতে শেষ জিনিয়াস , কারণ আমাদের জেনারেশনের কেউই উনার মত জানপ্রান দিয়ে অভিনয় করেনা।

বাবা – তা আপনাদের কি মদ্যপানেই সারাদিনের ক্লান্তি মিটতো, নাকি অন্য কিছুও লাগতো?

সুর বললেন – সখে যেতাম হুঁকা পাবে। ... নেশা নেই।

বাবা – ওকে, আপনাদের কন্ট্যাক্ট নম্বরটা আমাকে দিয়ে রাখুন। যদি কিছু জানার হয় , কল করে নেব। এপায়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনাদের সময় নষ্ট করবো না।

সুনন্দা – নম্বর নিয়ে নিন , কলে আপনি আমাদের পাবেন না । ... একটা মেসেজ দিয়ে রাখবেন হোয়াটসঅ্যাপে। আমরাই আপনাকে কলব্যাক করে নেব।

বাবা সকলের নম্বর নিচ্ছিলেন , এমন সময় সুমনাপিসি সুরকে প্রশ্ন করলেন – আচ্ছা সুর , মহিমাদি তোমাদের তিনজনের উপর এই মধ্যপ্রদেশ ট্রিপ থেকে এসে খেপে গেলেন কেন ? ওখানে কিছু হয়েছিল নাকি? ... না আসলে যেদিন দিদি ওখান থেকে ফেরেন , সেদিনই আমি দিদির সাথে একবার ফোনে কথা বলি, ওই হাটেহাড়ি সিরিয়ালে উনার যুক্ত হবার ব্যাপারে একটা ইন্টার্ভিউ চাইছিলাম। ... উনি সরাসরি বলে দিলেন, সুমনা, দুদিন পরে ফোন কর আমার মাথাটা না একদম ঠিক নেই।

সুর – আরে না না , ও তেমন কিছু নয়। সুমনা তুমি তো জানোই মহি খাবার ব্যাপারে কতটা রিডিকিউলাস। ... আমাদের ঠিক ছিল যে নেতাজি সুভাষে ল্যান্ড করে , আমরা জমিয়ে চিনারপার্ক আরসেলানে খেয়ে বাড়ি ফিরবো। ... তা ববিরও একটা কল এসে যায় , আর আমারও। সেই জন্য খাওয়াটা কেন্সেল হয়ে গেছিল। সেই রাগ ওর আমার আর ববির উপর তিন-চারদিন ছিল। তারপর শেষে তো আমি ওর বাড়িতে এসে , ওকে বললাম, এতো রাগ থাকলে , শরীর ডিটারিওট করবে। তখন ও

আমাকে বলল, এই রাগ কি করে হ্যান্ডেল করা যায় বলো তো। তাই আমি বললাম বাস্তু মতে , পুব দেওয়ালে ছবি টাঙাতে নেই। ... সেই জন্য ও ওর ঘরের দিওয়াল থেকে ছবিটা খুলে নিলো।

সুমনাপিসি হেসে চুপ করে গেল , বাবাও আর কথা বাড়ালেন না । ... এবার আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। মহিমাদির বডির পোস্ট মর্টাম হবে। তাই তজ্জরি চলছিল সেই উদ্দেশ্যে। আর সেই কারণে সাঁতরা সেখানে থেকে গেলেন আর বাদল স্যার আমাদেরকে , মানে বাবাকে আর সুমনাপিসিকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। আসলে এতো সেলিব্রিটির ভিড় যে , সুমনাপিসির গাড়িটা এই তল্লাটে রাখতেই পারা যায়নি। ... তাই বাদল স্যার আমাদেরকে একটু এগিয়ে দিতে আসছিলেন।

গড়মিল

আসলে বাদল স্যার একটু কেসটা নিয়ে বাবার সাথে ডিসকাস করতেই বোধহয় এগিয়ে আসছিলেন। তাই বেশ খানিকটা মহিমাদেবীর বাড়ি থেকে দূরে আস্তেই , বাদল স্যার বাবার উদ্দেশ্যে বললেন – কি বুঝলে বিজয়দা!

বাবা – এখনো কিছু বুঝিনি, শুধুই কিছু তথ্য নিয়ে বাড়ি ফিরছি। একটু তথ্যমন্থন করতে হবে। দেখি সুর , অসুর, মন্দার পর্বত, বাসুকি সবাইকে একসঙ্গে করি। তারপর যদি শ্রীহরি কচ্ছপ হয়ে আসেন , তবে মন্থন হয়ে অমৃত, হলাহল সব বেরিয়ে আসবে নিশ্চয়। ... তবে হ্যাঁ, ঠিক খুন তো এটা নয়, কিন্তু প্রেশার ক্রিয়েট করা হয়েছে একটা। ... কিন্তু কে প্রেশার ক্রিয়েট করেছে, আর প্রেশার ক্রিয়েট করার কারণই বা কি, সেটা এখনও শুধুই একটা হেঁয়ালি।

বাদল স্যার – ওই সিন্দিয়াকে আমার ভালো লাগলো না একদম।

বাবা – আসলে উনি প্রডিউসার, এক্টর তো নন যে নিজের কদর্য মূর্তিকে লুকিয়ে রাখতে জানেন। ... কিন্তু উনার এটিচিউড দেখে, সিদ্ধান্তে আসা সঠিক হবেনা। ... সিনেমা আর্টিস্টরা উনার কাছে এমপ্লয়ি , আর উনি তাদের বস্ , আর নির্দেশকরা হন ম্যানেজার। ... তাই এমপ্লয়ারের এমপ্লয়িদের উদ্দেশ্যে যেমন ব্যবহার হওয়ার কথা, উনার ব্যবহারও ঠিক সেইরকমই। ... তবে হ্যাঁ, লোকটা ডেঞ্জারাস।

বাদলস্যার – অভিনয়কে কেন্দ্র করেই এই প্রেশার বলতে চাইছো?

বাবা – অসম্ভব! ... কেরিয়ার নিয়ে রেষারেষি থাকে, গালাগালি বা হুমকি, এমনকি ঝামেলাও থাকে। বাট আল্টিমেটলি, ওসব দুইদিনের ঝঞ্ঝাট। আবার একটা সিনেমাতে একসঙ্গে কাজ হলে , সব ভুলে যায়। যেমন প্রাইভেট ফার্মে এমপ্লয়িদের মধ্যে রেষারেষি দেখনা , সেরকমই। সেটা চুরিচামারির লেভেলে গেলেও, খুনোখুনির লেভেলে কখনোই যায়না। ... অন্য কনো ব্যাপার আছে।... তবে হ্যাঁ, সিন্দিয়ার থেকে সাবধানে থাকতে হবে, ও কিন্তু মাথাগরমের লোক।

সুমনাপিসি – হ্যাঁ, খুব বাজে রেপুটেশন আছে উনার। এমনি লোক ভালো , কিন্তু উনার লেজে কেউ পা দিলে, উনি পুরো শিকারি কুকুর হয়ে যান। ... তবে উনার সুখ্যাতও প্রচুর , নিজে মদ্যপান করেন না, কিন্তু প্রতি মাসে সমস্ত এক্টরদের ডেকে এনে , দেদার মদ খাওয়ান। ... আর সিনেমালাইনে জানোতো , যে মদ খাওয়াবে, সেই শিকন্দর।

বাবা হেসে বললেন – হস্টেলের কালচার, তারমানে। যেই মদ খাওয়াবে, তার হয়ে সবাই কথা বলবে।

এই সমস্ত কথা বলছি আমরা, অমনি একটা লোহার রড আমাদের মধ্যে বাঁদিকে থাকা বাদলস্যারের দিকে ধেয়ে এলো। ... বাবা বাদল স্যারকে তাড়াতাড়ি আটকে না নিলে , নির্ঘাত বড় আঘাত পেতেন উনি। ... বাদলস্যার সেই দেখে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাদের বললেন, সিন্দিয়া নিজেকে বড় কেউকেটা মনে করে না, আজ ওকে দেখাচ্ছি, কে আসল কেউটে, ও না আমি।

বাবা – উত্তেজিত হয়ো না। হাতি শিকার করেনা, হাতির বাচ্চাকে কেউ শিকার করবে মনে করলে, হাতি দেখিয়ে দেয় যে সে বনের রাজা নয়, কিন্তু সে বনের ঋষি। রাজাকে আক্রমণ করলেও করতে পারো, কিন্তু ঋষিকে আক্রমণ করলে, ফল ভয়ানক হয়ে যাবে। ... যা হলো ভালোই হলো। এটা নাহলে , আমরা ভুল ট্র্যাকে হাঁটতাম। সিন্দিয়ার হিংস্রতা দেখে , আমরা ওকেই সন্দেহ করতাম , আর আসল আসামি পালিয়ে যেতো।

বাদলস্যার – তারমানে তুমি বলছো, সিন্দিয়ার এই ক্রাইমে কনো হাত নেই!

বাবা – না, নেই। ও যদি শিকারি হতো, তবে ও তোমায় নয়, আমায় আক্রমণ করতো। ... কিন্তু তোমায় আক্রমণ করে ও বুঝিয়ে দিলো যে, ও আসলে শিকারি নয়, ও নিজের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবে, এইটাই ওর সখ, আর ওর সখে কেউ হাত দিলে , ও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। ... শিকার যদি করার হতো , ও এমন আহত করার অস্ত্রও ছারতো না, সরাসরি মেরে ফেলার চিন্তা করতো।

বাদল স্যার কিছু বলতে যাবেন, বাবা তার কথা থামিয়ে দিয়েই বললেন – সুনন্দার উপরও এমন আক্রমণ হতে পারে। ... একমিনিট দাঁড়াও।

বাবা এবার পকেট থেকে ফোন বারকরে সুনন্দা দেবীকে ফোন লাগালেন। উনি ফোন তুলতে বললেন – সুনন্দাদেবী বিজয় বলছি। ...

ফোনের অন্যদিকের কথা – হ্যাঁ বলুন।

বাবা – আপনার এই আগামী সপ্তাহের প্রোগাম কি আছে?

সুনন্দাদেবী – তেমন কিছু নেই। ... শুধু দুটো সিনেমার শুটিং চলছে, সেটার সেটে যাওয়া আছে।

বাবা – আউটডোর!

সুনন্দাদেবী – না, স্টুডিওতে।

বাবা – পোস্টপোন করা যাবে?

সুনন্দাদেবী – কেন বলু... (ফোন মাটিতে পরে যাবার আওয়াজ)

ফোনে অস্পষ্ট ভাবে চিৎকার শোনা গেল – কি হলো কি?

অন্য কণ্ঠস্বর – ম্যাডাম, ব্রেকফেল হয়ে গেছে। ম্যাডাম কিছু করার নেই , স্পিড বেশি নেই। কনো ভাবে লর্ডসের মাঠ পৌছাতে হবে, তারপর মাঠে গাড়ি তুলে দিলে, ক্ষয়ক্ষতি কম হবে।

বাবা ফোন রেখে দিলেন। বাদলস্যার তাড়াতাড়ি গাড়ি বার করলেন। আমি, বাবা, সুমনাপিসি সকলে উঠে পরলাম গাড়িতে। আমাদের গাড়ি গোলপার্কের রাস্তার দিকে ছুটলো, তারপর যাদবপুর থানা হয়ে, বাঁদিকে আনোয়ার শাহতে আমাদের গাড়ি উঠলে প্রায় সাউথ সিটির কাছে সুনন্দাদেবীর গাড়িকে দেখতে পেলাম। ... উনার পিছনে পুলিশের গাড়িও ধাওয়া করেছে। স্বাভাবিক ; কতগুলো সিগনাল ভাঙতে হয়েছে , কে জানে!

আমাদের গাড়ি যতক্ষণে উনার গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছল , ততক্ষণে সুনন্দাদেবীর ড্রাইভার উনার গারিকে লর্ডসের মাঠে তুলে দিয়েছেন। লম্বা লম্বা ঘাসের কারণে , গাড়ির স্পিড অনেকটাই কমে গেছিল।

তারপরেও একটি বড়গাছে গিয়ে গাড়ি ধাক্কা মারতে , গাড়ি একটা বড় ঝাঁকুনি খেয়ে থামলো। গাড়ির পিছনের চাকা তখনও ঘুরছিল।

পুলিশও হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলে , বাদলস্যার পিছন থেকে আওয়াজ মারলেন – ব্রেক ফেইল হয়ে গেছিল। ... পুলিশ পিছন দিকে তাকাতে, বাদল স্যার নিজের পকেট থেকে সিয়াইডির আইকার্ড দেখালেন, তো পুলিশরা সকলে পিছনে সরে গেলেন। গাড়ি থেকে উদ্ধার হলেন , সুনন্দা দেবী, উনার হাতে ভালো চোট লেগেছে। ড্রাইভারের মাথার দিকে সামান্য কেটে গেছে। ... দুজনকে গাড়ি থেকে বারকরে, সামনেই অরবিন্দ সেবাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে, ড্রাইভারকে সামান্য ফাস্টেড করে ছেড়ে দেওয়া হয়, আর সুনন্দা দেবীর হাতে এক্সরে করে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়।

বাদল স্যার বললেন – যদি কিছু মনে না করেন , তবে আমার বাড়ি এখান থেকে কাছেই। ... আপনি আমার সাথে আসুন। একটু বিশ্রাম নিয়ে যাবেন।

আমরা সকলেই গেলাম বাদলস্যারের বাড়িতে। ... বাদলস্যার নিজেই চা বানিয়ে নিয়ে এলেন সকলের জন্য। বাবাও একটা সিগারেট খেয়ে এলেন বাইরের ব্যাল্কোনি থেকে। সুনন্দা দেবী মুখে বাঁহাতের চোটের ব্যাথায় অঙ্গভঙ্গি করছেন, আর ডান হাতে একবার করে ফোনে কিছু ছাপাচ্ছেন , পাশে রাখছেন, আবার মেসেজ আসছে, আবার তুলছেন।

সুনন্দাদেবী ব্যাল্কোনির দিকে পিছন করে বসেছিলেন। আর তাই বাবাকে দেখলাম , তীক্ষ্ণ নজর উনার সুনন্দাদেবীর ফোনের স্ক্রিনের দিকে। আর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম , বাবার ভ্রুকুটিটা বেশ ভালো ঢেউ খেলে গেছে। ... তারমানে বাবা যা অনুমান করছিলেন , তার সাথে কিছু একটা গড়মিল তো হচ্ছেই।

সুনন্দাদেবীকে এবার পুলিশ থেকেই একটা গাড়ি ঠিক করে দিয়ে , উনার বাড়িতে পৌঁছে দেন। আর আমাদেরকে বাদলস্যার গাড়িতে চাপিয়ে , ফিরিয়ে নিয়ে আসে বালিগঞ্জ সার্কুলারে , যেখানে সুমনাপিসির গাড়িটা পার্ক করা ছিল। ...

বাবা একটাও কথা বললেন না। সুমনাপিসির গাড়িতে চেপেও , তেমনই । তাই বাধ্য হয়েই সুমনাপিসি বললেন – কি হলো বলোতো বিজয়দা! ... কেমন যেন চুপ করে গেলে তুমি!

বাবা এতটাই মনোযোগ সহকারে ভাবছিলেন যে , পিসির কথা শুনতেই পাননি। তাই পিসি আমার দিকে তাকালেন। আমি চোখের ইশারায় বললাম , বাবা ভাবনায় মশগুল। পিসি তাই আর কথা বাড়ালেন না। আমরা পিসিদের বাড়িতেই নামলাম। পিসির কাজের লোক চা করে নিয়ে এলে , বাবা প্রথম কথা বললেন – অঙ্কটা খুবই জটিল বুঝলি সুমনা। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলতে পারবি , আসলে তুই তো এদের অনেক কিছু কভার করিস, তাই বলতে পারলে তুই-ই পারবি।

সুমনাপিসি বেশ আগ্রহী হয়ে সামনে ঝুঁকে এলে, বাবা বললেন – আচ্ছা, মহিমা মিত্রের বাড়িতে পার্টি শেষ হলে, ববি, সুদেষ্ণা, আর সুর কি সরাসরি বাড়ি যেতেন নাকি, অন্যত্র যেতেন?

সুমনাপিসি – দেখো বিজয়দা, আমি এই তিনজনের ব্যাপারে যতটা জানি , এঁরা রাত্রি ২টো ৩টের আগে কখনোই বাড়ি ঢোকেন না। কিন্তু মাঝের সময়টা এঁরা কোথায় যান , সেই ডিটেল আমি তোমাকে দিতে পারবো, কিন্তু তার জন্যে আমাকে আমার নিচে যারা কাজ করে পেজ থ্রির জন্য, তাদের থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে। ... কিন্তু কেন বলোতো

বাবা – হুম, তথ্যটা লাগবে। ... কেমন যেন একটা অন্যরকম কিছু মনে হচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে , একটা নাটক চলছে, চোখের সামনেই চলছে, কিন্তু ধরতে পারছিনা নাটকটা।

এতটা বলে বাবা চা খাওয়ায় মন দিলেন। প্রায় চা শেষের দিকে তখন বাবা আবার বললেন – আচ্ছা, কি সিরিয়ালে যেন সুনন্দা বেড়িয়ে যাচ্ছিল, আর মহিমা মিত্রকে ঢোকাতে চাইছিলেন সিন্দিয়া!

পিসি – হাটেহাড়ি।

বাবা – হুম, আচ্ছা সিরিয়ালের টিআরপি কি প্রথম থেকেই কম নাকি একটা পারটিকুলার সময়ের পর কমে?

পিসি – না প্রথমে খুব জনপ্রিয় ছিল। তারপরে কি হলো কে জানে , টিয়ারপি কমতে শুরু করলো। কিন্তু সিরিয়ালের দর্শকদের কিন্তু কনো কোমপ্লেন নেই জানো।

বাবা – কবে থেকে কমতে শুরু করে? মাস খানেক আগে থেকে, না আরো আগে থেকে?

পিসি – না না, এই তিন সপ্তাহ আগেও টিয়ারপি ফাটাফাটি ছিল। ভাবতে পারছো বড়পর্দার জনপ্রিয় হটস্টার, সুনন্দা। তাকে রোজ ছোটপর্দায় লোকে দেখতে পাচ্ছে।

বাবা – হুম, মানে এই দুই সাপ্তাহ থেকে ওটা ডাউন যেতে শুরু করে, তাই তো?

পিসি – হ্যাঁ, দিন পনেরো বলতে পারো।

বাবা – হুম, আজ উঠি বুঝলি। আমাকে না একটু ভাবতে হবে। ... কোথায় যেন একটা সূত্র মিলে যাবার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই সূত্রটা মাথার মধ্যে এসেও যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

পিসি – সিন্দিয়া লোকটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস দাদা। ... বাদলদাকে আক্রমণ করলো। তুমি বলতে যাচ্ছিলে সুনন্দাকে প্রটেকশন দেবার কথা, কিন্তু সে তার আগেই ব্রেক ফেল করে দিলো ওর গাড়ির!

বাবা – হুম, ঠিকই বলেছিস। ব্রেক ফেল করাই হয়েছে। ...

পিসি – সুনন্দা কি আন্ডার ডেঞ্জার!

বাবা – হুম, সোজাসাপটা দৃষ্টিতে দেখলে তো তাই মনে হচ্ছে। দেখা যাক। কিন্তু দেখার আগেও , যেটা করতে হবে, সেটা হলো আমাকে একটু ডিপ থিঙ্কিং করতে হবে। ... তারজন্য দরকার একটা ভাতঘুম। ... যাই বুঝলি, সন্ধ্যায় ফোন করছি। ... কোথায় পৌছাই তার মধ্যে দেখি।

আমি আর বাবা উঠে গেলাম এবার। বাড়ি এলাম। বাবা একটা কথাও বললেন না। ভাত খেলেন। একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে এস্ট্রেটা নিয়ে সরাসরি নিজের ছোট বিছানায় টানটান শুয়ে পরলেন। আর সেখানে যাবার সময়ে আমাকে আলাদা করে বলে গেলেন। আমি একটু একা থাকবো এখন।

বুঝে গেলাম, আমার নো এন্ট্রি। ... কি ভাবলেন , কি ভাবে ভাবলেন , বা আদোও কিছু ভাবলেন কিনা জানিনা। তবে একটু ঘুমিয়ে পরেছিলেন , সেটা পাশের ঘর থেকে বাবার নাক ডাকার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারি। তবে সেটা এই ২০ মিনিটের বেশি নয়।

বাবার একটা বিশেষত্ব আছে। বাবা একটা কিছু নিয়ে ডিপ থিঙ্কিং করতে করতে ঘুমিয়ে পরেন। আর ঘুম থেকে যখন ওঠেন , তখন উনার ঘুমিয়ে পরার আগের ইনকমপ্লিট ভাবনাটা কমপ্লিট হয়ে যায়। কি করে হয় জানিনা, কিন্তু হয় এমনটা। কে জানে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ভাবেন না কি?

ঘুম থেকে উঠে বাবা বললেন – অঙ্ক অনেকটাই পরিষ্কার , কিন্তু একটা ব্যাপার এখানে সব থেকে বড় প্রবলেম, সেটা হলো প্রমাণ যোগার করা অসম্ভব , আর দ্বিতীয় প্রবলেম হলো , মার্ডার ইন্সট্রুমেন্ট কি ব্যবহার হয়েছে, তার কনো আন্দাজ করতেই পারছিনা।

আমি তো এমনিই কিছু বুঝতে পারছিলাম না। এবার তো যদিও কিছু বোঝার চেষ্টা করছিলেম , সেই চেষ্টাও ছেড়ে দেবার অবস্থা হলো। আমি বললাম – কিছু ক্লু তো দাও।

বাবা – হুম, জানিস, শুটিংএর সময়ে প্লেনে বসে আছে অভিনেতা কি করে বোঝানো হয়?

আমি বললাম – একটা প্লেনের কাটিং তৈরি করা হয়, অভিনেতা চেয়ারে বসেন, আর উনার মুখের সামনে সেই প্লেনের স্লাইডটা ধরা হয়। ব্যাস, তারপর ডিরেক্টরের কেরামতি, মানে ক্যামেরার খেল।

বাবা – ভেরি গুড। ভুলে যাস না, এখানে যাদের সাথে ডিল করছি আমরা, তারা সকলেই সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী। তাই একটু সেরকম করে ভেবে দ্যাখ সমস্ত কিছুকে।

ওই আমি বললাম না, এবার আমার সমস্ত ভাবনা ঘেঁটে যাবে। ... ঘেঁটে গেল।

বাবা দেখলাম এবার সুমনাপিসিকে ফোন করলেন। দুজনের কথাই লিখলাম এখানে।

বাবা – সুমনা যেই খবরগুলো নিতে বলেছিলাম, সেগুলো নিয়েছিস?

পিসি – হ্যাঁ নিয়েছি। প্রথম হলো এই যে, মহিমা মিত্রের বাড়ি থেকে পার্টি করে বেড়িয়ে সরাসরি তিন বন্ধু চলে যেতেন হয় কনো পাবে, নয় সিন্দিয়ার বাড়িতে। ... আর এর অন্যথা কখনোই নাকি হতো না।

বাবা – হুম, আর সেই ব্যাপারটা অদ্ভুত ভাবে সকলেই চেপে গেলেন, তাই না। ... যাই হোক, মহিমা মিত্র যখন মধ্যপ্রদেশে বেড়িয়ে এলেন , তখন থেকেই ওই সিরিয়ালটা , কি যেন নাম ... হ্যাঁ , হাটেহাড়ি ফ্লপ খেতে আরম্ভ করে। আমি কি ঠিক বলছি?

পিসি একটু অবাক হয়ে – হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কি কিছু কানেকশন আছে?

বাবা – হুম, আছে। মেন কানেকশনটা এখান থেকেই তৈরি হচ্ছে। ... আচ্ছা রথিন রয়েছে বাড়িতে?

পিসি – হুম আছে। দেব?

বাবা – হুম একবার দে তো।

রথিনকাকা – হুম বল্, কি ইনফরমেশন লাগবে?

বাবা – সুনন্দা দেবীর সাথে পুলিশের রিলেশন, এই খবরটা লাগবে।

রথিনকাকা – খবর নিতে হবেনা। কলকাতার সমস্ত , আর বিশেষ করে সাউথ কলকাতার প্রায় সব ইন্সপেক্টর উনাকে চেনেন, এবং উনার কাছে তাঁদের বেশ যাতায়াত থাকে। সিকিউরিটি পারপাশেই।

বাবা – উমহুম, সিকিউরিটি পারপাশে নয়। ... অন্য পারপাশ আছে। আমাকে একটা হেল্প করতে হবে। কিন্তু সেই হেল্প আমার লাগবে, অত্যন্ত কনফিডেন্সিয়াল ভাবে। ...

রথিনকাকা – কাল ডিপার্টমেন্টে চলে আয়। হয়ে যাবে।

কি হেল্প, সেটা আমি জানতে পারিনি কারণ বাবা পরেরদিন রথিনকাকার অফিসে একাকী গেছিলেন। আমাকে নেন নি সঙ্গে। ... যখন ফিরলেন , তখন সোফায় শরীরটা হেলিয়ে দিলেন। বাবার ফোন বেজে উঠলো। বাদল স্যার।

বাদল স্যার – বিজয়দা, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

বাবা – হুম, সারটিফিকেশন আর ভিডিও প্রুফ রাখতে বলেছিলাম, রেখেছ?

বাদল স্যার – হ্যাঁ দাদা, এবার ওকে এরেস্ট করে নি!

বাবা – না বাদল, এখনই যদি এরেস্ট করো , তবে খুনের দায়ে এরেস্ট করতে পারবে না। ... একটু অপেক্ষা করো। সবে একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে। ... তাও সেটা প্রত্যক্ষ ভাবে এই খুনের সাথে উনি জড়িত, সেটা কনোভাবেই প্রমাণ করা যায়না। ... তাই একটু অপেক্ষা করো। ... চিন্তা করোনা। ... তোমার দিদির মৃত্যুর পিছনে যারা যারা আছে , সকলকে সিয়াইডির হেফাজতে যেতে হবে। ... আমার উপর আর ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখো।

বাবা ফোন রেখে দিলেন। আমি বেশ বুঝতে পারলাম , কেস বাবার মাথায় সম্পূর্ণ ভাবেই এসে গেছে , কিন্তু বাবার কাছে প্রমাণের অভাব। সেটাও স্বাভাবিক। আসলে খুন তো হয়নি। প্রেসারাইজ করে হত্যা করা হয়েছে। সেটাকে হত্যা বলে দাবি করতে হলে, ভালো রকমের প্রমাণ না থাকলে, আসামিকে আটকে রাখা অসম্ভব।

কিন্তু কেসের ব্যাপারে এখন যদি আমি বাবাকে প্রশ্ন করি, জানি কনো সদোত্তর পাবো না, বাবা এমন কিছু বলবেন, তাতে আমার সমস্ত কিছু ঘেঁটে যাবে। তাই সেই ব্যাপারে কথা না বলে অন্য কিছু প্রশ্ন করলাম বাবাকে। আমি বললাম – আচ্ছা বাবা, তুমিই তো বলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কনো কিচ্ছু হয়না। তাই, যদি এই হত্যাও হয়ে থাকে , তবে তাতে ঈশ্বরের ইচ্ছাও সামিল ছিল। তবে হত্যাকারীকে ঈশ্বর খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন কেন?

বাবা একটু হেসে বললেন – মহিমাদেবীর মধ্যে অনেক দোষ ছিল। তিনি অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন ব্যক্তি ছিলেন, আর তা ছাড়া, উনি প্রচণ্ড ইমোসানাল ছিলেন। ... কি বলতো , ইমোসানাল ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে গিয়ে, ঈশ্বরের কাছে পৌছাতে পারেন না , কারণ ঈশ্বর আবেগের বিরোধী , আর ভাবের পূজারী। কিন্তু মহিমা মিত্র একজন অত্যন্ত ভালো মানুষও ছিলেন , আর সেটা হওয়া খুবই স্বভাবিক। তিনি ঈশ্বরের অত্যন্ত কাছের লোক ছিলেন , তাই জন্যই তো তাঁর মধ্যে এমন অদ্ভুত অভিনয়ের প্রতিভা ছিল , যা সত্য অর্থে বিরল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাবা আবার বললেন – আসলে কি বলতো , উনি উনার প্রতিভার অহংকার করতেন না। উনি উনার প্রতিভাকে সমানে একটি বিজ্ঞানে পরিণত করার চেষ্টা করতেন। ... কাবেরিদেবী হয়তো জানেন না, মহিমা দেবী একটি বই লিখছিলেন। আমি উনার ল্যাপটপে দেখলাম। ... সেই বইতে উনি অভিনয়ের বিজ্ঞান লিখছিলেন। ... বুঝতে পারছিস , উনি উনাকে ঈশ্বর যেই প্রতিভা দিয়েছেন , তার রীতিমত পূজা করতেন। ... আর নিজের কানেই তো শুনলি , তিনি নিজের কাছের লোকদের কতটা গুরুত্ব দিতেন।

চিন্তা করে দ্যাখ , একজন কাজের লোকের কথায় উনি মদ্যপান ছেড়ে দিলেন। কতটা স্নেহ থাকলে , এমনটা করা যায়। ... সেই কাছের মানুষকে যে বা যারা এমন ভাবে হত্যা করলেন , ঈশ্বর কি তাঁদেরকে হাতেনাতে কর্মফল দেবেন না। ... অর্থাৎ কি দাঁড়ালো ? দাঁড়ালো এই যে , নিজের ইমোসান আর কুসংস্কারের জন্য, মহিমাদেবীর যাত্রাবদল করলেন ঈশ্বর , অর্থাৎ মৃত্যু প্রদান করলেন। আর অন্যদিকে যাদের নিকৃষ্ট মানসিকতাকে ব্যবহার করে ঈশ্বর এমন করলেন, তাঁদেরকে তিনি ছেড়ে দেবেন ভেবেছিস।

আমি অনেক কিছু বুঝছিলাম, কিন্তু সত্যি করে কিচ্ছুই বুঝতে পারছিলাম না। ... মা যদি প্রশ্ন না করতেন এখানে, তাহলে বাবার কথার অর্থ সত্যই বুঝতে পারতাম না। মা প্রশ্ন করলেন – ঈশ্বর এমন ভাবে কাজ করেন, তুমি কি করে জানলে?

বাবা একটু হেসে বললেন – মধু, পুরাণে ঋষিগণ যেই যেই দিব্য কথনের কথা লিখেছেন, তা তো ঈশ্বরের মহিমাকীর্তনই। আর কারুর মহিমাকীর্তন কি করে করা সম্ভব ? তাঁর কর্মের ধারার প্রশস্তিই সেই উপায়। তাই না! ...

সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে বাবা বললেন – গণেশের বুদ্ধির অহংকার হয়েছে, আর সেই বুদ্ধির নাশ করে, তাঁকে বিবেকে পরিণত করতে হবে , তাই তাঁর মাথা অর্থাৎ অহংকার কাটা যাবে। ... এই বিধান তো মাতা পার্বতীই করলেন। সেরকমই তো পুরাণের পাতায় বলছে। পুরাণের পাতা এমন বলছে যে , শনিদেবকে নবগ্রহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে , মানুষকে বুদ্ধির বিকারের নাশের উপায় করবেন বলে, মাতা পার্বতী কি করলেন? তিনি শনির চেতনা, অর্থাৎ ধামিনিকে দিয়ে শ্রাপ দিলেন শনিকে যে তাঁর ছায়া যার উপর পরবে, তার বিকারের নাশ হবে।

সেই শনিদেবকেই আবার ধামিনির মুখে গণেশের সুন্দররূপের প্রশস্তি দিয়ে আকর্ষিত করে , কৈলাসে নিয়ে এলেন, আর নিজের পুত্রের উপর শনির ছায়া পরতে , তিনি ন্যায়দণ্ড দিয়ে শনির পায়ে আঘাত করে , তার গতি কম করে , তাকে দিয়ে সারেসাতির প্রভাব বিস্তার করালেন , আর শনির শ্রাপকে কাজে লাগিয়ে মহাদেবেরও শাপমোচন করালেন।

আমি – মহাদেবের শাপ?

বাবা – হুম, মহর্ষি কাশ্যপের শাপ, যেখানে মহাদেব নিজের হাতে নিজের সন্তানের মুণ্ডচ্ছেদ করবেন। ... সেই শ্রাপকে কাজে লাগিয়ে, শনির শ্রাপকে জগতে স্থাপিত করলেন, আর সেই করম করার পিছনেও মুল কারণ কি? না সন্তানের অহংকারের নাশ করে , তাঁর মধ্যে বিবেকের সঞ্চার করা। আবার তারই সাথে সাথে, দেবতা আর মহাদেবের গণদের যেই দম্ভ , তাকেও তিনি দমন করলেন , গণেশের হাতে ন্যায়দণ্ড ধরিয়ে দিয়ে। ... সব মিলিয়ে কি হলো? প্রথমে নিজের সন্তানকে তিনি শাসন করে, তাঁর অহংকারের নাশ করে তাঁর মধ্যে বিবেকের সঞ্চার করলেন। আর তারই সাথে সাথে , সমস্ত দেবদের , সমস্ত গ্রহদের নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত করে , বুদ্ধির বিকারের যিনি নাশ করেন , সেই শনিকে উন্নত স্থান দিলেন। ... এবার বুঝলে?

মা বললেন – হুম, গভীর কথা। এতো দেখি সিরিয়ালে , কিন্তু মাথায় খালি একটাই কথা ঢোকে , একটা মানুষের গলা কেটে , হাতির মুখ লাগানো হলো। ... এরা যে কেউই মানুষ নয় , সকলেই দেব, অর্থাৎ আমাদেরই অন্তরের বিভিন্ন ভাব, সেটা জেনেও, যখনই দেখি সিরিয়ালে, সব ভুলে যাই।

আমি বাবার কথা বুঝলাম, আর এও বুঝলাম যে বাবা কেন বললেন ঈশ্বর দোষীদের দণ্ডের ব্যবস্থা ঠিকই করবেন। কিন্তু কেসটা হয়েছিল কি? আসল দোষী কে?

ছবিতে ছায়া

পরের দিন সকাল সকাল আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন , চল একটু বালিগঞ্জ সার্কুলারে যাবো। ... বাড়িতে বসে থাকলে হবেনা।

আমি বললাম – কেন কিছু হয়েছে আবার?

বাবা – না, কিন্তু কিছুতো হয়েছিল। সেটা একটু ভিসুয়ালাইজ করতে হবে। সেটা কি এখানে বসে বসে সম্ভব! ... চল ব্রেকফাস্ট করেই বেড়িয়ে পরবো।

আমিও রেডি হয়ে নিলাম। আমরা একটা উবার ধরে বালিগঞ্জ সার্কুলারে পৌঁছলাম। কিন্তু আমরা মহিমাদেবীর বাড়িতে গেলাম না। বাবাকে দেখলাম ইতস্তত রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছেন। খানিক পরে, তিনি আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন । আমরা পিছনের দিক থেকে মহিমা মিত্রের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। ... উনার বাড়ির পিছনেই একটা ছোট্ট পার্ক।

সেখান দিয়েই বাবা আস্তে আস্তে হাটছিলেন , আর যেন কিছু খুঁজছিলেন। খুবই সকাল। পার্কে কেউই নেই। ... আমি আর বাবা একাকী হাটছিলাম। সেখানে দিয়ে একটা ছোট্ট ছেলে হেঁটে ফিরছিল। ... আমাদের পাস দিয়েই সে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হলো কে জানে , বাচ্চাটা বাবার উদ্দেশ্যে বলল – আচ্ছা কাকু, এখানে যেই সার্কাস এসেছিল, সেটা কি চলে গেছে?

বাবাকে দেখলাম একটু নিচু হয়ে বসে বাচ্চাটার কাঁধে হাত রেখে বললেন – এখানে সার্কাস এসেছিল বুঝি?

বাচ্চাটা বলল – হ্যাঁ এসেছিল তো। ... ওই সার্কাসে যেমন অনেক আলো ছড়ায় রাত্রে , রোজ সেরকম অনেক রঙের, লাল নীল সবুজ আলো পরতো। ... অনেকক্ষণ খেলা চলার শেষে , বন্ধ হতো। ... আমি রাত্রে দেখতাম। আর এখন দেখতে পাইনা।

বাবা – তো তুমি থাকো কোথায়? অতো রাত্রে বাবামা বাড়ি থেকে বেরোতে দেন?

বাচ্চাটা – আমি তো এই ফুটপাতেই থাকি। ... আমার তো কনো বাবা মা নেই। ... একজন ওস্তাদ আছে, আমাকে পকেট কাটা শেখাচ্ছে। এই তো তার কাছেই যাচ্ছি এখন। ওই আলোর খেলা ওই বাড়িতে এসে পরতো, তাই সেটা দেখতে রোজ আসতাম এখানে। ... কিন্তু দুদিন ধরে আর হচ্ছে না।

বাবা একটু চুপ করে গেলেন , কারণ বাচ্চাটা যেই বাড়িটি দেখালেন , সেটা মহিমা মিত্রের বাড়ি। ... আর সেই বাড়িতে দুইতিন আগেই মহিমা মিত্রের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই সেই আলোর খেলা হয়না। ... তারমানে, সেই আলোর খেলা কি উনার মৃত্যুর সাথে কনো ভাবে কানেক্টেড?

বাবা আবার হেসে বাচ্চাটার উদ্দেশ্যে বললেন – আচ্ছা আলোটা কি ওই বাড়ি থেকে আস্তো?

বাচ্চাটা – না না, আলো তো, ওই ছয়তোলা বাড়ির উপরের তোলা থেকে আস্তো। ... আলো এসে পরতো এখানে। এই সুন্দর দেখতে বাড়িতে।

বাবা এবার বললেন – সার্কাসটা এখান থেকে চলে গেছে এখন। অন্য কোথাও পাবে এখন। দ্যাখো খোঁজ লাগাও, নিশ্চয়ই অন্য কোথাও হচ্ছে এখন।

বাচ্চাটা মাথা নাড়িয়ে চলে গেলে , বাবা আমার হাত ধরে সোজা সেই ছয়তোলা বাড়ির দিকে গেলেন। মাঝে বাদলস্যারকে ফোন করে ডেকে নিলেন। আমরা সেই ছয়তোলা বাড়ির সামনে আস্তেই , বাদলদা আরো একজন আমাদের চেনা, মানে ইরার কেসে ছিলেন, অসিত সাধু, তাঁকে নিয়ে এসেছেন।

বাবা বাদলদার দিকে তাকিয়ে বললেন – ভালো করেছ, অসিতকে নিয়ে এসেছ। অসিত, আমরা তিনজন উপরে ছয় তোলায় যাবো। যতক্ষণ না আমরা ফিরছি , ততক্ষণ তুমি এই হোটেলের মালিককে একটুও নড়তে দেবেনা। নো ফোনকলস্ , নো টেক্সট মেসেজ , নো মুভমেন্ট। বুঝতে পেরেছ। ... সবাই মিলে আছে, ... ফাঁক পেলেই সতর্ক করে দেবেন উনি, ফোন বা মেসেজ করে।

অসিত সাধু বুঝে গেলেন। হোটেলে ঢুকেই বাদল স্যার নিজের আইডি দেখিয়ে , উপরে চলে গেলেন আমাকে আর বাবাকে নিয়ে। আর অসিত সাধু সেখানে বাঘের দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর আমরা উপরে গিয়ে যা দেখলাম , তা দেখে আমাদের চোখ ছানাবড়া। ... তালা ভেঙে যখন ঘরে ঢুকলাম, তখন দেখলাম, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার রাখা। আর সেই টেবিলে , তিনটে লেসার টর্চ রাখা। কিছু মিনারেল ওয়াটারের বোতল রাখা, আর কয়েকটা মদের বোতল। আর কিচ্ছু নেই ঘরে। ...

বাবা লেসার টর্চটা জালিয়ে দেওয়ালে ফেললেন। আর দেখে, নিজের চোখটা বন্ধ করে নিলেন। রাগে বন্ধ করলেন চোখটা। বাবা এরপর একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে বললেন – মার্ডার অয়েপন।

বাদল স্যার অবাক হয়ে বললেন – মানে?

বাবা – মানে বোঝানোর সময় এটা নয়। ইমিডিয়েটলি, হোটেলের মালিককে ধরে নিয়ে কাস্টডিতে রাখো, আর ওকে কনোরকমে কারুর সাথে যোগাযোগ করতে দেবেনা। ... লয়েরারের সাথেও নয়। ... আর আমি মিলিকে নিয়ে তোমার দিদির বাড়ি যাচ্ছি। ... তুমি ওর কাস্টডির ব্যাপারটা ঠিক করে , চলে আসো তোমার দিদির বাড়ি। প্রচুর কাজ আছে।

বাবা যেমন বললেন , ঠিক তেমন তেমনই হলো। ... আমাকে নিয়ে বাবা মহিমামিত্রের বাড়িতে ঢুকেই , সরাসরি উনার ট্রফির রুমে গেলেন , আর সেখান থেকে এল্ব্যাম হাটকে একটা ছবি বার করলেন। ... ছবিটা দেখেই আমি আঁতকে উঠলাম ; লেসার টর্চ-এর থেকে আলো বেড়িয়ে আস্তে , দেওয়ালে যেই ট্যাটু দেখতে পাচ্ছিলাম, সেটাই এই ছবিতে রয়েছে। ... বাবা ইমিডিয়েটলি কল করলেন কাবেরিদেবীকে। ... কাবেরিদেবী আর বাদলদা, একসঙ্গেই এলেন প্রায়। ...

বাবা প্রশ্ন করলেন কাবেরিদেবীকে। কিছু ছবি প্রিন্ট করে , মহিমাদেবীকে কে দিতে এসেছিলেন মধ্যপ্রদেশের ট্রিপের পর?

কাবেরিদেবী – সুরস্যারই তো এসেছিলেন। আর তো কেউ আসেন নি। তবে ছবি ! ... একটা খাম দিয়েছিলেন, তবে তাতে ছবি ছিল কিনা জানি না আমি। ...

বাবা - খামটা কোথায়?

কাবেরিদেবী বললেন – দিদি মনে হয় ফেলে দিয়েছেন।

মিষ্টি বলে উঠলো – না না, দিদি ফেলে দেন নি। ওটা মাঝে মাঝেই খুলে দেখতেন দিদি। ভয়ে ভয়ে খামের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কি যেন বার করে দেখতেন , আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকিয়ে রেখেদিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতেন।

বাবা – সেই খামটা কোথায়?

মিষ্টি একটু খুঁজে এনে বাবাকে খামটা দিলে , বাবা খামের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ছবি বার করতেই দেখলাম, সেই ট্যাটুটাই বড় করে প্রিন্ট করা। ... এবার বাবা খামটা ভালো করে দেখতেই দেখলেন লেখা, আলোছায়া স্টুডিও। বাবা বাদলদাকে বললেন – এই এড্রেসে যাও আর মালিককে ইমিডিয়েটলি কাস্টডি তে নিয়ে, জেরা করে বার করো কথা বাদল , এই ছবি করতে উনাকে কে দিয়েছিলেন , এটা জানো ইমিডিয়েটলি।

আর হ্যাঁ, কথা বার করতে পারলে আমাকে একটা ফোন করে জানাবে। আজ রাত্রে একটা এক্সান আছে। ... একটু ফোর্স লাগবে। কারণ যেখানে যাবো , সেখানে একজন সশস্ত্র পুলিশও থাকবেন। ... আগে আলোছায়ার মালিকের থেকে কথা বার করে নাও। রেস্ট বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে পরে।

আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন – চল, কাজ শেষ। এবার জবানিকা পতনের সময়। ... তোর সুমনাপিসিকে একটা ফোন করতো। ... আচ্ছা আমিই করছি দাঁড়া।

বাবা ফোন করলেন একটা ওলার গাড়িতে উঠে। বাবা বললেন – সুমনা, আজ রাত্রে এই দেড়টা নাগাদ, আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে আর মিলিকে পিকাপ করে, সোজাসুজি ট্রায়েঙ্গুলার পার্ক, মানে সিন্দিয়ার বাড়িতে হামলা। ... ওখানে বাদল ওর টিম নিয়ে রেডি থাকবে। আমরা যেতেই একশন শুরু। ওকে, রেডি থেকো, আর ডিলে যেন না হয়।

পিসি – না দাদা, আমি একটার মধ্যেই পৌঁছে যাবো। ... কি ব্যাপারটা হয়েছে, সেটাও তো জানতে হবে।

বাবা – ব্যাপার আমার মুখ থেকেই জানবে, কিন্তু সেটা আমার বাড়িতে নয়। আমরা যখন সিন্দিয়ার বাড়ি যাবো, তখন সকলের সামনেই স্ক্রিপ্ট পাঠ করে শোনাব। সেখানেই সবাই জানবে কি হয়েছিল।

পিসি – কিন্তু এতো রাত্রে কেন রাখলে টাইমটা?

বাবা – পুরো জিনিসটা যেটার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল , সেটার প্রমাণ সহ তাঁদেরকে ধরতে হবে না! ... চাপ নিস না। ... রাত্রে চল , সব দেখতে, শুনতে পাবি। ... নো রেডিও , নো এফএম, অনলি মুভি। ... শব্দসহ চলমান চিত্র দেখতে পাবি পুরো। রেডি হয়ে চলে আসিস। ... ডিলে করলে, আমি আর মিলি কিন্তু বেড়িয়ে পরবো।

ফোন রেখে দিলেন বাবা। ... আমি বললাম – তুমি ঠিকই বলেছিলে। ঈশ্বর সত্যিই সাহায্য করলেন ওই বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে। নাহলে আমরা এই সত্য কিছুতেই জানতে পারতাম না। ... আচ্ছা বাবা , প্রথম দিনই তুমি সন্দেহ করেছিলে তাইনা! তুমি সুরকে প্রশ্ন করেছিলে, মধ্যপ্রদেশে নতুন কনো হন্টেড হাউজ করেছে কিনা। তখন এই ছবির কথাই তুমি প্রশ্ন করেছিলে, তাইনা!

বাবা একটা মুচকি হেসে বললেন – কারেক্ট।

আমি – তারমানে এই ছবি দিয়ে মহিমা মিত্রকে ভয় দেখান হয়। আর সেই ভয়কে কায়েম করার জন্য উনার ঘরে লেজার টর্চ দিয়ে সেই একই মুখ দেখানো হতো। আর সেই ছবি দেখেই মহিমা মিত্র ভয়ে এবং আতঙ্কে চেঁচাতেন, যেই চ্যাঁচানোতেই মিষ্টির ঘুম ভেঙে যেত। কিন্তু শেষ দিন , এই ছায়াছবি দেখে, উনি চেঁচিয়ে তো ওঠেন , কিন্তু শেষ নিশ্বাসই ত্যাগ করে দেন। তাই মিষ্টি ভাবে , টিকটিকি দেখে ভয় পেয়েছিলেন। চেঁচানোর চোটে টিকটিকি পালিয়ে যায় , তাই চেঁচানো থেমে যায়। ... কিন্তু আসলে , সেই ছায়াছবি দেখে, মহিমা মিত্রের হার্ট অ্যাটাক হয় , আর তিনি মারা যান। ... তারমানে তো এটা ভয়ানক একটা খুন বাবা!

বাবা – হুম। একদমই তাই। ... কিন্তু এই সবের কারণ কি?

আমি – সেটা তো বুঝতে পারলাম না!

বাবা – সেটাই আজ রাত্রে সাফ হয়ে যাবে। চল এখন বাড়ি গিয়ে একটা ভালো করে ভাতঘুম দিয়ে নিবি। রাত্রে অনেক ঘটনা আছে। ঘুম যেন না আসে।

আমরা বাড়ি গেলাম। বাবার কথা মত ঘুমিয়ে নিলাম। সন্ধ্যার সময়ে , কিছুতেই আমার সময় কাটছিলনা। মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কেন এমন করলো ? মোটিভটা কি? ... কিন্তু কনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না! ... শুধু একটাই জিনিস আমার মনে আস্তে বাবাকে বললাম – খুনি কি সুর!

বাবা হেসে বললেন – কেন?

আমি – সুরই তো এসে বাড়ির দেওয়াল থেকে যেই ছবিটা ছিল, সেটা সরিয়ে নিতে বলেছিল, বাস্তুর কথা বলে। ... ওই ছবি থাকলে তো, লেসারের ট্যাটুটা স্পষ্ট ভাবে দেওয়ালে পরতোই না!

বাবা – হুম, মেয়ের বুদ্ধি থেকে বিকারের পর্দা সরছে। তাই তো একটু একটু আলোর ঝলক দেখা যাচ্ছে।

আমি এই কথা শুনে মনে মনে বুঝে যাই যে মোটিভ এখনো বুঝিনি ঠিকই। কিন্তু খুনিকে ধরে ফেলেছি। এবার খালি ধরপাকড়ের খেলা, আর মোটিভটা সামনে আসার অপেক্ষা।

রাত্রি একটা পনেরোতেই সুমনাপিসি নিজেই ড্রাইভ করে গাড়ি নিয়ে হাজির। ... আমরা গাড়িতে উঠে পরলাম। ... গরিয়াহাটের মুখে দুটো স্করপিও ভর্তি সিয়াইডি অফিসার। এঁদের অনেককেই আমি চিনি। সকলে ইরার কেসে ছিলেন। ... তাছাড়াও আরো ৫-৬ জন ছিলেন।

গাড়িতে উঠে, বাবা বললেন – সুর, ববি আর সুদেষ্ণা, সুরের গাড়িতেই আসে। ... তাই সুরের ড্রাইভার , আর অন্যদিকে সুনন্দার ড্রাইভার , এঁদের দুজনকে অতর্কিতে ধরে , গাড়ির মধ্যে বেঁধে দুটো গাড়িতে দুজনদুজন করে পাহারায় বসিয়ে দেবে। ... নাহলে ওরা খবর দিয়ে দেবে , আর সকলে ফেরার হয়ে যাবে।

বাবা যেন মুভি হবার আগেই চোখের সামনে মুভি দেখে নেন। ... যেমনটা বলেছিলেন , ঠিক তেমনটাই হলো। কিন্তু সুনন্দাও এঁদের সঙ্গে যুক্ত! যাইহোক, দুজোন ড্রাইভারকে আর সিন্দিয়ার গেটকিপারকে আগে ধরে, মুখে রুমাল গুঁজে , হাতপা বেঁধে, গাড়িতে তুলে, চারজন গাড়ির মধ্যেই রইলেন , পাহারা দেবার জন্য। বাকি ১৪ জন , আমি, বাবা, বাদলস্যার, আর সুমনাপিসি, হাজির হলাম এবার সিন্দিয়ার বাড়িতে। ... পিছনের দরজায় চারজন। ব্যাল্কনি দিয়ে উঠে গিয়ে , ব্যল্কনির দরজায় চারজন। আর বাকি আমরা সকলে সামনের দরজায়।

বাদলস্যার আজ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। দরজায় এক কষিয়ে লাথি মারতে, দরজা খুলে গেল। ... এলার্ম বেজে উঠলো সর্বত্র। ... আর সাথে সাথেই প্রায় বেড়িয়ে এলেন, পুলিশ অফিসার সাঁতরা। ...

বাদল স্যার সহ সকলের হাতেই বন্দুক। তাই সাঁতরাকে বন্দুক মাটিতে রেখে হ্যান্ডস-আপ করতে হলো। ... এবার উনার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে , উনাকে নিয়ে যাওয়া হলো ভিতরের ঘরে। আর সেখানে গিয়ে দেখা গেল, সুর, সুদেষ্ণা, ববি, সুনন্দা, আর সিন্দিয়া একত্রে। সম্পূর্ণ ভাবে মদ্যপ সকলেই। একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ঘরে ঘোরাফেরা করছিল। ... মাথা ধরে যাচ্ছিল।

এরই মধ্যে ব্যাল্কনি থেকে , আর পিছনের দিক থেকে সকলে দরজা ভেঙে ঢুকে পরে সব দিক থেকে এঁদেরকে ঘিরে ফেলেছে। ... বাবা সমস্ত জানলা খুলে দিলেন। ... একটু গন্ধ আর ঝাঁঝ কমে গেল।

সেই নেশাগ্রস্ত আর খোলামেলা পোশাকে আবৃত অবস্থাতেই সুনন্দা টলতে টলতে বলল – কি চাই এখানে! ... এতো লোক কেন? এতো মাল নেই এখানে। ... আজ যাও, কাল দেব।

সিয়াইডির সকলে সাঁতরা সহ সকল ছয়জনের মুখে ক্লোরফর্ম লাগিয়ে অজ্ঞান করে দিলেন। ... এঁদের হুঁশ যখন এলো, তখন সবে সূর্য উঠছে। ... নেশা এঁদের কেটে গেছে। আর আমাদের হাতে এতক্ষণ সার্চ করে, প্রচুর হেরয়িন আর কোকেইন উঠে এসেছে।

জ্ঞান ফিরতেই, হম্বিতম্বি করে উঠে সুনন্দা আর সিন্দিয়া বলে উঠলেন – হোয়াট ইজ হ্যাপিনিং হেয়ার! ... এতো বন্দুক কেন? কারা এরা?

বাবা – সিয়াইডি, আর ইউ অল আর আন্ডার এরেস্ট। সমস্ত প্রমাণ পাওয়া হয়ে গেছে। তাই এরেস্ট ওয়ারেন্টও সিয়াইডি কোর্ট থেকে রাতের মধ্যেই সিয়াইডি চিফ ইস্যু করিয়ে এনেছেন।

সুনন্দা – কিন্তু হওয়াই? আমরা কি করেছি!

বাবা হেসে বললেন – সেই ফিরিস্তি দেবো বলেই তো , সকালের অপেক্ষা করলাম ম্যাডাম। ... আর এই দেখুন সমস্ত মিডিয়াও এসে গেছেন। ... লাইভ কভারেজ করবেন না আপনাদের। সেলিব্রিটি বলে কথা আপনারা সকলে। ... আপনাদের লাইভ কভারেজ না হলে চলে?

এবার সমস্ত রিপোর্টারদের উদ্দেশ্যে – আপনারা রেডি তো। তাহলে শুটিং শুরু করা যাক! সকলে বাবাকে থাম্ব দেখালে, বাবা বললেন – ওকে লেটস স্টার্ট ফরম ডি বিগিনিং। ওকে!

সত্যিই ছায়াছবি

বাবা বলতে শুরু করলেন – কেসের সূত্রপাত বাংলায় নয়, শুরু হয় মধ্যপ্রদেশে। প্রতিবার যেমন বেড়াতে যান, এবারেও তেমনই সুদেষ্ণা , ববি আর সুরের সাথে মহিমা মিত্র বেড়াতে যান । আনন্দই করছিলেন সেখানে, কিন্তু সেখানে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তাঁর সঙ্গীদের অন্যরূপের সাথে। ... উম্ , মোস্ট প্রোবাবলি, হোটেলের রুমে নয়, বনের মধ্যে ঘোরার সময়ে।

হেরোইন আর কোকেইনের নেশা করা তাঁর সঙ্গীদের সাথে সেখানেই প্রথম আলাপ হয় মহিমা মিত্রের। খবর জানাজানি হলে ক্ষতি ছিলোনা, কারণ ব্যবসা বেশ ভালোই ফাঁদা ছিল। কিন্তু গড়বড় হবার সম্ভাবনা জাগে যখন মহিমা মিত্র এই সমস্ত ব্যাপার তাঁর ভাই , বাদলকে জানিয়ে দেবে বলে। শুরু হয়ে যায় নেক্সট লেভেল প্ল্যানিং।

কিছুই নয়, যেই সিরিয়াল বেশ রমরম করে চলছিলো, কি যেন নাম সিরিয়ালটার?

সুমনাপিসি – হাটেহাঁড়ি।

বাবা – হুম, খাসা নামখানা কিন্তু হাটে হাঁড়ি। সত্যিই, আজই সিরিয়ালটার আসল ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে দেখুন। আজ পুরো হাটে হাঁড়ি ভাঙা হচ্ছে।

নিজের মনেই একটু হেসে নিয়ে বাবা ফের বলতে শুরু করলেন – তো হাটে হাঁড়ি যাতে না ভাঙা হয় , সেই উদ্দেশ্যে, হাটেহাঁড়ি সিরিয়াল থেকে সুনন্দাদেবীকে বাদ দিয়ে , সরাসরি এপ্রোচ, না না এপ্রোচ বললেও ভুল বলা হয়, সরাসরি প্রেসারাইজ করা হয় মহিমাদেবীকে। ...

জানতেন তাঁরা, এই সমস্ত প্রফেশনাল হ্যারাসমেন্ট দিয়ে মহিমা মিত্রকে কিচ্ছু করা যাবেনা। এই সমস্ত হ্যারাসমেন্ট উনি অনেক দেখে এসেছেন। কিন্তু তাও করা হলো এই প্ল্যানটা। না না একদমই মেরে ফেলার জন্য নয় , বরং এটা দেখানোর জন্য যে উনার মৃত্যু এই কারণে হয়েছে কারণ তিনি প্রফেশনে প্রেশার হ্যান্ডেল করতেই পারেননি। ... আর আসল প্ল্যান , অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকে নিশ্চয় করার অসাধারণ প্ল্যানকে রাখা হলো পিছনে।

কি সেই প্ল্যান ? ... প্ল্যান এই যে , মহিমাদেবীর এই বেড়াতে গিয়ে তোলা সোলো ছবিগুলির মধ্যে একটিতে, একটি অশরীরীর ট্যাটুকে রাখা হলো , সুপার-ইম্পোজ করে। আর সেই সুপার ইম্পোজিশন করে, তার একটা কপি সুর সাহেব আমাদের , নিজে হাতে নিয়ে গেলেন মহিমা দেবীর কাছে। ... মহিমা দেবী ভুতে ভয় পান , তাঁর বন্ধুরা ছাড়া এটা ভালো করে আর কেই বা জানবেন! ... তাই ভুতের ভয় দেখানো শুরু হলো।

তবে না, এখানেই ভয় দেখানো শেষ হয়নি। উল্টো দিকে এনিগ্মা হোটেল। হেরয়িন আর কোকেইন সাপ্লায়ারের অনেক জানাশুনা। তারউপর আবার অন্য শহরের স্টাররা এসে সেই হোটেলে থাকেন। তাঁদেরকেও তো এই সমস্ত সাপ্লাই দিতে হয়। তাই না! ... তাই হোটেলের মালিকের সাথে খুবই

দহরমমহরম। এনি ওয়েজ। তাই সেই হোটেলের একটি রুম নেওয়া হলো, আর সেখান থেকে লাল, নীল আর সবুজ লেজারের মুখে সেই একই ট্যাটু এঁকে নিয়ে, মারা হবে মহিমাদেবীর ঘরের দেওয়ালে।

কি বিশ্বাস হচ্ছে না! ... এই সেই ট্যাটু, আর এই সেই ছবি। ছবি প্রিন্ট হয়েছিল বালিগঞ্জ স্টেশন চত্তরের দোকান আলোছায়া থেকে। দেখে নিয়েছেন। বাদল , রেখে দাও প্রমাণ গুলো , আদালতে প্রমাণ করতে কাজে লাগবে। ... হ্যাঁ তো কি বলছিলাম , প্ল্যানের কথা। ... কিন্তু সেই সমস্ত প্ল্যান যে ভেস্তে যেতে চলেছিলো! (হেসে) কারণ?... কারণ যেই দেওয়ালে এই লেজার মারা হবে বলে ঠিক করা হয়েছে , সেই দেওয়ালে যে অন্য বড় ধরনের একটা মূর্তির ওয়ালপেপার , মানে যাকে বলে ক্যানভাসের উপর পোড়ামাটির কাজকরা একটা ছবি টাঙানো। ... লেজারের থেকে যেই ছবি দেওয়ালে পরবে , সেই ছবিই তো বিক্রিত হয়ে যাবে! তাই কিচ্ছু বোঝা যাবে না।

তাই আমাদের জনপ্রিয় অভিনেতা , সুর সাহেব সেখানে গিয়ে , বাস্তুর নাম ভাঙিয়ে , মহিমাদেবীকে দিয়ে সেই ছবি খুলিয়ে রাখলেন। ... কি সুর সাহেব, ঠিক বলছি তো?

সুর – কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয়!

বাবা – আহা, উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন। আপনি তো আসল ক্রাইম করেনই নি। ... আপনি একাও ড্রাগ সাপ্লায়ারকে ফোন করে জানানও নি। ড্রাগের নেশা তো , আপনাদের তিনজনেরই। ... সেই ড্রাগ নেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে, আপনারা তো আপনাদের কাজে কন্সেন্ট্রেটই করতে পারবেন না, তাই না! ... সেই জন্যই তো ফোন করে বলেছিলেন সেই কথা। কিন্তু তখনও কি আপনারা জানতেন , আপনাদের এই ড্রাগ আর আপনাদের এই ফোন , আপনাদের বন্ধুর প্রাণ নিয়ে নেবে! ... না ঘনাক্ষরেও জানতেন না। তবে হ্যাঁ , জানলে যে এমনটা করতেন না আপনারা , তা কখনোই নয়। ড্রাগের নেশা যারা করেন , তাঁদের কাছে ড্রাগের থেকে বড় যে কিছুই হতে পারেনা।

তবে সুর সাহেবকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া একদমই ঠিক নয়। উনি কিন্তু এখানে শুধুই একজন আজ্ঞাবাহ দাস ছিলেন। দোষ যদি উনাকে কিছু দিতে হয় , তবে সেই দোষ তো সুদেষ্ণা আর ববিকেও দিতে হয় , কারণ অরাও তো সেই একই ড্রাগের নেশায় চুর। ... প্রতিদিন রাত্রে , যেমন কালকে এসেছিলেন আর আমরা তাঁদের হাতেনাতে ধরি, সেই ভাবেই রোজ এসে ড্রাগের নেশা করে যান। ... ইল্লিগাল নেশা করার অপরাধে, কিছু তো শাস্তি হবে, কি হবেনা বাদল!

বাদল স্যার – তাহলে এই সিন্দিয়াই আসল কালপ্রিট, তাই তো? সেই সবাইকে ড্রাগ সাপ্লাই করতো।

বাবা – দাঁড়াও দাঁড়াও, এত উত্তেজিত হলে চলবে বাদল। সরষের মধ্যে ভুত বোঝো। ... এখানে মাছ অত্যন্ত গভীর জলের খেলারি। ... একটু খেলিয়ে খেলিয়ে না তুললে , সরাসরি ছিপই ভেঙে দেবে ... কি সিন্দিয়াজি, ঠিক বলছি তো?

সিন্দিয়া – আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন? ...

বাবা – ও তাই, সেদিনও কিচ্ছু বুঝতে পারেন নি, তাই না যখন সুনন্দাদেবীর গাড়িতে ব্রেকফেল হলো?

সিন্দিয়া – ওটার সাথে আমার কনো সম্পর্ক নেই। ... আমি কিচ্ছু জানি না ওই ব্যাপারে। ... ওটা একটা এক্সিডেন্ট ছিল।

বাবা – আচ্ছা, হুম। ... তো এক্সিডেন্টে কি কি হয়েছিল?

সিন্দিয়া ভ্রু কুঁচকে বললেন – এইসা ফালতু শওয়াল করকে সময় কিউ বরবাদ করতে হে আপ। হামারা সময়কে বহত দাম হে।

বাবা এবার একবার বাদলস্যারের দিকে কটমট করে তাকালেন । বাদল স্যার সরাসরি গিয়ে , সিন্দিয়ার গালে একটি সপাটে থাপ্পড় কষিয়ে গালে পাঁচআঙ্গুলের দাগ বসিয়ে দিয়ে বললেন – ইল্লিগাল নেশা করা আর সকলকে করানো, তারপর আবার বড় বড় কথা! ... আদালত যদি তোকে ছেড়ে দেয় না , তারপর আমি ...

বাবা একটু কেশে বললেন – বাদল এখানে প্রচুর ক্যামেরা আছে, লাইভ হচ্ছে।

বাদল স্যার থেমে গেলেন। ... বাবা এবার সিন্দিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন , বলুন সেদিন এক্সিডেন্টে কি কি হয়েছিল। আধমরা হয়ে জেলে না যেতে চাইলে , বলে ফেলুন ভালো ছেলের মত। ... আপনার বিজনেস, আপনার প্রতিষ্ঠা, তাতে আপনি নিজেই প্রস্রাব করে দিয়েছেন , সেই নিয়ে আর ধুয়ে খেতে পারবেন না। পেচ্ছাপের গন্ধ এসে গেছে তাতে। ... তাই ভালো ছেলের মত বলে ফেলুন... (চেঁচিয়ে উঠে) কথা কানে ঢুকছে না। ... বলুন ।

সিন্দিয়া একটু চমকে গিয়ে বললেন – ব্রে...ব্রেক ফেল হয়ে গেছিল গাড়ির। তাতে সুনন্দাজি আর উনার ড্রাইভার চোট পায়।

বাবা – হুম, সুনন্দা দেবী, কি ঠিক বলছেন সিন্দিয়া? ... না আপনি কিছু এড করবেন তাতে?

সুনন্দা দেবী একটু কড়া ভাবে – যা হয়েছিল, তা তো আপনার সামনেই হয়েছিল । ... আপনিও তো দেখেছিলেন, এক্সিডেন্ট হয় ব্রেক ফেলের জন্য।

বাবা – উমহুম, ভুল বললেন আপনি। আমাকে যেটা দেখানো হয়, সেটা হলো এই যে, আপনার ড্রাইভার হঠাৎ জানতে পারেন যে , আপনার গাড়ির ব্রেকফেল হয়ে গেছে। তারপর ভিড় রাস্তায় , আপনার গাড়ি একবারো ব্রেক না মেরে , সরাসরি লর্ডসের মাঠে নেমে পরে , গাছে ধাক্কা মেরে , সামান্য চোট দেয় আপনাদেরকে। ... কি এটাই দেখিয়েছিলেন তো আপনি! ...

সুনন্দা – এ আবার কেমন ধারার কথা। যা হয়েছে , তাই দেখেছেন আপনি। এখানে দেখানো হয়েছে , ইত্যাদি কথা বলে আপনি কি অহেতুক প্রেসারাইজ করার চেষ্টা করছেন!

বাবা – অহেতুক, তাও আবার প্রেসারাইজ। ... কই বাদল, একটু ট্র্যাফিক রেকর্ডস্‌টা দাও তো। ...

বাবা এবার মিডিয়ার দিকে ফিরে – লাইভ করছেন তো আপনারা। একটু এই সিটের উপর জুম করুন ক্যামেরা। সকলেই দেখতে পাবে। ... কি লেখা রয়েছে এখানে ? ... গরিয়াহাট মোড়ে গাড়ির স্পিড কত, ৩২ কিমি প্রতি ঘণ্টা, গোলপার্কে কত দেখাচ্ছে?

রিপোর্টাররদের উত্তর এলো – ১৮ কিমি প্রতি ঘণ্টা।

বাবা – হুম, যাদবপুর থানায় স্পিড ৪৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা, আর সাউথ সিটিতে কত স্পিড দেখাচ্ছে?

রিপোর্টাররা – ১৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা।

বাবা এবার সুনন্দাদেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন – যা হয়েছে, তাই দেখিয়েছেন না আপনি ম্যাডাম!

সুনন্দা দেবী এবার চুপ করে গেছেন। অন্তরে অন্তরে ফুঁসছেন যেন। সেই দেখে বাবা আবার বললেন – সন্দেহ আমার রাস্তাতেই হয়েছিল ম্যাডাম , কিন্তু সন্দেহ পাকাপাকি হয় , যখন বাদলের বাড়িতে বসে , আপনি হোয়াটসঅ্যাপে থাম্ব চালাচালি করছিলেন, আপনার সাক্রেদ, ওরফে সিন্দিয়ার সাথে।

বাবার দিকে এবার অগ্নিগর্ভ মুখ নিয়ে তাকিয়ে সুনন্দার হিংস্র মুখ প্রকাশ্যে এসে গেল । বাবা হেসে বললেন – চোরের মায়ের বড় গলা শুনেছিলাম, এতো দেখছি, চোরের রাগ পুলিশের মত।

বাবা আবার বলতে থাকলেন – সুনন্দাদেবী, ড্রাগের ব্যাবসা তো আপনার। ... সমস্ত থানার ইন্সপেক্টরদেরও কিনে রেখে দিয়েছেন আপনি। কিন্তু আপনার ইনফ্লুয়েন্সের কথা তো সুর , ববি আর সুদেষ্ণাও জানেনা। ... তাই তারা ডিল করেন শুধুই সিন্দিয়ার সাথে। তারা জানে যে সিন্দিয়াই সমস্ত সাপ্লাই দেন। কিন্তু সাপ্লায়ার তো আপনি। ...

তাই সুরদের ফোন যায় সিন্দিয়ার কাছে , মধ্যপ্রদেশ থেকে কল, ১৮ই মার্চ, সকাল ১০.৩০এ। আর ঠিক ১০.৩২এ সিন্দিয়ার কল আপনাকে। আর তারপর আপনার দুই দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু। ... ববির তোলা ছবি চেয়ে নিলেন , আর সেটা আলোছায়াতে দিয়ে , তাতে সুপার ইম্পোজ করালেন ভূতুরে ট্যাটু। ... আর তারপর এনিগ্মা হোটেলে ঘর নিয়ে , সেখান থেকে লেজার ফেলে , ভয় দেখিয়ে মেরে ফেললেন মহিমা মিত্রকে।

কিন্তু সেটা তো আপনার প্ল্যানের একটা দিক। অন্য প্ল্যানের দিক ছিল এই যে সমস্ত এটেনশন সিন্দিয়ার দিকে নিয়ে গিয়ে, এমন ব্যবস্থা করা যাতে ফাঁসলে উনি ফাঁসেন, আর আপনি অক্ষত থাকেন। ... কি তাই তো?

সুনন্দা – কি আবোলতাবোল বলছেন আপনি!

বাবা – হোটেল এনিগ্মার রুম আপনার সইসহ আপনার নামে বুক করা , আর লেজারেও আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে ম্যাডাম। আর তারই সাথে আলোছায়ার রেজিস্টারেও আপনার সই। ... আর শুধু তাই নয়। ... হাটেহাড়ি সিরিয়ালকে ডাউন করিয়ে দিয়ে , মহিমাদেবীকে সিন্দিয়াকে দিয়ে শাসানো , আর তারপর আপনার নিজের শাসানো , যা দিয়ে আপনি প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে সমস্ত প্রেশারটাই কেরিয়ারের প্রেশার। ... সেটাও তো আপনারই প্ল্যান। ...

অর্থাৎ, আপনিই একদিকে ভুতের ভয় দেখানোর প্ল্যান অতি গোপনে , মানে ববি, সুদেষ্ণা, সুর, এমনকি আপনার সাক্রেত, সিন্দিয়াকে না জানিয়েই করেন। আর অন্যদিকে সিন্দিয়া আপনাকে শাসাচ্ছেন , আর সেটা প্রফেশনাল একটা ব্যাপার , সেটা দেখানোর চেষ্টা করে , এমন প্রমাণ করতে চান যে প্রফেশনের প্রেশার হ্যান্ডেল না করতে পেরে, মহিমা দেবী হার্ট অ্যাটাক করেন।

ইন্সপেক্টর সাঁতরা – আমাকে আটকে রাখা হলো কেন তবে? ... একজন ইনচার্জ অফিসারকে আটকে রাখা কত বড় ক্রাইম, আপনি জানেন?

বাবা – সুনন্দাদেবীকে সিন্দিয়া বলার পরেও তো উনি কনো একশন নেন নি ইন্সপেক্টর সাঁতরা। ... মহিমাদেবী আপনার কাছে যখন এফআইআর করতে আসেন , তখন আপনি উনার একটা ডায়রি নেন , ডায়রি নম্বর ২০২২-০৩-১১৯। আর তার পরেপরেই আপনার ফোন যায় , সুনন্দাদেবীর কাছে, যেখানে আপনি বলেন, মহিমাদেবী একশন নিচ্ছেন, কারণ ববি, সুররা, না জানলেও, আপনি তো জানতেন, এই সমস্ত কিছুর পাণ্ডা হলেন সুনন্দা দেবী। ... তাই , প্রথম আপনি ক্রিমিনালকে সাহায্য করার জন্য দোষী , এবং দ্বিতীয় অন-ডিউটি অ্যান্ড অফ-ডিউটি ড্রাগ নেবার জন্য আপনার পুলিশের চাকরি তো যাবেই , সঙ্গে জেলও হবে।

বাবা এবার বাদলস্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন – বাদল, এরেস্ট ডেম অল। ... ডা মেন ক্রিমিনাল অ্যান্ড মাস্টারপ্ল্যানার হলেন সুনন্দাদেবী। আর অন্য সকলেই ড্রাগ নেওয়া এবং সরবরাহ করার সাথে যুক্ত।... প্রমাণ সমস্ত তোমার কাছে আছে। ... বাকি তুমি করে নিতে পারবে, আশা করি।

সকলকে নিয়ে চলে যাওয়া হলে, বাদল স্যার এবার বাবার কাছে এসে, বাবাকে জরিয়ে ধরলেন। ... বাবা হাসিমুখে বললেন – বাদল, যা করেছেন, তা ঈশ্বর করেছেন। আমি শুধুই একটা মাধ্যম মাত্র। ... তাই ধন্যবাদ দিও না আমায়।

বাদলস্যার – জানেন বিজয়দা, আমি আপনার কথা এসে দিদিকে বলেছিলাম , ইরা কেসের পরে। দিদি আপনার সাথে মিট করার জন্য খুব উত্তেজিত ছিলেন। পরে দুদুবার আমাকে মনেও করিয়েছিলেন , আপনাকে একবার উনার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য। ... আমিই কিছুতেই সময় বার করতে পারিনি । ... দাদা, আপনাকে পারিশ্রমিক আমি কিই দিই বলুন তো। ... দিদির মন উদার। ... দিদি হয়তো, আপনাকে একটা খুব মূল্যবান জিনিস দিতেন, এমন মনে মনে ঠিক করেছিলেন। ... কিন্তু আমি কি দিই?

বাবা হেসে – বাদল। দেহ ছেড়ে দিলেও, দেহের প্রতি আসক্তি মানুষের যায়না। ... তোমার দিদি নিশ্চয়ই দেখছেন আমাকে; হয়তো তিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখন। তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি ভালো করে করো, যাতে তিনি তাঁর পূর্বের শরীর থেকে মুক্ত হয়ে নতুন শরীর নিতে পারেন। ... আর হ্যাঁ , পারিশ্রমিক। ... পারিশ্রমিক তুমি দেবে অবশ্যই, কারণ কেসটা তোমার। ... আমি কারুর থেকে আজ পর্যন্ত ২৫ হাজারের বেশি পারিশ্রমিক নিই নি বাদল। এরপর তুমি সিদ্ধান্ত নেবে । ... তবে আমার একটাই জিনিস এখানে

চাওয়ার আছে। মহিমাদেবী একটি বই লিখছিলেন , অভিনয়-বিজ্ঞান বলে। ... সমাপ্ত হয়েছে কিনা জানিনা। তবে আমাকে শুধু ওইটাই দাও। ...

আর হ্যাঁ, ২৫এর বেশি তুমি আমায় দেবেনা। কারণ এই কেস অনেকের মনস্কাম পুড়ন করেছে। প্রথম তোমার প্রয়াত দিদির, আর দ্বিতীয়ত আমারই এই বোন, সুমনার। তার খুব ইচ্ছা ছিল, আমার সাথে একটি কেসে সে একসাথে কাজ করবে।

বাদলস্যার – আমি সমস্ত কাজ করে , দুদিনের মধ্যে আপনার বাড়ি যাচ্ছি। দিদির বই , আর পারিশ্রমিক নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি আমি। ... আর হ্যাঁ , দাদা, খুব খুব ধন্যবাদ আপনাকে। ... সত্যি বলতে , আপনার বুদ্ধির রহস্য তো আমি ভেদ করতে পারিনি। কিন্তু এমন বুদ্ধি আমি নিজে কখনো সামনাসামনি দেখিনি।

বাবা হেসে বললেন – রহস্য হলো বিকারমুক্ত বুদ্ধি। ... যাচনা , কল্পনা আর যোজনা , এই তিন বিকার বুদ্ধির গতি কমিয়ে দেয় , আর সত্যের অন্বেষণ করতে না দিয়ে , আজগুবি ভাবনার মধ্যে বুদ্ধিকে পতিত করে দেয়। ... এই তিন বিকারের থেকে বুদ্ধিকে বার করে আনতে যেই পারবে , তার বুদ্ধিই এমন হয়ে যাবে। ... তাই এই বুদ্ধি আমাকে ভগবান উপহার দেন নি , বরং যেই যাচনা, যোজনা আর কল্পনা করতে পারাকে জগত মনে করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ , সেই সমাজকথিত আশীর্বাদের থেকে আমাকে তিনি মুক্ত রেখে, আমার উপর এই অভাবনীয় কৃপা করেছেন।

বাবা আর আমি সুমনাপিসির সাথে চলে এলাম। ... বাবা ফিরতে ফিরতে পিসিকে বললেন – হ্যাঁ রে, মন ভরেছে, না এখনো ভরেনি।

পিসি হেসে বললেন – যা দেখলাম, তাতে মনে হলো কনোদিনও মন ভরবে না। ... সমস্ত ড্রামার নির্দেশক ছিলেন সুনন্দা। এতো ভাবতেই পারা যায়না। ... কি করে এমন করে ভাবতে পারলে তুমি?

বাবা – আবেগ রাখতে নেই ব্যাস। ... ইনি ভালো , ইনি খারাপ, এই ভাবনাই আমাদেরকে ভুল পথে চালনা করে। ... সুনন্দা যখন বাদলের ঘরে বসে হোয়াটসঅ্যাপ চালাচ্ছিল , আমি খালি দেখে নিয়েছিলেম দুটি কথা। সিন্দিয়ার মেসেজ , প্ল্যান একজিকিউটেড? ... সুনন্দার থাম্ব দিয়ে উত্তর। ... নেক্সট মেসেজ , চোট বেশি লাগে নি তো? ... উত্তর, লাগেই নি। কিন্তু একটু তো এক্টিং করতেই হবে।

বাবা হেসে বললেন – ব্যাস বুঝে গেলাম , আসল কাণ্ডারি এই সুনন্দা আর সিন্দিয়া মিলে মিশে। ... বাকিরা ওদের নেশার ট্র্যাপে পরে রয়েছে। ... তারপর আর কি , মাথা সুনন্দা না সিন্দিয়া , সেটা বুঝতে

হতো, তাই শান্ত মনে একটু কেশ সাজালাম ক্রিমিনাল সাইকোলজি অনুসারে। ... সেখানে দেখলাম , ক্রিমিনাল নিশ্চয়ই নিজেকে ভিক্টিম করে দেখানোর চেষ্টা করবে। ... ব্যাস তারপর কেস পরিষ্কার হয়ে গেল। ...

এর সাথে ঈশ্বরের সহযোগিতা তো রয়েছেই। তিনি সাহায্য না করলে , লেজারের ব্যাপারটা কিছুতেই ধরা সম্ভব হতো না। ...

পিসি – কিন্তু ড্রাগের ব্যাপারটা কি ভাবে বুঝলে তুমি?

বাবা – ববির নার্ভ দুর্বল। ... ওকে জেরা করার সময়েই দেখেছিলাম , ওর হাত মাঝে মধ্যেই কেঁপে উঠছে। ... আর এটাও দেখলাম যে সুদেশ্না সেটা বারবার থামিয়ে দেবার জন্য ওর হাতে হাত রাখছে। আর সুরকেও একবার দেখি যে সুদেশ্নাকে চোখের ঈসারা করে বলে দেয় যে ববির হাত কাঁপানো বন্ধ করতে। ... বুঝে গেলাম যে এঁরা কিছু লুকাচ্ছে। হাত নার্ভাস ব্রেকডাউনের কারণে কাঁপে। সেটা রোগ হতে পারে, কিন্তু রোগ হলে, হাত কাঁপাতে কারুর আপত্তি থাকতো না। ... ববির দুই বন্ধুর সেই হাত কাঁপাতে আপত্তি, এর মানে, সেই হাত কাঁপলে, তারাও ফেঁসে যেতে পারে। ... এরপর তো শুধুই দুয়ে দুয়ে চার।

তারপর যখন সুনন্দা আর সিন্দিয়ার মধ্যে চয়েসের অপশন এসে যায় , তখন কার সাথে পুলিশের যোগাযোগ খুব বেশি, সেটা তো তোর দাদাকে প্রশ্ন করেই জেনে গেছিলাম। তুইই লাইনটা তোর দাদাকে দিয়েছিলিস, মনে আছে তো!

পিসি – পুলিশের সাথে তারই যোগাযোগ র্যা ন্ডম ভাবে থাকবে , যে ড্রাগের ব্যবসা করে। ... হুম। কিন্তু তুমি ডায়রির নম্বরটা কি করে জানলে, যেটা মহিমা মিত্র, সাঁতরাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন?

বাবা এবার জোরে হেসে উঠলেন – তোর মনে হয় একজন ড্রাগ অ্যাডিক্টের ডায়রি নম্বর মুখস্থ থাকবে। ... সুনন্দা যখন থেকে মুভ করতে আরম্ভ করেছিলেন , সেটা মেলালেই বোঝা যায় যে, মহিমাদেবীরা বেড়িয়ে ফিরে আসার পরই সেই প্রসিডিং শুরু করেন উনি। ... তাই , মহিমাদেবী যদি মুভ না করতেন , তবে সুনন্দাও মুভ করা শুরু করবে না। ... বাদলকে তিনি বলেন নি , কারণ যদি বলতেন বাদল এই কেসের ব্যাপারে অনেক কিছুই আগে থেকে জানতো। ... অর্থাৎ পুলিশে কমপ্লেন করতে গেছিলেন মহিমা দেবী। ... কিন্তু পুলিশ তো সুনন্দার সাথে যুক্ত। তাই এফআইআর তো নেবে না পুলিশ। ...

ডায়রি নিয়ে, সরাসরি সুনন্দাকে ইনফর্ম করা হয় ; তারপরেই সুনন্দার মুভমেন্ট শুরু হয়। ... তাই একটা ডায়রির নম্বর বলে দিলাম। ডায়রির নম্বরের প্যাটার্ন তো জানাই আছে। ... আর মাসের মাঝখান , মানে

১০০টার উপর কেস তো হয়েই গেছে । ... তাই একটা বলে দিলাম , ডায়রির নম্বর তো সাঁতরারও মনে নেই। কিন্তু গল্প মিলে যেতে , ও বুঝলো যে ও ধরা পরে গেছে। তাই চুপ করে গেল। পিসি – আসল কথাটা কি জানো বিজয়দা। ... তুমি জিনিয়াস , এক্সট্রাওরডিনারি, এসব অনেক পরের কথা ; আসল কথা হল এই যে তোমার মনঃসংযোগ। ... এতটা বেশি মনঃসংযোগ তোমার যে, সময়ে গতিকেও ছাড়িয়ে আর ছাপিয়ে বেড়িয়ে যাও তুমি। ... যদি এটা প্রতিভা হতো , তবে হয়তো কপি করা যেত। কিন্তু তোমারটা কনো প্রতিভা নয়। ... এমন মনঃসংযোগ রাখতে পারলে , যে কেউ এই ভাবে কেস সলভ করতে পারবে , কিন্তু এম ন মনঃসংযোগ যে এক ঋষির থাকে , আর কারুর থাকে নাকি ?

মুখোশ

অকস্মাৎ একটা ভালো কেস সামনে এসে গেলে, বেশ মন্দ লাগেনা। তবে এবারে যেই কেসটি অকস্মাৎ এসে গেছিল, সেটি একটি প্রচণ্ড জট পাকানো কেস। এই ক্ষেত্রে এমন নয় যে প্রথমে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালানো হয়; কেসটা খুনেরই, কিন্তু কেসের জটগুলি এতো বেশী যে, তা খুলতে খুলতে বেশ সময় লেগে যায়।

কেসের সাথে আমাদের আলাপ রিপোর্টারের বেশেই। মানে বাবাকে একটি অনামা, সান্ধ্য সংবাদপত্র, নাম বিকাল বিকাল এসে যোগাযোগ করে, কেসটার কভারেজ করতে বলে। আমি আর বাবা সেখানেই যাই, খুনের কেসের কভারেজ করতে, কিন্তু প্রতিবার যা হয়, বাবা রিপোর্টার হয়ে যান, আর আলটিমেটলি, বাবাকেই কেসের তদন্ত করতে হয়, এবারেও তেমনটাই হলো।

খুন হয়েছেন, বিশিষ্ট ব্যবসাদার, সমরেশ হালদার। প্রথমজীবনে উনি প্রমটার ছিলেন, কিন্তু পরের দিকে, তিনি এক এক করে অনেক কিছুর ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করে দেন। ইলেকট্রিকের তার, সুইচ, প্লাগ, হোল্ডার, আর যাবতীয় ইলেকট্রিকাল গুডস্ ম্যানুফ্যাকচারিং করার জন্য, সারা পশ্চিমবঙ্গে উনার ৬টি ফ্যাক্টরি ছিল। আর সাথে সাথে কলের কাজেরও সমস্ত কিছুর ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করে দিয়েছিলেন। মুখ ধোবার বেসিন থেকে, বিভিন্ন ধরনের কল, বাথটাব, স্যানিটারি, কলের পাইপ, ওয়েস্ট পাইপ সমস্ত কিছু।

সব মিলিয়ে উনার এখন ৯টি ফ্যাক্টরি ছিল, যাতে সর্বসাকুল্যে ২৪০০ কর্মী দুই শিফটে কাজ করতেন। আর তা ছাড়াও উনার নিজের ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ছিল, যেখানে মার্কেটিং-এ কাজ করতেন প্রায় ৪০০ জন পশ্চিমবঙ্গে আর ৬০০ জন বাকি ভারতে। আর তিনটি অফিস ছিল, যাদের একটি হলো হেড কোয়ার্টার। ইদানীংকালে ইনি নাকি খুব গোয়ালিয়র যাতায়াত করছিলেন, সেখানের রাজবাড়ির কাজ করার জন্য। উনি নাকি সেখানের রাজবাড়িতে অসাধারণ কাজ করেছেন, যেখানে উনি কলের কাজে, বেশ কিছু হিরে-জহরতেরও ব্যবহার করেছেন। আর তারই সাথে, সেখানে যেই ঝাড়বাতি দিয়েছেন, তাতেও নাকি বেশ মূল্যবান পাথর ব্যবহার করে সকলকে চমক দিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই নিয়ে পেপারে বেশ লেখালেখিও হয়েছে। আসলে বাঙালীর দাপট আগের মত আর নেই। হ্যাঁ বাঙালীরা বিভিন দিকেই কাজ করছেন; বড় বড় কোম্পানির মালিক হয়ে বসে রয়েছেন তাঁরা, কিন্তু তাঁরা বাংলায় ফেরেন না, তাই বাঙালীর নাম অব্যহত থাকলেও, বাংলার নাম কমে এসেছে। সেই কারণেই বাংলার গুণগান করার সুযোগ পেলে, সংবাদমাধ্যমরা সেটা আর ছারেনা।

বিকাল বিকাল সংবাদপত্রের মালিক বাবার কাছে আগেই এসেছিলেন, এই সমরেশ হালদারের একটা ইন্টার্ভিউ নেবার জন্য। অ্যাপয়েন্টমেন্টও হয়ে গেছিল, পরের সাপ্তহের সোমবার ছিল সেই ডেট। কিন্তু তার আগেই, শনিবারেই উনার হত্যা করা হয়। তাই আমরা উনার কাছে গেলাম, কিন্তু ইন্টার্ভিউ নিতে নয়, বরং উনার মৃত্যুর কভারেজ করতে।

সেখানে যেতে দেখলাম বেশ ভিড়। এতবড় ব্যাবসাদার বলে কথা। তাই ভিড় তো হবেই । কিন্তু একটা জায়গার পর দেখলাম আর কারুকে যেতেই দিচ্ছে না। বাবা আমাকে নিয়ে একটু ঠেলেঠুলে সেই জায়গায় যেতে দেখলাম, এই যেতে না দেবার কারণ হলেন মুখ্যমন্ত্রী, স্যান্নাল মহাশয়।

সমরেশ বাবু নাকি উনার নিজের শালা। তাই উনি নিজের পত্নীকে নিয়ে এসেছেন, যিনি সমরেশ বাবুর মৃতদেহের থেকে সামান্য দূরে বসে, বসে কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছিলেন। বাবাকে দেখে মুখ্যমন্ত্রী, মানে স্যান্নাল মহাশয় বললেন – কি ব্যাপার বিজয়! তুমি এখানে?

বাবা একমুখ হাসি নিয়ে বললেন – বিকাল বিকালের হয়ে কভারেজ করতে স্যার।

মুখ্যমন্ত্রী – হুম, আমার শালা হন, নিজের শালা। পত্নীকে নিয়ে এসেছিলাম। খুনিও ধরা হয়ে যাবে শীঘ্রই; বাড়ির সবজি কাটার ছুরি দিয়ে গলার নলি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত বাড়ির কাজের লোকের কাজ।

বাবা – আর মটিভটা?

মুখ্যমন্ত্রী – উনার একটা অষ্টধাতুর গোপাল ছিল, তাতে অনেক মণিমাণিক্যও ছিল। এই দেরাজে থাকতো (একটি খোলা আলমারির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে)। এটাও হাওয়া। অর্থাৎ খুনি এই মূর্তিকেই হাতাতে গিয়ে, ব্যাঘাত পেয়ে, এই খুন করে। পুলিশ অফিসার তো এমনই বলছেন। ... কই বাড়ুই!

অফিসার বাড়ুই – হ্যাঁ স্যার। সিম্পিল কেস ওফ ডেকয়ীটি।

বাবা – হুম, সে তো বুঝলাম স্যার, কিন্তু খুনের অয়েপন এই ছুরি নয়।

অফিসার বাড়ুই – হোয়াট ডু ইউ মিন! ... অ্যান্ড হু আর ইউ, একজন রিপোর্টার এবার আমাকে ...

মুখ্যমন্ত্রী বলে উঠলেন – উমম্ বাড়ুই, তুমি জানো ইনি কে? ইনি ইরার কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। ... না জেনে শুনেই কথা বলতে শুরু করে দাও, এই তোমাদের প্রবলেম। ... (বাবার দিকে তাকিয়ে) ক্যান ইউ জাস্টিফাই, বিজয়!

বাবা – একটু নজর দেবেন স্যার। একটা সবজি কাটার ছুরিতে এতটাও ধার থাকতে পারেনা, যার দ্বারা একবার চালানোতেই গলার নলি ছিঁড়ে যাবে। ... খেয়াল করে দেখুন, গলায় কিন্তু ছুরি একবারই চালানো হয়েছে, একাধিক দাগের নিশানা নেই। অর্থাৎ ধারালো কনো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এবং যিনি সেটা চালিয়েছেন, তিনি একজন প্রফেসানাল, কারণ তা নাহলে, একবারে গলার নলির আন্দাজ পাওয়াও অসম্ভব। ... অর্থাৎ, এই ছুরিটি মার্ডার অয়েপন তো নয় স্যার। আর দ্বিতীয় কথা, যদি বাড়ির কেউও এই খুন করে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি একজন প্রফেসানাল কিলার।

অফিসার বাড়ুই এবার একটু থিতিয়ে গিয়ে, একটু খতিয়ে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করে, মুখ্যমন্ত্রীর দিকে একটু আমতা আমতা করে তাকালে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন – কি বাড়ুই! ও ঠিক বলছে?

বাড়ুই – হ্যাঁ স্যার, এবসোলিউটলি কারেক্ট হি ঈজ। ... আসলে ... এতটা ...

মুখ্যমন্ত্রী এবার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন – ইনভেস্টিগেট করবে নাকি বিজয় কেসটা! ... স্পন্সরার আমিই হবো। আমার কাছের আত্মীয়। তাই আমার এখানে স্পন্সারার হতে রাজনৈতিক ভাবেও কনো অসুবিধা হবে না।

বাবা এবার বাড়ুইএর দিকে তাকালে, বাড়ুই বললেন – আই হ্যাভ নো অব্জেকশন। স্যার বললে, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে এসিস্ট করবো। রিসেন্টলি, আপনিই ওই অভিনেত্রী, মহিমার কেসে সাঁতরাকে ধরেছিলেন, তাই না!

বাবা – হ্যাঁ, সেই জন্য আপনি আবার ভয় পাচ্ছেন নাকি!

বাড়ুই এবার হাসিমুখে বললেন – না না, জাস্ট টু আইডেন্টিফাই। আমি পুরো সাফ স্যার। ... আপনার সাথে কাজ করতে খুব ভালো লাগবে স্যার। অনেক শুনেছি, আপনার ব্যাপারে। সাখ্যাতে আপনার এসিস্ট করবো, কখনো ভাবিনি।

মুখ্যমন্ত্রী – অগ্রিম!

বাবা – স্যার, কাজটা করি। তারপর না হয়, আপনার যা মনে হয়, তাই দেবেন। ... একজন বাঙালী মাথা উঠিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন; সেই বাঙালীর শত্রুকে খুঁজে বার করাটাই, আমার মনে হয় সব থেকে বড় কাজ।

মুখ্যমন্ত্রী – ওকে, তবে তাই হোক। বাট, বিনা পারিশ্রমিকে নয় বিজয়।

বাবা – স্যার, আগে পরিশ্রম করি, তারপর নয় পারিশ্রমিকের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু আপাতত, আমাকে একটি সাহায্য করে দিতে হবে। আমাকে আর আমার এই কন্যাকে এই বাড়িতে, দিন সাতেকের জন্য থাকার পারমিশন করে দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী – ওকে , নো প্রবলেম। তুমি আজই চলে আসো। এখানেই থাকবে। এই রেবা (মুখ্যমন্ত্রীর শালার কন্যার নাম) ... উনাদের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও।

বাবা – এই ফ্লোরে, মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে হলেই ভালো হয়।

মিসেস রেবা – কিন্তু এই ফ্লোরে তো খালি কাজের লোক আর অতিথিরাই থাকেন।

বাবা – আমরাও তো অতিথি হয়েই থাকতে চাইছি ম্যাম।

মিসেস রেবা – আসলে, তিনটে অতিথির ঘর, আর তিন ঘরেই একজন একজন করে আছেন। ... (এবার সম্ভবত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে) আপনারা কিছুদিনের জন্য একটু এডজাস্ট করে নিতে পারবেন!

একজন অতিথি এঁদের মধ্যে সাধুগোচের। পরনে তাঁর গেরুয়া ঠিক নয়, একটু হলদেটে পোশাক, আর মুখে বড়দাড়ি, সঙ্গে বড় চুল। উনি একটু তামিল টোনে বললেন – কহি তক্লিব নেহি, কহি তক্লিব নেহি।

দ্বিতীয় একজন ন্যাড়া মাথা আর কানে দুল পরা। পরে জেনেছিলাম, উনি ইঞ্জিনিয়ার। উনি এবার বললেন – আপ মেরে রুমমে শিফট হো যাইয়ে। মেরা কোই প্রবলেম নেহি হে। ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমি আর বাবা বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে গোছগাছ করে, ফিরে গেলাম ওই ডাইমন্ড হারবার রোডের উপর আলিশান বাড়িতে।

পথে গাড়িতে যাতায়াত করার সময়েই বাবা খুনের মামলার রিপোর্ট করে, বিকাল বিকালের মালিককে এমেইল করে দিলেন। অগ্রিম ৫ হাজার দিয়েছিলেন, আরো ৫ দিয়ে দিলেন উনি অনলাইনে। আমিও

বেশ বুঝতে পারলাম, বাবা এই কেসের তদন্তকে সঠিক দিশায় নিয়ে যাবার জন্যই ওখানে থাকতে চেষ্টা করলেন। তাও একবার প্রশ্ন করলাম – আচ্ছা বাবা, বাড়িতে থেকেও তো কেসটা হ্যান্ডেল করা যেত; যেত না!

বাবা – খুনটা কখন হয়েছে?

আমি – ডাক্তারের রিপোর্ট অনুসারে ভোর বেলায়।

বাবা – সিকিউরিটি আর সিসিটিভি ক্যামেরা রিপোর্ট কি বলছে, প্রথম লোক কে আর কটায় বেরিয়েছে মেনগেট দিয়ে?

আমি – ঘর থেকে কেউ তো বারই হয়নি। প্রথম তো পুলিশের গাড়ি এসে ঢোকে, তারপর সমস্ত রিপোর্টারদের গাড়ি।

বাবা – হুম এর মানে কি? এর মানে এই যে, গোপালের মূর্তি যেই চুরি করে থাকুক না কেন, বাড়ির বাইরে এখনো নিয়ে যেতে পারে নি। ... বাড়ুই-এর কথা অনুসারে, উনি খুন দেখেই বুঝতে পারেন যে, বাড়ির কেউই খুন আর ডাকাতি করেছে। তাই উনি সমস্ত গেট সিল করে দেন। অর্থাৎ কেউ বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে যেতে পারেনি। মানে? ...

আমি – মানে বাড়ির গোপাল স্থানচ্যুত হয়েছে, কিন্তু বাড়িতেই আছে। আর যেই চুরি করে থাকুক, সে সেটাকে কনো না কনো ভাবে বাড়ির বাইরে চালান করার চেষ্টা করবেই। ... সেটা ধরে ফেলতে পারলেই, কেস শলভড়্।

বাবা – এই তো মেয়ের মাথা কাজ করছে।

আমি – সেই জন্যই তুমি, গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঘর নিলে! ... আচ্ছা বাবা, ওই অতিথি তিনজনকে দেখে তোমার কি মনে হয়!

বাবা – হুম, সন্দেহের ঊর্ধ্বে কেউই নয়। তবে কাকে কতটা সন্দেহ করতে হবে, ওই বাড়িতে উঠে, সকলের সম্বন্ধে জেনে, তবেই করাটা ঠিক হবে। ... হ্যাঁ, অতিথি মানে বাইরের লোক, সেটা ঠিক। কিন্তু সমরেশ হালদারের মত বিচক্ষণ মানুষ কি যাকে তাকে অতিথি করে রাখবেন! ... শুনেছি, উনি নাকি সখের ডিটেকটিভও ছিলেন। ... ছোটখাটো অনেক কেসও শলভ করেছেন উনি। ... বাড়ুই বলছিল, উনি নাকি

প্রথম পুলিশে জয়েন করার পর, সমরেশ বাবুর থেকে অনেকবার কেস শলভ করা নিয়ে সাহায্যও পেয়েছেন। বাড়ুই-এর কথা অনুসারে, দুইচারটে গোয়েন্দা গল্পও নাকি উনি লিখেছিলেন। তবে, তার পরপর ব্যবসা বেড়ে ওঠার জন্য, সেই নিয়ে আর এগোনো সম্ভব হয়নি। ... সেই ব্যক্তি যদি কিছু ভুল করেন, তবে সেটা আবেগের ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু অতিথির ক্ষেত্রে কি আবেগ চলে!

আমি – আবেগ মানে, ঘরের লোকদের কথাই তুমি বলছো! ...

বাবা – হুম, তা না হলে, গোপাল কোথায় থাকে, আর সেই আলমারির চাবিই বা কোথায় থাকে, সেটা কেই বা জানতে পারে!

আমি – তারমানে, ঘরের মধ্যেই কেউ খুনি লুকিয়ে আছেন, আর তিনি প্রফেসানাল কিলারও। ... মার্ডার অয়েপনও তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার মানে, মার্ডার অয়েপনও লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। ... আচ্ছা বাবা, এর মানে তো এটাই হয় যে বাড়ির কাজের লোকদের মধ্যে কেউ হবে। ... বাড়ির কাজের লোকই সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়, আর সেখানেই নতুন লোক ঢোকে। ... সেই নতুন লোক যদি প্রফেসানাল কিলার হয়, তবে সেই খবর গোপন করা যেতেই পারে!

বাবা – হুম, রাইট, কিন্তু কথা হচ্ছে যে নতুন কাজের লোককে কি আর গোপন সিন্দুকের খবর দেওয়া হবে?

আমি – তারমানে, কেউ তাকে কাজে লাগিয়েছে বলছো? ... মানে বাড়ির কেউ তাকে বাড়িতে কাজের লোক করে ঢুকিয়েছে, আর ঢুকিয়ে এই সমস্ত কীর্তি করিয়েছে?

বাবা – এক্সিলেন্ট মিলি! ... এক্সিলেন্ট। ... কিছু কেসে সঙ্গে থাকতে থাকতেই মাথা কেমন খুলে গেছে দেখেছিস। ... হুম, একদমই ঠিক জায়গায় ধরেছিস। ... এই ভাবেই, প্র্যাক্টিকাল গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে, একটা ঘটনাকে অনুভব করতে থাকলে, দেখবি কি কি সম্ভব, আর কি কি সম্ভব নয়, আর সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে তা সম্ভব, সমস্তই চোখের সামনে ভেসে উঠবে। ... ব্যাস, খালি যাচনা, যোজনা বা কল্পনাকে মন আর বুদ্ধিতে স্থান দিতে নেই। ... এক্কেবারে খালি মাথা। নিউট্রাল মাইন্ড, উইথ নো প্রি-এজম্পশন।

আমি আর বাবা এবার এসে গেলাম সেই বাড়ির দ্বারে। সিকিউরিটির খাতাতে সমস্ত নাম, আধারকার্ড ইত্যাদি এন্ট্রি করিয়ে ভিতরে যেতেই, মিসেস রেবা আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। বাবার রিকোয়েস্টে সন্ধ্যার সময়ে সান্ধ্যভোজনটা একই সঙ্গে করার আয়োজন করা হলো। বুঝে গেলাম, সেখানেই বাবা সমস্ত

জেরা সেরে ফেলবেন। আমিও আমার মাথাকে পরিষ্কার করে নিলাম। বাবা প্রশ্ন করবেন, আর আমাকে সেই প্রশ্ন, কাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, আর কি উত্তর পাওয়া হচ্ছে, সেই কথাকে মাথাতেই ঢুকে নিয়ে আস্তে হবে। ঘরে এসে নোটবইতে তুলে ফেলতে হবে।

বাবার সাফ কথা, জেরা করার সময়ে, জেরা যে করা হচ্ছে, সেটাই বুঝতে দেওয়া যাবেনা। এমন বোঝানো হবে যেন সকলের সাথে আলাপ করা হচ্ছে। ... তাই নোটবই নিয়ে যাওয়া নিষেধ। মাথায় ঢুকে এনে, পরে নোটবইয়ে চালান করতে হত সমস্ত কিছু।

সান্ধ্যভোজন

আমি আর বাবা খাবার হলঘরে গিয়ে দেখলাম, একটা বিশাল বড় ঘর, যেখানে বিয়েবাড়ির মত টেবিল পাতলে, একবারে বসে ৫০০ জন খেতে পারবে। ঘরটাও অদ্ভুত। তিনটে দরজা। একটা দরজা রান্নাঘরে খোলে, একটা দরজা বাথরুমের দিকে খোলে, আর আরেকটা দরজা মেন-করিডরে খোলে। আর এই তিনটে দরজাকে ছেড়ে রেখে, গোল করে একটি একটি করে হাই-বেঞ্চি আর তার পিছনে লো-বেঞ্চি পাতা। না বেঞ্চিগুলো স্কুলের মত নয়। হাই বেঞ্চিটাও বেশ চওড়া, বার্মা-টিকের; আর লো-বেঞ্চিতেও সোফার মত গদি করা, আর সেটাও বেশ বসে আরাম করে খাবার মতই। অসাধারণ ব্যবস্থা। সৌখিন ছিলেন ভদ্রলোক, এই আয়োজন দেখেই বোঝা যায়।

সকলে সেখানে সান্ধ্যভোজনে বসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীও সেখানে ছিলেন। সেখান থেকে জানা গেল, হালদার মশাইয়ের তিন ছেলে, এক মেয়ে। তিন ছেলের মধ্যে এক ছেলেই সেখানে ছিলেন, কারণ তিনি কলকাতাতেই থাকেন, আর সেই বাড়িতেও। তাঁর নাম অম্বরিস, ও তাঁর স্ত্রীর নাম রেখা হালদার। অম্বরিস হালদার বাবার ব্যবসাতেই যোগদান করতেন। আর স্ত্রী আগে শ্বশুরের কোম্পানিতেই চাকরি করলেও, এখন গৃহবধূ।

অন্যদিকে, বাকি দুই পুত্রেরা বাইরে থাকেন। তাঁরা বাবার মৃত্যুর সংবাদ লাভ করে ফিরছেন। একজন থাকেন ব্যাঙ্গালুরুতে, অন্যজন থাকেন মিশরে। ব্যাঙ্গালরুতে যিনি থাকেন, তাঁর নাম সায়ন্তন হালদার। এবং তাঁর স্ত্রী ও তিনি দুইজনেই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আর ব্যাঙ্গালুরুতেই তাঁদের থাকা, গত পাঁচ বছর ধরে, চাকরিসূত্রে। আর মিশরে যিনি থাকেন, তিনি সেখানের ডাক্তার। তাঁর স্ত্রী একজন মনস্তত্ত্ববিদ, আর ছেলে, মানে সমরেশ বাবুর ছেলে, সমরেন্দু হালদার হলেন গাইনো। দুইজনেরই সমস্ত কাজ গুছিয়ে, ছুটি, ভিসা নিয়ে ফিরতে একটু সময় লাগবে, তাই বাবার মরদেহকে রাখতে বারং করেন।

উপস্থিত যারা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হলেন অম্বরিশ বাবু ও তাঁর স্ত্রী রেখা, ও তাঁদের একটি ৩ বছরের ছেলে। ইনি হলেন কনিষ্ঠ পুত্র সমরেশ বাবুর। তবে কনিষ্ঠ সন্তান হলেন মিসেস রেবা।

ইনি একজন ড্রাইভারের সাথে প্রেম করে বিয়ে করেন। তাই তাঁর পিতা, অর্থাৎ সমরেশ বাবু, উনার পতিকে নিজের ড্রাইভার করেই রেখে দেন। সেই কারণে, উনি ও উনার পতি, উজ্জ্বল হাজরা এই বাড়িতেই থাকেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে, অম্বরিস বাবুর বয়স এই ২৮, আর উনার স্ত্রী হবেন এই ২৪ কি ২৫। মিসেস রেবার বয়স হবে ২৫-২৬, আর ড্রাইভার বা বাড়ির জামাই, উজ্জ্বল হাজরার বয়স ৩০ এর বেশী।

যারা বাড়িতে উপস্থিত নয়, তাঁদের বয়স জানতে চাইলে, এই জানা যায় যে, সমরেন্দু হালদার হলেন বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্র, আর উনার বয়স ৩৩ মতন, আর সায়ন্তনের বয়স ৩১। মিসেস রেবার বিবাহ হয়েছে দুই বছর আগে। এখনো সেই দম্পতি নিঃসন্তান। বাড়ির এই মূল পাঁচ সদস্য, অর্থাৎ মিসেস রেবা, তাঁর পতি উজ্জ্বল হাজরা, অম্বরিস হালদার ও তাঁর স্ত্রী রেখা হালদার, ও ইনাদের ৩ বছরের একটি ছেলে, নাম সনাতন।

বাবা, এই বিষয়ে একটু টিপ্পনী কেটে বললেন — অম্বরিস বাবু, আপনার ছেলের নামে আপনাদের দম্পতিদের দেখা মেলা ভার। বরং আপনার দাদা, সায়ন্তনের ছাপ রয়েছে নামে।

অম্বরিস বাবু – হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। দাদা মানে বড়দা অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং সর্বক্ষণ পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন। তাই, উনার বয়সের কাছাকাছি হলেও সানু, মানে সায়ন্তন ওর সাথে খুব একটা মিশত না। তবে সানু আমার বলতে পারেন ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইড। আমি ওর ছায়া হয়ে স্কুল এমনকি কলেজেও থাকতাম। কলেজে আমি, প্রথমে ওর দেখা দেখি আইটি-ই নিয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। শেষে দেখলাম, আমার মাথায় কোডিং ঠিক ঢুকছে না। তাই স্ট্রিম পালটে, ইলেকট্রিকাল নিই । ও দূরে চলে যেতে, ওকে আমি খুব মিশ করতাম। আর তার এফেক্ট আমার ছেলের নামেই দেখতে পাচ্ছেন।

বাবা – আপনি তো বাবার ব্যবসাই দেখতেন?

অম্বরিস বাবু – দেখতাম বলা ভুল হবে। বাবার ব্যবসার ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টটা আমি দেখতাম। মানে ফ্যাক্টরি গুলোর দেখাশুনা আর ওয়ার্ক লেআউট দেখাশুনা করতাম। বাবার অফিসের সব থেকে বেশী বেতনের কর্মচারী বলতে পারেন। পোস্ট ছিল প্রডাকশন ম্যানেজার।

বাবা – আর উনার ফিনেন্সিয়ালস কে দেখতেন তবে?

অম্বরিস বাবু – কোম্পানির ফিনেন্স দেখার জন্য বেতনভুক্ত অফিসিয়াল আছেন, চ্যাটার্ড আছেন। আর উনার ব্যক্তিগত ফিনান্সিয়ালস উজ্জ্বলদা দেখতেন।

বাবা এবার উজ্জ্বল হাজরার দিকে তাকিয়ে – আপনি একাএকাই করতেন, নাকি উনি আপনার সাথে সব সময়ে ব্যাঙ্কট্যাঙ্কে যেতেন!

উজ্জ্বল হাজরা – বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কি করতে হবে বলে দিতেন, আমি করে আসতাম ব্যঙ্কে গিয়ে, বা অন্যত্রও।

বাবা – আর কিছু জায়গায় উনি ইনভেস্ট করতেন?

উজ্জ্বল – বাবা, মিউচুয়াল ফান্ডে অনেক ইনভেস্ট করতেন। সেই সূত্রে, সেখানেও যাতায়াত থাকতো।

বাবা – কটা সেভিংস আর কারেন্ট একাউন্ট ছিল উনার? আর কি কি ইনভেস্টমেন্ট ছিল, মনে আছে আপনার! মনে থাকলে, এখানেই বলুন।

উজ্জ্বল – সেভিংস একাউন্ট উনার নিজের নামে একটাই, স্টেট ব্যাঙ্কে। তবে আরেকটা সেভিংস একাউন্ট উনার মেয়ের নামে ছিল, কোটাক মাহিন্দ্রায়। সেটা উনিই করিয়েছিলেন, আর উনিই দেখাশুনা করতেন। কিছু এমাউন্ট ওখানে ঢুকিয়ে ট্যাক্স কম করতেন। উনার নিজের সেভিংস-এ লাস্ট এক সপ্তাহ আগে দেখেছিলাম ৩ কোটি ৭২ লাখ ছিল। আর রেবার একাউন্টে ১ কোটি । কারেন্ট একাউন্ট, প্রতিটি ফ্যাক্টরির নামে নামে একটা একটা, আর কোম্পানির নামে একটা। ফ্যাক্টরির গুলোতে তেমন কিছু পরে থাকতো না। যখন যেমন ছোড়দা বলতেন, তেমন ঢোকাতেন, সেটা ফ্যাক্টরির কাজেই লাগতো। আর কোম্পানির একাউন্টে, তিনদিন আগে ছিল ৪২ কোটি টাকা। ... এই সমস্ত কিছু ছাড়া, উনার প্রায় ১ কোটির উপর মিউচুয়াল ফান্ড আছে, ব্যাস।

বাবা – উনি ক্যাশ বেশী ডিল করতেন নাকি ইলেক্ট্রনিক মোড!

উজ্জ্বল – কোম্পানির কাজে বেশীর ভাগ সময়েই ক্যাশ ডিল করতে হতো। কিন্তু নিজের কাজের ক্ষেত্রে উনি ইলেক্ট্রনিক মোডই বেশী ব্যবহার করতেন। ওই কাজ গুলো, কখনো রেবা করতো, আর কখনো ছোটবউদি, আবার কখনো নিজে।

মিসেস রেবা – বাবা নিজে নিজে কমই করতেন। ইলেক্ট্রনিক ভাবে কাজ করা উনি পছন্দ তো করতেন, কিন্তু অতটা অয়াকিবহল নন উনি, তাই আমাকে বা বউদিকে দিয়েই করাতেন।

বাবা আবার উজ্জ্বলের উদ্দেশ্যে বললেন – আপনি আপনার জীবন নিয়ে খুশী ছিলেন?

উজ্জ্বল – জীবন নিয়ে জীবনে কেউ খুশী তো হয়না। তবে হ্যাঁ, আমি ভাবিও নি, আমার জীবন এই জায়গায় এসে দাঁড়াবে। রেবা যখন আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছিলাম বাড়ি ছেড়ে। বাড়িতে দুই দাদা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তাই পিছুটান তো ছিল না। বাবার অফিসের গাড়ি চালাতাম আমি। উনি যা বেতন দিতেন, তাতে দিব্যি চলে যেত আমার । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর শালার জামাই হবার যোগ্যতা আমার ছিল না। তাই রেবা ছেলেমানুষি করে বিয়ে করতে চেয়েছে, একরকম কথা। সেই কথা যদি বাবা, মানে তৎকালীন আমার স্যার জানতে পারতেন, তখন আমার যে কি হতো, সেই ভেবে আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছিলাম।

বাবা আর আমি দুইজনেই মনঃসংযোগ করে সেই কথা শুনছিলাম। প্রথমত কথাটা ইন্টারেস্টিং, দ্বিতীয়ত, পুলিশের কথা অনুসারে, উজ্জ্বল একজন প্রাইম সাস্পেক্ট, তাই। অন্যদিকে উজ্জ্বল বলতে থাকলো – রেবা তারপর খাওয়াদাওয়া ছেড়ে, উদাস হয়ে যাবার পর, বাবা নিজেই আমার বাড়িতে যোগাযোগ করেন। আমার বড়দার একটা সিম নিয়ে আমি পালিয়েছিলাম। সেই সিমে বড়দা ফোন করে আমাকে ডেকে পাঠালেন, আর আমার রেবার সাথে বিয়ে হলো। তাও ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কিন্তু দেখলাম বাবা, প্রচণ্ড বিশ্বাস করেন আমায়। ভয় কেটে গেল একসময়ে। আর মনপ্রান থেকে এই পরিবারের সদস্য হয়ে গেলাম।

বাবা – পালিয়ে গেছিলেন কোথায়?

উজ্জ্বল – মেজদাদার কাছে। ব্যাঙ্গালুরুতে। উনি একটা কাজে ওখানে ঢুকিয়ে দেবেনও বলেছিলেন।

বাবা – সায়ন্তনবাবুর সাথে আপনাদের সকলেরই খুব সদ্ভাব আছে, তাই না!

উজ্জ্বল – হ্যাঁ, উনি সকলকে খুব বোঝেন, আর সকলের যেমন যেমন করলে ঠিক হবে, তেমন সদবুদ্ধি দিতেন।

বাবা – আর অম্বরিস বাবু!

উজ্জ্বল – উনার বুদ্ধি খালি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রেই চলে, আর সেখানে অসাধারণ ভাবে চলে। অন্যত্র উনি উদাসীন। তবে হ্যাঁ, যদি কনো সময়ে টাকাপয়সার প্রয়োজন পরে, উনি নিজেকে দেউলিয়া করেও দিয়ে দেন। মেজদা আর আমি অনেক বুঝিয়েছি উনাকে, কাজ হয়নি। ছোটবউদি এখন সেইব্যাপারে একটু অঙ্কুশ লাগিয়েছেন উনার। তাও কেউ যদি কারে পরেছে দেখেন, তবে উনার দুর্বলতা সামনে বেড়িয়ে আসে।

আমারও মনে হচ্ছিল, তবে পরে ঘরে যাবার পর বাবাও এক কথা বলতে বুঝলাম, ঠিকই বুঝেছিলাম আমি – এই পরিবারে, সকলেই সকলকে চেনেন, আর বেশ সম্মানও করেন।

বাবা এই ক্ষেত্রে, অম্বরিস বাবুকে বললেন – কারুকে ধার দিয়ে, ডুবে যাননি!

অম্বরিস বাবু কিছু বলার আগেই, মিসেস রেবা বললেন – ডোবেন নি আবার। কিন্তু ওর শিক্ষা হয়না। ছোটবউদি ওর জীবনে না এলে, ও কোনদিন দেউলিয়া হয়ে যেত।

বাবা – কনো বিশেষ কেস আছে না কি এমন!

মিসেস রেবা – আমাদের বাড়িরই একটা কাজেরলোক ছিল। অনেকদিনের পুরনো, নাম বিনয়। ওর বউ মৃত্যু অভিমুখী হয়ে গেছে বলে দুই লাখ টাকা চাইলো, আর ছোড়দাও রাতারাতি তা দিয়ে দিল। পরের দিন সকাল থেকে তার কনো খবরই নেই।

বাবা – ফেরার হয়েছে, জানলেন কি করে?

উজ্জ্বল – আমি ওর বাড়ি গেছিলাম। সেখানে গিয়ে জানলাম, ও নাকি কনো একটা কাজ পেয়েছিল, কিন্তু সেখানে কাজ পেতে গেলে, প্রচুর টাকা লাগতো। ছোড়দার থেকে সেই টাকা নিয়ে, সে হাওয়া। ...

রেবা – যদিও যা হয়, তা ভালোর জন্যই হয়। দাদার জীবনে ওটা একটা টারনিং পয়েন্ট। এই কেসের পরপরই, একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময়ে, একজন শ্রমিক পরে গিয়ে ইঞ্জিওর্ড হন। সেই সময়ে বাবার কলাইটিস বেড়ে যাবার জন্য, হাসপাতালে ছিলেন। তাই টাকা তুলতেও পাচ্ছিলেন না। মেজদা আর বড়দা সঙ্গেসঙ্গে যা পেরেছিলেন, সেই দিয়ে ১০ লাখ টাকা হয়। কিন্তু তাতেও ঠিক ২ লাখেরই শর্ট পরছিল। বুঝতে পারছেন তো, এই শুশ্রূষা না করা হলে, ইউনিয়ন ম্যানেজমেন্টকে ছেড়ে দিতো না।

সেই সময়ে, ছোটবউদি দেবদূতের মতন দাদার সামনে এসে, ২ লাখ টাকা দেন। বাবা সুস্থ হতে, উনাদের বিয়ে দেন। বউদি যদি ওর জীবনে না আসতেন, তবে ওকে হাজতবাস করিয়ে ছাড়ত ইউনিয়ন। হাড়ে হাড়ে টের পাওয়ার পর থেকে একটু সুদরে গেছে।

বাবা – হুম, দেবতার খেলা। যখন কনো অঘটন ঘটে, তখন মনে হয় দেবতা কতই না নিষ্ঠুর। কিন্তু সেই ঘটনাই যখন সমাধান দিয়ে দেয়, তখন আর দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়না, ভুলে যাই আমরা।

বাবা আবার বললেন – তা আপনার দুই দাদা আর বাড়ি ফিরবেন না!

অম্বরিস – মেজদার কোম্পানি কলকাতায় অফিস করছে। দাদা ইস্ট জোনের চেয়ারম্যান হয়ে আসবে। ... তবে বড়দা আর বড়বউদি দুইজনেরই মিশরে খুব পশার হয়েছে। তাই ফিরতে পাচ্ছে না। ...

বাবা এবার উজ্জ্বলকে একটা আলটপকা প্রশ্ন করে দিলেন – আচ্ছা উজ্জ্বলবাবু, শ্বশুরমশাই আপনার হাতে কিছু ক্যাশ দিতেন নাকি!

উজ্জ্বল – উনার সব দিকে চোখ থাকে। আমার হাতে দিলে, আমি যদি খারাপ মনে করি, তাই নিজের মেয়ের হাতে মাস গেলে একটা টাকা দিয়ে বলতেন আমাকে দিয়ে দিতে। সেই পরিমাণও কম ছিল না, প্রায় ২০ হাজার। তাছাড়া, কোম্পানির গাড়ি আমি এখনও চালাই, তাই সেই সূত্রে ১০ হাজার তো পাইই।

অম্বরিস – এমনিও উজ্জ্বলের টাকাপয়সার খুব একটা দরকার পড়েনা। সামান্য সিগারেটের নেশাও নেই। তাই ওর খরচ কি? তবে আমার জন্য মাঝে মাঝে ওর খরচ হয় বটে। ... আসলে, সেই ঘটনার পর থেকে, আমার হাতে বাবা একদমই টাকা দেন না। আমার স্যালারিটাও রেখার কাছেই দেন। ... তবে আমার একটু এই পিজা, কেএফশি খাওয়ার খুব সখ। ... সেটা উজ্জ্বলই মাঝে মধ্যে নিয়ে এসে খাওয়ায় আমাকে।

বাবা মুচকি হেসে চুপ করে গেলেন। আর এবার বাড়ির বাকি সদস্যদের দিকে একটু নজর দিলেন। হরিদাস ও তাঁর স্ত্রী সুজাতা হলেন বাড়ির সমস্ত কর্মকাণ্ডের দেখাদেখি করেন। কেনাকাটা করতে বউদি ও ননদ একসাথেই যেতেন, আর তাও উজ্জ্বল ড্রাইভিং করে নিয়ে যেত। তাই এর অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন ছিল না বাড়িতে।

বাবা বললেন – সেই কাজের লোক, কি নাম ছিল তার, যে ফেরার হয়ে যায়!

অম্বরিস – বিনয়

বাবা – হ্যাঁ, তো সে চলে যাবার পরে কি হরিদাস আর ওর স্ত্রীর আগমন এখানে!

মিসেস রেবা – না না, হরিকাকাকে আমরা ছোট থেকে দেখছি। বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হরিকাকার বিয়ে দেন। উনারা নিঃসন্তান, তবে আমাদের কারুকে উনারা সন্তানের থেকে কনো ভাবে কম চোখে দেখেন না।

উজ্জ্বল – বিনয়কে স্যার নিয়ে এসেছিলেন, ডালখোলা থেকে। আমার গাড়িতেই স্যার ছিলেন। ডালখোলার একটা ধাবায়, আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। স্যার গেলেই ওখানে দাঁড়াতেন। সেখানের তড়কারুটি স্যারের খুব পছন্দ ছিল। সেই সময়ে একটা কলকাতার বাসের এক প্যাসেঞ্জারের থেকে, কিছু জিনিস ছিনতাই করে বিনয় পালাচ্ছিল। যা নিয়েছিল, তাতে ছেলেটির চাকরির এপয়েন্টমেন্ট লেটারও ছিল। তাই স্যার আমাকে নিয়ে বেড়িয়ে পরে বিনয়কে ধরেন। তারপর সেই ব্যাগ স্যার ফিরিয়ে দেন, কিন্তু বিনয়কে ওদের হাতে না দিয়ে বলেন, সে পালিয়ে গেছে। সেখান থেকেই বিনয়কে নিয়ে আসেন স্যার, আর এখানের কাজের লোক করে বহাল করেন।

বাবা – এমনি কেমন ছিল?

অম্বরিস – এমনি ভালোই ছিল, অভাবের জন্য চুরিছিনতাই করতো।

উজ্জ্বল – ছাড়ুন তো ওর কথা। ভালমানুষের মুখোশ পরে ছিল, নাহলে ২ লাখ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়! চুরির স্বভাব ওর ভিতরেই বাসা বেধেছিল, কোনদিনও যায়নি।

বাবা এবার সেই বিষয়ে আর আগে না এগিয়ে, বাড়ির তিন অতিথির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা নিজেদের ব্যাপারে কিছু বলুন।

এঁদের মধ্যে একজন জটাধারী সাধুবেশের, অন্যজন ফিটফাট, আর তৃতীয়জন একটু লম্বা করে, কুরূপ কিন্তু অত্যন্ত সৌখিন। যিনি সুপুরুষ তিনিই হিন্দিতে বললেন। যা বললেন, আমি তার বাংলা বলছি – স্যারের সাথে আমার আলাপ গোয়ালিয়রে। সেখানের রাজবাড়িতে কাজ করতে গিয়ে, বেশ কিছু জায়গায় উনি আটকে যান, আর আমি ঠিক করে দিই। ... তাই আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন উনি এখানে।

বাবা এবার সাধু মহারাজের দিকে তাকালে, উনি তামিলভাষীর ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললেন – হামারে সাথ বাবুকা বহত দিন কি পেহেচান হে। মে হি তো উনকো গোয়ালিয়র রাজঘরানে কি কাম দিয়ে থে।

শেষে সেই সৌখিন কুরূপের দিকে তাকাতে, উনি বললেন – মিস্টার হালদারের লাইফলাইন দেখতাম আমি। আই আম আ জ্যোতিষ।

বাবা এবার একটা অন্য প্রসঙ্গে কথা বললেন – তো মিস্টার অম্বরিস, এবার বাবার বিজনেসের কি হবে?

অম্বরিস – আমি মেজদাকে বলেছি। মেজদা অবশ্য বলছে, রেখাকে দায়িত্ব দিতে। রেখা সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে।

রেখা – দিদির সাথে (সায়ন্তনের স্ত্রী) আমি কথা বলেছি। দিদিকে বলেছি, আমরা দুই বউ, আর রেবা বাড়ির আর পরিবারের দেখভাল করবো, আর উনারা দুই ভাই ব্যবসা দেখুক।

অম্বরিস – আমরা দুই ভাই হলেই হবে না। উজ্জ্বল না থাকলে, আমরা অনেক কিছুই দেখতে পারবো না। উজ্জ্বল অবশ্য তাতে আপত্তি করেনি।

বাবা আর সেই বিষয়ে কথা বাড়ালেন না। সন্ধ্যাভোজনের পর্ব শেষ। যে-যার ঘরে ফিরে গেলাম। বাবা একটা সিগারেট জ্বালালেন। আমিও পাশে গিয়ে বসলাম।

ইন্টারপ্রিটেশন

বাবাই শুরু করলেন – কি বুঝলি!

আমি – পরিবারের মধ্যে বেশ ভালোই সদ্ভাব আছে। প্রতিটি সদস্য অন্য সদস্যের অবদানকে মাথায় রাখে। পারিবারিক মামলা তো মনে হচ্ছেনা তাই। অফিস সংক্রান্ত ব্যাপার হতে পারে, কারণ অফিসের ব্যাপারে আমরা কিচ্ছুই জানিনা প্রায়।

বাবা – আর গোপাল চুরি!

আমি – সেইটাই তো বুঝতে পারছিনা! ... টাকার অভাব কারুরই নেই।

বাবা – আছে, ... আছে ... ছোটছেলের, বউয়ের কাছ থেকে হাত পেতেও খুব একটা লাভ হয়না। আরেকটা হতে পারে, যদি আন্টিক কালেকশনের সাধ থাকে। ঘরে গিয়ে গিয়ে একবার চোখ বোলাতে হবে।

আমি – চাকররা?

বাবা – আমার ইন্টিউশন কি বলছে জানিস! মনে হচ্ছে যেন, চুরির জন্য খুন হয়নি; যেন মনে হচ্ছে খুনের জন্য চুরি হয়েছে।

আমি – সে আবার কিরকম কথা! চুরির জন্য খুন!

বাবা – হুম, মানে খুনটা করা হয়েছে, অথচ এটা প্রমাণের চেষ্টা হচ্ছে যে চুরির জন্যই খুন হয়েছে। অর্থাৎ বাড়ির কেউই সেটা হাতাতে চেয়ে খুন করেছে। একটু মার্ডার এনাটমিটাও ভাব। ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করা হয়েছে, কারণ কনো মার্ডার স্ট্রাগেল নেই। না যে মেরেছে, সে স্ট্রাগেল করেছে, আর না যাকে মেরেছে, সে স্ট্রাগেল করেছে। মরদেহের মাথার দিক থেকে ক্লরোফর্মের গন্ধ আসছিল, মানে হত্যার আগে অজ্ঞান করা হয়েছে, তারপর গলায় ধারালো ছুরি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আবার তার উপর একটি সবজি কাটার ছুরি রাখা হয়েছে। মানে একটা প্ল্যান্ড মার্ডার। একটা গোপাল হাতানোর জন্য এতকিছুর কি প্রয়োজন ছিল! ... শুধু অজ্ঞান করলেই তো কাজ হয়ে যেত! খুনের আবশ্যকতা কি ছিল!

বাবা খানিক চুপ করে থেকে, আবার বললেন, ওই তিন অতিথির মধ্যেই কেউ একজন হবে। সবজির ছুরি রেখে দিয়ে, খুনি বাড়ির কারুর উপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করছে। ... কিন্তু কে করলো খুন, আর কেনই বা খুন করলো। যদি গোপাল চুরি ইন্টেনশন নাই থাকে, তবে, সেই গোপালই বা গেল কোথায়?

আমি – বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে। ওর ফুটেজ দেখলেই তো বোঝা যাবে, তাই না!

বাবা – ফলস্, চেক করে দেখে নিতে পারিস, মেন সার্ভারের তার ছেরা আছে। অর্থাৎ শুধুই বেটারি পুরছে ক্যামেরাগুলো তো।

আমি – কি করে জানলে?

বাবা – গ্যারেজের কোলে যেই ঘরটা, সেখানে সিসিটিভির ক্যামেরার ডিভিআরটা লাগানো আছে। চার জায়গার চারটে স্টিল পিকচার দেখাছে। মানে কানেকশন কাটা আছে।

আমি – বাড়ির একজনেরও সেই ব্যাপারে কনো হুঁশ নেই! একবার ক্যামেরা চেক করতেও চাইলো না কেউ? সন্দেহজনক নয় ব্যাপারটা!

বাবা একটা হতাশার নিশ্বাস ফেলে বললেন – না, বাড়ুই চেক করবে কাল এসে। তবে বাড়ির লোকরা এই বিষয়ে মাথা ঘামান না। একটা জিনিস বুঝতে পারছিস না। এঁরা কেউ ইনসিকিওর্ড নন। একে অপরের সাহায্যে আসেন, সাহায্য করতে তৎপর। তাই সিসিটিভি ক্যামেরাটা খালি সমরেশ বাবু, নিজের কোম্পানির মালের প্রদর্শন করার জন্যই রেখেছেন হয়তো।

বাবা ঠিকই বলেছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ুই এসে সিসিটিভি চেক করতে চাইলে, অম্বরিস বাবু বললেন – বাবা ওর ব্যাটারি খুলে রেখে দিয়েছিলেন, বলতেন কনো কাজের নয়। বাড়ুই কথাটা শুনে বেশ বিরক্তই হলেন। তবে উনার দৌলতে আমরা সমস্ত ঘর ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম। বাবার মুখভঙ্গি দেখে বুঝলাম, আন্টিক বস্তুর কালেকশনের কথা যা বাবা বলছিলেন, তার কনো ইঙ্গিত ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল না।

সমস্ত কিছুর শেষে, বাড়ুই বাবার সামনে বসে বললেন – কি করি বলুন তো এবার! মুখ্যমন্ত্রীর শালা। তাই প্রেশার বুঝতে পারছেন তো। কিন্তু কিচ্ছু মুভ নিতে পারছিনা। ... আবার মুখ্যমন্ত্রীর নিজের লোক সব, কারুকে ধরে জেলে পুরে দিয়েও মুভ করছি, দেখাতে পাচ্ছিনা। মহা ফ্যাসাদে পরেছি মশাই। ... আপনি কি কিছু এগলেন?

বাবা – অনুমান করেছি। সেটাকে এগোনো বলা চলে না। মার্ডার অয়েপন, খুনির কাছেই রয়েছে, এবং খুনি সেটা অত্যন্ত গোপন করে রেখেছেন। তাই সার্চ করেও পাওয়া যাবেনা। আপনি তো সার্চ করে দেখলেন। ... তাই একটাই উপায় আছে, সেটা হলো সিকিউরিটি হাল্কা দেওয়া, যাতে খুনি মার্ডার অয়েপনকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। তবেই হাতে না হাতে খুনিকে ধরা সম্ভব হবে।

বাড়ুই – তবে কি বলছেন সিকিউরিটি হাল্কা করবো!

বাবা – না এখনই নয়। বাড়ির অন্য সদস্যদের বাড়িতে ঢুকতে দিন। আর সেই সুবাদে, খুনির উপর চাপ সৃষ্টি হোক। এখন খুনি সিকিউরিটি হাল্কা হবার অপেক্ষা করে বসে রয়েছে । সিকিউরিটি হাল্কা হলেই, সে মার্ডার অয়েপনকে নিজের থেকে বিদায় দেবে। একটু চাপ বাড়লে, সে তখনও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করবে, কিন্তু তখন একটু ঘাবড়ে গিয়ে সেটা করবে, তাই কিছু ভুল করে ফেলবেই। ... আর তাছাড়া,

এখনও আমার ধারণা যা, তা নেহাতই অনুমান। শিওর না হয়ে, এমন ঝুঁকি নিতে গেলে, আসল খুনি নিজের মার্ডার অয়েপন সরিয়ে ফেলবে, আমরা জানতেও পারবো না।

বাড়ুই – তারমানে মশাই, আপনি একটা মাইন্ড গেম খেলেন আসামির সাথে, এমনই আমার মনে হচ্ছে। আসামির মাইন্ড রিড করে নিয়ে, ওর থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকেন, আর সেই এগিয়ে থাকা থেকে, আপনি আসামিকে সহজে ধরে নেন, যেটা আমরা করতে পারিনা।

বাবা – করতেও আপনারাও পারেন তা, কিন্তু কেসে কি মুভমেন্ট হলো, সেই কথার উত্তর দেবার জন্য, আপনাদেরকে সবসময়ে তাড়াহুড়ো করতে হয়। আর এই তাড়াহুড়োর চক্করে, আসল আসামি গাঢাকা দেবার সুযোগ পেয়ে যায়।

বাড়ুই চলে গেলেন। আমি বললাম – খুনি কি তবে, এই তিন অতিথির মধ্যেই কেউ!

বাবা – মনে তো হচ্ছে, কিন্তু হিসেব মিলছে না বুঝলি। ... মার্ডার অয়েপন মোস্ট প্রবাবলি সার্জারির ছুরি, সমরেশবাবুর খুন দেখে তাই তো মনে হয়েছিল। সেই অনুসারে দুটো জিনিস আবশ্যক। প্রথম হলো ডাক্তার বা সেই জাতীয় কেউ, যার কাছে সেই সারজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট থাকবে আর সে সেটা চালাতে জানবে। কারণ হলো যিনি খুন করেছেন, তিনি এনোটমিতে এক্সপার্ট, নাহলে এমন সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করতে পারেনা। একবার সেই ছুরি চালানো হয়েছে, আর একদম পারফেক্ট জায়গায় ছুরিটা বসানো হয়েছে, এটা এনোটমি জানা লোক না হলে সম্ভব নয়।

আবার একটু চুপ করে বললেন – ইঞ্জিনিয়ার, সাধু বা জ্যোতিষ, এঁদের একজনেরও কি এনোটমির ছাত্র হওয়া সম্ভব! ... উম্, ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে তো সম্ভব নয়। সাধুর যদি একটা সেই গোত্রের ইতিহাস থাকে, তবে তা সম্ভব। আর জ্যোতিষীর পক্ষেও সেটা অসম্ভব। কিন্তু কেউ যদি নিজের ইতিহাস গোপন করে, তবে জানবো কি করে?

আমি – বাড়ির সকল সদস্যের জন্য অপেক্ষা করতে বললে কেন?

বাবা – ভুলে যাচ্ছিস, এই বাড়ির একজন ডাক্তার এবং গাইনো। অর্থাৎ সার্জারির বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ।

আমি – তারমানে তুমি বলছো যে, এই বড়ছেলে বিদেশে নেই। এখানেই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে আর সেই ...!

বাবা – আকাশ পাতাল ভাবিস না। হলে অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু কি হতে পারে, সেটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। কি হচ্ছে, আর কি হয়েছে, সেটা অনুভব করার চেষ্টা কর।

আমি – কিন্তু মোটিভ!

বাবা – সেখানেই তো সমস্যা। বাড়ির সমস্যা কিনা, বড়ছেলে আর মেজছেলে বাড়ি ফিরে এলে, ওদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনই সমস্ত বলে দেবে। যদি তেমন কিছু না হয়, তবে পারিবারিক কারণে খুন নয়। তাহলে কি? ব্যবসার কারণে! নাকি অন্য কিছু!

কথা বলতে বলতে বাবার ফোন বেজে উঠলো। ফোনের দিকে তাকিয়ে বাবা ফোন ধরলেন। শুধুই আচ্ছা আচ্ছা বললেন, আর ফোন রেখে দিলেন।

আমি বললাম – এই কেসের কিছু!

বাবা – হুম, সস্ত্রীক সমরেন্দু হালদারের ফ্লাইট কায়রো থেকে বুক হয়েছে। কাল সকাল ১০টা ৩০ এ ল্যান্ডিং। আর সায়ন্তন বাবুর ফ্লাইট আজ সন্ধ্যা ৮.৪০এ ল্যান্ডিং।

আমি বুঝলাম, আমি যেই কথা বলেছিলাম, অর্থাৎ বড় ছেলে দেশের বাইরে থাকার নাতক করে এখানেই ছিল, সেটা বাবা আগে ভেবে নিয়েছিলেন, আর তাই খবর নিতে বলে দিয়েছিলেন। তাই আমি বললাম এবার – এবার কি? সকলেই তো নিজের নিজের বাড়ি আসছেন!

বাবা – পৌঁছাতে দে। সময় কখন কি ভাবে খেলে, কিচ্ছু বোঝা যায়না। শুধু চোখকান খোলা রেখে দে, আর দেখতে শুনতে থাক, কি হচ্ছে, কি ভাবে হচ্ছে।

সত্যই বলেছিলেন বাবা। বাবা কি এমনটা আগে থেকে ধারণা করে নিয়েছিলেন, নাকি অনুমান! কিসের ভিত্তিতে এমন ওয়াইল্ড এজম্পশন করতে পারেন মানুষটা। ... সন্ধ্যায় মেজছেলে এলো, আর বাবা কেন গোপালকে লকারে রাখেন না, সেই নিয়ে খানিকক্ষণ মাথা খারাপ করলেন। পরেরদিন সকালে বড়ছেলে এলেন। মেজভাই সেই একই প্রসঙ্গ তুললে, সমরেন্দু বললেন – মাথা খারাপ করিস না। এখানে শুধু চুরি হয়নি। বাবাকে খুন করা হয়েছে। আর অম্বরের (অম্বরিস) থেকে যা শুনেছি, সেই অনুসারে বাবা মৃত্যুর সময়ে কনো স্ট্রাগেলও করেন নি। ... বুঝতে পারছিস কিছু!

সায়ন্তন চুপ করে সন্দিহান চোখে তাকিয়ে রইলে, সমরেন্দু বললেন – ইটস আ মার্ডার, নট এনি থেফট। ... আমি দেখলাম, বাবা চুপ করে সমস্ত কথা শুনছেন, আর সকলের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন পরছেন।

সায়ন্তন এবার বললেন – অম্বর, পুলিশ কি বলছে? নাকি বরাবরের মতই অপদার্থ ওরা!

সমরেন্দু বললেন – তুই যে বললি, একজন এই কেসের ইন্সপেকশন করছেন, আর তাঁকে মেসমসাই নিজে এপয়েন্ট করেছেন। সে কিছু বলছে না!

বাবা এগিয়ে গিয়ে এবার হাতটা বারিয়ে দিয়ে বললেন – আমি বিজয় সিংহ, আপনার বাবার কেসের দেখভাল করার ব্যাপারে সিএম স্যার আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

সমরেন্দু একটু নিরুৎসাহ দেখিয়ে বললেন – টিকটিকি!

বাবা – না রিপোর্টার। তবে স্যার ভরসা করেন। তাই।

ডাক্তার হালদার এবার একটু গলা নামিয়ে বললেন – খুব জটিল কেস?

বাবা – হুম, বলতে পারেন। একজন খুন করে, মার্ডার অয়েপন সরিয়ে রেখে অন্য একটা অয়েপনকে মার্ডার অয়েপন হিসাবে প্রতিস্থাপন করতে চাইলেন। তা কেস তো জটিল বটেই। তবে চিন্তা করবেন না, খুব শীঘ্রই খুনি ধরা পরে যাবে। বিশ্বাস রাখতে হবে আপনাদেরকে।

ডাক্তার বাবু এবার একটা চেয়ারে বসে পরে বললেন – কিছুদিন আগেও বাবার সাথে ফোনে কথা হয়েছিল জানেন। বাবাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম এবারের পুজোতে আসবই। বাবা বলেছিলেন, সমস্ত পরিবার মিলে গোয়ালিয়রের রাজবাড়ির অতিথি হবো আমরা। সেখানে ঘুরতে যাবো। ... (জোরে নিশ্বাস ফেলে) কিছু ভাবতে পারছিনা। ভাবতে ইচ্ছাই করছে না। অকারণেই নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে।

বাবা আর কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন – বিশ্রাম নিয়ে নিন। পরে কথা হবে।

আমি আর বাবা রুমে চলে আসছিলাম। সেই সময়ে বাবা দাঁড়িয়ে পরলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে পরলেন। আর কি বুঝলেন জানিনা, উনার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ঘরে চলে এলাম, বাবা একটা সিগারেট জ্বালিয়ে, বিছনায় টানটান শুয়ে পরলেন। আমি বুঝতে পেরেছি, বাবা কিছু ভাবছেন।

আমি পাশে বসে বললাম – কনো গড়মিল পেলে নাকি!

বাবা – বাড়ুইকে বলে সিকিউরিটি কাল সকাল থেকেই হালকা করতে হবে। আসামিকে সনাক্ত করা গেছে। এবার প্রমাণ পেতে হবে। শুধু একটাই ব্যাপার। সারজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট না লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু একটা ৬ ইঞ্চির গোপালকে কি লুকিয়ে রাখা যেতে পারে! কি করে? কোথায়!

সেইদিন রাতে আর তেমন কিছু হলো না। বাবা নিজের সময় মত ঘুমিয়ে পরলেন। আমি অনেক রাত পর্যন্ত সিডনি সেল্ডন পড়ছিলাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বিছনা ছেরে, আড়মোড়া ভাঙার কালে দেখলাম, বাবা ইন্সপেক্টর বাড়ুইএর সাথে কথা বলছেন। খানিক পরে, ঘরে এসে বললেন – আমাদের গোয়ালিয়র যেতে হবে। প্যাক করে নে। তোর মাকে বলে দিয়েছি। আমি আর তুই গোয়ালিয়র রাজবাড়িতে ওয়েস্ট বেঙ্গল চিফ মিনিস্টারের সুপারিশে অতিথি হয়ে থাকবো কিছুদিন।

আমি – কিছু কি পেলে?

বাবা – পেলাম! হুম, কিছু পেলাম। আর কিছু ১০টার পরে পেয়ে যাবো। আজ ১০টার পর, সিকিউরিটি হাল্কা করা হবে। আমি তখন একটু ঘুরে আসবো। ফিরে এসে এখানে লাঞ্চ করেই বেড়িয়ে পরবো। অম্বরিস আর ওর ভাইদের যা বলার বলে দিয়েছি। আর সকলকেও বলা হয়ে যাবে সঠিক সময়ে যে আজ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সিকিউরিটি হাল্কা করা হবে। যার যা বাজার আসবাব নিয়ে আসার যেন এর মধ্যেই করে ফেলে, কারণ বিকাল ৫টার পর থেকে ৭ দিন পর্যন্ত সিকিউরিটি টাইট থাকবে।

আমি – কিন্তু গোয়ালিয়র কেন?

বাবা – এখানের কাজ মোটামুটি শেষ। একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে, আরেকটা প্রমাণ পাওয়া বাকি আছে। সেটাও আশা করছি সকালের মধ্যেই পেয়ে যাবো। তবে, এখানে যা পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে আসামিকে সনাক্ত করা গেছে, কিন্তু আসামির মটিভ এখনও ধরা যায়নি।

আমি – তাতে কি হয়েছে? আসামিকে ধরা নিয়ে তো কথা!

বাবা – বি প্র্যাক্টিকাল মিলি। একজন খুনি এমনি এমনি খুন করে না। তাই যদি খুনিকে ধরা হয়, অথচ তার খুনের পিছনে থাকা মটিভ জানা না যায়, তার মানে বুঝিস! তার মানে এই যে কেস তখনও চলমান, মানে আরো খুন হতে পারে, এবং তা চলতে পারে। ... যতক্ষণ না খুনির মটিভ জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ

একটা ক্রাইমকে তার শেকড় থেকে উপরে ফেলা যায়না। এনি অয়েজ, খুনির মটিভ জানতে হলে, আমাদের গোয়ালিয়র যেতেই হবে, কারণ আমার বিশ্বাস সমরেশ বাবুকে হত্যার চক্রান্ত শুরু হয় গোয়ালিয়র থেকেই।

আমি – আর খুনি ততক্ষণ কি মুক্ত থাকবে?

বাবা – হুম, সিকিউরিটি টাইট থাকবে, তাই কিছু করতে পারবে না । আমার ধারণা, আসামির দুটি কাজ ছিল। একটি তার ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি আজকের মধ্যে সম্পন্ন করে ফেলবে সে। তবে সে এখান থেকে ছাড়া পাবেনা। তবে কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাই রিল্যাক্স হয়ে যাবে। আমরা যে গোয়ালিয়র যাচ্ছি, সেই ব্যাপারে বাড়ুই আর মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া কেউ জানবে না। তাই আসামি ভাববেও না যে, তাকে নিয়ে ভাবা চলছে এখনো। ওদিকের সমস্ত কাজ গুছিয়ে এসে, আসামির হাটে হাড়ি ভাঙতে হবে।

আমি – মানে, তুমি বলছো, এখানে আসল আসামি নেই! এখানে খালি আসামির সেই লোক আছে, যাকে কনো এজেন্ডায় পাঠানো হয়েছিল। সে তার এজেন্ডা পুরো করে এখানে রিল্যাক্স থাকবে, আর আমরা অন্যদিকে গিয়ে, আসল আসামিকে ধরে নিয়ে আসবো!

বাবা – হুম, এতক্ষণে মাথায় ঢুকল তাহলে। ... চল ফ্রেস আর রেডি হয়ে নে। ... বাড়ুই আবার আসলো বলে। ওর সাথে আমার কিছু কাজ আছে। তারপর সকলকে বলতে হবে, ১০টা থেকে ৫টার রিল্যাক্সেসানের ব্যাপারে। তারপরে একটু বেড়িয়ে আরো একটা কাজ সেরে নিতে নিতে, প্লেনের টিকিট এসে যাবে। বেড়িয়ে পরবো তারপর গোয়ালিয়র। রেডি হয়ে নে।

গোয়ালিয়র রাজবাড়ি

বাবা মাঝে মাঝেই বলতেন, শিকারকে বুঝতে দিতে নেই যে তার শিকার হতে চলেছে, তবেই শিকার করা সম্ভব হয়। উনি বলতেন, যে শিকারকে জানিয়ে শিকার করতে যায়, সে শিকারকে দুর্বল মনে করে, আর সেখানেই সমস্ত কিছু গণ্ডগোল করে দেয়।

এই সুত্রে বাবা আন্দোলন ইত্যাদিকেও আমল দিতেন না । তিনি বলতেন, আন্দোলনের অর্থ এই যে, অর্ধেক বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া। এটা মেনে নেওয়া যে, যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হচ্ছে, তিনি হলেন মালিক, আর আমরা শ্রমিক, অর্থাৎ সিধাসিধা নিজের হাতে, নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হেলায়

হেলানো ছাড়া অন্য কিছুই নয় । শ্রমিক মালিকের কাছে ন্যায়ের আবদার করছে, সেখানেই আন্দোলন শোভা পায়। তিনি বলতেন, আন্দোলনের অর্থ দাবি করা। আর দাবি তার কাছেই করতে হয়, যিনি আমার দাবি মেটাবেন এমন অঙ্গিকার করেন। যিনি দাবি মেটাবেন না, এমন মনস্থির করে রেখেছেন, তাঁর কাছে আন্দোলনের অর্থ, বৃথা সময় ও শক্তি নষ্ট করা।

এই সুত্রে, বাবার কাছে একজন আসতেন, যিনি শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলতেন বাবাকে। তিনি বাবাকে বলতেন, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্ত কিছুই পণ্য। চাকরী করা বা বাণিজ্য করারই শিক্ষা দেওয়া হয় এই শিক্ষাব্যবস্থায়। প্রকৃত শিক্ষা, অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা সমাজ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি আন্দোলন করতে চান এর বিরুদ্ধে, আর সেই জন্য তিনি ছেলেমেয়ে যোগার করছেন আর তাদের সেই আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করছেন। বাবার কাছে এই বিষয়ে সমর্থন চাইতে এসেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগদানও।

বাবা উনাকে স্পষ্ট করে একটি কথা বললেন। উনি বললেন – আপনি কি এই মনে করেন যে, আন্দোলন করলে, আপনি যেই শিক্ষানীতির প্রবর্তন চাইছেন, তা সরকার পুড়ন করতে পারবেন?

উনি উত্তরে বললেন – চাইলেই পারবেন। কিন্তু চাইছেন না তাঁরা।

বাবা – আপনার মনে হয় যে উনাদের নজরে পরছে না ব্যাপারটা, তাই চাইছেন না! আপনি আন্দোলন করলে, উনাদের নজরে এসে যাবে, আর উনারা সেটা চাইবেন?

উনি বললেন – না তা নয়। আসলে প্রকৃত শিক্ষার সাথে সরকারের কনো সম্পর্কই নেই। সরকারের চিন্তা সকলকে পেশা দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া নয়। আর সরকার সেটাই করার চেষ্টা করছে।

বাবা এবার হেসে বললেন – তাহলে আন্দোলন করার চিন্তা করে বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন? যেটা আবশ্যক মনে হচ্ছে আপনার, সেটা হলো প্রকৃত শিক্ষাদান। তা আপনি সেই কাজ শুরু করে দিন । গণতন্ত্রের সুবিধাকে গ্রহণ করুন। গণতন্ত্রের কারণে আপনাকে তো আপনার কাজে কেউ বাঁধা দিতে আসবে না। তাই প্রতিবাদ ইত্যাদি করে সময় নষ্ট না করে, আর ফালতু নিজের মার্কেটিং না করে, যেই উদ্যম আপনি চাইছেন সরকার নিক, সেই উদ্যম আপনি নিজেই নিয়ে নিন।

এরকম অনেক ক্ষেত্রেই বাবাকে দেখেছি, উনি সঠিক পন্থাকে প্রথম বেছে নিতে বলতেন। উনি বলতেন, যেটা করে উদ্দেশ্য পূর্তি হবে, সেটাই করা উচিত। যদি কনো এমন পরিবর্তন আনতে হয়, যেই

পরিবর্তনকে সরকার বা শাসক গ্রহণ করবেন না, বা করতে পারবেন না, সেই ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তন আনার জন্য আন্দোলনের পথে না গিয়ে, সেই পরিবর্তন করার দিকেই অগ্রসর হতে হয়। ... উনি বলতেন সরকার অনেক কিছুই করতে চান, কিন্তু ভোটবাক্সের চিন্তা করে অনেক কিছুই করতে পারেন না। যাদের কাছে সেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার চেতনা এসে পৌঁছচ্ছে, তাঁদেরকেই উদ্যম নিতে হয়। সরকার ঠিক সময়ে, সেই উদ্যমকে অনুমোদন করে দেন।

বাবা এই সুত্রে বলতেন, সরকার কখনই আশ্রম স্থাপন করতে পারেন না। যদি সরকার এমন করেন, তবে সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠে যাবে, যাতে সরকারের ভোটব্যাঙ্কে ধ্বস নেবে যাবে। আশ্রম নিজেদেরকেই খুলতে হয়। সরকার সঠিক সময়ে, সেই আশ্রমকে অনুমোদন করে দেন। ঠিক সেই ভাবেই, পরিবর্তন করার আবদার করতে নেই। গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে, পরিবর্তন করে দিতে হয়। সরকার সঠিক সময়ে, সেই পরিবর্তনকে সমর্থন দিয়েই দেন।

এই কথাগুলি বাবার হয়েছিল, খোদ মুখ্যমন্ত্রী ও লাহিড়ী মহাশয়ের সম্মুখে। লাহিড়ী মহাশয় বাবাকে এমনিই পছন্দ করতেন। কিন্তু সেদিনের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রীও বাবাকে অত্যন্ত পছন্দ করতে শুরু করেন। তাঁর মতে, বাবা হলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং বিচক্ষণ। তাঁর মতে অহেতুক বুদ্ধিদাতা অনেক হন। কিন্তু তারা সকলেই সরকারের কাছে নিজেদের কথার অনুমোদন খুঁজতে চলে আসেন, এবং নিজেদেরকে বিদ্যজন বলে দাবি করেন। বাবার কথাকে উনি সমর্থন করে বলেছিলেন, সরকার অনেক কিছুই করলে ভালো হয়, বুঝতে পারেন, কিন্তু ভোটের কথা মাথায় রেখে, অনেক কিছুই করতে পারেন না। কেউ যদি সেই উদ্যম নিয়ে, এগিয়ে যায়, ঠিক সময়ে সরকার তাঁকে মদত দিয়েই দেয়।

এমনই হলেন আমার বাবা। তিনি পরিবর্তন বিরোধী নন, তিনি পরিবর্তনের দাবি করার বিরোধী। তাঁর মতে পরিবর্তনের দাবি নয়, পরিবর্তন উদ্যম নিয়ে করতে হয়। দাবি করে অহেতুক সময় নষ্ট করা অর্থহীন, তাঁর মতে। ঠিক তেমনই বাবা আসামিদের ক্ষেত্রে মনে করতেন যে, ধরপাকড় করা হবে, এমন ভাবে তজ্জরি করে আসা মানে, আসামিকে পালিয়ে যাবার সুযোগ প্রদান করা। তিনি বলতেন, বাঘ যদি এক মুহূর্তের জন্যও বুঝতে পারে যে, তার শিকার করা হবে, তবে সে সেইদিন অনাহারেই কাটিয়ে দেবে। এমনিও বনের পশুরা, অধিকাংশ জীবন অনাহারেই কাটায়। তাই আরো একটা দিন অনাহারে কাটিয়ে দেওয়া এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।

তাই, বাঘকে জানতেও দেওয়া যায় না যে, তার শিকার হতে চলেছে। তবেই তার শিকার করা যায়। উনি বলতেন ক্রিমিনাল বিচিত্র মস্তিষ্কের হয়, তবে ক্রাইম করার জন্য অদম্য সাহস লাগে। তাই ক্রিমিনালকে

ছাগল মনে করা হলো শ্রেষ্ঠ ছাগ্লামি। ক্রিমিনাল হলো বাঘ। আর তাই বাঘকে বুঝতেও দিতে নেই যে তার শিকার করা হবে, বা তার শিকার করার তজ্জরি চলছে।

বাড়ুইও শেষদিন বাবার প্রশংসা করে বলেছিলেন — মিস্টার সিংহ, আপনি একজন অদ্ভুত সাইকো গেমার। ক্রিমিনালের সাইকোলজি নিয়ে আপনি খেলেন। ক্রিমিনালকে আপনি চালনা করতে শুরু করেন। যাই হোক, এই সমস্ত কিছু কেসের নিষ্পত্তির দিন হয়। তাই সেই কথা আগেভাগে না বলে, চলে যাই কেসের কথায়।

এই নয়টা নাগাদ, বাড়ুই এলেন আর বাবার সাথে কি সমস্ত কথা হলো, তারপর বাড়ুই আর বাবা একটু বাগানের দিকে গেলেন। তারপরই সকলকে একত্রিত করে ঘোষণা করা হয়, সকাল দশটা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সকলকে একটু রিল্যাক্সেসন দেওয়া হবে, যাতে সকলে নিজেদের বাজার দোকান করে নিতে পারেন। বিকাল ৫টার পর, ৭ দিনের সময় চেয়ে নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে এই কেসের নিষ্পত্তির জন্য। তাই বিকাল ৫টার পর ৭দিন কড়া সিকিউরিটি থাকবে।

এমন কথা বলার পর, বাড়ুই চলে গেলেন। বাবাও দেখলাম তজ্জরি করে বেড়িয়ে পরলেন। কিছু সামগ্রী নিয়ে চলে গেলেন আর যৎসামান্যই রেখে গেলেন, যা আমার পিঠের ছোট স্কাইব্যাগেই ধরে যাবে।

ফিরে এলেন বাবা, তখন প্রায় ১টা কি আরো একটু বেশি। বাবাকে দেখলাম, পোশাক পালটে এসেছেন, মানে বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছেন উনি। বোধহয় গোয়ালিয়র যাবার প্যাকিং করে এসেছেন। হালদার বাড়িতে এসে, প্রথমে তিনি আমার কাছে এলেন না। প্রথমে গেলেন অম্বরিস বাবুর ঘরে। সেখান থেকে আমার কাছে ফিরে এসে বললেন — অম্বরিসকে বলে এলাম, ৭দিনের জন্য গোয়ালিয়র যাচ্ছি, কেসের নিষ্পত্তির জন্য। সঙ্গে এও বলে দিলাম যে, সেই কথা যেন কারুকে না বলেন কারণ, এই বাড়িতেই আসামি রয়েছে, তবে সেই আসামির মাথা বাইরে আছে। তাকে ধরতেই যাওয়া। বললাম, সকলের উদ্দেশ্যে বলতে যে, আমার দ্বারা কেস শলভ হয়নি, তাই আমাকে মুখ্যমন্ত্রী কেসের থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

বাবা এমনটা করে থাকেন প্রায়শই। নিজের নামে কলঙ্ক লেপে নিয়ে, গাঢাকা দিয়ে কাজ করা, এটা বাবার একটা অনবদ্য স্টাইল। প্রচণ্ড এফেক্টিভও হয় দেখেছি এই স্টাইল, কারণ শত্রু বাবাকে ম্যাপিং করাই বন্ধ করে দেয়। আর সেই সুযোগে, বাবা সমস্ত কিছুকে ম্যাপিং করে নেন। বাবার এমন কিছু ইউনিক স্টাইল দেখে রথিনকাকা আর অতনু আঙ্কেলও মাঝে মাঝে বাবাকে বলতেন, এই স্টাইলগুলো ক্রাইমডিপার্টমেন্টেও ইনক্লুড করা উচিত। অনবদ্য শিকারি আমার বাবা। মা এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উক্তি

করতেন। উনি বলতেন, বাবা হলেন জন্মগত শিকারি। উনার মজ্জায় মজ্জায় শিকার করার কৌশল লুকিয়ে আছে। তা যেটাই হোক, আমার মা কম বড় শিকারি নন, কারণ এই জন্মগত শিকারির শিকার উনিই করেছেন।

যাইহোক এবার আমাদের কলকাতা ছাড়ার সময়। বাবা বললেন – বিকাল ৫টায় ফাইট গোয়ালিয়র বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে লাঞ্চ করে বাড়ি গিয়ে, লাগেজ ওখান থেকে উঠিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রা করা হবে।

রাজপ্রাসাদ দেখবো, একটা থ্রিলিং থ্রিলিং ব্যাপার মনে হচ্ছিল। তাই কনো কথা নয়। লাঞ্চ করে, উবার ধরে বাড়ি। আর বাড়িতে মায়ের সাথে দেখা করে, লাগেজ নিয়ে ফের উবার ধরে এয়ারপোর্ট। প্লেন প্রথম যাবে নিউ দিল্লি, তারপর সেখান থেকে গোয়ালিয়র। পরের দিন ভোর ভোর, আমরা রাজবাড়ি পৌঁছলাম। এয়ারপোর্টেই আমাদের জন্য গাড়ি রাখা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের চিফ মিনিস্টারের সুপারিশে যাচ্ছি অতিথি হয়ে। খাতিরদারিই আলাদা।

রাজবাড়িও এলাহি। একসময়ে এই রাজবাড়ির কতই না দাপাদাপি ছিল। দাপাদাপি এখন অবশ্য নেই, তবে হ্যাঁ, তার জৌলুস এখনো আছে। বড় বড় থাম, বড় বড় কড়িবরগা, সমস্ত কাঠ হলো বার্মাটিক। জায়গায় জায়গায় বার্মিজ আর জার্মানির কাঁচ। অসাধারণ ঝাড়লন্ঠন। দেখতে দেখতে চোখজুরিয়ে যাচ্ছিল। এমনই এদিক সেদিক দেখে চলছিলাম, একজনের কথাতে ঘোরটা ভেঙ্গে গেল।

একজন সুন্দর দেখতে পুরুষ সামনে বেড়িয়ে এসে হিন্দিতে বললেন – আপ আজ আয়ে, ওর হাম আপকা খাতিরদারি নেহি কর সক রাহা হে। মাফি চাতে হে। ... আপকে আনে কি থোরা পেহেলে এক হাদশা হো গেয়া। ঈশলিয়ে।

এরপরের কথোপকথন সমস্ত হিন্দিতেই হয়। আমি বাংলায় লিখলাম।

বাবা বললেন – হাদশা, কেমন হাদশা!

ভদ্রলোক বললেন – আর বলবেন না, আমার কাছে একটা আকবরের তোফা দেওয়া কালারচেঞ্জিং এলেকজ্যান্ড্রাইট পাথরের হার ছিল, সেটা আজকেই, এই এক ঘণ্টা আগে একটা চিল ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়।

বাবা ভ্রু কুঁচকে – চিল হার চুরি করে নিলো! হাড় ছেরে শেষে হার!

ভদ্রলোক এবার হাত বারিয়ে হ্যান্ডসেক করে বললেন – আমি এখনকার রাজপুত্র, মহেশ ভেজা সিন্দিয়া। মিস্টার স্যান্যাল আপনার আসার কথা বলেছিলেন। সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। ঠিক ছিল, আমি নিজে গিয়েই গেটে আপনাকে এস্করট করে আনবো। ... এই সমস্ত ব্যাপারে একটা ঝামেলায় আটকে গেলাম।

বাবা – হারটাকি বাইরেই থাকতো আপনার!

রাজপুত্র – আরে না না, আমার কাছে লাইট আর স্যানিটারি কাজ করছিল, কলকাতার মিস্টার হালদার। উনার কাছেও একটা আকবরের খাজানা আছে। আকবর উনার হিন্দু পত্নীকে একটা লাড্ডু গোপালের দামি মূর্তি করে দিয়েছিল, সেটা উনার কাছে আছে। তা উনি বলেছিলেন, উনি পরেরবার যখন আসবেন তখন দেখাবেন। তা আমি, আমার কাছে যেটা আকবরের খাজানা ছিল, সেটা দেখাতে হারটা বারকরেছিলাম। যাবার আগের দিন মিস্টার হালদার আমাকে বলে গেছিলেন, হারটা সামলে রাখতে, ওটা ছিনতাই হয়ে যেতে পারে। ... আমার পত্নী, হারটা দেখে, আয়নার সামনে বসে দুদিন গলায় পরে দেখেছিলেন। আজও আমাকে গলায় পরে দেখালেন। আমি দেখে বললাম, ওটা আমায় খুলে দিতে, আমি সিন্দুকে উঠিয়ে রাখবো। যেমনই দিয়েছে হারটা আমাকে, অমনি একটি বিশাল চিল এসে আমার হাত থেকে হারটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল!

বাবা – হুম, স্ট্রেঞ্জ! ... যাই হোক, আপনি জানেনকি মিস্টার হালদার আর নেই?

রাজপুত্র – হুম, ভেরি স্যাড নিউজ। হি হ্যাস বিন মার্ডারড়্। হাউ কাম! ... উনি একজন রীতিমত জেন্টিলম্যান। ...

বাবা – হুম, আসলে, আমার কাছেও একটা আকবরের খাজানা আছে। আমার ব্যাগে আছে, নিচের দিকে। মিস্টার হালদারের থেকেই আমি জানি যে আপনার কাছে আকবরের হার আছে। তাই আপনারটাও দেখতে এসেছিলাম, আর আমারটাও দেখাতে এসেছিলাম।

বাবার কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম! বাবার কাছে আবার আকবরের কি খাজানা আছে! ... আমি ছাড়াও আরো একজন অবাক হয়ে গেছিলেন সেই কথা শুনে। সেই খ্যাপাটে দেখতে লোকটা আগিয়ে এসে বললেন – ইউ হ্যাভ আকবর প্রপার্টি! হোয়াট ইজ ড্যাট?

বাবা সেই খ্যাপাটে লোকের দিকে একটু ভ্রু কুঁচকে তাকালে, রাজপুত্র বললেন – উনি একজন বৈজ্ঞানিক। উনার অদ্ভুত স্কিল দেখে, উনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। বৈজ্ঞানিক হলেও, পেট চালাবার জন্য,

হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাচ্ছিলেন গোয়ালিয়র স্টেশনের সামনে। তাই উনাকে নিয়ে এসেছি। এখন উনি এখানে, এই রাজপ্রাসাদেই থাকছেন।

বাবা হেসে বললেন – হাতসাফাইএর খেলা দেখাচ্ছেন, সেই খবর কে দিলো আপনাকে? আপনারই কনো লোক?

রাজপুত্র – হ্যাঁ, আমার লোককে একজন বলেছিলেন। আসলে, আমার দরবারে কিছুদিন আগে একজন এসে হাতসাফাইএর খেলা দেখিয়ে গেছিলেন। তারপর থেকেই আমার ইচ্ছা হয়, আমার কাছে যদি এমন একটা হাতসাফাইএর লোক থাকে! ... তা আমি সেই লোকের কাছে আমার লোক পাঠিয়েছিলাম যে উনাকে আমি রাজপ্রাসাদের অতিথি করে রেখে দেব। কিন্তু উনি রাজি না হয়ে বলেন, উনার এক শিষ্য রেলস্টেশনের বাইরে খেলা দেখায়, তাকে গিয়ে বলতে। সেই সন্ধান করেই, উনাকে পেয়েছি।

বাবা – উনাকে দেখে তো দেশী মনে হচ্ছে না! ... এংলো মনে হচ্ছে। ... যাইহোক, আমার কাছে আকবরের সিন্দুকের একটা তালা আছে। তালাটা একটি বিচিত্র ধাতু দিয়ে নির্মিত, যার কারণে তালাটির তিনটি চাবি হয়। বাইরের আবহাওয়া অনুসারে তালার মুখ পালটে যায়, তাই চাবিও অন্য লাগে।

রাজপুত্র সেই কথা শুনে বললেন – মিরাকিউলাস! সত্যিই ভাবা যায়না। আমাদের দেশে যে কি কি জিনিস রয়েছে, আমরা তার কিচ্ছু জানিনা। ... আমি আপনার ওই তালাটা অবশ্যই দেখবো। ... আপনি আগে ফ্রেস হয়ে, লাঞ্চ করে নিন। তারপর না হয় দেখছি। ... আমারটা তো আপনাকে দেখাতে পারলাম না। আপনারটাই দেখবো।

বাবা আর কথা বাড়ালেন না। ... আমাকে নিয়ে গেস্টরুমে চলে গেলেন। গেস্ট রুম দেখেও, আমার মাথা ঘুরে গেল। যেকোনো ফাইভস্টার হোটেল এর কাছে তুচ্ছ! ... স্নানের জায়গায় রাজকীয় বাথটাব। প্রথমবার জীবনে বাথটাবে স্নান করলাম। বিছনায় এসে একটু শুতে মনে হলো যেন, মেঘের মধ্যে শুইয়ে পরেছি। নিজেকে রাজরানি রাজরানি মনে হচ্ছিল, এক সময়ে। বাবাকে দেখলাম, নিজের কাজে মত্ত। কোথা থেকে ঘুরে এলেন আর হেসে বললেন, দাঁড়া, ওই তালাটা বার করতে হবে না!

এই বলে ব্যাগ হাতরে, একটি তালা বার করলেন। তালাটা আমার খুব চেনা। আসলে আমার এন্টিক জিনিসের সখ আছে। তাই আমি কিছু কিছু কালেকশন করতাম। সেই কালেকশনেরই একটি সেই তালা। আমি বললাম – কিন্তু এটা তো আকবরের নয়! এটা তো ব্রিটিশদের!

বাবা – জানি, তবে মনে হয়েছিল, এমন একটা কিছু সঙ্গে রাখলে কাজ দেবে। তাই হাতের সামনে যেটাকে দেখে মনে হয়েছে বেশ রাজকীয় লাগবে, সেটাই তুলে নিয়ে চলে এসেছি।

বাবাকে দেখলাম, মোবাইল নিয়ে কি একটা ঘাটাঘাটি করছেন। বললাম – কিছু কি খুঁজছো!

বাবা – হুম, এখানে চিল হাড় ছেরে হার চুরি করছে, ওখানে গোপাল চুরি হচ্ছে। দুটোই আকবরের সামগ্রী। একটা কেমন গন্ধ গন্ধ লাগছে। ... তাই একটু দেখছি। ... আচ্ছা চল, একটু এখানের পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে। ... তুই যাবি না, আমি একাই ঘুরে আসবো?

আমি – আমার যাবার কি দরকার আছে? এই বিলাসিতাটা একটু এনজয় করছিলাম আর কি।

বাবা হেসে বললেন – হুম, ... ঠিক আছে, ঘুরে ঘুরে দেখ একটু। আমি আসছি। বেশ কিছু কাজও আছে, সেরে আসছি। ফিরে আস্তে আস্তে রাজঘরানার লাঞ্চ রেডি হয়ে যাবে। তখন জমিয়ে খাওয়া যাবে। তবে এখানে কাঁটা চামচে খেতে হবে। চিফ মিনিস্টারের খাস লোক হয়ে এসেছি। উনার প্রেস্টিজ রাখতে হবে।

আমি – চামচে করে রাজকীয় খাবার খাওয়া যায় না কি!

বাবা হেসে বললেন – সুখ কি খালি খেয়ে হয়! এখানে খাবার সুখ নয়, রাজকীয়তার সুখ নিতে হবে। যাইহোক, তুই ঘুরে দেখ আমি আসছি।

তালা চুরি

বাবা ফিরে এলেন প্রায় ২টো। লাঞ্চের ডাক ৫ মিনিট আগেই দিয়ে গেছে রাজপ্রাসাদের বেয়ারা। বাবা আস্তেই, বাবাকে বলছিলাম সেই কথা। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা আবার এসে হাজির। উনি বললেন – হুজুর খানা তৈয়ার হে। রাজাসাহেব ভি টেবিল পে ইন্তেজার কার রেহে হে।

বাবা হেসে বললেন – বহত দেরসে ওয়ে টেবিল মে আয়ে হে?

বেয়ারা – নেহি হুজুর, আভি বেইঠে হে।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – রাজাসাহেবকে বসিয়ে রাখা ঠিক নয়। চল, এখনই চল।

বেয়ারার সাথেই আমরা চলে গেলাম, খাবারের টেবিলে।

হালদার বাড়িতে একরকম দেখেছিলাম। আর এখানে সম্পূর্ণ রাজকীয়তা। বিশাল টেবিল। দুটো ডবল বেড মেলালে বোধহয় টেবিলের সাইজ ঠিক হবে। বার্নিশ করা বার্মা টিকের টেবিল। উপরে শ্বেতপাথর দেওয়া, আর তার উপর হাই-কোয়ালিটি কাঁচ। তার উপর খাবার রাখা আছে। আর বিশাল বিশাল রূপোর থালায় আর বাটিতে, বেয়ারা খাবার সার্ভ করে দিচ্ছে।

খাবারের স্বাদ বাঙালিদের পোষাবে না। মশলা কম খাবারে। তবে পদ প্রচুর। তবে ওত ভেবে লাভ নেই। চামচ দিয়ে কি আর রাজকীয় খানার স্বাদ পাওয়া যায়! ... অগত্যা, অল্পই খেতে হলো, কারণ চামচ দিয়ে বেশি পরিমাণ খেতে হলে, দিন কাবার হয়ে যেত। খাবার সময়ে হাল্কা হাল্কা কথা। বাবা বললেন – তালাটা বার করে রেখেছি। কখন দেখাবো আপনাকে বলুন।

রাজপুত্র – খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ, ব্যাল্কনিতে টি-মিট করবো। সেখানেই দেখাবেন।

আর তেমন বিশেষ কথা হয়নি, শুধু রাজপরিবারের সাথে আলাপ করা ছাড়া। অনেক সদস্য, কেউ সোজাসুজি রাজপরিবারের আবার কেউ রাজপরিবারের একসময়ে কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের পরিবারও রয়েছে এখানে।

খাবার খেয়ে সুখ হয়নি। তবে ওই নরম বিছানা আমাকে টানছিল। তাই খাওয়া পর্ব সেরে, ঘরে গিয়ে টানটান বিছানায়। বাবা বললেন – খেয়ে উঠেই শুইয়ে পরলি। একটু হাঁটাহাঁটি করে নিতে পারতিস।

আমি অভিযোগের সুরে বললাম – বেশি খাইনি তো। চামচ দিয়ে কি আর বেশি খাওয়া যায়! ... বিছানাতে একবার শুইয়ে দেখো। এমন বিছানায় আমি এর আগে কনোদিনও শুইনি।

বাবা – হুম, মেরিনো তুলোর তৈরি তোষক, আর চাদরটা ইজিপ্সিয়ান কটনের থেকে তৈরি।

আমি – মেরিনো তুলো মানে?

বাবা – অস্ট্রেলিয়াতে তৈরি হয় মেরিনো তুলো। মেরিনো ভেড়ার পশম থেকে পৃথিবীর সব থেকে নরম আর মনোরম তুলো তৈরি হয়। সেই দিয়েই তৈরি এই তোষক। আর ইজিপ্সিয়ান কটনই পৃথিবীর সব থেকে সৌখিন আর চামড়ার জন্য আইডিয়াল। এই বুনন এমনই যে, আমাদের চামড়ার প্রতিটি

রোমকূপকে এখানে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া হয় বিশ্রাম করার। সেই কারণে, এটি পৃথিবীর সেরা কটন বলে চিহ্নিত করা হয়।

আমি – তুমি শোবে না একটু?

বাবা – রাত্রে শোবো। ... এখন অনেক কাজ আছে। ... তোর তালাটা চুরি যাতে হয়, সেটাও তো দেখতে হবে।

আমি – মানে! ওটা আমার সখের তালা! ... চুরি হবে মানে! ... তুমি কি চোরকে নিমন্ত্রণ দিয়ে চুরি করাবে নাকি!

বাবা – উম, ... হুম। একরকম ভাবে সেটাই বলতে পারিস। চোরকে নিমন্ত্রণ তো দেওয়া হয়ে গেছে। তাই চুরি তো হবেই।

আমি – কিন্তু!

বাবা – চিন্তা করিস না, ঠিক সময়ে অক্ষত অবস্থায় ফেরত পেয়ে যাবি।

আর কিছু বললাম না। আসলে মনোরম বিছানায় শুইয়ে যে আরামটা পাচ্ছিলাম, সেটা নষ্ট করতে চাইছিলাম না, কিন্তু হ্যাঁ সখের তালাটা হারিয়ে ফেলবো, সেই নিয়ে একটু খারাপ তো লাগছিল।

বাবাকে দেখলাম, একটা বন্দুক নিয়ে কি করছেন। আমি তাকিয়ে দেখে বললাম – তোমার কি গান লাইসেন্স আছে নাকি? তোমার বন্দুক আছে, জানতাম না তো?

বাবা – আমার নয় বন্দুকটা। পুলিশের বন্দুক, তবে এটা গুলি চালানোর বন্দুক নয়। এটা বনদপ্তর ব্যবহার করে খুব। দূর থেকে প্রাণীদের নিঃশব্দে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পারিয়ে দেবার যন্ত্র এটা।

আমি – কিন্তু কি কাজে লাগবে এটা!

বাবা – চিল বাবাজি কোথায় হার নিয়ে যায়, জানতে হবে তো! তাই সেই ব্যবস্থা করছি।

আমি – চিল ঘুমিয়ে পরলে, কি করে যাবে!

বাবা হেসে উঠে বললেন – ঘুমের ওষুধ দিলে তবে না ঘুমবে। আমি তো আর ঘুমের ওষুধ দিচ্ছিনা। ... আমি ওকে একটা অন্য ইনজেকশন দিচ্ছি, যাতে ওর ট্র্যাকিং করা যেতে পারে। ... তুই একটু ঘুমিয়ে নে। আমাকে আমার কাজটা করে নিতে দে। ... আর হ্যাঁ, আমি গান রাখিনা ঠিকই। তবে বন্দুক চালাতে জানি। ট্রেনিং নিয়েছি। তাই নিশ্চিন্তে থাক, লক্ষ্যচ্যুত হবো না আমি।

আর চাপ নিই নি। বেশ বুঝতে পেরেছি। বাবা এখন ফাঁদ পাতাতে মত্ত। আমি নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে একটা ছোট্ট ঘুম দিলাম। জীবনের সেরা ঘুম ছিল সেটা। এমন বিছানায় শোবার পর, বাড়ি গিয়ে দুদিন ভালো করে ঘুমোতেই পারিনি। ওই শক্ত বিছানায় শুইয়ে কেমন যেন ঘুমই আসছিলো না।

ঘুম থেকে নিজের থেকে আমি কনোদিনও উঠতে পারিনা। এখনও পারি না। এখন প্রতিভা, মানে ফরেনসিকের প্রতিভা, আমাকে ফোন করে ঘুম ভাঙায়। তখন বাবা আমাকে ঘুম থেকে তোলেন। মুখধুয়ে এসে বসতে যাবো, বেয়ারা এসে বলল – হুজুর, চা সার্ভ করে দিয়েছি।

বাবা আমাকে আর সঙ্গে আমার সখের তালাটা আর তার তিনটি চাবি নিয়ে চায়ের টেবিলে গেলেন। সেখানে গিয়ে চা খাবার সাথে সাথে সকলে সেই তালাকে দেখলেন, আর প্রচুর তারিফ করলেন, সেই তালার, আকবরের দূরদৃষ্টির আর ভারতের সম্পদের। ... বাবা তেমন কিছু বললেন না, শুধু সকলের হ্যাঁতে হ্যাঁ মিলিয়ে গেলেন।

শেষে সকলে চলে গেলে, বাবা আমাকে নিয়ে আবার ফিরে এলেন। তালাটি খোলা ব্যাল্কনির পাঁচিলে রাখতে বললেন আমায়, আর বললেন ব্যাল্কনিতে একটু ঘোরাফেরা করতে। আমিও তেমনই করলাম। খানিককষন এমন করার পর, এই মিনিট পনেরো পরে, কোথা থেকে, একটা চিল উড়ে এলো। আমি ভয় পেয়ে পাঁচিলের নিচেই বসে পরলাম। আর সেই চিল পাজিটা, আমার সখের তালা নিয়ে হাওয়া। চিল চলে যেতে, বাবা ঈসারা করে আমাকে ডেকে নিলেন।

এই তালাটা যোগার করতে, আমাকে অনেক কাঠখড় পোয়াতে হয়েছিল। একটু একটু করে টিফিনের পয়সা জমিয়ে, এই তালাটা কিনেছিলাম, আমার চেনা গড়িয়াহাটের এন্টিক সপ থেকে। ঘরে এসে বাবাকে দেখলাম রিল্যাক্স হয়ে একটু বিছানায় গড়িয়ে নিলেন। শুইয়ে শুইয়ে বললেন, কাল সকালের মধ্যে, তোর তালাচাবি, আর সিন্দিয়াজির এলেকজ্যান্ড্রাইট হার, আর যদি ভুল না করি, তবে হালদারের গোপালের সাথে সাথে আরো বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়ে যাবে। ... আজ আরাম করে, এখানে এই বিছানায় শুইয়ে নেওয়া যাক, কি বল!

আমি আর কি বলবো। চুপ করে থেকেই বললাম – তুমি শিওর! ...

বাবা কিছু না বলে একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন   – এত বড় চিল দেখেছিস এর আগে? ... ঈগলের মত বড়, আর গায়ে কেমন এরোলাইটের গন্ধ, টের পাসনি। আমি তো অতো দূর থেকে গন্ধ পাচ্ছিলাম। ... যাই হোক, স্যান্যাল স্যারকে একটা ফোন করতে হবে আর বাড়ুইকেও।

বাবা ফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রথমে উনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ধরলেন, তারপর মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী – হ্যাঁ বিজয় বলো।

বাবা – স্যার, কালকের সন্ধ্যার ফ্লাইট করে দিন। কাল সকাল কি বেলার মধ্যে এখানের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এখানের আসামি গ্রেপ্তার হয়ে যাবে এখানেই। ... তারপর ওখানে গিয়ে, ওখানের আসামিদেরকেও তো গ্রেপ্তার করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী – ওকে, আমি বিকাল বিকাল ভায়া দিল্লির ফ্লাইট বুক করে দিচ্ছি তোমার আর তোমার কন্যার। ... হালদার বাড়িতে কবে আসছো?

বাবা – কলকাতা বিমানবন্দরে নেবে, প্রথম সেখানেই যাবো। ওখানের কাজ শেষ করে, তারপর বাড়ি যাবো।

মুখ্যমন্ত্রী – ওকে, বাড়ুইএর সাথে কথা বলে নাও। ওকে যা ইন্সট্রাকশন দেবার আছে, দিয়ে দাও।

বাবা – ওকে স্যার।

বাবা ফোন রেখে, সঙ্গে সঙ্গেই ইন্সপেক্টর বাড়ুইকে ফোন করলেন।

ইন্সপেক্টর বাড়ুই – হ্যাঁ বলুন বিজয় স্যার।

বাবা – কাল দুপুর-বিকাল নাগাদ, হালদার বাড়িতে একটুকরো বাহিনী নিয়ে উপস্থিত থাকবেন, আর সকলকে একত্রিত করবেন। ... আমি এয়ারপোর্টে নেবে, ওখানেই যাবো। হয়তো, আমার সাথে সিন্দিয়াজিও যাবেন। যদিও, উনি গেলে, উনার নিজস্ব প্রাইভেট জেটেই যাবেন। সেখানেই সমস্ত কেসের নিষ্পত্তি করে, সমস্ত এরেস্ট করা শেষ করে, বিদায়। ... আমি তোমাকে মেইল করে দেবো, এরেস্ট ওয়ারেন্ট কাদের নামে ইস্যু হবে। ... আমাকে একটু তোমার অফিসিয়াল মেইল আইডিটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও।

বাবা ফোন ছেড়ে দিলেন। খানিকক্ষণের মধ্যে বাবার কাছে হোয়াটসঅ্যাপও চলে এলো। বাবা একটা মেইল করে দিলেন।

আমি যেন সত্যিই এই কেসে একজন অতিথি। এর আগের সমস্ত কেসে, আমার একটা রোল ছিল। এটাতে যেন আমি শুধুই দর্শক। ... আসলে, এই কেসটা এমনই জটিল, আর ছড়ানো যে, আমার মাথায় কিছু ঢুকছেও না। তাই আরামে থেকে, সিনেমা দেখার মত করে, সমস্ত কিছু দেখে চলেছিলাম।

বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণ হলো। বেলা ১১টা নাগাদ, গয়ালিওর থানার ইন-চার্জ, মিস্টার জাকারিয়া একটা ছট বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন। বাবারও তলপ পরতে, আমি আর বাবা রাজদরবারে উপস্থিত হলাম। বিশাল হলঘরের মাঝে, ১০-১৫টি পুলিশ, আমরা দুইজন, আর রাজপুত্র সহ, রাজপরিবারের ১০জন সদস্য আর ১১জন বিশেষ অতিথি, যেন সাগরের মাঝে জাহাজ মনে হচ্ছিল।

বাবাই সেখানে প্রথম কথা বললেন। সমস্ত কথা হিন্দিতেই হলো। আমি বাংলায় বললাম।

বাবা – ক্ষমা করবেন রাজকুমার সিন্দিয়া। আমার আসল নাম বিজয় সিংহ, সেই ব্যাপারে আমি কনো গোপন করিনি। তবে, আমি আমার নিজের পরিচয় গোপন করেছিলাম। আমি একজন রিপোর্টার, আর হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী অনির্বাণ সান্যালের বিশ্বস্ত পাত্র। আমি এখানে এসেছিলাম সমরেশ হালদারের খুনের তদন্তের জন্যই, আর মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশেই এখানে আসি। আর ক্ষমা করবেন, আপনাকে একটি মিথ্যা কথা বলার জন্য।

রাজকুমার এবার নিচের দিকে এগিয়ে এসে – মিথ্যা কথা! কি মিথ্যা কথা!

বাবা – আজ্ঞে, আমি যেই তালাটি দেখিয়েছিলাম, সেটি এন্টিক পিস, সেই ব্যাপারে কনো সন্দেহ নেই। তবে সেটা আকবরের সম্পত্তি নয়, বরং ব্রিটিশরা সেই তালা ব্যবহার করতো, নিজেদের সুবেদারদের থেকে নথি গোপন করার জন্য। তবে সেই মিথ্যা কথা বলেছিলাম আপনাকে, যাতে যিনি আকবরের ধনের সন্ধান করছেন, তিনি সেই ধনকে লুণ্ঠন করতে চান, তার জন্য।

বাবা এবার অফিসার জাকারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন – চিল উদ্ধার হয়েছে?

উনি সামনে এসে এবার একটা বিশাল চিল নিয়ে আসলে, রাজপুত্র দুহাত দূরে সরে যান ভয়ে। বাবা সামান্য হেসে বললেন – ভয়ের কিছু নেই রাজাসাহেব। এটা সত্যিকারের চিল নয়, একটা রবোটিক ড্রন যার উপর এরোলাইট দিয়ে, কিছু তুলো, আর তার উপর চিলের লোম লাগানো হয়।

বাবা আবার হেসে এবার বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্যে ইংরাজিতেই বললেন — মিস্টার রবার্টশন, আপনার বোধকরি চিলের ব্যাপারে বিশেষ পড়াশুনা নেই। যদি থাকতো, তবে নিশ্চয়ই জানতেন, চিল পরে থাকা শিকারের দিকে হাত বারায়না। চিল শিকারকে আধমাইল উপর থেকে লক্ষ রাখে। আর সেই লক্ষ রাখার সময়ে, সে শিকার কনো দিকে কতটা গতি আর দিশার ফের নিয়ে চলছে, তা নজর করে, আর তার উপর অঙ্ক কষে। সেই অঙ্ক কোষে, নিচে নামে সে, আর সেই জায়গায় হামলা করে, যেই জায়গায় তার উপরে থাকার সময়ে শিকার ছিল না। অর্থাৎ, সে শিকারের ভাবি অবস্থানকে গণিতের মাধ্যমে হিসাব করে নিয়েই সেখানে আক্রমণ করে। ... আপনারাও সেই অঙ্ক কষেন, আর তাকে বলেন প্রজেক্টাইল মোসানের অঙ্ক।

বাবা পায়চারি করতে করতে, আবার বললেন — আর দ্বিতীয় কথা, ভারতের মানুষ চিল সম্বন্ধে ভালোই অয়াকিবহল, তা হয়তো আপনি ভারতীয় হলে জেনে থাকতেন। ভারতীয় নন, তাই আপনার সেই বিষয়ে জানা ছিলনা। আর তাই চিলের গতিবিধিও ঠিক রাখতে পারেন নি, আর চিলের সাইজও। চিল এতো বড়ো হয়না। ডানা না মেলে থাকলে, ভারতীয় চিল এক থেকে দেড় ফিট হয়, আর দানা ছড়ালে তিন থেকে সাড়ে তিন ফুটের বেশি নয়।

আর হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলবেন, চিল হাড়ের শিকার না করে, হারের শিকার করবে কেন? বাসা তৈরি করার সময়ে চিলের অন্য দ্রব্য লাগে, আর সেগুলো কে শিকার করেনা, যোগার করে। ... সেই সুত্রে বলে দিই আপনার ইনফরমেশনের জন্য, শুধু চিল নয়, কনো পাখিই ধাতু দুয়ে বাসা করেনা । কারণ? কারণ ধাতুতে রোদ্দুরের আলো পরলে, তা চকচক করে, আর তা অন্য পাখিদের নজরে এসে যায়, যারা ওর ডিমকে নষ্ট করে দিতে পারে। ... তাই আ টোটাল মিসজাজমেন্ট মিস্টার রবার্টশন।

বাবা এবার রাজপুত্রের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন — স্যার, এই নিন আপনার এলেকজেন্ড্রাইটের আকবরি হার। ... আর স্যার, আপনার এই বৈজ্ঞানিককে এরেস্ট করতে হবে। ... উনি সম্পূর্ণ ভাবে আসামি নন। তবে হ্যাঁ, আসামির উদ্যোক্তা বলা যেতে পারে। ... বাকি কথা জানতে হলে স্যার, আপনাকে কলকাতা আস্তে হবে। হালদার বাবুর বাড়িতে বাকি কেসের নিষ্পত্তি হবে। ... যদি আপনি ইন্টারেস্টেড থাকেন, তবে আপনি চলে আস্তে পারেন। আমরা আজ বিকালেই রওনা দেব। কাল ১টার মধ্যে ওখানে মিটিং, আর সেখানেই সমস্ত কেসের সমাপ্তি হবে।

পুলিশ এবার রবার্টশনকে এরেস্ট করলে, রাজপুত্র বললেন — এক্সিলেন্ট সিন, এক্সিলেন্ট। ওকে, আমি অবশ্যই কলকাতা যাবো। আমার প্রাইভেট জেট আছে । তাতে যদি আমি এখান থেকে সকাল সাতটায় রওনা দিই, তবে কলকাতাতে বাই টুয়েলভ পৌঁছে যাবো।

বাবা – ওকে স্যার, আমি তাহলে এয়ারপোর্ট থেকেই আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে যাবো । আপনি মুখ্যমন্ত্রীর গেস্ট হয়ে যাবেন। তাই আমার বাড়িতে থাকতে বলবো না। আর আমার বাড়িতে আপনি থাকতেও পারবেন না, কারণ আমি অত্যন্ত মধ্যবিত্ত একজন। ... তবে হ্যাঁ, আমার বাড়িতে লাঞ্চ করার নিমন্ত্রণ করতে চাই। ... রাজকীয়তা থাকবে না, তবে এমন স্বাদের ঘরোয়া খাবার আপনি হয়তো খুব কমই খেয়েছেন। ... আর তার থেকেও বড়ো কথা, আমি একজনের সাথে আপনার দেখা করাতে চাই। ... হ্যাঁ, উনার সাথে দেখা করে, আপনি সত্যই আনন্দিত হবেন। তারপর না হয়, আপনার কনভয় আপনাকে মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক করা পাঁচতারা হোটেলে পৌঁছে দেবে।

রাজপুত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে, আমি আর বাবা এবার কলকাতায় ফেরার তজ্জরি করলাম। আর বিকালের ফ্লাইটে দিল্লি হয়ে, পরের দিন ১২টা ১৫তে কলকাতা বিমানবন্দরে ল্যান্ড করলাম।

নিষ্পত্তি

এয়ারপোর্টে আস্তেই, দেখি রথিনকাকা আর অতনু আঙ্কেল অপেক্ষা করছেন। বাবা উনাদের দেখে হেসে বললেন – নিশ্চয়ই আমার জন্য নয়; রাজপুত্র সিন্দিয়ার জন্য, তাই না!

রথিনকাকা – হ্যাঁ উনার সিকিউরিটির জন্য একটা আগে আর একটা পরে আর্মড ভ্যান রাখা হয়েছে। তবে, উনার গাড়িতেই তুমি যাচ্ছ। ... তুমি কি কম বড় সেলিব্রিটি নাকি হে!

বাবা – কি বলছো রথিন! আমি আমার সেলিব্রিটি!

অতনু আঙ্কেল – না বলে থাকতে পারছি না বিজয়। তুমি যেই ভাবে তোলপাড় করে দিচ্ছ সমস্ত কিছু, কালকে যদি ভারতজুরে তোমার নাম হয়, আর ফর্বসের ম্যাগাজিনের কভার পেজে তোমার নাম ছাপে, তবে কিচ্ছুই অবাক হবো না ভায়া।

বাবা – ঠাট্টা থামাও আর বলো, মিস্টার সিন্দিয়া কি এসে গেছেন!

অতনু আঙ্কেল – হ্যাঁ, ১০ মিনিট হয়েছে। গাড়িতে অপেক্ষা করছেন তোমার আর মিলির।

বাবা আর আমি, সেই কথার পর আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। সামনে যা দেখলাম, তাতে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। রোলস্ রয়েস, ফ্যান্টম সিরিজের গাড়ি। আমরাও নাকি সেই গাড়িতেই উঠবো। ... স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু এমন স্বপ্ন দেখারও দুঃসাহস করিনি কোনদিনও। বাবার দিকে তাকালাম।

দেখলাম, বাবাও কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেছেন। বাবা রথিন কাকার দিকে তাকালেন। রথিনকাকা চোখের ইশারায় বললেন, উঠে পরো গাড়িতে।

বাবা একটু কেমন যেন যবুথবু হয়ে গেছিলেন, এই সমস্ত রাজকীয়তায়। যেন উনার স্মার্টনেস উধাও হয়ে গেছে। আমি আর বাবা গাড়িতে উঠলাম, গাড়ি ছেড়ে দিল। সামনে একটা পুলিশের গাড়ি, পিছনে একটা। বাবা একটাও কথা বলছেন না। রাজপুত্রই বললেন — কি ব্যাপার সিন, আজ যে বড় চুপচাপ! টেন্সড নাকি!

বাবা একটু নিজেকে সামলে নিয়ে — না স্যার। এমন রাজকীয়তাতে আমি একদমই অভ্যস্ত নই। অত্যন্ত সামান্য একজন ভারতীয় নাগরিক। এই প্রাচীন, ঋষিমুনিদের দেশে জন্ম লাভ করার জন্য, দিবারাত্র ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। সামান্য একজন ভেতো বাঙালী স্যার আমি, আর এই নয় শক্তিপীঠ বিশিষ্ট, তিনতিনটি অবতারগরিষ্ঠের দ্বারা পবিত্র করে দেওয়া পীঠে জন্মগ্রহণ করতে পেরে, ঘুমের মধ্যেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। ... আমার কাছে এই রাজকীয়তা যেন ভয়াবহ লাগছে স্যার।

মিস্টার সিন্দিয়া হেসে বললেন — বাট, আ ম্যান লাইক ইউ, উইথ সাছ জেনারাসিটি, ইন্টেলিজেন্স, অ্যান্ড ফেইথ অন নেশন, ডিজার্ভ ড্যাট। তোমার কি তা মনে হয়না!

বাবা — না স্যার, আজ যেই প্রকারে আমার মন মস্তিষ্ক চলছে, তা চলতে পারছেই কারণ আমি বিলাসিতাশূন্য হয়ে মাটির মানুষ বলেই। আজ যেই ভাবে অনেকের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছি আমি, একজন পুলিশও নই যে, তাকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এমন দায়িত্ব দিচ্ছেন যা একজন সিয়াইডিকেও দেন না উনি। ... স্যার, এই সমস্ত এই কারণেই সম্ভব হয়েছে, কারণ এই মাটির সাথে আমি যুক্ত, আর এই ভারতমাতার পবিত্র মাটিকে আমি চিনি বলে। ... স্যার, যদি এই মাটির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, তবে আমিও নষ্ট হয়ে যাবো।

মিস্টার সিন্দিয়া সামান্য মুচকি হেসে বললেন — এটাই তো জিনিয়াসদের বিশেষত্ব সিন। আর এই রহস্য ভেদ করা সত্যিই অসম্ভব। বিজ্ঞান বুঝতেও পারেনা, মাটির গুণ ঠিক কি, আর ভেবে মরে যে কনো ফ্যাসিলিটি ছাড়া, এই গুণীরা কি করে এমন গুণী হতে পারে। ... কিন্তু রহস্য এখানেই, গুণ এই মাটিরই। আর যে যে যখন যখন এই মাটির সাথে লেপটে পরে থেকেছে, সেই গুণী হয়ে উঠেছে।

বাবা এবার একটু সামান্য হয়ে বললেন — হ্যাঁ স্যার, এটাই রহস্য । আমরা কেউ গুণী নই। আমাদের দেশের এই পাবন মাটিই আমাদেরকে গুণী করে দেয়। এই মাটির গুণকে কেউ নষ্ট করতে পারেনা, তাই

সহস্রবার লুটলেও ভারতকে গুণীমুক্ত করতে পারেনা কেউই। ... উলটে, যেই যখন এই ভূমিকে ভালোবেসে ফেলেছেন, তিনিই গুণী হয়ে উঠেছেন, তা সে পাঠান শেরশাহই হন, আর মহামহিম আকবরই হন। ...

মিস্টার সিন্দিয়া – কিন্তু এই মাটির সাথে ভারতীয়দের সম্পর্ক নষ্ট করে দিচ্ছে বিদেশিরা আস্তে আস্তে। ভারতবাসীকে যন্ত্রমুখর করে দিয়ে, মাটির সাথে যোগাযোগ নষ্ট করে দিচ্ছে, আর ফলে গুণেরও নাশ হচ্ছে।

বাবা এবার হেসে বললেন – ঋষিত্ব বোঝেন স্যার! ... হুম ঋষিত্বের তেজ এই ভূমিতে বীজরূপে বপন করা আছে। এমনই বীজ তা যে, সহস্র সহস্র বছর ধরে সেই বীজ ভিতরে ভিতরেই মহীরুহে পরিণত হয়ে গেছে, এমনই বীজ তা যে, সমানে সেই বনস্পতির শেকড় বাড়তেই থাকছে। যদি ভারতভূমির সমস্ত মাটিকে খনন করে সমুদ্রে যদি ফেলে দেওয়া হয়, তবুও সেই বীজের নাশ হবেনা, কারণ ঋষির বীজ, সে যে কালজয়ী। স্থান, কাল, পাত্র, সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে সেই বীজ। তাই ভারতকে গুণশূন্য করা অসম্ভব।

বাবা আবার থেমে বললেন – হ্যাঁ, যান্ত্রিকতার বিস্তার হয়েছে, মানুষ সমানে যন্ত্রনির্ভর হয়ে চলেছে। তাই সেই গুণ এখন সুপ্ত হয়ে রয়েছে। তবে যে যে যখন যখন এই মাটির মধ্যে যেই বীজ আছে, তা বুঝেছেন, তিনিই ঋষি হয়ে গেছেন স্যার। তা রাজনীতিবিদ, মহাত্মাগান্ধী বা নেতাজি হন, বা বিপ্লবি অরবিন্দ ঘোষ হন। এই বীজের নাশ এখনও হে হয়নি, আর কনোদিনও হবে না, তার রিসেন্ট প্রমাণ হলেন এপিজে আব্দুল কালাম স্যার। ... স্যার, এই মাটি তো সাম্প্রদায়িকতার রক্তে ভেজে না, এই মাটি তো হিন্দু-মুসলমান চেনে না। এই মাটি কেবল নিজের সন্তানকে চেনে। যে-ই এই মাটিকে আঁকড়ে ধরবেন, সেই উনার সন্তান, তা তিনি হিন্দু হন বা মুসলমান, জৈন হন বা খ্রিস্টান। এই মাটির গুণ নষ্ট হয়নি, আমরা সেই গুণের দিকে তাকাতে ভুলে গেছি।

বাবা বলতে থাকলেন – সেই গুণের দিকে আজও যিনি তাকান, তিনি আজও ঋষি হয়ে ওঠেন। আর যিনি না তাকিয়ে, যন্ত্রে আর আধুনিক ভেল্কিবাজীর বিজ্ঞানের দিকে তাকান, তিনি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছেন। তবে আজও যে এই মাটি সমান ভাবে গুণসম্পন্না, তার প্রমাণ দেখানোর জন্যই তো আমি আপনাকে আমার বাড়িতে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেছি। আপনি আসছেন তো?

মিস্টার সিন্দিয়া বললেন – হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা কথা বলো, ঋষিত্বই কি এই মাটির প্রকৃত গুণ!

বাবা একটু হেসে বললেন – স্যার, ঋষিত্ব মানে কি জানেন! ঋষিত্ব মানে সত্যের জ্ঞান লাভ করা, বিজ্ঞানের মত অসত্যে সত্যের সন্ধান করে ফেরা নয়। সত্য সত্য, সত্যের সন্ধান লাভ করাকে ঋষিত্ব বলে। ... (আবার হেসে) আর স্যার এই মাটির গুণই হলো আমাদের অন্তর্মুখী অর্থাৎ সত্য অভিমুখী করে

দেওয়া। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কি বলতেন জানেন স্যার। উনি বলতেন, একবার নাচতে শিখে গেলে, উঠান ব্যাকা হলেও নাচা যায়। তেমনই স্যার, এই ভারতভূমি সিদ্ধিলাভ করে ফেলেছে। তাই এই ভূমির মধ্যে অজ্ঞানতা বিরাজ করতেই পারে না।

তাই যিনিই একবার এই মাটির সম্পর্কে চলে আসেন, তিনিই অন্তর্মুখী হয়ে যান, আর সহজেই ঋষিত্ব লাভ করে নেন। এই দেশে দাঁড়িয়ে ঋষিত্ব লাভ করা, স্যার, একটা বাচ্চাছেলে চাইলেও পারবে। কিন্তু সেই একই প্রয়াস, একই বাচ্চাকে দিয়ে অন্যদেশে করান। অসম্ভব হয়ে যাবে তার কাছে। ... এই তো এই মাটির গুণ স্যার।

মিস্টার সিন্দিয়া – হুম, তুমি অন্যরকম সিন। আই মাস্ট সে, ইউ আর ভেরি মাচ প্র্যাক্টিকাল। কিন্তু একটা কথা বলো, আমাদের দেশ তো বিজ্ঞানের দিকেও বেশ এগোচ্ছে, তাই না!

বাবা এবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেন – স্যার, বাঘ যে ব্যাঙের শিকার অনায়সেই করে নেবে, এতে চমকাবার কি আছে! ... যে দ্রুতগামী হরিণের শিকার করে অভ্যস্ত, তার কাছে ব্যাঙের গতি কি করে বেশি লাগতে পারে স্যার! ... এটা ভারতবর্ষ স্যার। এখানের মানুষ সাপ নয়, বাঘ। এরা হরিণের শিকার করে অভ্যস্ত। এঁদের কাছে ব্যাঙ ধরা যে বাচ্চাদের কাজ। ... ওই গল্পটা পরেছিলাম আমরা সকলে ছোটবেলায়, একটা অন্তঃসত্ত্বা বাঘিনী ভেরা শিকার করতে গিয়ে মারা যায়, তারপর সেই বাঘিনীর বাচ্চা ভেড়ার পালের সাথেই মিশে থেকে ঘাস খায়। ... আমাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম স্যার।

আরো বিস্তারে বলতে বাবা বললেন – আসলে, আমরা ভুলেই গেছি যে আমরা বাঘ। সারা পৃথিবী কায়েরের মত ব্যাঙ ধরাকেই রাজকীয় কর্ম বলে গণ্য করছে, তাই আমরাও সেই ব্যাঙ ধরাতেই মেতে উঠেছি। ... স্যার, বিজ্ঞানের দৌরাত্ব হলো ব্যাঙের যাত্রা। ... যেদিন যেই মানুষ ঋষিত্ব অর্জন করতে ছোটে, তখনই সে নিজের ওই ব্যাঙের পিছনে ছোটার কথা স্মরণ করে নিজের উপরেই নিজে হাসে। ... ঋষিত্ব স্যার, জাত যুবতী হরিণ। ... বাঘকে নিজের সর্বশক্তি লাগয়ে দিতে হয়, এই হরিণকে বাগে আনতে। সেই কাজ করে আমরা অভ্যস্ত, ব্যাঙ ধরতে গেলে, আমরা তো শিরপা লাভ করবোই, এতে আবার অস্বাভাবিক কি আছে!

সিন্দিয়া স্যার মন দিয়ে শুনছেন দেখে বাবা আবার বললেন – আসলে স্যার কি বলুন তো, কাকের গল্প শুনেছেন ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে ময়ূর হতে চায়। কিন্তু আমরা হলাম ময়ূর, পেখম ঝেড়ে কাক হতে চেষ্টা করছি। বারে বারে পেখম ঝাড়ি, আর বারে বারে কাকেরা আমাদের ঠুকরে যায়। ... স্যার, ভারত সারা

দুনিয়ার রাজত্ব করতো একদিন, আবারও করতে পারে। যেদিন রাজত্ব করতো, সেদিনও ঋষিত্বের বলেই করতো, আর আবার যেদিন ঋষিত্বের বলে ভারত বলিয়ান হয়ে উঠবে, সেদিন আবার সারা দুনিয়ার শাসন করবে। ততদিন পর্যন্ত, ওই পেখম ঝেড়ে কাকের দলে ভিড়বে, বারে বারে ঠোকরাবে, বারে বারে ফিরে আসবে। ... বাঘের কি সাপে ভয় থাকে স্যার! ... কিন্তু দেখুন না, আমরা বাঘ হয়ে ব্যাঙ ধরতে নেমেছি বলে, আমেরিকা ইত্যাদিদের মত সাপেদের থেকেও ভয়ে রয়েছি।

সিন্দিয়া স্যার সমস্ত কথা শুনছিলেন। উনার চোখমুখের রঙ পালটে গেছিল বাবার কথা শুনে । শেষে গাড়ি থেকে নামার সময়ে একবার বললেন – আর কি কনোদিনও সমস্ত কিছু আগের মত হবেনা!

বাবা হেসে বললেন – ৫১ শক্তিপীঠের দেশ স্যার এটা, ১২টা জ্যোতিরলিঙ্গের দেশ স্যার এটা। কতদিন আর ভ্রমে ঘুরে বেড়াবে। সময় আসলে, ঠিকই জাত বেড়িয়ে আসবে। ... যতই অধিরথ-রাধার সন্তান হয়ে কর্ণ বিরাজ করুক, হাতে বিজয় ধনুক পরলে, তার ক্ষত্রিয়ত্ব বেড়িয়ে আস্তে বাধ্য স্যার। ... রাজার ছেলে যতই বস্তিতে থাকুক স্যার, যখন শাসনের সময় আসবে, তখন তার রাজপুত্র হবার গুণাগুণ সামনে না বেড়িয়ে থাকতেই পারবে না। ... তাই নিশ্চিন্তে থাকুন। একটু আবহাওয়া পালটাতে ইচ্ছা হয়েছে, তাই এই ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের একটু ছুটি কাটাতে দিচ্ছেন। বিজ্ঞানের মত ব্যাঙ ধরতে মেতে থাকতে দিয়েছেন উনি। যখন উচিত সময় আসবে, তখন ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের ঠিকই সমস্ত কিছু স্মরণ করিয়ে দেবেন।

বাবা আবার একটু হেসে বললেন – স্যার, সঠিক সময় আস্তে ধরিত্রী মাতা নরকাসুরকেও নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি হলেন বরাহরূপী নারায়ণের সন্তান। আবার লহিতাঙ্ককেও বলেছিলেন, তিনি হলেন মহাদেবের থেকে উদ্ভূত শিবাংশ। ... নরকাসুর সেই সত্য জেনে, কৃষ্ণের হাতে নিহত হন। আবার লহিতাঙ্ক সত্য জেনে, মহাদের থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গল গ্রহ হয়ে অমর হয়ে যান। ... তাই চিন্তা করবেন না স্যার, সঠিক সময় আসলে, আমাদের মা আমাদেরকে আমাদের সত্য জানিয়েই দেবেন। সত্য জানার পর, আমরা নরকাসুরের মত নিজের নাশ ডেকে আনবো না লহিতাঙ্কের মত উদ্ধার হয়ে যাবো, সেটা তখনের ভাবার বিষয়। আপাতত আমরা হালদার বাড়ি এসে গেছি। তাই চলুন কেসের নিষ্পত্তি করে আসি।

বাবা এবার আমাদের সকলকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলাম, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত। সঙ্গে বাড়ুই আর বাড়ির সকল সদস্য উপস্থিত, আর সঙ্গে রয়েছেন সেই তিন অতিথিও। বাবা দালানে উঠতে উঠতেই, মুখ্যমন্ত্রীর দিকে চোখ রেখে, চোখের ইশারায় একটা প্রণাম করে বললেন – কি বিনয় মিস্ত্রি! ... তোমার বাঁদিকের ঝুল্পির রঙটাতোবাকি চুলদাড়ির সাথে ম্যাচ করছে না!

আমাদের দেখা সেই সাধুটি এবার বলে উঠলেন – কে বিনয় মিস্ত্রি!

বাবা হেসে উঠে বললেন – তাহলে তামিল সাধু, যিনি কোনরকমে হিন্দি বলছিলেন, তাঁর মুখ দিয়ে বাংলা বেড়িয়ে এলো এবার হ্যাঁ! ... বাড়ুই, ওর পটচুলদাড়ি খুলে দাও দেখি।

ইন্সপেক্টর বাড়ুই এবার কয়েকজন কনস্টেবল দিয়ে চেপে ধরিয়ে, সাধুর পটচুলদাড়ি খুলে ফেললে, বাড়ির সকল সদস্যরা অবাক হয়ে বললেন – বিনয়!

বাবা হাস্যছলে বললেন – তামিল সাধু, যিনি ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলতে পারেন। ... ভাই বিনয়, একটা কাজ ঠিক করে যদি তুই করতে পারতিস! ... একটা নাটক করার সময়ে একটু রিহার্সাল তো করবি! ... তা না, সোজা স্টেজে মেকআপ! ... মাঝে মাঝে তুই হিন্দি বলার সময়ে তামিল টানটা ভুলে যেতিস, মনে পরে সেই কথা! ... নাকি কেউ বুঝতে পারছেনা, তাই বেমালুম চালিয়ে যাচ্ছিলি নাটকটা! ...

এই বলে পকেট হাতরে, বাবা একটা ঝুল্পি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন – এই নে, গোপাল লুকিয়ে রাখতে গিয়ে, মাটি কুপিয়ে ছিলিস তো! সেখানে তোর বাঁদিকের ঝুল্পিটা খুলে গেছিল। ... আমরা যেদিন এখান থেকে গেলাম, নিউমার্কেট থেকে নতুন পটচুল লাগাচ্ছিলিস, তার ভিডিও এটা। ... এই বাড়ুই, আমার থেকে নিয়ে নিও পরে এই ভিডিওগুলো। আদালতে এভিডেন্স প্লেস করতে কাজে দেবে।

অম্বরিস এবার ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়ে বললেন – হারামজাদা আমার থেকে দুইলাখ টাকা ঝেড়েও শান্তি হলো না, আবার গোপাল নিতে এসেছিলিস!

বাবা একটু গলা চড়িয়ে বললেন – দাঁড়ান অম্বরিস বাবু, এখনো অনেক কিছুই বাকি আছে। ... কেসটা তাহলে বলি প্রথম থেকেই হ্যাঁ।

এই বলে বাবা বলতে শুরু করলেন – কেসের শুরু হয় গোয়ালিয়র থেকে, বা বলা যেতে পারে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। ... ক্যালিফোর্নিয়াতে একটা মিউজিয়াম করা হচ্ছে, যেখানে আকবরের সমস্ত জিনিস রাখা হবে। ... বেশ ভালো। এবার ভারতেই সেই সমস্ত জিনিস রাখা আছে, আর তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভারতীয় সংরক্ষণেই আছে। মজার কথা এই যে সেই সমস্ত কিছুর আবার রেকর্ড রয়েছে ইউনেস্কোর কাছে। তাই সেই সমস্ত কিছু আমেরিকা নিয়ে যেতে পারছেনা। ... তাই আমেরিকা কিছু বড়বড় ভারতের রাঘববোয়াল ক্রিমিনালদের সিলেক্ট করে নেয়, যাদের মাধ্যমে আকবরের ছোট ছোট সামগ্রীগুলোকে নিয়ে আসা যায়।

সেই থেকেই সমস্ত কিছুর আরম্ভ হয়। এই তালিকার মধ্যে অনেক কিছু আগের থেকেই ছিল, যাদের মধ্যে একটি হলো গোয়ালিয়র রাজপ্রসাদে থাকা আলেকজান্ড্রাইট পাথরের একটি হার। সেই হারের সন্ধান করতেই, রাজদরবারে একজন ভেল্কি দেখাতে গেলেন। ... কি মিস্টার সিন্দিয়া, এই বিনয়ই তো গেছিল, আপনার প্রাসাদে!

মিস্টার সিন্দিয়া মাথা নেরে বললেন – জি হা!

বাবা মুচকি হেসে বললেন – সেখানে গিয়ে যুবরাজকে ইমপ্রেস করিয়ে, একজনকে রাজপ্রাসাদে ঢোকাতে হতো, যিনি সেই হারটি চুরি করবেন। ... সেই জন্য যুবরাজ বিনয়কেই আস্তে বললে, এঁদের মাথার কথা অনুসারে, বিনয়ের বদলে এংলো ইন্ডিয়ান, রবার্টর্শন গেলেন। ... বৈজ্ঞানিক হয়ে, একটা যান্ত্রিক চিলের রচনা করলেন, আর সেই চিল দিয়ে হার চুরির প্ল্যান করলেন।

(সামান্য মুচকি হেসে) এরই মধ্যে মিস্টার হালদার রাজবাড়িতে গেলেন কাজের সুত্রে, আর উনার কাছে যেই আকবরের পত্নীর সম্পত্তি, গোপালটি ছিল, সেটির কথা বলেন। ... কিন্তু মিস্টার হালদার একজন গোয়েন্দা গল্পের লেখকও ছিলেন। তিনি সেখানে কি চলছে, তার একটা আন্দাজ করেন, এবং বেশ কিছু জিনিস জেনেও ফেলেন, মানে এঁদের এজেন্ডা, এরা কি চায়, কি করতে চায়, সেই সমস্ত কিছু। ... আর সেই সমস্ত কিছু জেনে ফেলার জন্যই রাজাবাহাদুরকে তিনি সতর্ক করে আসেন যে উনার হার যেন উনি লুকিয়ে রাখেন।

গণ্ডগোলটা এখানেই হয়। প্রথম গণ্ডগোল হলো, মিস্টার হালদারের কাছে একটা আরো আকবরি সম্পত্তি আছে জেনে, সেটা হাতিয়ে নেবার চিন্তা হয়, আর দ্বিতীয়টা হলো উনার মৃত্যু। মিস্টার সরকার ওদের এজেন্ডা জেনে ফেলেছেন। তাই উনাকে রাস্তা থেকে সরাতে হবে, নইলে বিপদ হতে পারে। ... তাই কারুকে উনার কাছে পাঠাতে হতো। ... আর সেই প্ল্যান করার জন্য, সুনীল শর্মা ইঞ্জিনিয়ারকে রাজবাড়িতে ঢোকানো হলো।

সুনীল শর্মা মিস্টার হালদারকে ইমপ্রেস করে, উনার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকার নিমন্ত্রণ পেলেন, আর সেই সুবাদে তিনি আরো দুইজনকে নিজের সাথে নিয়ে চলে এলেন। কি তাই তো, মিস্টার শর্মা!

অতিথিদের মধ্যে একজন ইতস্তত করছেন দেখে, বাবা মুখ বেঁকিয়ে হেসে উঠে বললেন – কেন এই অসৎ ব্যক্তিদের সাথে কাজে যুক্ত হন আপনারা! ... এছাড়া কি একজন কাজ জানা লোকের চলে না! ... একটু কম রোজগার করতেন। এখন তো আর রোজগারই করতে পারবেন না! ... সারা জীবনের মত রোজগার বন্ধ হয়ে গেল! ... যাই হোক, এখানে এসে আপনিই তো সিসিটিভি ক্যামেরার তার কেটে দিয়েছিলেন,

আর ডিভিআরএ কারচুপি করে স্টিল ইমেজ লাগিয়ে রেখেছিলেন, কি তাই তো! ... আবার একটা কাঁচা কাজ করলেন এখানে।

মিস্টার হালদার, সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে উনার উপর নজর রাখা হতে পারে ধরে নিয়ে, আগেই সমস্ত ক্যামেরা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। ... একটু দেখে নিন, কি করছেন! ... বশ যা বলল, তাই করতে হবে! ... বশ তো আর জানতে পারছেন না, এখানে কি করা হয়েছে। সেটা তো আপনাকেই দেখতে হতো, কি হতো না মিস্টার শর্মা! ...

মিস্টার বাড়ুই, এরেস্ট করে নিন উনাকে। ... আর কিছু রোল উনি ডিরেক্টলি পলে করেন নি। ... হ্যাঁ, এই বিনয়কে আনা হয়েছিল, কারণ সে আলমারির কোথায় গোপাল থাকে আর আলমারির চাবি কোথায় থাকে, সেটা জানতো বলে, আর উনার পুরানো মনিবের সমস্ত কিছুই উনি জানতেন তাই। ... কি ঠিক বলছি তো! ... বিনয়! (মুখ বিকৃত করে) আসলে কি জানো তো ক্রাইম একটা নেশা । একবার এই নেশা ধরে গেলে, সেটা ছেড়ে ফেলা খুব কঠিন। মিস্টার হালদার কম তো চেষ্টা করেন নি, তোকে ঠিক পথে নিয়ে আস্তে। কিন্তু তুই কি করলি! ... এই ক্রিমিনালদের দলে যোগ দেবার জন্য, তোর ছোড়দাবাবুর থেকে ২ লাখটাকা হাতিয়ে নিয়ে, সেই দলে সেই টাকা দিয়ে যোগ দিলি। ... একবারের জন্যও তোর মনে হলো না, যেই মানুষটা তোর জীবনকে সুদরে দেবার জন্য এতকিছু করলো, তার এমন দুর্দশা করতে একবারও তোর খারাপও লাগলো না!

বিনয় কান্নার সুরে বলে উঠলো এবার – আমি দাদাবাবুকে খুন করি নি!

বাবা এবার একটু রাগের সাথেই ঝেঝিয়ে উঠে বললেন – একদম মরাকান্না কাঁদবি না। চুপ। ... যখন তুই চুরিটা করতে গেলি, তখন দাদাবাবুর মৃতদেহকে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকতে দেখিস নি! ... তখনও তোর একবারও হাত কাঁপল না!

অম্বরিস এবার বললেন – বিনয় করেনি তো, খুনটা কে করেছিল!

বাবা – কেন আর একজন যে অতিথি ছিল আপনাদের! ... ডাক্তার এল্বার্ট মনোজ সিম্পসন! ... সমরেন্দু বাবু, আপনি তো চিনেছিলেন উনাকে। কি তাই না!

সমরেন্দু বাবু বললেন – কিন্তু ও তো বলল, ও এল্বার্টের ভাই। ... দেখলাম হ্যাঁ একটু চেহারাও ফুলে গেছে। তাই ...

বাবা – হ্যাঁ, আমি সেদিনে আপনাদের কথা শুনে নিয়েছিলাম। ... আসলে, খুন করা হয়েছে একটা সারজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে। সেটা বড় কথা নয়, এমনি দোকান থেকেই সেটা যেকেউ কিনে নিতে পারে। কিন্তু যিনি সেই অস্ত্রটা চালিয়েছেন, তাঁর এনোটমির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে, নাহলে এমন নিখুঁত ভাবে গলার নলি কাটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ... তাই আমি কনো ডাক্তার বা কম্পাউন্ডারের সন্ধান করছিলাম। ... যখন আপনি উনাকে বললেন, আরে এল্বার্ট না, তখন আমার হিসাব মিলে যায়। আর তার আগেই, প্রথম আপনাকে দেখে, ইনি চমকে ওঠেন, আর সতর্ক হয়ে যান। তখনই আমার সন্দেহ হয়।

এবার ডক্টর এল্বার্ট গর্জন করে উঠলেন – টকিং রাবিশ। ... আমি একজন জ্যোতিষী, ডাক্তারির কিচ্ছু জানি না।

বাবা একটু গভীর হয়ে উঠে, নিজের ছোট হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট ধাতু বার করে, সমরেন্দু বাবুর হাতে সেটা দিয়ে চোখের ঈসারা করতে, উনি এল্বার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন। ... এল্বার্ট সেই দেখে চেঁচাতে থাকলেন – ও ওপেন হার্ট কি সারজিকাল নাইফ হে। যান লে লেগা ও। ... দূর হাঁটো মুঝসে। ... দূর হাঁটো হালদার। ... তুমারা বাজপানা আভি গেয়া নেই কেয়া!

বাবা এবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে হিন্দিতেই বললেন – কি হলো ডক্টর এল্বার্ট, আপনি নাকি ডাক্তারির কিছু জানেন না। আপনি নাকি ডাক্তার হালদারকেও চেনেন না! ... ডাক্তার হালদারের বাড়ি এটা, আর উনার সাথে দেখা হয়ে যাবে, যদি আগে জানতেন তবে আপনিও নিশ্চয়ই বিনয়ের মত মেকআপ নিয়ে আসতেন তাই না! ... আরেকটা ভুল আপনি করে ফেলেছেন। আপনি এল্বার্ট আর সিম্পসনটাকে তো ছেঁটে এলেন, কিন্তু মনোজটা আপনি ছাঁটতে পারলেন না। গয়ালিওরে গিয়ে, ডাক্তার মনোজকে জেনে আসা কি খুব কঠিন ব্যাপার ডাক্তার এল্বার্ট।

ডাক্তার এল্বার্ট এবার গর্জন করে উঠলেন – হ্যাঁ আমি ডাক্তার এল্বার্ট, তাতে কি প্রমাণ হয়!

বাবা – হুম, রাইট ইউ আর। তাতে কি প্রমাণ হয়! ... আপনি যে আরো একটা ভুল করে ফেলেছেন তাড়াহুড়োর মাথায় ডাক্তার এল্বার্ট! ... আপনি খুনটা করলেন হাতে সারজিকাল গ্লাব্স পরে, কিন্তু মার্ডার অয়েপনটা ডাস্টবিনে ফেলতে গেলেন, উইথআউট এনি গ্লাব্স! ... সেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্টতা এলো না! ...

এই বলে বাবা নিজের মোবাইল ফোন খুলে সকলের সামনে রেখে দেখালেন, এই দেখুন যেদিন আমরা এখান থেকে যাই, সেইদিন বেলা ১২টা নাগাদ, ডাক্তার এল্বার্ট খালি হাতে নিজের মার্ডার অয়েপনটা আর গ্লাভস গুলো ডাস্টবিনে ফেলছেন। ... বাড়ুই, ফরেনসিক টেস্ট হয়েছে!

বাড়ুই – হ্যাঁ স্যার, ছুরির ব্লাড সেম্পেল মিস্টার হালদারের ডেড বডির সেম্পেলের সাথে মিলে গেছে। আর ছুরিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে গ্লাভসএরও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়ে গেছে। ... এল্বার্টের সাথে ওটা ম্যাচ করিয়ে দেখে নিতে হবে খালি।

বাবা হেসে বললেন – আপনারা খুব বোকা আসলে। কি ভাবলেন, বাজার দোকান করার জন্য ১০টা থেকে ৫টার রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে! ... আরে না না! ... আপনারা গোপালটা লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেটাকে পাচার করতে হতো। আপনাদের মার্ডার অয়েপন ফেলতে হতো। আপনাদের পটচুলের জুলফি হারিয়ে গেছে সেটাকে রিপ্লেস করতে হতো। সেই কারণেই তো এই রিল্যাক্সেশন দেওয়া হলো। ... আপনারাও আপনাদের কাজ করলেন, আর আপনারা কি কি করলেন, সেই সমস্ত কিছু আমরাও এভিডেন্স রূপে কালেক্ট করে নিলাম। ...

বাবা এবার অম্বরিস বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন – এই নিন অম্বরিস বাবু। যেই গোপাল এখান থেকে পাচার করা হয়েছিল, আর গোয়ালিয়রে উদ্ধার করা হয়েছে, সেটা।

অম্বরিস বাবু ম্লান একটা হাসি দিয়ে বললেন – বাবাকে হারিয়ে ফেললাম যখন, এই গোপাল নিয়ে আর কি হবে স্যার। ... এটা আপনিই রেখে দিন।

বাবা হেসে বললেন – বেশ, আমার কন্যার এন্টিক পিস কালেকশনের হবি আছে। ওর জন্যই বরং এটা রেখে দিই। ... তবে ওটা আপনি আপনার কাছে রাখতে পারেন, ওটা নকল।

অম্বরিস বাবু বললেন – নকল! ...

বাবা হেসে বললেন – আসলটা বাড়ুইএর কাছে। আমি এখান থেকে যাবার দিন সকালেই বাগান থেকে আসলটাকে মাটিচাপা দেওয়া অবস্থা থেকে উদ্ধার করি। ... বাড়ুইকে ডেকে এনে, ওর একটা ডুপ্লিকেট করে দিতে বলি। ও নটার সময় সেটা নিয়ে আসে। ... নকলটাকে, যেমন আসলটা মাটি চাপা রাখা ছিল, তেমনই ভাবে রেখে দিই, যাতে চোরকে হাতেনাতে ফুটেজ সহ দেখা যায়। ... আর আসলটা বাড়ুইএর কাছেই, সেফ কাস্টডিতে ছিল। ... বাড়ুই, ফুটেজ উঠেছে ওখান থেকে?

বাড়ুই – একদম স্যার। ... তবে বিনয় তখনও পটচুলদাড়ি লাগানোই ছিল।

বাবা – অসুবিধা নেই তাতে। দুটো ছবি তুলতে হবে তোমাদের, একটা চুলদাড়ি দেওয়া, আরেকটা মেকআপ ছাড়া। ... চুলদাড়ি দেওয়াটার এভিডেন্স হবে বাগান থেকে গোপাল তোলার ফুটেজ। আর নিউমার্কেট থেকে পটচুলদাড়ি কেনা হয়ে যাবে বিনয়ের জন্য এভিডেন্স।

বাবা আবার বললেন – তবে, আমার মতে এই অরিজিনাল গোপালকে আপনারাই রাখুন, আর বাড়ির কুলদেবতা করে রাখুন। ... আপনাদের বাবার স্মৃতি সকলের সামনে থেকে যাবে।

সায়ন্তন বাবু বললেন – হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আপনি যেই অসাধ্য সাধন করলেন, তার পুরস্কার হিসেবে এই মূর্তি হতে পারে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক কখনোই তেমন একটা মূর্তি হতে পারেনা, যেটাকে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যাবেনা।

মুখ্যমন্ত্রী এবার বললেন – বাড়ুই, সমস্ত আসামিদের নিয়ে তুমি যাও তাহলে এবার।

বাড়ুইএর সমস্ত কনস্টেবল তিন অতিথিকে এরেস্ট করে নিতে এলে, ডাক্তার এল্বার্ট হুঙ্কার দিয়ে বললেন – আমাদের এরেস্টের ওয়ারেন্ট কোথায়?

বাড়ুই হেসে বললেন – আপনাদেরকে যে এরেস্ট করা হবে, তা আমাকে কালই বিজয় স্যার বলে দেন, আমি ওয়ারেন্ট বার করেই রেখেছি। ... কনস্টেবল, ওদেরকে নিয়ে গিয়ে লকআপে দিয়ে দাও। আমি বাইকে এসেছি। যাচ্ছি এখনই।

কনস্টেবলরা আসামিদের ধরে নিয়ে গেলেন। ... বাড়ুই এবার বাবার সামনে এসে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিয়ে বললেন – স্যার, অনেক মাতব্বর দেখেছি। কিন্তু এই ভাবে ক্রিমিনালকে লেজে খেলাতে কনোদিনও দেখিনি। ... আজ একজন বাঘের দেখা পেয়ে যাচ্ছি স্যার। ... স্যার আমার পারসোনাল নম্বর আপনার কাছে রইল। ... কখনো কনো অসুবিধা হলে, এই ছোট ভাইটিকে বলুন আর ফ্যানটিকে বলুন, একবার স্মরণ করবেন। আসি স্যার।

বাড়ুই চলে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী সামনে এসে বললেন – পারিশ্রমিক যাই দিই তোমায় বিজয়, তোমার তো কনো চাহিদা নেই। ... কিন্তু সত্যি বলতে কনো পারিশ্রমিকই তোমার ট্যালেন্টের মূল্য হতে পারেনা। ... এই নাও, একটা এক লাখ টাকার চেক। ... আমার কথা শুনে তো আর তোমার পেট ভরবে না। তাই এই চেকটা নাও। ... আর একটা কেস আছে। খুবই ক্রিটিকাল কেস। পুলিশ, সিয়াইডি দিয়ে ওই কেস শলভ

হবেনা। ... একবার আমার বাড়িতে তোমার কন্যাকে নিয়ে এসো। ... না না, স্ত্রীকেও নিয়ে এসো । ... নিমন্ত্রণই করলাম তোমাদেরকে। আমার বাড়িতে এসে লাঞ্চ করবে, এই সানডে। ... সপরিবারে। সেখানেই ওই কেসের ব্যাপারে কথা বলবো।

মিস্টার সিন্দিয়ার দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন – আপনি তো উনার বাড়ি যাবেন না। ... ঠিক আছে। রথিন, সিয়াইডি চিফ, আর অতনু, কলকাতার সিবিয়াই হেড। ... ওরা আপনাকে ওখান থেকে হোটেলে পৌঁছে দেবে। ... সন্ধ্যায় আমি আপনার হোটেলে যাচ্ছি। সেখানে কথা হবে, ঠিক আছে!

সিন্দিয়াজি এবার একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন – আপসে কুছ বাত হে। ... ইধার আইয়ে। ...

মুখ্যমন্ত্রী একটু সরে গেলেন। কি কথা হলো জানিনা, তবে মুখ্যমন্ত্রী বাবার দিকে একবার হাসিমুখে তাকালেন, তারপর সিন্দিয়ার কাঁধে হাত রেখে কিছুর আশ্বাসন দিয়ে চলে গেলেন। ... বাবা আর আমি আবার সিন্দিয়ার সাথে রোলস্ রয়েসে চেপে আমাদের বাড়ি গেলাম।

সেখানে গিয়ে আমাদের ছোট্ট বাড়িটি দেখলেন সিন্দিয়া। আর বললেন, বাড়ির সব থেকে ভালো জায়গা হলো, সামনের খোলা জায়গাটা। ... বাবার সেখানে মিস্টার সিন্দিয়াকে নিয়ে আসার কারণ ছিল মাতা বিদিপ্তার সাথে দেখা করানো। ... উনার সাথে আলাপ করে, আর উনার অদ্ভুত বাগ্মিতা, এবং ঋষিত্বের তেজ দেখে, সিন্দিয়া হতবম্ব হয়ে বাবার দিকে তাকালেন।

বাবা সেই দেখে হেসে বললেন – কি দেখলেন তো সিন্দিয়াজি, ঋষিত্বের প্রকৃত তেজ। ... যেদিন ভারত আবার এই তেজকে বরণ করতে পারবে, সেদিন আর কাক সাজতে হবেনা, ময়ুর হয়েই সারা জগতের রানী হয়ে বিরাজ করবে। ...

সিন্দিয়াজি বাবার কাঁধে হাত রেখে বললেন – যা দিলে তুমি সিন, আমি তার কিছুই দিতে পারব না। ... মুখ্যমন্ত্রী তো তোমার বুদ্ধির খোরাক দিয়ে দিলেন আরেকটা কেস দিয়ে। কিন্তু আমার কাছে সেটাও নেই। আমাকে বুদ্ধির বহর দেখালে, ঋষিত্বের কথা শোনালে আর সাথে সাথে একজন ঋষিকে দেখিয়েও দিলে। ... আমার জীবন তো ধন্য হয়ে গেল। ... এনি অয়েজ, আমি একটা প্রেজেন্ট তোমাকে দিতে চাই। না এমন কিছু দেবনা, যার জন্য তোমাকে মাটি থেকে দূরে চলে যেতে হয়। ... তবে তোমার কাজে একটু সাহায্য হবে। ...

আসলে যা বুঝলাম, গাড়ির জন্য তোমাকে কারুর না কারুর উপর, নয়ত উবারের উপর ওয়েট করতে হয়। এন ইনটেলিজেন্ট লাইক ইউ মাস্ট নট ওয়েট ফর এনিবডি। ... তাই (বাইরের দিকে তাকিয়ে, আবার ঘার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন) বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বলেরোটা আজ থেকে তোমার।

বাবা একটু ইতস্তত করছিলেন দেখে, সিন্দিয়াজি মায়ের কাছে এসে বললেন — সামঝাইয়ে ইনকো, রাজা হু, ইনাম ভি রাজা জেইসাই হোনা চাইয়ে না! ... ইচ্ছা তো থি, এক রোলস্ রয়েসই দে দু। ... লেকিন সোচা, যেই সমাজে আপনারা থাকেন, সেখানে ওটা হলে, আপনাদের অনেকে ঈর্ষা করবে, তাই এটা। ... ইনকার মাত কজিয়ে ভাবিজী। আপ ভি জানতি হে, আপকে পতি ... হি ডিজার্ভ, মাচ মোর দ্যান দিস।

মা কিছু না বলে মুচকি হাসলেন। সিন্দিয়াজি মাতা বিদিপ্তাকে প্রণাম করে, বাবার সাথে গলা লাগিয়ে চলে গেলেন। একটা দারুণ কেসের নিষ্পত্তি হলো।

এলিয়ান রহস্য

প্রাথমিক বিবরণ

বাবার নতুন গাড়ি হবার পর, আমি আর মা খুব প্ল্যান করে ছিলাম, এখানে যাবো, সেখানে যাবো। কিন্তু সেইসব কিছুই হলো না। আমাদের চিফ মিনিস্টার আগের কেসের সময়েই বাবার সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন, কনো একটা গোপন অভিযানে পাঠাবেন। দুদিন যেতে না যেতেই মুখ্যমন্ত্রীর দরবার থেকে বাবার কাছে ফোন এলো, তড়িঘড়ি ফরমাইস যেন বাবা, তাঁর এসিস্ট্যেন্টকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাখ্যাত করেন।

গাড়ি চাপতে পারবোনা বলে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। মা আমাকে বোঝাচ্ছিলেন, গাড়ি তো আমাদেরই, এই কেসের পর ফিরে এসে, গাড়ি চরবো। মুখ্যমন্ত্রী কেস দিচ্ছেন। বেশ মোটা টাকার কেস হবে নিশ্চয়ই। ...

কথাটা বাবার কানেও গেছিল নিশ্চয়ই। কারণ বাবার মাঝে উত্তর এলো। উনি বললেন – ভাবছি গাড়ি আর তোমাদের নিয়ে একটা বড় ট্রিপ করে আসি। হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রীর ফরমাইস, তাই দেখা তো করতেই হবে। মিলিকে আর নিয়ে যাচ্ছিনা। আমি একা গিয়েই বলে আসি, এই কেসটা আমি করবো না, নতুন গাড়ি হয়েছে, একটু পরিবারের সাথে ঘুরে আসবো।

মা একটু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কথাটা শুনে । মা বলে উঠলেন, গাড়ি তো আমাদেরই থাকবে। ঘুরতে যাবে বলে, নিজের প্রফেশান ছেড়ে যাবার চিন্তা করা, এমন কথা তোমার মুখে তো মানায় না!

বাবাও গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তদন্ত করা আমার প্রফেশন তো নয়! ... আমার প্রফেশান হলো রিপরটিং করা।

মা উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন – কিন্তু এই পাঁচছয়টা যে কেস হলো, কত কামাই হলো বলো তো?

বাবা এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন – কামাই বেশি হবে বলে আমি তদন্ত করি না। যদি তেমনই হতো, তবে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে বসতাম। রথিন, অতনু আর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর একটি কলমের খোঁচা, এই তিনের বলে সেটা করতেও আমার বিশেষ সময় লাগতো না। ... একবার সেটা নিয়ে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে, তাদের দেওয়া চুরি, ছিনতাই, হুমকি, পারিবারিক খুনোখুনি, এসবের তদন্ত করে কামাই

করতাম। ... আমি সেই কেসেই তদন্ত করতে এগিয়ে যাই, যেই কেসের সাথে দেশের, রাজ্যের, বা সম্পূর্ণ মানবজাতির ভবিষ্যৎ জরিয়ে আছে। ... কনো একজনের সাথে ন্যায় করার জন্য দেশে পুলিশ আছে। পুলিশ নিজের কাজ ঠিক করলো না ভুল করলো, সেটা দেখার জন্য দেশে ন্যায়ালয় আছে। ইটস নান অফ মাই বিজনেস।

এই কথাতে মায়ের একটু ইগো হার্ট হয়ে গেছিল বোধহয়। তিনি একটু রেগেমেগেই বললেন – ও শুধু, দেশ, রাজ্য, বা মানবজাতির স্বার্থেই তুমি কেস নাও!

বাবা মাকে আর কথা আগে বাড়াতে দিলেন না। তিনি গলা চড়িয়ে বললেন – একদমই তাই। মিলিকে নিয়ে প্রথম যেই কেস করেছিলাম, কোচিতে গিয়ে, সেটা এই কারণে করেছিলাম, কারণ এর সাথে দেশের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির সম্পর্ক ছিল, খেয়াল করে দেখ। আশ্রমে গিয়ে যেই কেস নিই, মুখ্যমন্ত্রীর ফরমাইসে, সেটাও এইজন্যই নিই, কারণ সেখানে মানবজাতির ভিত্তি, মানবধর্মকেই পলিউটেড করা হচ্ছিল, কলুষিত করা হচ্ছিল। বৎসনাভ নিয়ে কেসটা প্রথমে নিই নি। সঙ্গে ছিলাম, কনো কেউ আমাকে এপয়েন্ট পর্যন্ত করেনি। কিন্তু ছিলাম কেসে, আর বেশি করে রইলাম, যখন দেখলাম, এই কেসের উদ্দেশ্য হলো, সত্যধর্ম অর্থাৎ লকারের গহনাকে লকার থেকে কেউ বার করে আনতে চাইছিল বলেই, খুনের রহস্য।

মা আবার মুখ খুলতে গেলেন, কিন্তু আবার বাবা মায়ের মুখ বন্ধ করে দিয়ে বললেন, অভিনেত্রীর খুন। মিলি ছিল সঙ্গে, মিলিকে প্রশ্ন করো। অভিনেত্রীর ভাই আমাকে কেসটা নিতে বলেছিল। আমি কি বলেছিলাম? ... বলেছিলাম, আগে যাই দেখি, যদি নেবার মত কেস হয়, তবে নিশ্চয়ই নেব। যখন দেখলাম যে এই খুনের পিছনে রয়েছে, সারা বাংলায় ড্রাগ পাচারের চক্র, তখনই কেসে সিরিয়াসলি আগে এগোলাম। এর আগের কেসেও, একই কারণ। গোপাল চুরি হোক, বা খুন, পারিবারিক কাণ্ড নিয়ে আমার কনো মন্তব্যই নেই। কিন্তু যখন দেখলাম আন্তর্জাতিক চক্র, আমাদের দেশের ঐতিহ্য হাতিয়ে নিতে চাইছে, তখনই আগে এগিয়েছি। ...

একটা জোরে নিশ্বাস নিয়ে বাবা আবার বললেন, মিলির মা, আমি এই পাঁচটা কেসে এতোই টাকা উপার্জন করেছি, যা এর আগের সমস্ত উপার্জন মেলালেও, তার থেকে বেশি। কিন্তু কেন পেয়েছি জানো? কারণ আমি এই কেসগুলোতে এগিয়েইছিলাম, যেই দেশে জন্ম নিতে পেরে ধন্য হয়ে গেছে এই জীবন, সেই ভারতের সম্মান রক্ষার জন্য, সিদ্ধপুরুষদের এই রাজ্য, বাংলা, যাতে পরস্পর অবতারগন জন্ম নেন, একের পর এক সাধকের জন্ম হয়ে আমাদের এই জন্মকেই ধন্য করে দিয়েছে, তাঁর মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট ভাব যাতে না আসে, তাঁর মানুষদের মধ্যে উৎকৃষ্ট কিছু আসলে, তাকে যখন কেউ নষ্ট করে দিতে যায়, তার তদন্ত করে, এই দেশমাতার, এই বঙ্গভূমির, এই মানবজাতির রক্ষা করার প্রচেষ্টা করতে এগিয়ে যাই

বলেই, এই টাকা আসে। এটা আমার প্রফেশান হলে, এতো টাকা আসতো না, শুধু আমার ফিজটা আসতো।

মা আর একটাও কথা বললেন না। আমার বাবা আর মা, দুইজনের মধ্যেই একটা গুন দেখেছি; ইনাদের দুইজনেরই যদি একবার অনুভব হয়ে যায় যে তাঁরা ভুল করছিলেন, তাহলে, তাঁরা কনো সময় নষ্ট না করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মাও তাই করলেন। উনি মাথা নিচু করে, বললেন ভুল হয়ে গেছিল আমার। আসলে, আমার মাথায় ... সবার যেমন আসে ... না না, সবাই করে বলে, আমিও করবো, এটা কনো কথা নয়। আমি ভুল করে ফেলেছি। ... যেখানে আমার তোমাকে নিয়ে গর্ব করে বলা উচিত, আমার স্বামীর জন্য আজ সিনেমা জগত যেই ড্রাগের চক্র বাংলায় বসাচ্ছিল, তা বসতে পারেনি; কোথায় আমি বলবো আমার স্বামীর জন্য ধর্মকে নিয়ে যারা নোংরা বাণিজ্য করতে শুরু করেছিল, তারা ভিম্রি খেয়ে গেছে, কিন্তু আমার মাথায় টাকাটাই এলো ...

বাবা এবার মায়ের কাছে এসে, মায়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন — টাকা দরকার, পেট চালানোর জন্য নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু সেই টাকার জন্য জীবন বাঁচার জন্য, ঈশ্বর আমাদেরকে এই জীবন দেননি, তাই না! ... টাকা আমাদের জীবন দেয়নি, জীবন দিয়েছেন ঈশ্বর। এই শরীরের মধ্যে জীবন ফুঁকেছেন তিনি, আর এই শরীর পেয়েছি আমরা এই ভারতমাতার জন্য, এই বঙ্গভূমির জন্য। তাঁরাই তাঁদের মাটি দিয়ে আমাদের এই দেহের সৃজন করেছেন। তাই টাকার জন্য বাঁচা মুর্খামি, এটা বলার মত জ্ঞানী তো আমি নই, তবে হ্যাঁ এটা অবশ্যই বলতে পারি যে, শুধু বিভিন্ন উপায়ে টাকা উপার্জনের জন্য, বা যেখান থেকে টাকা পাচ্ছি, তার গুলামি করার জন্য বেঁচে থাকা, এটা সেই ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, যিনি বিশ্বাস করে আমাদের দেহে প্রাণ ফুঁকেছেন।

মায়ের চোখে জল দেখলাম এবার। বোধহয় খানিকটা অনুশোচনায়, কিন্তু বাকিটা গর্বে। যদি শুধু অনুশোচনা থাকতো তবে বাবার চোখে চোখ রাখতেন না উনি। কিন্তু উনার চোখে, নিজের ছলছলে চোখ রাখতে, বুঝলাম সেই জলের ৭০ শতাংশ গর্বের কারণেই। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেই কারণেই তুমি তোমার প্রিয়লেখকের খুনিকে নিজের কাছে রেখে, তাঁর সেবা করে চলেছ। তিনি খুন তো করেন নি। আসলে যিনি লকারের গহনাকে সকলকে দেখানোর অপরাধ করতে চলেছিলেন, তিনি তাঁকে সেই অপরাধ করতে না দিয়ে, ধর্মের সেই গ্রন্থকে রক্ষা করলেন, যা পাঠ আর অনুধাবন করে ভবিষ্যতে সহস্র সাধুঋষি নির্মাণ হবে। মহাভারতের মত লকারের গহনা সকলের সামনে এসে গেলে, আজ যেমন মহাভারত নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা হয়, তেমন বিষ মানবসভ্যতায় মিশে যেত।

আবার থেমে গিয়ে মা বললেন – হ্যাঁ ওই কেসে তো তুমি কিছুই পাওনি বলতে গেলে, কারণ ওই কেস তো তোমাকে কেউ দেয়ই নি। ... শুধুই ঈশ্বরের নির্দেশে যেই মানুষরা কাজ করছেন, তাঁদের সত্য উদ্ঘাটন করে, তাঁদের সেবা করার জন্যই ওই কেস করেছিলে। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছ, দেবী বিদিপ্তাকে নিয়ে এসেছ। ... আমাদের সকলের জীবনকে ধন্য করে দিয়েছ। ...

বাবা এবার ক্লাইম্যাক্স শেষ করার জন্য বলে উঠলেন – তাহলে হেডমিস্ট্রেস আমরা যাই! ... যদি দেখি যে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ করার সুযোগ রয়েছে এই কেসে, তবে কেস নেবো, নাহলে নেবো না।

মা হেসে বললেন – হেডমিস্ট্রেস! ...

মায়ের কিন্তু মনের গ্লানি কম হয়নি। একা একা, থুম হয়ে বসে ছিলেন। উনার চোখে বাবার জন্য সম্মান ছিল, নিজের ভাবনার প্রতি গ্লানি ছিল, আরো হয়তো কিছু ছিল, যা আমি ধরতে পারিনি। বিদিপ্তা দেবী উনার কাছে গিয়ে, উনার পাসে বসলেন।

মা বাচ্চা মেয়ের মত কেঁদে উঠে বিদিপ্তা দেবীর কাঁধে মাথা রেখে বললেন – এতো দিন ধরে উনাকে দেখেও, আমি উনাকে কিচ্ছু জানলাম না। কিচ্ছু চিনলাম না মা উনাকে। উনার মত মানুষের পত্নী হতে পারা যে কতটা গর্বের আর সৌভাগ্যের, এখনো অনুভবই করতে পারলাম না মা!

বিদিপ্তা দেবী আমার বড় দিদি, আর আমি উনার ছোট বোন। না বয়সে নয়। বয়সে তো উনি আমার বাবার থেকেও অনেক বড়। কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা ওরকমই। উনার কথা আমার কাছে অমৃতের মত। উনি মাকে বললেন – আসলে কি জানিস তো মেয়ে! আমরা একটা মানুষকে ততটাই চিনি, যতটা সেই মানুষটার কাছে আমাদের প্রয়োজন থাকে। তার থেকে একটুও বেশি আমরা চিনি না। চেনার প্রয়োজনও পরে না। ... কখন প্রয়োজন পরে জানিস এই চেনার? কখন এই চিনতে না পারলে, কষ্ট হয়, মনের মধ্যে একটা কাঁটা ফোটে জানিস!

মা কিছু না বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে, বিদিপ্তা দিদি হেসে বললেন – যখন সেই মানুষটা অদ্ভুত প্রতিভাবান হন। ... বিজয় আসলে সেই রকমেরই একটি প্রতিভা। বুদ্ধি, মনের গভীরতা, গভীর আধ্যাত্মিক চেতনা, সমস্ত কিছু মিলিয়ে ও একটা বিরল প্রতিভা। সাধারণ মানুষের মত তুই তো তোর যতটা ওর থেকে প্রয়োজন ততটাই ওকে চিনেছিস। কিন্তু ওর প্রতিভার ঝলক যখন যখন তুই দেখিস, তখন তখন তোর মনে হয়, মানুষটাকে চিন্তেই পারলাম না।

মা শান্ত হলেন। আর আমরা পরের দিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে যাত্রা করলাম। বিচিত্র কেস বটে, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া কেসটা। আমি তো বাবাকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বেড়িয়ে বললাম, এই কেস নিলে কেন বাবা!

বাবা হেসে একটাই কথা বললেন, এটা ঘোর গণ্ডগোল নয়, ঘোর নোংরামি। এই নোংরামি বিদেশে চলতে পারে, কিন্তু এই ভারতে এই সমস্ত নোংরামির কনো স্থান নেই। তাই নিলাম কেসটা।

নোংরামির কি পেলেন বাবা, তা তো বুঝতে পারলাম না। আপনারা বুঝলেও বুঝতে পারেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী যেই কেস দিলেন, তার বিবরণ আপনাদের প্রদান করি। জায়গাটা মুর্শিদাবাদ । বহরমপুর থেকে রামপুরহাটের মাঝের একটা বড় গ্রাম। বড় এই কারণে নয় যে, সেখানে প্রচুর মানুষ থাকেন। জনবসতি সেখানের সব মিলিয়ে ১৫০ থেকে ২০০ মাত্র। কিন্তু সেখানে প্রচুর ক্ষেত, আর ক্ষেতের কারণেই গ্রামের এরিয়াটা বড়।

এই গ্রামটার উপর আগে, মানে এই বছর দশেক আগে, চোখ ছিল একটা টেলিকম কোম্পানির। এই গ্রামটা নাকি এমন জায়গায় রয়েছে, যার তলা দিয়ে কেবিল তার নিয়ে গেলে, প্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকা বেঁচে যেত। কিন্তু এই গ্রাম না পাবার জন্য মুর্শিদাবাদে ওই কেবিল কোম্পানির কাজই স্থগিত হয়ে গেছে। পরে অবশ্য সেই কোম্পানির মালিক মারা গেছেন । তাই এই সমস্ত কিছু বিশবাঁও জলে চলে গেছে।

কিন্তু ইদানীং যেই উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, সেই গ্রামে, তা হলো এলিয়ানের উৎপাত। এলিয়ান মানে, অন্য গ্রহের জীব, আর ধারনা করা হয় যে মানুষের থেকে অনেক উন্নত জীব। এরা নাকি এই গ্রামের ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে, হয়তো নিজেদের ঘাটি গাড়ার জন্য। এবার আপনারাই বলুন, এখানে নোংরামির কি দেখলেন আপনারা! আর এটাও বলুন যে, বাবা এখানে কি করতে পারেন! বাবা আমার। কনো হিম্যান বা সুপারম্যান থোরাই যে এলিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করে, ওদের কে হারিয়ে দেবেন? নাকি বাবা এলিয়ানদের ভাষা জানেন যে, এলিয়ানদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। ... কেন যে বাবা এই কেসটা নিলেন, আমার মাথায় ঢুকল না।

বাড়ি গিয়ে মাকেও কথাটা বললাম। মা বললেন – তোর বাবা যখন পুরো কেস শুনে কেসটা নিয়েছেন, তখন গোলমাল তো কিছু আছেই। আজ পর্যন্ত উনি কেস নিয়েছেন আর সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন নি বা মীমাংসা করতে পারেননি, এমন হয়েছে! তাহলে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

মায়ের থেকে সদুত্তর না পেয়ে, বিদিপ্তা দিদির কাছে গেলাম। সেখানে তো আমার পুরো বেইজ্জতি হয়ে গেল। দিদি কিছু বললেন না। সমস্ত কেসটা শুনে প্রথমে মুখটিপে, তারপর হো হো করে হেসে উঠে বললেন – বাবার সাথে তুমি যাবে তো! সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সত্যি বলছি, আমার মুর্শিদাবাদ যাবার একদামই ইচ্ছা ছিল না। নিজের চোখে বাবাকে অপদস্ত হতে দেখতে কার ভালো লাগে! ... কিন্তু সকলে আমাকে নিয়ে এইক্ষেত্রে এতো মজা করেছে, আমি আর কনো কথাই বলিনি। বরং, বাবা কি করেন এই কেসে, তা দেখার জন্য সঙ্গে রইলাম কেবল।

বাবা সন্ধ্যার দিকে একটু বেরোলেন, কেসের ব্যাপারেই নাকি কিছু এসেন্সিয়াল কাজ আছে, সেগুলি সারতে গেলেন। পরের দিন সকালে, ট্রেনে করে রামপুরহাট। সেখান থেকে ইন্সপেক্টর সুরেশ বাঘ এসে আমাদের রিসিভ করে নিয়েগেলেন পিলসিমা গ্রামে। গ্রামে থাকার ব্যবস্থা নেই। তাই দেবগ্রাম বিডিও কোয়ার্টারের পাশে একটা খালি কওয়ারটারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। সুরেশ বাঘ জানেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ফরমাইসে এসেছি। তাই কথাবার্তা হয়ে গেল যে পরের দিন সকালে, বাবাকে আর আমাকে নিয়ে উনি পিলসিমা গ্রামে যাবেন।

রাত্রের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে, মিস্টার বাঘ নিজের জিপে উঠে বসলেন, আর কারুর সাথে ফোনে কথা বলতে বলতে গেলেন – হ্যাঁ এসে গেছেন ... আমি সব ...

জিপ চলে গেল। বাবার মুখ থমথমে। রাত্রের খাবার খেয়ে, সেদিনের মত শুয়ে পরলাম। পরের দিন বাবা বলে রেখেছেন, সকালে কিছু জলখাবার খেয়ে, দেবগ্রাম থানার সামনে উনি চলে যাবেন। সেখান থেকেই আমরা উঠবো মিস্টার বাঘের জিপে। আমি আর বাবা সকালে উঠে স্নান করে একটু বেড়িয়ে, মুড়ি ঘুঘ্নি পেলাম, সেটাই জলখাবার। পেট ভরলও বেশ। তাই কনো কথা না বাড়িয়ে চলে গেলাম থানায়।

নটায় আশার কথা মিস্টার বাঘের। এখন সাড়ে আটটাও বাজে নি। বাবা আমাকে নিয়ে থানায় ঢুকে সেখানের ওসির সাথে আলাপ করলেন। ওসির নাম অভিজিত বালা। ঠিক বাঙালি নন, তবে বাংলা উচ্চারণ স্পষ্ট আর সম্পূর্ণ বাঙালির মত করেই বাংলা বলেন। উনি আমার সাথে অনেক কথা বলছিলেন। বেশ মজাদার লোক। বললেন এখানের থানায় বেশি কেস আসেনা। এই ছোটখাটো ঝুটঝামেলা, জমি নিয়ে মারামারি, এ ওর বউ নিয়ে পালিয়া যাওয়া এই সব। কথা বলার তেমন কেউ নেইই এখানে। বাবার সাথেও কথা হচ্ছিল।

শেষে বাবা আমাকে উনার কাছে বসিয়ে রেখে, বাইরে স্মোক করতে চলে গেলেন। স্মোক করতে বাবা গেলে এই পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তেমনটা হলো না। সেই জন্য আমি

একটু বাইরের দিকে বেড়িয়ে বাবার সন্ধান করলাম। বাইরে বেরোতেই দেখলাম মিস্টার বাঘের জিপ থামলো। আসলে জিপটা মিস্টার বালারই। সেটাই মিস্টার বাঘ নিয়েছিলেন, আমাকে আর বাবাকে রিসিভ করার জন্য, আর আজ গ্রাম দেখাবার জন্য।

গাড়ি থেকে নামার সময়ে, আমাকে ঠিক খেয়াল করেন নি মিস্টার বাঘ । মোবাইল ফোনে ছিলেন। বলছিলেন – আমি কি করে জানবো! ... কেন পাঠিয়েছে, কেন এসেছে, খবর দেবে না সিনেমা করবে, কিছুই জানিনা। যেমন যেমন জানবো, তেমন তেমন বলবো।

আমাকে দেখেই, ফোনে কথা বলার গতি কমে গেল। ফোনে বললেন – পরে বলছি আপনাকে, এখন রাখছি। কথাটাও খুব আসতে বললেন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে – কি ব্যাপার, একা? বাবা আসেন নি!

বাবাকে দেখলাম থানার পাস থেকে বেড়িয়ে এলেন। গা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন – এখানে বুঝি লিচু হয়না, তাই না!

মিস্টার বাঘ বললেন – আপনি কি ক্ষেত দেখতে চলে গেছিলেন না কি মশাই?

বাবা – না, সিগারেটে টান মারতে মারতে লাল লাল কিছু চোখে পরলো, ভাবলাম লিচু। তাই একটু ক্ষেতে নেমে গেছিলাম।

মিস্টার বাঘ – না না, এদিকটায় লিচু হয়না। একটু উপরের দিকে গেলে, ওখানে লিচুর জঙ্গল পাবেন। ... তো উঠে পরুন। চলুন আপনাদের গ্রামটা একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি।

বাবা – মিস্টার বালাকে বলে আসি। উনি তো আপনার আগমনবার্তাই পাননি।

দুই মিনিটের মধ্যে বাবা ঘুরে এলেন ভিতর থেকে। তারপর আমরা গাড়িতে উঠে রওনা দিলাম পিলসিমা গ্রামের উদ্দেশ্যে। রাস্তা বেশি নয়, খুব বেশি হলে ৫ থেকে ৬ কিমি হবে । কিন্তু মেঠো রাস্তা, তারুপর আবার ছাগল আর গরু বাছুর আর ষাঁড়ের ভিড় মাঝে মাঝে। তাই পৌছাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল।

আমরা গেলাম পিলসিমা গ্রামের প্রধানের কাছে। উনাকে সঙ্গে নিয়েই, বাবা আমি আর মিস্টার বাঘ খানিক ঘুরলাম। উনি বললেন, লাস্ট এলিয়ান এটাক হয়েছে আগের পূর্ণিমাতে। তার আগের পূর্ণিমাতে দেখা মেলেনি, আগের আগের পূর্ণিমার পরের দিন দেখা পাওয়া গেছিল। আর জানলাম আমরা যে, যেদিন যেদিন এদের দেখা পাওয়া যায়, সেদিন সেদিন গ্রামের বিভিন্ন জায়গার ক্ষেতফসল তছনছ করে দেয় ওরাই।

মিস্টার বাঘ আমাকে একটা ধানের ক্ষেতের আল ধরে নিয়ে গিয়ে, এক জায়গায় কেমন করে ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করা হয়, তার কিছু নমুনা দেখালেন। বাবাকে দেখলাম, একটু এগিয়ে গেলেন গ্রাম প্রধান, আব্দুল জিয়াউদ্দিনের সাথে। দুপুরের খাওয়া আব্দুল সাহেবের বাড়িতেই করলাম। দেশী মুরগির ঝোল, আর গ্রামের লাল চালের ভাত। জমিয়ে খেলাম। তারপর জিপে করে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যা তখনও ঠিক করে নামেনি। আসলে গরম ভালো পরে গেছে, তাই সন্ধ্যা হচ্ছে একটু দেরি করে। বাবা আমাকে বললেন, ড্রেস করে ব্যাগ গুছিয়ে রাখতে। সন্ধ্যায় আমরা নাকি ফিরে যাবো। আমার মাথায় কিছুই ঢুকলো না। যদি ফিরেই যাবো, তবে এলাম কেন? তবে কি বাবা বুঝে গেছেন, এ আমাদের কম্ম নয়!

বাবাকে যে কিছু প্রশ্ন করবো, কেন ফিরে যাবো, ইত্যাদি, সেই সুযোগও পেলাম না। আমাকে ফিরে যাবো, ব্যাগ গুছিয়ে রাখিস বলেই, বাবা বললেন – আমি একটু আসছি, তুই ব্যাগ গুছিয়ে রাখ।

বাবার ফিরতে অনেক দেরি হলো। যখন ফিরলেন, তখন বাবার কাঁধে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রাফটার, একটা বড়ো স্ট্যান্ড, যেমন জি-এস-আই ব্যবহার করে। আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম – এই সব কি হবে?

বাবা একটু কেজুয়ালি বললেন – কাজের জিনিস কাজে লাগবে, আর কি? ব্যাগ রেডি?

আমি কিছু বলবো, অমনি একটা বাইক আমাদের বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালো।

সন্ধ্যা হতেই

বাবা তড়িঘড়ি বাইরে বেড়িয়ে গেলেন, আর ঘরে আব্দুলকে নিয়ে ঢুকলেন। কি যে হচ্ছে, কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। শুধু বাবা যেমন যেমন করতে বললেন, তেমন তেমনই করলাম। উনি একটা বাইক নিয়ে এসেছিলেন। বহু পুরানো হবে বাইকটা, নয়তো ধুলো রাস্তার উপর দিয়ে নিত্য যাতায়াতের কারণে এমন

ময়লা হয়ে গেছে বাইকটা। বাবা আব্দুলের পিছনে বসলেন, হাতে ড্রাফটার আর স্ট্যান্ড। আর আমার পিঠে স্কাইব্যাগ, যাতে বাবার আর আমার জামাকাপড় আছে।

মাঝে থানায় গেলাম। আমি যাইনি। আমি আর আব্দুল রাস্তাতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম । বাবা একাই গিয়ে, বাংলোর চাবিটা মিস্টার বালাকে হ্যান্ডওভার করে এলেন। তারপর বাইক ক্ষণিকক্ষণ চলতেই বুঝলাম, আমরা রামপুরহাট যাচ্ছিনা, বরং আমরা তো পিলসিমার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।

বাইক মাঝে একটা জায়গায় থামলো। সেই জায়গার নাম দাসদেবগ্রাম। সেখানে একটি বাড়িতে আব্দুল আমাদের নিয়ে এলেন। এটা তাঁর বোনের শ্বশুরবাড়ি। আমার হাতে বাবা একটা প্লাস্টিক ধরিয়ে দিয়ে বললেন, পোশাকের সমস্ত কিছু পরে আয়। আমিও পরলাম, সেই কোচির কেসে যেমন মোটা মেয়ে হয়েছিলাম, তেমন হলাম। বেড়িয়ে বাবাকেও দেখলাম, সেই বৃদ্ধের বেশ। কিন্তু কেন এই ছদ্মবেশ!

কনো কথা নেই, আবার বাইকে উঠে সোজা পিলসিমাতে আব্দুলের বাড়ি। বাবার কড়া নির্দেশ, পোশাক ছাড়া যাবেনা, এই পোশাক পরে ঘুমাতেও হবে। ছদ্মবেশটা এই যে, আমরা উগান্ডার অধিবাসী। সেখানের বৈজ্ঞানিক বাবা, আর আমি উনার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

রাত্রে শুতে যাবার আগে, আব্দুল ঘরে এলো। বাবা বললেন – আব্দুল, এবারে মনে হচ্ছে দেখা যাবেনা এলিয়ানদের। আকাশে এতো মেঘ!

আব্দুল – কি বলছেন সাহেব। আকাশে মেঘ থাকলেই তো ওদের দেখা পাওয়া যায়।

বাবা – বাহ, তাহলে তো ভাগ্য ভালো আমাদের, কি বলো?

সামান্য এদিক সেদিকের কথা হয়ে গেলে। শুয়ে পরলাম। পরের পরের দিনই পূর্ণিমা। এলিয়ান দেখবো নিজের চোখে। একটা হেভি উত্তেজনা আসছিল মনে।

পরেরদিন ছিল একা মিটিং। গ্রামের সকলকে নিয়ে আব্দুল সাহেব মিটিং করলেন। খাওয়াদাওয়া অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। সমস্ত দিশি খাবার। স্বাদই আলাদা। তারপরের দিন, মানে পুরনিন্মার দিন সকালে উঠে দেখি, বাবা ড্রাফটারকে ছুরি দিয়ে ছুলে ছুলে, অবিকল টেলিস্কোপের মত দেখতে একটা যন্ত্র করেছে। বিকেল বিকেল হতেই, আব্দুলের টালির চালের উপর একটা টুল নিয়ে স্ট্যান্ড রেখে, বাবার

দ্বারা নির্মিত নকল দুরবিন চোখে লাগিয়ে বসার ব্যবস্থা করলেন। আমাকে বললেন – চোখ রেখে দেখ কিছু দেখতে পাস কিনা! ...

আমি চোখ রাখতে দেখি, একটা ক্যামেরা লেন্স লাগানো রয়েছে ড্রাফটারের মধ্যে। তাকিয়ে দেখলাম, নিচে একটা ক্যামেরা বসানো। বাবা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, স্ট্যান্ডের উপর ভর করিয়ে ক্যামেরা ঘোরাতে থাকবি, (একটা সুইচ দেখিয়ে বললেন) যদি কিছু দেখিস, ক্ষেত নষ্ট হচ্ছে বা সেরকম, তবে এই সুইচটা টিপবি, ভিডিও রেকর্ড হয়ে যাবে।

রাত্রি ৯টা, চারিদিকে একটা হইহই পরে গেছিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখলাম, স্ত্রীরা শাড়ির আঁচল লুটিয়ে আর পুরুষেরা লুঙ্গি গুটিয়ে কনো একদিকে ছুটছেন । সেই দেখে, আব্দুল বাবার দিকে তাকাতে, বাবা ইশারায় বললেন – যাও, সবাই যেই দিকে যাচ্ছে। ... আব্দুলও দেখলাম লুঙ্গি তুলে ছুট লাগালো।

সবাই চলে গেলে, গ্রাম পুরো শ্মশানের মত চুপচাপ। বাবা আমাকে টালির মাথায় তুলে দিয়ে বললেন, যেমন বলেছি, তেমনটাই করবি। এই বলে চলে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম – তুমি কোথায় যাচ্ছ।

বাবা – আমার অন্য কাজ আছে। তোকে যেটা বললাম, সেটা কর।

আব্দুলের বাড়ি দোতলা। টালির ছাদ দেওয়া বাড়ি যে দোতলাও হয়, সেটা খালি টিভিতেই দেখেছিলাম। এই প্রথম সচক্ষে দেখলাম। পুরো গ্রামে এই একটাই এমন বাড়ি। এর মাথায় বসে, প্রায় পুরো গ্রামই দেখা যায়। আমি প্রথমে উপরের দিকে ড্রাফটারতা ঘোরালাম, দেখলাম যেমন টিভিতে দেখি, তেমন কালো কালো শসার, মেঘের উপরে ভাসছে, আবার একটা মেঘ সরে গেলে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার একটা অন্য মেঘ এলে ছায়া দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে লাল আর সবুজ আলোর ঝলক দিচ্ছে স্পেস সিপগুলো।

এই বিরল দৃশ্যকে ক্যামেরা বন্দি করবো না! আমি ভিডিও রেকর্ডিংএর সুইচ মেরে দিলাম। বেশ খানিক ক্ষণ সেই দৃশ্য রেকর্ড করলাম। তারপর, কি যেন খশখশ আওয়াজ আমার কানে ভেসে এলো। ক্যামেরা নিয়েই এদিক সেদিক করতে গিয়ে দেখলাম, বেশ কিছু ক্ষেতের তলায় যেন কিছু রয়েছে, আর কি প্রবল গতিতে ক্ষেতগুলো সমস্ত লণ্ডভণ্ড করা হচ্ছে। আমি আর ভিডিও বন্ধ করলাম না। একই ভিডিওতে সমস্ত কিছু রেকর্ড করতে থাকলাম।

আবার খানিক পরে দূর থেকে একটা হো হো শব্দ শুনে উপর দিকে তাকালাম। দেখলাম আকাশ পরিষ্কার। শসার দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু একটা লাল আলো যেন অদৃশ্য একটা আকাশের স্থান থেকে ভেসে আসছে। ... আমি সেটাও রেকর্ডিং করলাম। আর রেকর্ডিং করতে করতেই, দেখলাম লাল আলোটা আসা বন্ধ হয়ে গেল। মেঘ এলো আকাশে, কিন্তু এবার আর শসার দেখা গেল না।

ভিডিও বন্ধ করে দিলাম। ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড থ্রিলিং লাগছিল। নিজের চোখে স্পেসসিপ দেখেছি আমি। ... ভাবা যায়। ... যেটাই হোক, বাবা হয়তো এই কেস শলভ করতে পারবেনা। কিন্তু বাবার দৌলতে নিজের চোখে স্পেসসিপ দেখা তো হয়ে গেল! তবে আমার ভাবনার আনন্দ খানিকক্ষণেরই ছিল। খানিক পরে, গ্রামের মেয়েদের, পুরুষদের আর্তনাদ শুনে, সামনের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সকলে হাহুতাশ করছেন। আর বলছেন, আমাদের সব শিষ হই গিল রে। ... আমরা ধনেপ্রাণে গেলুম রে!

তাকিয়ে দেখলাম, চারিদিকের ক্ষেত তছনছ হয়ে গেছে। আমি ড্রাফটার আর স্ট্যান্ডতো পারতে পারিনি, তবে ক্যামেরাটা নিয়ে নেমে এসেছিলাম। বাবা তখনও আসেনি। ... ক্যামেরা নিয়ে ঘরে চলে গেলাম। প্রথম ক্যামেরাটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম, বাবার ইন্সট্রাকশান অনুযায়ী। তারপরেও বাবা ফেরে না! ... বাবা ফিরলেন প্রায় আরো এক ঘণ্টা পরে। রাত্রে আর খাওয়াদাওয়া হয়নি। হয়তো কনো বাড়িতেই সেদিন আর ভাত চাপেনই রাত্রে। তবে বাবাকে দেখলাম, বাবার জামাকাপরে ধ্বস্তাধস্তির স্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

আমি বললাম – বাবা কোথায় গেছিলে তুমি! ... কারুর সাথে কি ধ্বস্তাধস্তি হয়েছে তোমার?

বাবা – ও তেমন কিছু নয়। ... তুই কি ভিডিও করেছিস কিছু?

আমি – ইয়েস স্যার।

বাবা – এখন চেপে যা, রাত্রে ঘরে বসে দেখছি।

রাত্রে বিছনায় শুয়ে শুয়ে বাবাকে ভিডিওগুলো দেখানোর সময়ে, আমার কমেন্টস সমানে বর্ষার ধারার মত ঝরতে থাকলো। আমি বললাম – এই দেখ বাবা, এলিয়ানদের স্পেস শিপ, লাল আর সবুজ আলো আসছে।

আবার ক্ষেত নষ্ট হবার দৃশ্য দেখানোর সময়ে বলতে থাকলাম, কেমন অদ্ভুত ভাবে ক্ষেত নষ্ট করছে দেখলে!

শেষ ভিডিওটা দেখানোর সময় বললাম – দেখ, স্পেস শিপ দেখা যাচ্ছেনা, কিন্তু আলো দেখা যাচ্ছে, দেখেছো কি এডভান্স টেকনোলজি!

বাবা সমস্ত ভিডিওগুলো দেখলেন, একটাও কথা বললেন না। সমস্ত দেখে, একটু চোখ বুঝে শুইয়ে রইলেন, তারপর বললেন – আমার মনে হচ্ছে ... ঠিক আছে। কাল সন্ধ্যার দিকে, একটু বেরোবো। তুইও সঙ্গে থাকবি।

আমি – কি ব্যপার বলো তো? এত সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখালাম, তুমি কনো কমেন্ট দিলে না যে!

বাবা – হুম, ভিডিওগুলো সত্যিই খুব ভালো তুলেছিস।

আমি – আরে ধুত, আমি আমার পছন্দের কমেন্ট চাইনি। কিছু বলো ভিডিওগুলোর ব্যাপারে।

বাবা – হুম, খেয়াল করে দ্যাখ, আলোগুলো স্পেসসিপ থেকে আসছে না, স্পেসসিপে যাচ্ছে। আরো একটু খেয়াল করে দ্যাখ, স্পেস সিপ থেকে আলোটা আসছে না, তাই স্পেসসিপ দেখা না গেলেও, আলো যাচ্ছে। ... আর ক্ষেত নষ্ট করার ব্যাপারে, বোধহয় তুই ভিডিওটা ঠিক করে দেখিস নি। ভালো করে দ্যাখ, দেখতে পাবি বেশ কিছু গামছা দিয়ে মাথা জরানোর ছবি। ... এলিয়ানরা বুঝি মাথায় গামছা দিয়ে ক্ষেতে নামে?

বাবার কথামত আমি আবার ভিডিওটা দেখলাম, একটু স্লো মোশানে দেখতে দেখলাম, বাবা ঠিকই বলেছেন। এতো কিছু মাথায় গামছা জরানো মানুষ। ... না মানুষ কিনা বোঝা যাচ্ছেনা। তবে এলিয়ান যদি গামছা না ব্যবহার করে, তবে তারা মানুষ, এটা নিশ্চিত।

বাবা চুপচাপ। আমি বললাম – আর কিছু বলো। এরপর তাহলে করনিয় কি?

বাবা – কিছু সন্দেহজনক লোককে ধরা হয়েছে, জেরা করা চলছে। ... আর আমার ধারনা যে, যা বা যারা এই কাজ করছে, তারা খুব শীঘ্রই মিটিং করবে। মুখ্যমন্ত্রীকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। উনাকে আসতে বলেছি, হাতেনাহাতে আসামিকে ধরার জন্য। ... আমার ধারনা যদি ঠিক হয়, তবে খুব তাড়াতাড়ি

আমাকে গা ঢাকা দিতে হবে। আমি গা ঢাকা দিলে, আমার সাথে কনোরকম যোগাযোগ করবি না, শুধু আমি যেমনটা বলবো মেসেজে, তেমন তেমন করবি।

বাবা চোখ বন্ধ করে, বিশ্রাম নিলেন। আমি আর কথা বাড়ালাম না। পরেরদিন সন্ধ্যায়, আমি আর বাবা, আমাদের ছদ্মবেশেই গ্রামের পথে ঘুরছিলাম। গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে গেলে, একটা টাটাসুমো গাড়ি দেখে বাবা সতর্ক হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন – আমি এই গাড়ির পিছনে উঠে বসছি। তুই বাড়ি ফিরে যাবি, আর আব্দুলকে বলবি, বাবা একটা বিশেষ কাজে গাঢাকা দিয়েছে। আর বলবি, ছদ্মবেশে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। রাত্রের মধ্যেই, ইন্সপেক্টর বালা আসবেন। আর উনি আমার জিপিএস ট্র্যাকিং করে, আমার কাছে উনাদের নিয়ে যাবেন। সঙ্গে তুইও চলে আসবি।

বাবা আর কথা বাড়ালেন না। একটা বড় ক্লিপ দিয়ে গাড়ির দরজাটা হাল্কা করে খুলে, পিছনের দরজার লকটা খুললেন। তারপর যেমন দরজা লক ছিল, তেমন করে দিয়ে, বাবা পিছনের ডালা খুলে ঢুকে ভিতর থেকে লক করে দিলেন। আমি চুপিসারে সেই জায়গা থেকে সরে গেলাম।

ক্লাইম্যাক্স সিন

বাবা যেমন বলেছিলেন, তেমনই গিয়ে বললাম আব্দুলকে। সন্ধ্যার শেষবেলা আর রাত্রির শুরুতে ছদ্মবেশে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে ইন্সপেক্টর বালা ঢুকলেন। আমাকে বাবা মেসেজ করে দিয়েছেন, রাত্রের অন্ধকারে, প্রায় দুটো নাগাদ বাবা যেখানে আছেন, সেখানে জলসা বসবে।

আমরা সেই টাইম অনুসারে সেখানে চলে গেলাম। জিপিএস ট্রেস করে, পৌঁছলুম সেখানে প্রায় পৌনে তিনটে। পৌঁছে দেখি, বাবাকে একটা চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে। আর উনার মাথায় একজন পিস্তল ঠেকিয়ে রয়েছে। মিস্টার বালা শূন্যে একরাউন্ড ফায়ার করলে, ঘরে থাকা সকলে চমকে উঠলেন। মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম, প্রায় জনা ২০ জন পুলিশ, আর মুখ্যমন্ত্রীর দেহরক্ষী ব্ল্যাকক্যাটরা সকলে সেই চারজনকে তাক করে বন্দুক বাগিয়ে রেখেছেন, তাই সকলে হাত উপরে করে নিলেন।

যিনি বাবার মাথায় পিস্তলটা ধরে ছিলেন, তিনি এবার মুখ্যমন্ত্রীর দিকে বন্দুক তাক করতেই, বাবা বাঁধা হাত নিয়েই, মাথা দিয়ে একটা সজোরে গুঁতো মারলেন সেই লোককে। লোকটা একটু বেসামাল হয়ে গেলে, ব্ল্যাকক্যাটের একজন এসে, তাকে জাপটে ধরলেন, আর অন্য একজন মাথায় হাতের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করতে, লোকটা পুরুপুরি ভিমি খেয়ে গেল। তারপর মিস্টার বালা এগিয়ে গিয়ে বাবার বাঁধনটা খুলে দিতে, মিস্টার বাঘ, ইন্সপেক্টর বালার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে গেলেন।

উত্তরে, মিস্টার বালা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন – আমাকে কিছুই বলতে হবেনা, যা বলার আগেভাগেই বিজয় বলে রেখেছে আমাকে।

মিস্টার বাঘ ভ্রু কুঁচকে বললেন – বিজয় সিনহা! সে তো চলে গেছে অনেকদিন হলো।

বাবা এবার হাসতে হাসতে, আমার দিকে ঈসারা করে দিয়ে, নিজের ছদ্মবেশ খুলতে শুরু করলেন। আমিও আমার ছদ্মবেশ ছেড়ে ফেললাম। গরমের মধ্যে এত মোটা ছদ্মবেশের পলেস্তা, প্রাণ বেড়িয়ে যাচ্ছিল। খালি হতে, বাবা বলতে শুরু করলেন – আপনারা অত্যন্ত বোকাবোকা একটা প্ল্যান করেছিলেন, মিস্টার সুতাওয়ালা।

মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, বাবা আবার বললেন – পরিচয় করিয়ে দিই স্যার, ইনি হলেন অরবিন্দ সুতাওয়ালার ছেলে, রাকেশ সুতাওয়ালা। আপনি অরবিন্দকে চিনতেন, কারণ তিনি আপনার কাছে এই পিলসিমা গ্রামের অধিকার চাইতে অনেকবার আপনার কাছে গেছিলেন। ইনাকে চেনেন না। বাবার অবর্তমানে, এখন ইনিই কোম্পানির মালিক।

অন্যএকজনকে দেখিয়ে বললেন বাবা – ইনাকে তো আপনি চেনেনই। বিহারে বিরোধীদলনেতার ভাইপো। ইনি স্যার হলেন পিলসিমা গ্রামের দেখাশুনা করা সাব-ইন্সপেক্টর, মিস্টার বাঘ; আর ইনি হলেন মিস্টার বাঘ তথা এঁদের সকলের ইনফরমার, যিনি পিলসিমা গ্রামেরই অধিবাসী।

বাবা বলতে থাকলেন – এবার আপনাদেরকে পুরো কেসটা বলি। তবে তার আগে মিস্টার সুতাওয়ালা! ... স্যার, এই সব এলিয়ান ফেলিয়ানের গল্প আমেরিকা টামেরিকাতে চলে; সেখানকার সমস্ত মানুষ আধুনিক ভেল্কিবাজির বিজ্ঞানের উপর অন্ধবিশ্বাস করে, এই পোরা দেশের মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষাই ঠিক করে জানেনা, কি বিশ্বাস করবে বলুন তো!

মুখ্যমন্ত্রী – বিজয় কেসটা একটু বুঝিয়ে বলো দেখি।

বাবা – হ্যাঁ স্যার। কেসের শুরু হয় তখন যখন অরবিন্দ সুতাওয়ালাকে আপনি সাফ বলে দেন যে, পিলসিমা চত্বর হলো উর্বর জমি। সেখানের মাঠক্ষেত আপনি টেলিকম হাবের কেন্দ্র করার জন্য দেবেন না। অরবিন্দ সুতাওয়ালা জাত ব্যবসাদার। তিনি জানেন, যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাফ বলে দিচ্ছেন, তখন অন্য উপায় করতে হবে। কিন্তু উনার ছেলে হলেন, ওই বাপের মসনদে এসে বসে পরা ব্যবসাদার। তাই কি করলে কি হয়, এই সবের ধারণা উনার নেই। ... উনি প্ল্যান খাটালেন, আর হিসাব করলেন। হিসাব

করলেন যে, এই পিলসিমাকে অধিগ্রহণ করে নিতে পারলে। উনার ১২০০ কোটি টাকা প্রথমে, আর তারপরে বহু শতক কোটি টাকার মুনাফা হবে।

থেমে গিয়ে, বাবা আবার বললেন – এই হিসাবটা অবশ্য, আমি ওদের আজকের মিটিংএর কথা পিছন থেকে শুনছিলাম, তাই জেনেছি। আপনারা একটু দেরি করে দিয়েছেন আসতে। তবে হ্যাঁ দুটোর সময় আসলে, এই সমস্ত কথা জানতে পারতাম না। ... সেই ১২০০ কোটি টাকার মুনাফা পেতে, ৫০ কোটি টাকা অগ্রিম, আর কাজ হয়ে গেলে, আরো প্রায় ১০০ কোটি দেবেন বলে কথা দেন, বিহারের বিরোধী দলনেতাকে। ১৫০ কোটি টাকা, সামনেই ভোট। বুঝতেই পারছেন, বিশাল কাজে লাগবে, তাই লোভ সামলাতে পারেননি। ... কিন্তু কথা এই যে, সেই টাকা নিয়ে উনি করবেনটা কি, বা কেনই বা তাঁকে টাকা দেওয়া হলো!

বাবা একটু পায়চারি করে – টেকনোলজি দিয়ে যেমন বিদেশ সবাইকে এলিয়ানের ভাঁওতা দেওয়া হয়, তেমনই একটা ভাঁওতা দেবার চিন্তা করলো সুতাওয়ালা। কিন্তু বিদেশে সেই ভাঁওতা দিতে অনেক খরচ করে মিস্টার রাকেশ।... হ্যাঁ মানছি, আপনি যেরকম ছায়া ফেলছিলেন, তেমনই ছায়া ফেলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁরা আপনার মত মূর্খও ঠিক নন। তাঁরা ছায়াটা মাটি থেকে প্রজেকশন করেনা। প্রজেকশন করে, কনো অন্য আকাশযান থেকে, তাই সকলে মনে করে সত্যি সত্যি এলিয়ান। ...

মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে – যাই হোক স্যার, এলিয়ানের ভাঁওতা তো দেওয়া গেল, কিন্তু এলিয়ান আকাশে দেখা গেলে কি আর গ্রামের লোক ভয় পাবে! তাঁরা তো এলিয়ান টেলিয়ানের কিছু বোঝেনই না। তাই কি করলেন উনি? উনি বিহারের বিরোধী দলনেতাকে পয়সা দিয়ে, কিছু ভাড়া করা লোক আনালেন, পূর্ণিমার সময়ে সময়ে। আর তাদের দিয়ে ক্ষেত নষ্ট করতে শুরু করলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে – মিলি ভিডিওটা দেখা।

আমি ভিডিওটা দেখিয়ে দেখালাম, কিছু গামছা পরা লোক ক্ষেত নষ্ট করছেন। বাবা বললেন – ওরা গামছা মাথায় দেওয়া মানুষ না এলিয়ান ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা তো। ... একটু অপেক্ষা করুন, কেউ আসছে এখানে।

রথিনকাকার গলা পেলাম অকস্মাৎ। অদেখা সেই মানুষের গলা বললেন – আসছি না, এসে গেছি বিজয়। ...রথিন কাকা এবার সামনে এসে মুখ্যমন্ত্রী স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন – স্যার, আপনার এই বিশ্বস্ত রিপোর্টার, বিজয়, আপনার থেকে কেসের কথা শুনেই সবটা বুঝে গেছিল। তাই আমাকে বলেছিল

গোপনে, এই ৫-৬জন ট্রেনড্ অফিসারদের নিয়ে এই পিলসিমা গ্রামের পাসে ঘাটি গারতে। পূর্ণিমার দিন, বিজয়ের মার্গদর্শনে আমরা ... কই নিয়ে আয়!

৬ জন সিয়াইডি অফিসার তিনজনকে নিয়ে এলেন। রথিনকাকা আবার বললেন – স্যার, এঁদের মধ্যে এই মানুষটাকে দেখছেন, এ হল সেই সমস্ত লোক, যাকে জাকির সাহাব, মানে বিরোধী দলনেতা ক্ষেত নষ্ট করতে লাগিয়েছিলেন, তাদের একজন। ... বোল শালে, কেয়া করনে ভেজাথা তুঝে বোল।

সেই লোকটাও হিন্দিতে বললেন, আমি বাংলায় অনুবাদ করে বলছি – স্যার, এইবার নিয়ে তিনবার আমাদেরকে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে ক্ষেত আর ফসল নষ্ট করতে, আর খুব দ্রুততার সাথে নষ্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এবারেও করে ফিরছিলাম, সেই সময় (বাবাকে দেখিয়ে) উনি পিছন থেকে আমাকে দলের থেকে সরিয়ে নেন। ... আমিই সব থেকে পিছনে ছিলাম। আমার নাকে কি গন্ধ দিয়ে দেয়, আর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর স্যার কাস্টডিতে জ্ঞান ফেরে।

বাবা – ক্ষমা করবেন স্যার, আসল আসামিদের কাছে পৌছাতে হলে, ওদের কিচ্ছু জানতে দেওয়া যাবেনা। তাই আমি পিছনের লোকটাকে মুখে ক্লোরফর্ম দিয়ে নিয়ে যাই, আর রথিনের কাছে হ্যান্ডওভার করে দিই। দেহের শক্তিতে আমি পেরে উঠতাম না, তাই এই ক্লোরফর্মের ব্যবহার করতে হয়েছে।

এবার মিস্টার বাঘের দিকে তাকিয়ে – আর উনি যে এঁদের সাথে মিশে আছেন, তা আমি বুঝে গেছিলাম, প্রথম দিনেই। প্রথম দিনে ফোনে কথা শুনে বুঝে যাই, আমাদের আগমনের বার্তা কারুকে দিচ্ছেন উনি। পরের দিন সকালে, জিপ থেকে নামার পরে, আমি জিপ যেখানে থামবে, ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, ওর ফোনে কথা শুনবো বলে। ... মিলি আর অফিসার বালাকে আমি সিগারেট খাবার নাম করে, সরে এসেছিলাম। সেখানে আমার সন্দেহ যে সঠিক, তা কনফার্ম হয়ে যাই।

সেই কারণে, আব্দুলের সাথে কথা বলে, আর মিস্টার বালার সাথে কথা বলে, আজকের দিনে উনাকে যে ফর্স নিয়ে আসতে হবে, আর আমি যে ছদ্মবেশে গ্রামে থাকবো, সেই কথা বলে, আব্দুলের সাথে চলে আসি।... স্যার আব্দুল সবটাই জানতো, তাই ও আমাকে আর মিলিকে ওর বোনের বাড়ি নিয়ে যায়, যেখানে আমরা বেশ পালটে নিই ।

স্যার নতুন বেশ ধারণের দুটো কারণ। মিস্টার বাঘ আমাদেরকে চেনেন। তিনি প্রায়ই এই গ্রামে আসেন, তাই দেখেই চিনে ফেলবেন, আর এই মাথাদের কাছে আমি যে চলে যাইনি, সেই খবর চলে আসবে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে গ্রামে একজন না একজন তো ইনফরমার থাকবেই, নাহলে এখানে কি হচ্ছে, তার খবর পেতেই পারবেনা কেউ। ... তাই এই ছদ্মবেশ।

গ্রামে থাকতে আসার পরের দিনই একটা মিটিং হয়। আগের দুইবার এলিয়ান আক্রমণ হয় পূর্ণিমার রাত্রে আর পরেরটা পূর্ণিমার রাত্রের পরের দিন। তাই সেই নিয়েই একটা মিটিং আব্দুল রাখে, আমারই কথাতে। আর এই মিটিং করতে বলার কারণ ছিল গ্রামের মধ্যে কে ইনফরমার, তাকে চিনে নেবার জন্য। আব্দুলের থেকে সেই রাত্রেই আমি জেনে নি যে মিটিংএ কে আসেনি। আর যারা আসেননি, তাঁদের সংখ্যা হলো মাত্র একজন, ইমতিহান... এই যিনি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

স্যার, এই এলিয়ানের নামে যেই ভাঁওতাবাজি পৃথিবীজুরে চলে, সবটাই ছায়ার খেলা। আমাবস্যার রাত্রে কি করে আর ছায়া দেখা যাবে স্যার! ... ছায়ার মধ্যে ছায়া যে দেখাই যায়না। তাই পূর্ণিমার রাতটা বা মেঘলা আকাশের দিনগুলিকে বেছে নেওয়া হয় এই দৃশ্য সকলকে দেখানোর জন্য। বিদেশে দেখানো হয়, থ্রেট আছে দেখিয়ে, সেই থ্রেট নিয়ে ইন্ডাইরেক্ট ব্যবসা করার জন্য। আর সুতাওয়ালা করলেন, ডিরেক্ট বিজনেস করার জন্য। ... তবে ছায়া ফেলার জন্য একটা মিডিয়ামও তো আবশ্যক। এই শূন্য আকাশ তো আর মিডিয়াম হতে পারেনা। তাই যেই পূর্ণিমার রাত্রে, বা তার আগের দিন বা পরের দিন, যেদিন রাত্রের আকাশ আলো ভালো থাকে আর সঙ্গে আকাশে মেঘও থাকে, সেদিনকেই সবসময়ে বেছে নেওয়া হয়, এই এলিয়ানের নামে ভাঁওতা দেবার জন্য।

এঁরাও তাই দিলেন। আর এই পূর্ণিমাতে আকাশে মেঘ থাকবে, পূর্বাভাস আমরা লাভ করতে পারছি, আর ওরা পারবেনা! ... তাই ওরা প্রস্তুত হয়। তবে স্যার বলতেই হয়, অত্যন্ত কাঁচা কাজ এদের । একটা জায়গায় ঘাটি গেরে, একজন স্পেস-সসারের ছায়া ফেলছে, আর অন্যজন লাল আর সবুজ লেজার লাইট দিয়ে দেখাচ্ছে যে স্পেসসিপ আলো ছড়াচ্ছে। ... বাইরের দেশেও একই ভাবে ভাঁওতা দেয়, কিন্তু স্পেস-সিপের ছায়াটা অন্য একটা আকাশযান থেকে দেয়। আর লেজারটাও, তাই ধরা যায়না লাইট বা ছায়ার সোর্সটা কি, কিন্তু এরা মাটিতে বসেই ... মানে করবে চুরি, সেখানেও কার্পণ্য। ...

এরও দুটো প্রমাণ আছে স্যার। একটা এই ভিডিও। একটা ভিডিওতে মেঘের উপর মানে মেঘকে মিডিয়াম করে স্পেস-সিপের ছায়া ফেলা হচ্ছে, আর দেখুন লাইট মানে লেজারটা উপর থেকে তলায় নয়, তলা থেকে উপরে যাচ্ছে। আর অন্য প্রমাণটা ... রথিন!

রথিনকাকা বললেন – এই স্যার দুই ব্যক্তি, এদের একজন ছায়া ফেলছিলেন, আর অন্যজন লেজার।

বাবা হেসে বললেন – মিলির তোলা লাস্ট ভিডিওটা দেখুন স্যার। তখন রথিন এঁদেরকে ধরে নিয়ে ছিল। তাই ছায়া সসার তো আকাশ থেকে গায়েব। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকার জন্য, লেজার টর্চএর লাইট

তখনও দেখা যাচ্ছে। ... রথিনরা ছায়া সসার প্রজেক্সানের যন্ত্র, আর ব্যবহার করা লেজার, দুইই নিজেদের কাস্টডি তে নিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম – বাবা এইসব আমাকে কিচ্ছু বলেনি। সেইদিন রাত্রে বাবাকে ধস্তাধস্তি করে আসতে দেখাচ্ছিল, কারণ বাবা এত কিছু করে এসেছিলেন তাই।

বাবা আবার বললেন – সেই রাত্রে, যখন সকলে এলিয়ানের আক্রমণ হয়েছে বলে ছুটে গেলেন, তখনই শুরু হয়, এই জল্লাদদের ক্ষেতে নেমে ফসল নষ্ট করার আসুরিক কর্ম। আর সেই সময়ে আমি দেখি কি, ইমতিহান নিজের বাড়ির সামনে পায়চারি করতে করতে বিড়ি খাচ্ছে। আমার যেই সন্দেহ হয়েছিল যে ইমতিহানই সেই ইনফরমার, সেটা পাকাপাকি হয়ে গেল। সারা গ্রাম ফাঁকা। এর থেকে ভালো সময় আর হয়না, গোপন কথা ফোনে সেরে ফেলার। আমি ইমতিহানের পায়চারি করার ধরন দেখেও বুঝে যাই, সে সমস্ত গ্রামবাসির চলে যাবার অপেক্ষা করছে। তাই চুপচাপ, ওর বাড়ির পিছনে এসে গাঢাকা দিই।

আমার অনুমান সঠিক। একটু পরেই ইমতিহান ফোন করলো, আর বলতে শুরু করলো – এই বলে বাবা একটা রেকর্ডিং চালিয়ে দিলেন।

রেকর্ডিংএ ইমতিহানের গলা – স্যার, কাজ হয়ে গেছে আজকের। ফিল্ড ফাঁকা, ক্ষেতে ওরা নেমে গেছে ক্ষেত নষ্ট করতে। ... স্যার আজকের টাকাটা কবে পাবো? ... (খানিক চুপ ... উলটো দিকের কথা হচ্ছে, যেটা রেকর্ডিংএ আসেনি... তারপর আবার ইমতিহানের গলা) ... স্যার, সেটা আমি কি করে বলবো? আপনি বলেছেন, ক্ষেত নষ্ট করার ব্যবস্থা করে দিতে, আমি করে দিয়েছি। ... এবার গ্রামের লোক কবে ভয় পেয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, সেটা আমি কি করে বলবো? (আবার চুপ... আমার কথা) ঠিক আছে স্যার, আপনি কাল সন্ধ্যায় গাড়ি পাঠিয়ে দিন। আমি চলে যাবো। ... টাকাটাও নিয়ে আসবো, আর পরের আক্রমণের জন্য কথাও বলে আসবো।

বাবা রেকর্ডিং বন্ধ করে দিলেন। ...এরপর আর কি! আপনাকে ফোনে জানিয়ে দিলাম, আপনি আসুন, কারণ সেই গাড়ি যেখানে নিয়ে যাবে ইমতিহানকে, সেখানে সবকটা আসামির একসাথে গোলটেবিল বৈঠক বসবে। আব্দুল গিয়ে মিস্টার বালাকে সমস্ত সূচনা দিয়ে দিল। আর আপনারা আমার মিস্টার বালাকে দেওয়া আর রথিনকে দেওয়া ট্র্যাকার ফলো করে, এখানে উপস্থিত, আর এই চার মুখ্য আসামি আপনার সামনে।

মুখ্যমন্ত্রী বালার উদ্দেশ্যে বললেন – এরেস্ট দেম।

সকলকে এরেস্ট করে নিয়ে গেলে, মুখ্যমন্ত্রী পিলসিমা গ্রামে আমাদের নিয়ে ফিরে এলেন। গ্রামবাসি এলিয়ান সঙ্কট কেটে গেছে বলে খুব আনন্দ উৎসব করলো, আর বাবাকে! ... কমবয়সী তো ছেড়ে দিন, গ্রামের দাদুরাও পায়ে হাতদিয়ে প্রণাম করতে আসে। ... প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল গ্রাম থেকে । এতো এতো সবজি, বিভিন্ন ধরনের আচার, আরো কতকি। গ্রামের মানুষ, কিনে উপহার দেয়না, কষ্ট করে যা উৎপন্ন করেন, সেই সোনার ঘামলাগানো জিনিসই তাঁদের দেওয়া উপহার। মিস্টার বালাও বাবাকে আর সকলকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। আর আমরা সন্ধ্যা হতে, মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে চেপে ফিরলাম।

বাবা বলেছিলেন, আমরা রথিন কাকার গাড়িতে উঠছি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আবদার, আমরা যেন উনার সাথেই যাই। ... পথে বাবাকে, একটা ১০ লাখ টাকার সরকারি চেক দিলেন, আর প্রশ্ন করলেন – আচ্ছা বিজয় এলিয়ান বলে কি কিছু সত্যি করেই হয়না! ভিন গ্রহে কি প্রাণ নেই?

বাবা বললেন – স্যার, ভিন গ্রহ ব্যাপারটা কি? একটা কল্পনা, এই কল্পনা যে যেমন পৃথিবী আছে, তেমন পৃথিবীর মত অন্য গ্রহও থাকবে, যাতে প্রাণ থাকবে। ... আসলে বিজ্ঞান নিচ হতে হতে, অধমে পতিত হতে হতে, এতটাই নিচে নেমে গেছে যে, এখন তা মনে করে যে, কিছু গ্যাস ইত্যাদির মিশ্রণ হলেই প্রাণ সঞ্চার হবে। ... কিন্তু এই ভাবনা ভাবার সময়ে একবারও নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, তাঁরা মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেনা। ... আসলে স্যার প্রাণ কি? প্রাণ হলো চেতনার প্রবাহ।

বাবা বলতে থাকলেন – চেতনার উৎস হলেন একমাত্র ঈশ্বর। অর্থাৎ ঈশ্বরকে যতক্ষণ আমরা ধারনা করতে পারি, ততক্ষণই প্রাণ। যেই সেই ধারনা শেষ, অমনি আমরা মৃত। আধুনিক বিজ্ঞান, কিছু চেতনাকে সুপারকম্পিউটারে কোডিং করে, একটা মেশিনে সেই কালেক্টিভ কন্সাসনেশ মানে চেতনাকে ঢুকিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরি করে ভাবছে, তাঁরা ভগবান হয়ে গেছে, প্রাণ ফুঁকে দিয়েছে তাঁরা। ... এটা মুর্খামি ছাড়া আর কি স্যার!

মুখ্যমন্ত্রী বিস্মিত নেত্রে দেখছেন খালি বাবার দিকে, আর বাবা বলতে থাকলেন – স্যার, আমার অঙ্ক কশা সবার আগে হয়েছে না আমার থেকেও আগে কেউ অঙ্ক কশে নিয়েছে, এই ভাবনা থেকেই, আমরা অন্যের খাতায় উকুঝুকি মারি। অর্থাৎ আমরা যতটা বেশি ইন্সিকিওর্ড, ততটাই আমরা অন্যের খাতায় চোখ দিই। তেমনই আধুনিক বিজ্ঞানের নিজের উপর কনো বিশ্বাসই নেই, তাই সমানে অন্য গ্রহের দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে চলেছে। ... আসল কথা এই স্যার যে, আমরা নিজেদের এট্মস্ফেয়ার ছেড়ে কনোদিনই বেড়তে

পারিনি এখনও, আর কনোদিন পারবোও না। ... আপনি মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে, কেন্দ্রের মন্ত্রীও ছিলেন। আপনি ভালো করেই জানেন, এই সমস্ত চন্দ্র অভিযান, মঙ্গল অভিযান, এগুলো আসলে কি। ...

মুখ্যমন্ত্রী হেসে বললেন – হ্যাঁ, সবাই যখন মিথ্যা বলে, তখন মিথ্যা বলারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়; এও সমস্ত অভিযানও সেই রকমই।

বাবা – তাহলে বুঝতে পারছেন তো, আমরা শ্রেষ্ঠ জীব নই, আমাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ আছে, আর তারা কেন শ্রেষ্ঠ? যান্ত্রিক ভাবে তারা আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। এর অর্থ বোঝেন স্যার! ...

মুখ্যমন্ত্রী মাথা নাড়লে, বাবা আবার বললেন – স্যার, যদি মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলে চিহ্নিত করা হয়, তবে মানুষের মধ্যে তো প্রশ্ন আসবে, আমরা কেন শ্রেষ্ঠ? কি আছে আমাদের মধ্যে যার কারণে আমরা শ্রেষ্ঠ? আর একবার সেই প্রশ্ন মনে এসে গেলে কি হবে? মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে উঠবে, আর অন্তর্মুখী হয়ে গেলে কি হবে? যান্ত্রিকতার থেকে মানুষের মন উঠে যাবে, আর আত্মার অধ্যায়ন বা আধ্যাত্মের প্রতি মানুষের মন চলে যাবে। আর একবার যদি তা চলে যায়, বুঝতে পারছেন, আজকে যাদের কাছে সমস্ত পয়সা, তা তো টেকনোলজির জন্যই। সেই সমস্ত ব্যবসা শেষ, সেই সমস্ত কোষাগার শূন্য হয়ে যাবে। ... তা যাতে না হয়, তাই এই এলিয়ানের গল্প, আর এই বোঝানো যে যান্ত্রিকতা বা টেকনোলজিতে উন্নত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ... অর্থাৎ বর্তমান বিজ্ঞান কি করছে স্যার! ঝুরি ঝুরি মিথ্যা কথা বলছে, আর মানুষজাতিকে ভ্রমিত করে ব্যবসা করছে, যান্ত্রিকতার ব্যবসা।

মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত কথা শুনে বললেন – কি ধাতু দিয়ে তুমি তৈরি বিজয়। তুমি আমার কাছে দিনকেদিন একটা আশ্চর্য মানুষ হয়ে উঠছো। ... আচ্ছা এই ভাবেই কি এলিয়ানের ভাঁওতা দেওয়া হয়!

বাবা – হ্যাঁ স্যার। মেঘকেই মিডিয়াম করা হয়, আর মেঘের উপরেই স্পেস-সসারের ছায়া ফেলে, তাতে লেজার কাস্টিং করে, যা কনো কালেই সত্য ছিলনা, তাকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়। আর যেই গুহায় এই সমস্ত আঁকা দেখতে পান, তাও এঁদেরই আঁকা। ... এককথায়, এই সমস্তই ব্যবসার ছক স্যার। বাস্তবে মানুষই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরনির্মিত জীব, আর তা ততদিন শ্রেষ্ঠ থাকবে, যতদিন না মানুষের থেকেও অধিক দ্রুততার সাথে কেউ সমাধিস্থ হতে পারবে। সমাধি মানে জানেন তো! ... সম্পূর্ণ ভাবে শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া, যেখানে আমিও নেই, আর আমার ব্রহ্মাণ্ডও নেই।

বিষাক্ত চাটনি

মৌলবি খুন

এলিয়ান রহস্যের খবর অমৃতলালে ছাপার পর, বাবার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে গেছিল। না বাবাকে কেমন দেখতে, তেমন কেউ জানেন না, তবে বাবার নাম সম্বন্ধে আপামর জনসাধারণ অবগত হয়ে উঠেছিল। সেটা বুঝলাম কি করে? বাবার এই কেসের পর, আমি মা আর বিদিপ্তাদিদি বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের স্করপিও গাড়িতে করে একটা ছোট ট্রিপে গেছিলাম। মা প্ল্যান করেছিল বাইরে কোথাও যাবে, কিন্তু বাবা বললেন, আমাদের এই বাংলা এমনই পুণ্যভূমি, যেখানে সব থেকে বেশি সংখ্যক শক্তিপিঠ রয়েছে, যার মধ্যে একাকী বীরভূম জেলাতেই ৪টে মূল শক্তিপিঠ রয়েছে, সেসব না দেখে, বাইরে কেন যাওয়া হবে।

তাই আমাদের গাড়ি ছোটে বীরভূমে। প্রথম শান্তিনিকেতন, সেখান থেকে কাছাকাছি কঙ্কালি, ফুল্লরা দেখে, সরাসররই এলাম বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বরের মহাশক্তিপিঠ দেখে, সেখানে মহর্ষি বশিষ্ঠের তপভুমি দর্শন করে এলাম তারাপীঠ। তারাপীঠ থেকে বিরচন্দ্রপুরে গিয়ে, প্রভু নিত্যানন্দের জন্মভিটা দেখে, পাণ্ডবদের একচক্র গ্রাম দেখে, অন্যদিকে সাধক বামাখ্যাপার জন্মভিটা দর্শন করে, দেখে এলাম নলহাটির নলহাটেশ্বরীকে। এই পুরো যাত্রাপথে, যেখানে যেখানে বাবাকে পরিচয় দিতে হয়েছে, সেখানে সেখানে খাতিরদারি দেখার মত ছিল।

একটা কমন ডাইলগ – ও আপনি কি সেই রিপোর্টার, বিজয় সিংহ, যিনি পিলসিমা গ্রামকে বাঁচিয়েছিলেন! ... আর তারপর তো লেগেই আছে কথা; আপনার সাহস মশাই বলিহারি। না আপনি পুলিশ, না গোয়েন্দা, আপনি এইসব করেন কি করে? ভয় লাগেনা! ... এত বড় বড় ক্রিমিনালদের একাহাতে সাহেস্তা করেন কি করে। ... আরো কত কি কথা – আপনি আমাদের বাস্তব জগতের হিরো, আপনি আমাদের প্রেরণা, আরো কত কিছু। ... তারাপীঠে হোটেলের মালিক তো বাবাকে হোটেলের চিফ গেস্টই বানিয়ে দিল। সংবর্ধনা দিল, আর আমাদের থেকে একটা টাকাও নিলোনা। এমনকি তারাপীঠের পাণ্ডার সাথে কথা বলিয়ে, সেখানেও নিজের খরচে তারামায়ের দর্শনের সুবন্দোবস্ত করে দিলেন।

মায়ের মুখে দেখলাম একটা আনন্দের ছাপ, কিন্তু বাবার মুখে একটা বিরক্তির ছাপ। প্রশ্ন করতে, বাবা বলল, এরকম পশার হয়ে গেলে, কাজ করা খুব অসুবিধা হয়ে যাবে বুঝলি; একটা ছদ্মনাম ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনে, সেই নামের নথিও সঙ্গে রাখতে হবে । আসল নাম এইভাবে ক্যারি করলে, ক্রিমিনাল তো আমার উপস্থিতিতেই সতর্ক হয়ে যাবে।

আমার কিন্তু ভারি আনন্দ হয়েছে। কিরকম একটা সেলিব্রিটি সেলিব্রিটি ভাব। সেদিন বুঝিনি, তবে আজ নিজে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারি, নামের পশার থাকলে, থাকা খাওয়া, আতিথেয়তার খুব সুবিধা হয়, তবে কাজের খুব অসুবিধা হয়, বিশেষ করে যদি তদন্ত করার মত কাজ হয়, বা গোপনীয়তা বজায় রেখে খবর সংগ্রহ করার কাজ হয়।

যাই হোক, বেজায় মজা করে, প্রায় ১০ দিনের ট্রিপ করে, আমরা বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফেরার পরের দুইদিন, আমার মায়ের আর বিদিপ্তাদিদির কাপড় কাচতে আর আলমারি গোছাতেই সময় চলে যায়। বাবাকে এই সময়ে দেখে খুব রাগ হতো। পায়ের উপর পা তুলে, নিজের ছোট্ট বিছানায় সারাদিন বসে বসে, সমস্ত শক্তিপিঠের থিসিস লিখে চলেছেন। আমরা গাধার খাটনি খেটে চলেছি, আর উনি পায়ের উপর পা তুলে আয়েশ করছেন।

ফিরে আসার তিনদিনের দিন, সন্ধ্যায়, আমরা চারজনেই একত্রে চা খেয়ে, চায়ের টেবিলকে ঘিরেই গল্প করছিলাম। কলিংবেলটা বেজে উঠতে, আমি উঠে গিয়ে আইহোলে দেখলাম। দেখলাম একজন সামান্য দেখতে সুপুরুষ মানুষ দাড়িয়ে রয়েছেন। বাবাকে বলতে, বাবা দরজা খুলতে বললেন। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে, হাতজোর করে বললেন – নমস্কার, আমি জাকির আব্বাস, পার্কসার্কাস মসজিদের মৌলবি সাহেবের বড় ছেলে।

বাবা ভিতর থেকে বললেন – নিয়ে আয় উনাকে।

আমি উনাকে চায়ের টেবিলে নিয়ে আসতে দেখলাম, মা আর বিদিপ্তাদিদি সেখান থেকে টেবিলের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ইতিমধ্যে উঠে গেছেন। ভদ্রলোককে সোফায় বসাতে বসাতেই বাবা বললেন – কাল রাত্রে রোজা ভাঙার খাবার খাওয়ার সময়ে বিষক্রিয়ায় দেহত্যাগ করেছেন তো মৌলবি?

জাকির – হা জি। কিন্তু কে কেন, কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না!

বাবা – পুলিশের কাছে যান। এটা তো পুলিশ কেস!

জাকির – জি পুলিশ তো নিজে থেকেই এসেছে । বডি নিয়ে গেছে কাল রাত্রেই, আজ সকাল থেকে আমাদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আর বলেছে, কাল সকালে সবাইকে জেরা করবে।

বাবা – হুম, তো আমার এখানে কি কাজ?

জাকির – জি, আমি জানি যদি কেউ এই মার্ডারের আসল খুনিকে খুঁজে বার করতে পারে, তা আপনিই।

বাবা – কিন্তু আমি পারিবারিক কেস নিইনা। আর আমি তো আর ডিটেকটিভ নই, আর পুলিশের অনুমোদিত তদন্তকারিও নই। পুলিশ থাকতে, আমাকে সেখানে ভিড়তেই দেবে না পুলিশ।

জাকির – স্যার, আমি জানি সেইসব কথা; তাই তো চিফমিনিস্টারের থেকে একটা চিঠি লিখিয়ে এনেছি, আপনাকে এই কেসে এপোয়েন্ট করার জন্য। ... (সাথে থাকা কালো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বার করে) ইয়ে লিজিয়ে, ... চিফমিনিস্টারের লেটার।

বাবা একবার চিঠিটা নিয়ে, চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন – বেশ। ... আচ্ছা পার্কসার্কাস থানার ওসিই তদন্ত করছেন তো?

জাকির – জি হা, তাপস শিকদার উনার নাম।

বাবা – ওকে থ্যাঙ্ক ইউ। আমি উনার সাথে কথা বলে নিয়ে, কাল সকালে উনার জেরা করার সময়ে, উনার সাথেই যাচ্ছি আপনাদের বাড়ি।

জাকির সাহেব বললেন – স্যার, আপনার ফিজটা!

বাবা – আমার কনো ফিজ নেই। আমি কনো পেশাদার নই। ... আপনাকে সাফ বলে রাখি কিছু কথা আগেভাগেই। যদি দেখি যে পারিবারিক কেস, তবে কিন্তু আই উইল কুইট। ... আমি মনে করিনা, পারিবারিক কেসের তদন্ত করার জন্য আমি সঠিক ব্যক্তি। তার জন্য পুলিশই যথেষ্ট। আর সেই ক্ষেত্রে আমি কনো ফিজই নেবনা। ... আর যদি দেখি যে না, এই কেস পারবিবারিক নয়, বরং তা অন্যধারার কেস, তবেই আমি এগবো। আর সেই ক্ষেত্রেও আমার কনো ফিজ নেই। যে যা কিছু আমার পারিশ্রমিক মনে করে দেন, আমি তাই নিই।

জাকির সাহেব চলে গেলেন। বাবা কিছু ফোন করতে বসলেন। দুতিনটে চেনা পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলে নিয়ে, বাবা কল করলেন তাপস শিকদারকে, মানে পার্ক সার্কাস থানার ওসিকে।

ফোনে বাবা বিশেষ কিছুই বললেন না। খালি বললেন যে মৌলবিসাহেবের বড় ছেলে, বাবার শরণাপন্ন হয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর থেকে চিঠি করে নিয়ে। তাই তিনি কালকে কেসের তদন্তের বিষয়ে যাবেন। ...

কথাবার্তার মধ্যে বাবা এও বলে দিলেন যে, যদি দেখেন যে পারিবারিক কেস, তাহলে তিনি এই কেসে আর যুক্ত হবেন না। ... অন্যদিক থেকে তাপসবাবু বললেন – বেশ, কাল সকালে দেখা হচ্ছে।

আমি আর বাবা, পরেরদিন সকাল সকাল উঠেই পার্কসার্কাস চলে গেলাম। কি বিশাল বাড়ি! আর অসম্ভব রকম খানদানি বাড়ির গঠন আর সাজনগোছনটাও। বাড়ির দরজাতেই দাঁড়িয়েছিলেন ইন্সপেক্টর শিকদার, আর তার সাথে দুটি কনস্টেবল আর আরেকজন কালো কোর্ট পরা লোক। বাবা আর আমি সেখানে যেতেই, মিস্টার শিকদার এগিয়ে এসে হ্যান্ডসেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন – অনেক শুনেছি আপনার ব্যাপারে। নাইস টু মিট ইউ, মিস্টার সিংহ।

বাবা উনার সাথে হ্যান্ডসেক করছেন, এমন সময়ে সেই কালো কোর্ট পরা লোকটা এগিয়ে হেসে বললেন – হাই, আই এম ডিটেকটিভ সুপার ইনটেলিজেন্ট।

বাবা হাত মিলয়ে বললেন – আচ্ছা, আপনাকেও কি এখানে ডাকা হয়েছে নাকি?

ডিটেকটিভ বললেন – হ্যাঁ, আমাকে ডেকেছে এই বাড়ির একমাত্র জামাই, নাজির ওমার সাহেব।

বাবা – ওকে, তা আপনাকে কি বলে ডাকা হোক, আপনি পছন্দ করবেন?

ডিটেকটিভ – ফাইন, মাই অরিজিনাল নেম ইজ সুমন্ত দত্তরায়। ইউ ক্যান কল মি সুমন্ত।

বাবা – নাইস টু মিট ইউ, মিস্টার সুমন্ত। (মিস্টার শিকদারের দিকে তাকিয়ে) তাহলে এবার ভিতরে যাওয়া যাক।

মিস্টার শিকদার – হ্যাঁ চলুন, আপনি কি আলাদা করে জেরা করবেন?

বাবা – আপাতত আপনারাই করুন। যা নোট করার আমি তার থেকেই করে নেব। যদি তারপরেও কিছু লাগে, আই উইল মুভ ইন্ডিভিজুয়ালি। ... আশা করি, তাতে আপনাদের আপত্তি থাকবেনা!

মিস্টার শিকদার – আরে মশাই, আপনাকে আটকালে, আমার কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন! পুরো পুলিশ, সিয়াইডি ডিপার্টমেন্ট আপনার ফ্যান; স্বয়ং চিফমিনিস্টার আপনার ভক্ত। আমাকে তো আমার চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে হবে নাকি!

বাবা ও সকলের হাসি। আর তারপর হাসি থামিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ। জেরা সূত্রে জানা গেল যে মৌলবি সাহেবের প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন, ১০ বছর আগে। উনার তিন সন্তান, দুই পুত্র এবং একটি কন্যা। বর্তমান স্ত্রী নিঃসন্তান। তবে, উনাকে সকল মৌলবিসাহেবের সন্তানই অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং মন থেকেই আম্মি বলে ডাকেন। আমি বরং আপনাদের জেরাতে কে কি বলল, সেটা বিস্তারেই বলি। অনেক তথ্যই পেয়েছিলাম এই জেরা থেকে। আর যা বুঝলাম যে, আমি আর বাবাই একমাত্র যারা কনো পড়াশুনা না করে এই কেসের তদন্তে নেমেছিলাম। ইন্সপেক্টর শিকদার আর গোয়েন্দা সুমন্ত রীতিমত পড়াশুনা করে এসেছিলেন। কেন বলছি এই কথা? জেরা শুনলেই বুঝতে পারবেন। শুনুন তবে –

জেরার ধুম

শুরু হলো জেরা, আম্মিকে দিয়েই। প্রথম প্রশ্ন ইন্সপেক্টর শিকদারের – আপনার তো বিয়ে হয়েছে ১০ বছর, তাই না!

আম্মি – হা সাহেব।

শিকদার – আপনি তো বয়সে মৌলবিসাহেবের থেকে অনেকটাই ছোটো। মানে আমার কথা এই যে, আপনাকে কি এই নিকা করার জন্য জোরজবরদস্তি করা হয়, নাকি আপনি স্বেচ্ছায় এই নিকাতে মত দেন।

আম্মি – আমার বাপমা আমার নিকার প্রায় ৪ বছর আগে মারা যান। আমার এই নিকার কথা বলে আমার ভাই, রহমন।

শিকদার – আর আপনি রাজি হয়ে যান। মানে এটা জেনেও যে মৌলবি সাহেবের বয়স হয়েছে, উনার বড় বড় তিনটি সন্তান আছে। ... সব জেনেও আপনি রাজি হয়ে যান কেন? ... মানে ... রাজি হওয়ার তো কথা নয়, তাই না! ... কি বলছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই আপনি। সব স্ত্রীই চান, তাঁর স্বামী হবে, তাঁর সন্তান হবে, তাঁর পরিবার হবে। ... কিন্তু এক্ষেত্রে তো কিছুই আপনি পাবেন না, আপনি জানতেন। আপনার স্বামীও অন্য কারুর স্বামী ছিলেন। সন্তানরাও অন্য কারুর। মৌলবি সাহেবের বয়স হয়েছে, তাই আর নতুন করে সন্তানও পাবেন না, সেটাও জানতেন। তবে কেন?

আম্মি – আমার বাবা মা যখন মারা গেছিলেন, তখন আমি আর আমার ভাই বেঁচে থাকতে পেরেছিলামই, মৌলবি সাহেবের জন্য। আর যখন সেই সাহায্যের প্রতিদান দেবার সময় এসেছে, তখন নিজের চিন্তা করবো? ... এমন করলে, আল্লাহর কাছে গিয়ে কি জবাব দেব সাহেব?

শিকদার – হুম, এই প্রশ্ন যে আপনার কাছে আসবে, এই দুইদিনে আপনি বেশ বুঝেই গেছিলেন, আর তাই উত্তরও তৈরি রেখে দিয়েছেন দেখছি! ... আসলে আপনার ভাই আর আপনি মিলে তো এই প্ল্যানটাই করেছিলেন, যাতে মৌলবি সাহেবের টাকার সাহায্যে, আপনার ভাইয়ের একটা হিল্লে হয়ে যায়। ... কি ভুল বলছি? ... আপনার ভাইয়ের সারজিকাল ইন্সট্রুমেন্টের ব্যবসাটা তো মৌলবিসাহেবেরই তৈরি করে দেওয়া, তাই না! ... আর সেই ব্যবসা এখন বাড়ানোরও খুব প্রয়োজন। সেই নিয়ে, আপনার ভাই আর মৌলবি সাহেবের তো প্রচুরবার কথা হয়েছে। কি ভুল বলছি? ... আর যখন আপনি আর আপনার ভাই দেখলেন যে, মৌলবি সাহেব আর কিছুতেই আপনার ভাইকে টাকা দিচ্ছেন না, তখনই উনাকে খুনের চিন্তা করলেন! উনার মৃত্যুর পর, উনার সম্পত্তির যেই ভাগ পাবেন, তাই দিয়ে ভাইয়ের ব্যবসা তো দিব্যি বড় হয়ে যাবে। ঠিক বললাম! ... তো এবার নিজের মুখে আপনার দোষ কবুল করে নিন। ঝামেলা মিটে যাবে। ... কই বলুন!

আম্মি – ইয়ে সব আপনি কি বলছেন সাহেব! ... মৌলবি সাহেবকে আমি খুন করে দেব! ... বা আমার ভাই খুন করে দেবে? ... কি সব বলছেন আপনি!

শিকদার সাহেব – আচ্ছা, তাহলে আপনি আপনার দোষ স্বীকার করবেন না। তাই তো! ... ঠিক আছে, আপনার কাছে শেষে ফিরছি। আচ্ছা আপনার বড় ছেলেকে একটু ডেকে দিন দেখি।

আম্মি কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে চলে গেলেন। দরজায় একজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। কে তিনি এখনও জানিনা। তিনি আম্মিকে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন, আর বললেন – আম্মি, টুট মত যাইয়ে। পুলিশ তো এইসেহি পুছতাছ কারতে হে।

আমার মনে অন্য কথা চলল। এইরকম একটা কেস তো আমি ফেলুদাতে পরেছিলাম। স্ত্রী নিজের ভাইকে দিয়ে স্বামীকে খুন করিয়েছিলেন, ভাইকে সম্পত্তির অংশ দেবেন বলে। সত্যিই কি তবে এই আম্মিই খুন করেছেন? হতেই পারে, খাবার খেয়ে মারা গেছেন। আর খাবার তো স্ত্রীই দেবেন স্বামীকে খেতে। তাহলে উনার কাছেই তো খুন করার সুযোগ সব থেকে বেশি। ... বাবার দিকে তাকালাম। বাবাকে দেখলাম, উনি নির্বিকার। তাই আমিও আর উচাটন না হয়ে, বসে রইলাম।

ঘরে এলেন আমাদের চেনা জাকির আব্বাস সাহেব। সঙ্গে সেই স্ত্রীটি যিনি আম্মিকে সহানুভূতি দিচ্ছিলেন। বুঝলাম, ইনি জাকিরের স্ত্রী। ... চেয়ারে এসে বসলেন জাকির, আর স্ত্রী পিছনে দাড়িয়ে রইলেন।

ইন্সপেক্টর শিকদার বললেন – হুম, জাকির। আপনার যেন কিসের ব্যবসা?

জাকির সাহেব – জি, ঘড়ি কা। ... লালবাজার কে পিছে দুকান হে।

মুখ খুললেন আমাদের ডিটেকটিভ বাবু, মিস্টার সুমন্ত। বললেন – কিন্তু আমার কাছে তো ইনফরমেশন আছে যে আপনার আরো একটা ব্যবসা আছে, ওষুধের।

জাকির সাহেব – জি ড্রাগ লাইসেন্স করিয়েছি। এখনও ব্যবসা শুরু করতে পারিনি।

সুমন্ত – কেন? পয়সা নেই। তাই তো? ছয়মাস হয়ে গেছে ড্রাগ লাইসেন্স হয়ে গেছে। হাতে পয়সা নেই তাই ওষুধের ব্যবসাটা খুলতে পারছেন না। ... মৌলবিসাহেব খুন হলে সম্পত্তির ভাগ পেয়ে, আরাম্‌সে ব্যবসা খোলা হয়ে যাবে। কি তাই তো?

জাকির সাহেব বাবার দিকে তাকালেন একবার ভ্রুকুঁচকে। বাবাকে নিরুত্তাপ দেখে, উনি বললেন – আপ যো সোচ রেহে হে, ও দারাসাল গলত হে। ... আমার ঘড়ির ব্যবসা এখনো ভালোই রানিং । ওষুধের ব্যবসা এখনো শুরু করতে পারিনি, কারণ মেনুফ্যাকচারিং কোম্পানিদের সাথে সমস্ত কথা শেষ হয়নি। ... উনারা ড্রাগ সাপ্লাই দিতে রাজি না হলে, পাতি ওষুধের দুকান খুলতে হবে। আর আমি চাইছি ডিস্ট্রিবিউটার হতে। তাই দেরি হচ্ছে।

শিকদার সাহেব – পোস্টমরটেম রিপোর্ট বলছে, মৌলবি সাহেবকে পটাশিয়াম সায়েনাইড দেওয়া হয়েছে। আপনার এই ড্রাগ লাইসেন্স তো আপনাকেই সন্দেহ করতে বাধ্য করছে জাকির সাহেব।

জাকির সাহেবের স্ত্রী এবার বললেন – ইয়ে সব আপ কেয়া বল রেহে হে? ... আপনে পিতাজিকা হি কাতিল কর দেঙ্গে ও!

সুমন্ত ডিটেকটিভ – আপনি তো জাকির সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী, তাই না?

ভদ্রমহিলা – হা।

সুমন্ত – আপনার প্রথম সন্তান হবার সময়ে, আমরা জেনেছি, কারুর আক্রমণ হয়েছিল?

ভদ্রমহিলা – ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু যিনি আক্রমণ করেছিলেন, তিনি এখন পালটে গেছেন, আল্লাহর মেহেরবানিতে।

সুমন্ত – তিনি আপনার স্বামীর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন, তাই তো? ... কেন করেছিলেন উনি এই আক্রমণ?

ভদ্রমহিলা – উনি মা হতে পারছিলেন না, সেই কারণেই ঝমেলা হো কে, উন দনো কি তালাক হউই থি। তো মেরে গোদ ভারি থি, উসিলিয়ে ...

সুমন্ত – আর তারই সন্তান হবার সমস্ত খরচ করেছিলেন, আপনার শ্বশুরমশাই। তাই রাগে, আপনিই বিষ দিয়েছেন। ... তাই তো?

ভদ্রমহিলা – সাহাব, সুলতানা ভাবিকে গোদ ভর যানে সে, কই আগার চেয়েন কি শ্বাস লে পা রেহি হে তো, ও মে হু। মে তো আব্বা কা আভারি হু। ... সিধা সোচিয়ে সাহাব। হামেশা টেরা কিউ সোচতে হে আপ?

শিকদার – আপনাকে এখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে ডাকা হয়েছে, প্রশ্ন করতে নয়। ... আপনারা যান, আর মৌলবি সাহেবের ছোট ছেলেকে ডেকে দিন।

জাকির সাহেব ও তাঁর স্ত্রী চলে গেলেন। ঘরে এসে ঢুকলেন, আমার বয়সই এক ছেলে। ঘরে ঢুকে, তাকে বসতেও দিলেন না শিকদার স্যার। সরাসরি চার্জ করলেন – বাবা বাইক কেনার পয়সা দিলেন না বলে, সরাসরি খুনই করে দিলে?

জাহির, মানে মৌলবি সাহেবের ছোট ছেলের চোখ ছলছল করে উঠলো। একটু রাগ নিয়েই বলে উঠলো সে – দেখুন পুলিশ বলে, যা মুখে আসবে আপনি বলে দিতে পারেন না। ... হ্যাঁ, বাইক দেন নি। ... বোঝাতেন, বকতেন। আমারও সব বন্ধুদের বাইক আছে বলে হুজ্জতি করতাম। কিন্তু এর জন্য নিজের আব্বাকেই আমি খুন করে দেব? ... শিকদার সাব, আপনার স্ত্রীও তো আপনার দ্বিতীয় ছেলে চাননি। আর সেই কারণে আপনি উনাকে খুন করে দিয়েছিলেন। আর নিজে পুলিশ বলে কেস ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই না!

শিকদার সাহেব নিজের টেম্পার হারিয়ে ফেললেন এবার। পুলিশ অফিসারের দাপট দেখিয়ে বলে উঠলেন – সেদিনের ছোকরা, শিকদারের উপর চোখ রাঙাবে?

জাহির – আপনার কথা আপনাকেই ফিরিয়ে দিয়ে দেখালাম, এমন কথা বললে কেমন লাগে। আর শুনেন শিকদার। আপনাদের মত দুদিনের পুলিশ অফিসারকে আমরা পরোয়া করিনা। ... আব্বা বেঁচে থাকতে, আপনিই তো আসতেন না আব্বার পা চাটতে। ... নর্দমার কিড়া শালে।

এই বলে ঘর থেকে চলে গেল জাহির। শিকদার দুদুবার চিৎকার করে উঠলো — আই শেড, স্ট্যান্ড দেয়ার। ইটস মাই অর্ডার। তোমার এই এটিটিউডের জন্য আমাদের সন্দেহ পুরোপুরি তোমার দিকে জাহির। আমি কিন্তু তোমাকে যেকোনো সময়ে এরেস্ট করতে পারি।

জাহির পিছন ফিরে তাকালো, আর কুট ভাবে বলল — আপনার ছেলে কোন স্কুলে পড়ে যেন? ... হা, ডনবস্কো না। ... চিনি আপনার ছেলে কে, আমাকে ও চেনে না। ...

শিকদার এই হুমকিতে তটস্থ হয়ে গেল। জাহির ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। ... রাগে গজগজ করতে করতে বললেন শিকদার — একদিন কাস্টডিতে নিয়ে, আচ্ছা করে ধোলাই দিলে, সব তেল বেড়িয়ে যাবে শালাদের।

সুমন্ত ডিটেকটিভ হুঙ্কার ছাড়লেন — মৌলবি সাহেবের মেয়ে জামাইকে পাঠিয়ে দিন।

ঘরে এলেন সেহেনাজ আর উনার স্বামী, নজির। চেয়ারে বসলেন নজির; স্ত্রী রইলেন দাড়িয়ে। শিকদার বললেন — সিসিটিভির ব্যবসা!

নজির — শুধু সিসিটিভি নয় স্যার, সিকিউরিটির সমস্ত কিছু, হাইডেল আর স্প্লিন্টলার সিস্টেমও।

শিকদার — শ্বশুরের পয়সায় নাপুরচুপুর করে, শ্বশুরের খুন করতে লজ্জা করে না!

নজির — কেয়া বোল রাহে হে সাহাব! ... আব্বা আমার নিজের আব্বা ছিলেন। ... আমার আম্মি জান্নাত চলে যাবার পর, আমার আব্বা দুসরা নিকা করে, তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। মৌলবি সাহেব আমাকে এই ব্যবসা করে দিয়ে, প্রথমে নিজের ব্যবসা আমাকে দেখভাল করতে বলেন। তারপর যখন পুরোপুরি ভাবে ব্যবসা শিখে গেলাম। তখন উনি আমার নামে এই ব্যবসা লিখে দিলেন। ... সাহাব, উনি আমার জন্য রসুল সে কুছ কম নেহি থে। ... তারপর উনি নিজে থেকেই আমার সাথে সেহেনাজের সাথে নিকা করালেন। ... আর এইটাই আমার পরিবার, আমার সব কিছু।

সুমিন্ত ডিটেকটিভ — কিন্তু সেহেনাজের তো প্রেমিক ছিল। আপনি জানেন?

নাজির — জি হা, পরে জেনেছি। সেহেনাজ নিজেই বলেছিল। ও ভি আজ, যো কুছ হে, সব কুছ আব্বা কেলিয়েই হে। ...ইয়েহি তো আব্বা কা সবসে বারা গুন থা। ... ও স্রেফ, এই পরিবারের সদস্যদেরই

নিজের পরিবার মানতেন না। সবাই উনার পরিবার ছিল। ... জাকির সাহাবের প্রথম স্ত্রীও উনার পরিবার। তাই জাকির সাহাবের সাথে উনার তালাক হবার পরে, আব্বা নিজে দায়িত্ব নিয়ে, সুলেমনের সাথে, মানে সেহেনাজের প্রেমিকার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। ... আর শুধু তাই নয়, রুকসানা ভাবির বাচ্চা নষ্ট করতে সুলতানা ভাবি এগিয়ে এলে, সকলে উনাকে ভুল বুঝলেও, আব্বা ভুল বুঝলেন না। ... উনি সুলেমনকে বলে, ভালো ডাক্তার দেখিয়ে, আইভিএফের পুরো খরচ দিয়ে, সুলতানা বেগমকে মা হতে দিলেন। ... এইসা রসুলকে সাথ হাম মে সে কইভি কুছ গলত নেহি কর সকতে স্যার।

সেহেনাজের দিকে এবার শিকদার তাকিয়ে বললেন – আব্বার উপর তো খুব রাগ হয়েছিল তাই না, যখন সুলেমানের সাথে তোমার নিকা না করিয়ে, নাজিরের সাথে নিকা করালেন।

সেহেনাজ – জি হয়েছিল। ... তবে নাজিরকে আমরা আগে থেকেই চিনতাম। ... আমাদের বাড়িতে খুবই আসতো সে। সুলেমান তখন আমার ভাইয়ের মতন একটু রগচটা ছিল। তাই আম্মি ওর সাথে আমার নিকা না হতে দেবার জন্য চেষ্টা করতেন। ... আমারও বয়স তখন কম ছিল, তাই একটু রাগ হয়েছিল। তবে নাজির যে সেরা ইনসান, সেই ব্যাপারে আমার কনো সন্দেহ ছিল না।

বাড়ির সকল সদস্যদের জেরা করা হয়ে গেলে, এবার বাড়ির বাইরের সদস্যদের জেরা করার জন্য দুইজনকে ডাকা হলো। প্রথম হলেন বাড়িতে যিনি রান্না করেন, তাঁকে; নাম সুহানা বেগম । আর পরে যিনি মৌলবি সাহেবের সেক্রেটারি ছিলেন, তাঁকে; নাম আব্রাম মণ্ডল। এঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মধ্যে কনো তেজ দেখতে পাওয়া গেল না। খালি সুহানা নামক বয়স্ক মহিলাকে একটু চাপ দেওয়ার চেষ্টা হলো, যাতে নিজে মুখে স্বীকার করেন তিনি যে তিনি বিষ দিয়েছেন খাবারে। আর আব্রামকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় যে এই কয়দিন যাবত মৌলবি সাহেবকে তিনি কেমন দেখছিলেন।

জেরার পর্ব সমাপ্ত করলে, বাবা বললেন – ব্যাস জেরা শেষ? নাকি আরো কিছু বাকি আছে?

শিকদার – শেষ ... আবার কি। ... এদের মধ্যেই কেউ একজন খুনটা করেছে।

সুমন্ত – হ্যাঁ স্যার, একদম ১০০% শিওর।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল, কারণ এঁদের সকলেরই খুন করার মোটিভ এতটাই ক্লিয়ার যে, আর অন্য কারুকে সন্দেহ করার কিচ্ছু পরেই থাকেনা। বাবা খালি একটা কথা বললেন সকলকে – মৌলবি সাহেব ছিলেন। অনেকের সাথেই জানা পরিচয় ছিল তাঁর। বাইরের লোকও তো এই কাজ করতে পারে!

শিকদার – কি যে বলেন আপনি? আরে সব কেসই কি আপনি যেমন তদন্ত করেন, তেমন বড় ধরনের কেস হয় নাকি? এসব ছোটমোটো কেস। এইরকম কেস আপনি হয়তো রিপোর্টার হিসাবে ফেস করেছেন, কিন্তু এই সমস্ত কেসের তদন্ত আপনি করেন নি। সম্পত্তির জন্য করা খুন। ব্যাস।

বাবা আর কথা বাড়ালেন না। দেখলেন গোয়েন্দা সুমন্তও বললেন – হ্যাঁ স্যার, আমার মনে হয় এই ছোট ছেলেটাই হবে। ওর রক্ত গরম।

শিকদার – হুম ছোটটাকে দুটো ডাণ্ডা দিলেই, ওর গরম চলে যাবে। কিন্তু আমার তো মনে হয় মৌলবি সাহেবের স্ত্রীই আসল কাণ্ডারি। এখনও রূপযৌবন আছে। আর যা আছে, তাতে লুকনো প্রণয় সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। সঙ্গে ভাইয়ের ব্যবসস্থা করার ব্যাপারটাও রয়েছে।

সুমন্ত – তাহলে স্যার, কাকে এরেস্ট করবেন?

শিকদার – দুদিন চুপ করে বসে থাকবো। মৌলবি সাহেবের খুন বলে কথা। মসজিদের লোকেরা হুজ্জতি করবেই, যদি কারুকে এরেস্ট না করা হয়। আর হুজ্জতির পর যাকে ধরা হবে, তাকেই সকলে দোষী মেনে নেবে। তখন ভাবা যাবে, কাকে আগে তুলবো, আর কাকে পরে।

আরো কিছু যেন বলার ছিল শিকদারের, কিন্তু বাবাকে ইশারায় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন সুমন্তকে। সুমন্ত আর প্রশ্ন করলেন না।

আমি আর বাবা সেদিন সেখান থেকে চলে এলাম। বাড়ি আসার পর জাকিরের ফোন এসেছিল বাবার কাছে – আপনি কিছু বললেন না তো?

বাবা – পুলিশ পুলিশের কাজ করছিল। আমার যা জানার, তা সেই জেরার থেকেই জেনেছি। তবে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, যা আমি পুলিশের সামনে করতে চাইছিলাম না। সেই প্রশ্ন করতে, কালকে বাড়িতে গেলে, সকলকে পাবো?

জাকির – হ্যাঁ, একটু সকালে চলে আসলে সবাইকে পেয়ে যাবেন। আমি আর নাজির দোকান খুলতে বাড়ি থেকে ১০টার আগে বার হই না। তবে আমাদের ছোট ভাইয়ের কনো ঠিক নেই।

বাবা – ও না থাকলেও হবে। অসুবিধা নেই।... ঠিক আছে, কাল সকালে দেখা হচ্ছে। আর হ্যাঁ, আমি যে কাল সকালে যাচ্ছি, সেটা পুলিশ বা গোয়েন্দাকে জানানোর প্রয়োজন নেই আগে ভাগে। ...

বাবার জেরা

বাবার জেরা করার স্টাইল তো আপনারা জানেন। উনি আলাদা আলাদা করে নয়, সকলকে একত্রে বসিয়ে একসঙ্গে কথা বলেন। তেমনই সকলকে একসঙ্গে বসালে, বাবা একবার চোখ বলালেন, আর দেখলেন বাড়ির সমস্ত সদস্যই আছেন। বাইরের লোকের মধ্যে, আব্রাম নেই, কিন্তু সুহানা আছে।

বাবা প্রথম কথা পারলেন – আচ্ছা নাজির সাহেব, আপনি তো গোয়েন্দা সুমন্তকে যোগাযোগ করেছিলেন, তাই না?

নাজির – হ্যাঁ স্যার।

বাবা – উনার হদিশ আপনাকে কে দিলো, বা কি সুত্রে পেয়েছিলেন?

নাজির – স্যার, আব্বার যেদিন মৃত্যু হয়, সেদিন আমার দোকানের এক পুরানো কাস্টমারের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজো হয়, সেখানে নেমন্তন্ন ছিলো। সেখানেই এই গোয়েন্দা নিজে থেকে এসে আলাপ করেছিলেন আমার সাথে, আর আমাকে উনার একটা কার্ড দিয়েছিলেন। ... আর স্যার, এই চত্বরে পুলিশ কি ভাবে কাজ করে, আমরা সবাই জানি। তাই কার্ডের কথা মনে পরতেই, আমি উনাকে কল করে, উনাকে এই কাজে এপয়েন্ট করি।

বাবা – হুম, আর আপনি যে অন্নপূর্ণা পুজোতে যাবেন, সেটা কারা কারা জানতেন?

নাজির – বাড়ির সকলে, দোকানের সকলে আর আমার দুইজন কাছের বন্ধু, সুলেমান আর ইমরান।

বাবা – সুলেমান মানে সেই না, যার সাথে জাকির বাবুর প্রাক্তন স্ত্রীর বিয়ে হয়েছে?

নাজির – হ্যাঁ স্যার। ও আমাদের খুব কাছের বন্ধু। শুধু আমার নয়, ও জাকিরেরও খুব কাছের বন্ধু। মাঝে জাকিরের সাথে ওর একটু মনমালিন্য হয়েছিলো, যখন সুলতানা বেগমের সাথে সুলেমান নিকা করে। তবে শেষে সুলেমানই জাকিরের সাথে আলাদা করে কথা বলে যে, আব্বা নিজে এই বিয়ে দেন, আর সুলতানার বাচ্চা হবেনা জেনে ও এই বিয়ে করেছে। ... তারপর আবার ঠিকঠাক হয়ে যায় সব।

বাবা – হুম। ... আচ্ছা আম্মি, আমাকে একটা কথা বলুন, আব্বার খাবার কি খালি বাড়িতেই হতো, না বাইরের কেউও কিছু দিতেন?

আম্মি – না, বাইরের কেউ না কেউ কিছু রোজই দেয়। কিন্তু উনি খান না। ... তবে রোজার সময়ে, ইফতারের ক্ষেত্রে, উনাকে যে যা দেন, একটু একটু করে চেখে নিতেন। বলতেন, আল্লাহর দান।

বাবা – হুম, তা সেদিন কে কে বাইরের লোক খাবার দিয়েছিল, মনে আছে?

আম্মি – আমার হাতে এসে দেয় না তো বাবা। এই সুহানার কাছে এসে দেয়।

বাবা সুহানার দিকে তাকাতে, সুহানা বেগম বললেন – সেদিন... বাইরে থেকে চারজন খাবার দিয়েছিল। একজন সাবনাম। আব্বুযানকে খুব ভালোবাসে ও। কম বয়সই মেয়ে, এই ১৫-১৬ বছর হবে। কিন্তু সব সময়ে আব্বুর কথা শুনে চলে। আর ও যখনই কিছু খাবার করে দেয়, তা রোজা হোক বা না হোক, আব্বু অবশ্যই সেই খাবার খান। ... এ ছাড়া খাবার দিয়েছিল, জাকারিয়া স্ট্রিটের মৌলবিসাহেব। ... উনি তো আম্মির হাতেই কোফতা দিয়ে গেছিলেন। ... আর দিয়েছিল, ইমরান আর সুলেমান।

বাবা – জাকারিয়া স্ট্রিটের মৌলবি সাহেব দিয়েছিলেন কোফতা। বাকিরা কি দিয়েছিলেন?

সুহানা একটু মনে করে – সাবনাম দিয়েছিল কিমার ঝাল। আর ইমরান দিয়েছিল ফিরনি। ... আর সুলেমান দিয়েছিল চাটনি।

এবার আবার নাজিরকে প্রশ্ন করলেন বাবা – আচ্ছা, আপনার তো সিসিটিভির ব্যবসা। তা বাড়িতে লাগান নি সিসিটিভি?

নাজির – জি, ঘরে তো লাগাই নি, আব্বার মত ছিল না, কিন্তু হা, আব্বাকে আমি রাজি করিয়েছিলাম যাতে উনি উনার বাইরের ঘরে সিসিটিভি লাগান। ... সেখানে আসলে অনেক মানুষ আসে আব্বার সাথে দেখা করতে। কার কি মতলাব ... বোলা যায় ... আপনি বলেন না।

বাবা – হুম, সে তো বটেই। ... চলুন না আমাকে একবার সেই ক্যামেরাটা দেখান।

আমাকে আর বাবাকে নিয়ে নাজির উঠে গেলে, বাবা সকলের উদ্দেশ্যে বললেন – আপনারা নিজের নিজের কাজে যেতে পারেন। আমার যা জানার ছিল, আপনাদের থেকে জেনে নিয়েছি। আমরা বসার ঘরে গেলাম। কি বিশাল ঘর! খিলান দেওয়া। প্রায় ৫-৬টা খিলান। একদম প্রথম খিলানে, একটা স্কুলের ডেস্কের মত ডেস্ক, তবে পা দেওয়া নেই, মাটিতে বসানো।

নাজির – এই টেবিল, মানে খাজাঞ্চি টেবিলের উপরের একটা ঘাজে গোপন ক্যামেরা ফিট করে দিয়েছিলাম। ...

কিন্তু যেখানে নাজিরসাহেব বললেন, সেখানে ক্যেমেরা নেই। ... নাজির একটু থতমত খেয়ে গেল।

বাবা – এর মেমরিটা কোথায়?

নাজির – টেবিলের ভিতরে। দাঁড়ান দেখছি।

সেখানে দেখলেন নাজির যে মেমরিটা রয়েছে। বাবা প্রশ্ন করলেন – আমাকে এই মেমরিটা দিতে পারবেন। আজকে রাতের মধ্যে চেক করে নিয়ে, আপনাকে কালকে আপনার দোকানে গিয়ে দিয়ে আসবো। ... চাঁদনীতে তো আপনার দোকান?

নাজির – জি, সেহেনাজ স্টোরস।

বাবা – আচ্ছা, এটা তো গোপন ক্যামেরা। আপনি আর মৌলবি সাহেব ছাড়া, আর কেউ কি জানতেন এর ব্যাপারে?

নাজির – জি নেহি। ... হা ইন্সটল করার শেষের দিকে, মানে যখন ক্যামেরাটা ফিট করছি, তখন আব্রাম ঘরে এসেছিল। ও হয়তো জানলেও জানতে পারে, তবে এই সব ব্যাপার ও বোঝে কম।

বাবা – ঠিক আছে। ... আর শুনুন, অন্য ভাবে নেবেন না। আপনার গোয়েন্দার থেকে একটু সামলে থাকবেন। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই খুনের কথা উনি জানতেন, আর জানতেন বলেই, আপনার সাথে যেচে পরে আলাপ করেন, যাতে আপনি ডাকেন উনাকে। ... এবার এই যেচে পরে আলাপ করার উদ্দেশ্য শুধুই নিজের ব্যবসা নাকি আরো অন্যকিছু, সেটা এখনই বলতে পারবো না। ... তবে মোটকথা এই যে, একটু সাবধানে থাকবেন উনার থেকে। শুধু ব্যবসার জন্য এলে, ঠিক আছে, নাহলে আপনাদের ক্ষতিও করে দিতে পারে।

বাবা ঘর থেকে বেড়িয়ে আসার সময়ে বললেন — আচ্ছা, আমাকে একটু সুলেমানের এড্রেসতা দিতে পারবেন? ... আর যেখানে অন্নপূর্ণা পুজো হয়েছিল, সেই এড্রেসটাও।

নাজির বাবাকে চেতলার সেই বাড়ির এড্রেস দিয়ে দিলেন, আর সুলেমানের বাড়ি আঙ্গুল দিয়েই দেখিয়ে দিলেন। তপসিয়া মোড়ের খুব কাছে। বাবা আমাকে নিয়ে প্রথম সুলেমানের বাড়ি গেলেন। সুলেমান তখন বাড়িতে নেই। উনার স্ত্রী সুলতানা বেগম ছিলেন। ... বাবা নিজের পরিচয় দিলেন, আর বললেন মৌলবি সাহেবের কেসের তদন্ত করছেন উনি। সুলতানা বেগম ভিতরে আসতে বললে, বাবা বললেন — আজ না, আপনি যেদিন চাটনি করে খাওয়াবেন, সেদিন আসবো।

ভদ্রমহিলা খুব রেগে গেলেন বাবার কথায়। বাবা বললেন — রেগে গেলেন না কি?

সুলতানা বেগম — আপনি কি আমাকে রান্নার খোঁচা দিতে এসেছেন এখানে। শুনুন, আব্বা আমার হাতের খানা খেতে খুব ভালো বাসতেন। চাটনি বানাতে পারিনা বলে, আপনি আমাকে চাটনির খোঁচা দিচ্ছেন!

বাবা হেসে বললেন — তা আপনার হাতের খানা মৌলবি সাহেব এত পছন্দ করেন, তো শেষ বেলায় আপনার হাতের খাবার খেয়ে গেলেন না কেন উনি?

একটু মুছরে পরে — আসলে, আমি একবার মনে মনে ওদের খুব ক্ষতি চেয়েছিলাম। আমি জাহির সাহাবের প্রথম সন্তানকে মেরে ফেলতে গেছিলাম। ... নিজের সন্তান না হওয়া, আর সেই কারণে তালাক হওয়ার জন্য, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। সেই গুনহার জন্য হয়তো, আল্লা আমাকে সাজা দিলেন। ... তাই শেষ বেলায়, আমার হাতের তৈরি ফিরনি না খেয়েই আব্বু চলে গেলেন।

বাবা — ঠিক আছে, আজ তবে আসি। অন্য একদিন আসবো।

বাবা যে কি চাইছে, আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। ... আর ফিরনি তো ইমরান দিয়েছিল না! ... সেটা সুলতানা বেগম বানালো কেন?... যাইহোক, ভাবার অবকাশ নেই। আমাকে নিয়ে বাবা চলে গেলেন চেতলা। সেই বাড়িও বড়। বাবা নিজের পরিচয় বিজয় সিংহ দিতেই, ভদ্রলোক বাবার সাথে দেখা করতে রাজি হয়ে গেলেন। বাবাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, উনি কি ভাবে কাজ করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর শেষে বললেন, আপনি কি এখানেও কনো কেসের ব্যাপারেই, নাকি?

বাবা – হ্যাঁ, একটা ছোট্ট জিনিস জানার ছিল। ... আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজোতো প্রতিবছর হয়। নিশ্চয়ই একটা নিমন্ত্রিতদের তালিকা থাকে।

ভদ্রলোক – হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

বাবা – একবার একটু দেখে বলবেন, এই নামের কারুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিনা? ... এই বলে, গোয়েন্দা সুমন্তের একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন বাবা। ...

ভদ্রলোক বললেন – দাঁড়ান আমাকে একটু মিলিয়ে দেখতে হবে। কার্ডটা আমি নিয়ে যেতে পারি কি?

বাবা – হ্যাঁ অফ কোর্স।

খানিকক্ষণ আমরা বসে রইলাম ঘরে। আমি বসে উনাদেরই দেওয়া কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছিলাম আর মাঝে বাবাকে প্রশ্ন করলাম, এই কার্ড উনি কি ভাবে পেলেন! বাবা বললেন – উঠতি গোয়েন্দা, পশার জমাতে চাইছে; কার্ড চাইতেই ধরিয়ে দিল হাতে। ভদ্রলোক বেড়িয়ে এসে বললেন – না মিস্টার, ইনি তো আমাদের এখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন না।

বাবা – আর মিস্টার নাজির। ...

ভদ্রলোক – সিসিটিভি!

বাবা – হ্যাঁ, হ্যাঁ। ...

ভদ্রলোক – আরে উনি তো আমাদের কতদিনের পুরনো বন্ধু। উনি নিমন্ত্রিত ছিলেন তো। এসেও ছিলেন উনি। কিন্তু উনাকে না খেয়েই চলে যেতে হয়; আসলে উনি খেতেই যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে উনার আব্বার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

বাবা – ওকে মেনি মেনি থ্যাংকস। আজ তাহলে উঠি।

রাস্তায় আসতে আসতে বাবাকে দেখলাম গভীর চিন্তনে মগ্ন। তাই কিছু বললাম না। আসলে আমার মাথায় প্রচুর চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আসলে আমি বাবার মত চিন্তন করতে পারিনা, তাই চিন্তাতেই আবদ্ধ থাকি। বাড়ি এসে স্নান খাওয়া করে, বাবার ঘরে আমি ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। বাবা সিগারেট জ্বালিয়ে ঘরে ঢুকলে,

আমি বাবার দিকে ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম। বাবার থেকে বেশি আমার মনের কথা আমিও জানিনা, তার প্রমাণ আমি অনেকবারই পেয়েছি। এবারেও তার ব্যতিক্রম নয়।

বাবা বললেন – কি ভাবছিস? বাড়ির লোকের খুন করার যথেষ্ট মোটিভ আর সুযোগ থাকলেও, আমি সেই দিকে কেন তাকাচ্ছি না, এই তো?

আমি – হ্যাঁ, আমি এটাই বুঝতে পারছি না। ... মৌলবি সাহেবের ছোট ছেলেকে না ছেরে দিলাম। খুনটা ঠাণ্ডা মাথার, আর জাহিরের মাথা গরম। তাই সে বাদ। কিন্তু বড় ছেলে আর জামাই! ... না খাবারে বিষ তারা মেশাবে কি করে! কিন্তু তাঁদের স্ত্রীরা তো তাঁদের কাজ করে দিতেই পারে। ... আর আম্মি! খুন করার সব থেকে বড় মোটিভ তো উনারই। মানে ... আমি একটা ফেলুদার গল্পে, এই আমির মটিভে খুন করেছে, তাঁর ভাই, মানে আততায়ী হলেন নিহতের শালা, আর তাও নিহতের স্ত্রীর নির্দেশে, এমন পড়েছি। ... তবে সেগুলোকে তুমি উড়িয়ে দিচ্ছ কেন?

বাবা একটা জবরদস্ত ভাবে সিগারেটে টান দিয়ে, নিজের ছোট্ট বিছনায় গা এলিয়ে বসে বললেন – পারিবারিক ক্ষেত্রে খুন হয়না, তেমন নয়। সম্পত্তির জন্যও খুন হয়, সেটাও উড়িয়ে দেবার বিষয় নয়। তবে সেই সম্পত্তির পরিমাণ হয় কয়েকশো কোটি টাকা। মৌলবি সাহেবের সম্পত্তির কাগজ তো দেখলি। জমিজমা, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, ঘরের মধ্যে ক্যাশ ব্যালেন্স, সবই তো দেখলি। ... সব মিলিয়ে কত হবে?

আমি - এই তিন চার কোটি হবে।

বাবা – চার ভাগে ভাগ হলে, এক কোটি টাকা করে।... এবার কথা হলো এক কোটি টাকা অনেক। ... হ্যাঁ, আমার তোর, সুমন্ত, শিকদারের কাছে অনেক। কিন্তু যারা জন্ম থেকে, বিয়ের পর থেকে এতো বৈভব দেখে এসেছে, তাদের কাছে নয়। ... যদি অঙ্কটা ১০০ কোটি হত, তবে নিশ্চয়ই পরিবারের লোককে সন্দেহ না করা মুর্খামি হতো। কিন্তু যখন অঙ্কটা ১ কোটি, তখন চোখকান বন্ধ করে যারা পরিবারের লোককেই সন্দেহ করছে, এবং দোষী সাব্যস্থ করার চেষ্টা করছে, তারাও আমার সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

আমি – মানে বলছো শিকদার আর সুমন্ত?

বাবা – হুম। ... তবে খুন তো তারা করেনি। ... কিন্তু সম্ভাবনা, যদি সত্যি থেকে থাকে, সেটা হলো খুনিকে মদত দেওয়া, আর যারা খুনি নয়, তাদেরকে ফাঁসিয়ে দেওয়া। ... প্রশ্ন হলো কেন?

আমি – সুমন্ত যেচে পরে নাজিরের সাথে আলাপ জমিয়েছিল। কিন্তু এর উদ্দেশ্য তো নিজের গোয়েন্দার ব্যবসাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও হতে পারে!

বাবা – প্রশ্ন এটা নয় যে, কি উদ্দেশ্যে আলাপ করলো নাজিরের সাথে সুমন্ত। প্রশ্ন এই যে, নাজিরের কাছে যে সেই রাত্রেই কেস আসবে, সেটা সুমন্ত জানলো কি করে? ...

আমি – মানে তুমি বলছো যে আততায়ী অত্যন্ত গোপনে কাজ করছে, আর তার অনেকগুলো হাতপা আছে। সুমন্ত তাদের মধ্যে একটা।

বাবা – হুম, কাজে তো লাগানো হচ্ছে, তবে কাজে লাগানোর অনেক ধারা হয় বুঝলি। কেউ সরাসরি টাকা দিয়ে কারুকে কিনে নিয়ে কাজে লাগায়। আবার কেউ অন্যের স্বার্থ কিছুতে জরিয়ে আছে দেখিয়ে, তাকে দিয়ে নিজের প্রয়োজনের কাজটা করিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, যেই ব্যক্তিকে কাজে লাগানো হয়, সেই ব্যক্তি নিজেও বুঝতে পারেন না যে তাঁকে কাজে লাগানো হয়েছে। ... সুমন্তের ক্ষেত্রে কোনটা, সেটা একটু ক্ষতিয়ে দেখতে হবে। ... তবে তার আগে, আমাকে একবার পার্কসার্কাস যেতে হবে, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, মসজিদে ঢুকে | কিছু জিনিস জানার আছে। ... মসজিদে মহিলাদের সাধারণ ভাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাই তোকে ঢুকতে দেবেনা। তাই, আমিই ঘুরে আসছি।

আমি – কিন্তু বাড়ির লোক কি কনোভাবেই ইনভলভড় নেই?

বাবা – থাকলেও অজ্ঞাত ভাবে। ... মানে ধর, খাবারে বিষ দেওয়া আছে, বাড়ির লোক জানেও না যে তাতে বিষ আছে, কিন্তু সেই খাবার খেয়েই বিষক্রিয়াতে খুন হলেন ভদ্রলোক, এই রকম ভাবে ইনভলভড়।

আমি – তুমি এতো শিওর কি করে হচ্ছ, আমি বুঝতে পারছি না। গোয়েন্দা না ছেরেদিলাম, ওর ইন্টারেস্ট কিসে, বোঝা যাচ্ছেনা। ইন্সপেক্টরও তো বাড়ির লোকেরই কারুকে সন্দেহ করছে, তাই না।

বাবা পার্কসার্কাস যাবেন বলে ড্রেস পরছিলেন। গায়ে জামাটা চাপিয়ে বোতাম লাগাতে লাগাতে বললেন – বিষটা পটাশিয়াম সায়েনাইড। ওষুধের দোকান কেন, ওষুধের ম্যানুফ্যাকচারার কাছেও থাকেনা। ... হাই লেভেলের ইনফ্লুয়েন্সিয়াল না হলে, এই বিষ আনানো অসম্ভব। ... অর্থাৎ?

আমি – অর্থাৎ এই সমস্ত কিছুর পিছনে কনো কেউ প্রচণ্ড পাওয়ারফুল ব্যক্তি রয়েছেন!

বাবা আর কিছু বললেন না। মুচকি হেসে চলে গেলেন। আমিও কেমন যেন একটু বোকা বনে গেলাম, যেরাকম সবসময়েই হই। ... সহজ সহজ জিনিসগুলো ছেড়ে, আমরা বড় বড় জিনিসগুলোতে বড্ড হাতরাই, আর সেখানেই আমরা নিজেও ঘেঁটে যাই, আর অন্যকেও ঘেঁটে দিই। ...

সম্পূর্ণ নিমজ্জিত

বাবা চলে গেলে, আমি অনেক কিছু ভাবার চেষ্টা করতে করতে ঘুমিয়ে পরি। ঘুম ভাংলো বাবারই কণ্ঠস্বরে। চোখ মেলে দেখি, প্রায় দুইঘণ্টা ভাতঘুম দিয়ে ফেলেছি।

চোখ মেলে দেখি, বাবা ফোনে কথা বলছেন – ইন্সপেক্টর বালা, আপনার নম্বরটা আমি সিয়াইডি চিফ, রথিনের থেকে পেয়েছি। আমি বিজয় সিংহ।

অন্যদিকের কথা কিছু হয়, তার উত্তরে বাবা – হ্যাঁ, আমি সেই বিজয়ীয় সিংহই।

আবার অন্যদিকের কিছু কথা। তারপর বাবার কথা – হ্যাঁ আমার একটা জিনিস দরকার, সেটা হলো আপনার এলাকায় একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছে, নাম সুমন্ত... এজেন্সির নাম সুপার ইনটেলিজেন্ট। ... সাধারণত প্রেমিক প্রেমিকার তদন্ত করে থাকে।

অন্যদিকের কথার উত্তরে বাবা – হ্যাঁ, ওকে। ... আমার জন্য একটি কাজ করে দিন যে, যেকোনো উপায়ে, আমার নাম না করে, উনার থেকে লাস্ট একটি মাসে উনার চেম্বারে যা সিসিটিভিতে রেকর্ড হয়েছে, সেটার একটা কপি লাগবে।

আবার অন্যদিকের কথার উত্তরে বাবা – অনেক ধন্যবাদ।... এই নম্বরটা শেভ করে রাখুন। কপি পেয়েগেলে, আমাকে একটু ফোন করে দেবেন, আমি আপনার থানায় গিয়ে আপনার থেকে ওটা কালেক্ট করে নেব। ... আর হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি করবেন। একটা বড় ধরনের ক্রাইম আটকানোর জন্য ওটা খুব প্রয়োজন।

আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না আর। আসলে বাবা যখন বড় বড় যায়গায় চলে যান, তখন আর আমার ফেলুদা ব্যোমকেশ সার্লকহোমস কাজ করেনা। ... তবে ইচ্ছা হলো বাবাকে একটা প্রশ্ন করি। বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন – ঘুম থেকে উঠে পরেছিস? ... হুম, তোর কাজ আছে। সময় হলে

বলছি। সন্ধ্যায় আমি একজায়গায় যাবো, সেখানে তোকে নিয়ে যাবো না। ... কারণটা এই যে, তোকে সেখানে আবার যেতে হবে। তাই তোর মুখটা অপরিচিতই থাকতে হবে।

আমি বললাম – ক্রাইম আটকানোর জন্য, এমন কেন বললে? ক্রাইম তো অলরেডি হয়ে গেছে!

বাবা – যেটা হয়েছে, সেটা আসল ক্রাইমের তথ্য ফাঁস হওয়া রোধ করার জন্য করা হয়েছে মাত্র। আসল ক্রাইমটা অনেক বড়। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদেরকে। নাহলে ওই জঘন্য ক্রাইমটা আটকানো যাবেনা।

আমি – তোমার কি কেস শলভ করা হয়ে গেছে?

বাবা – প্রমাণ হাতে যা লেগেছে, তাতে ডালপালাকে ধরা যাবে, আসল মাথা অচ্যুতই থেকে যাবে। আর তা যদি হয়, তবে ক্রাইমটাকে আটকানো যাবেনা। তাই যা করতে হবে, খুব ফাস্ট। ...

মা ঘরে ঢুকে বললেন – হ্যাঁ গো রাত্রে আজ কি রান্না করি বলো তো?

বাবা – যা করবে, তোমাদের জন্য করো। আমার আজকে রাত্রে ফিরতে দেরি হবে। বাইরে খেয়ে নেব।

মা – চা চাপিয়ে দিই তাহলে?

বাবা – চা... হুম ... হলে মন্দ হয়না। ... বিস্তর কাজ। ... একটু এনার্জিও দরকার। ... চাপিয়ে দাও।

বাবা রেডি হয়ে নিলেন। একটা ব্যাগ নিলেন পিঠের। তাতে একটা পোশাক ঢুকিয়ে নিলেন। বাবার সাথে এই কয়দিন থেকে এটুকু বুঝে গেছি যে পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। আমি বললাম – ছদ্মবেশ ধরতে হবে না কি?

বাবা – হুম... আচ্ছা একটা কথা বল তো, ছদ্মবেশ কখন ধরতে হয়?

আমি – যখন গোপন খবর সংগ্রহ করতে হয়, বা গোপন কাজ করতে হয়।

বাবা – কার থেকে গোপন?

আমি – যেকোনো কারুর থেকে।

বাবা – আজ্ঞে না। যদি যার থেকে গোপন করতে হবে, সে নিজে বা সে যার ইনফরমার, এঁদের কেউ অত্যন্ত ইনফ্লুএন্সিয়াল হয়, তখনই ছদ্মবেশের প্রয়োজন। ... কেন?

আমি এবার একটু ভেবে বললাম – গোপনীয়তা যাতে সময়ের আগে না ভাঙে, সেই জন্য?

বাবা – হুম, রাইট।

বাবা আর কিছু বললেন না। চা খেয়ে বেড়িয়ে পরলেন। তবে এটুকু আমাকে বলে দিয়ে গেলেন যে এই কেসে সতর্কতা অবলম্বন খুব আবশ্যক কারণ প্রতিপক্ষ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল।

বাবা যতক্ষণ না ফিরলেন, ততক্ষণ আমরা কেউই ঘুমাই নি। বাবা ফিরলেন, তখন প্রায় রাত্রি একটা। বাবা ঘরে এসে মুখ হাতপা ধুয়ে একটু বসলেন। মা বললেন – শুয়ে পরো, অনেক ধকল গেছে। যা কথা কাল সকালে উঠে হবে।

বাবা – হুম, মিলিকে একটা কাজ বুঝিয়ে দেবার আছে। সেটা করেই শুয়ে পরছি।

আমি জানি, বাবা জানেন আমার মনে কি চলছে; যতক্ষণ না সেই তুফান শান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ আমার ঠিক করে ঘুমও আসবে না। তাই মাকে কাটিয়ে দিলেন। ... আমি বললাম – কি হলো? কি করলে?

বাবা – কি করলাম! ... (একটু হেসে) আশা করা যায়, কাল খবরের কাগজ দেখলেই আন্দাজ পেয়ে যাবি। শিকদারকে একটু চাপ দেওয়া হলো, আর আততায়ীকে একটু ভিম্রি খাইয়ে দেওয়া হলো। ... শোন, তোর জন্য একটা কাজ আছে। ... একটা এড্রেস দিচ্ছি, সেখানে কালকে বেলার দিকে গিয়ে তোকে বলতে হবে যে, রথিন বাবুর একটা কাজের জন্য শিবু পেমেন্ট পায়। তাই শিবুর একাউন্ট নম্বরটা লাগবে। ... শিবুর মা সেখানে থাকবে। উনি তোকে দিয়ে দেবেন। ... রথিনের সারনেমটা নেবার দরকার নেই, আর নিবিও না। শুধু একাউন্ট নম্বরটা নিয়ে চলে আসবি।

বুঝতে কিছুই পারলাম না, তবে এটুকু বুঝে গেছি যে বাবার কেস শলভ করা হয়ে গেছে, শুধু প্রমাণ সংগ্রহ করছেন, আততায়ীকে ধরার জন্য। ... আমি বললাম – ওই সিসিটিভিটা, যেটা নাজির দিয়েছিল, তার থেকে কিছু পেলে?

বাবা – সমস্তই পেয়ে গেছি। ... তুই দেখলে দেখাতেও পারি, আমি কপি করে রেখে দিয়েছি। তবে যদি চাস নিজের থেকে বোঝার চেষ্টা করতে, তাহলে দেখিস না ভিডিওটা।... সাসপেন্সটা পুরো চলে যাবে।

আমি – আর সুমন্তের ভিডিও?

বাবা – হ্যাঁ, কি করে আগে থেকে জানতো ও এই খুনের ব্যাপারে, সেটা পরিষ্কার। ... দুইজনকে এখনও ম্যাপ করা যায়নি। কাল তুই একাউন্ট নম্বরটা নিয়ে এলে, আশা করা যায় খানিকটা এগিয়ে যাবে এই দিকটাও।... নে এখন শুয়ে পর, নাহলে মা এসে মুখ ঝামটা দেবে।

শুয়ে পরলাম। পরের দিন ঘুম ভাঙলো মায়ের কথাতে। টিভির আওয়াজ, মায়ের কথা, আর বাড়িতে সকালে যেই কাজের পিসি আসে, তার কণ্ঠস্বরে ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙতেই মনে পরলো, শিবুর বাড়ি যেতে হবে। তড়িঘড়ি উঠে বাবার সন্ধান করতে, জানলাম বাবা কোথাও একটা বেড়িয়ে গেছেন। পুরপরি ভাবে কেসের মধ্যে বাবা ঢুকে গেছেন। একটু সিরিয়াসও বাবা। ...

মা বললেন – হ্যাঁরে, তোরা পার্কসার্কাসের মৌলবি খুনের মামলার তদন্ত করছিস না!

আমি – হুম, কেন?

মা – আরে উনি তো খুন হননি। কালকে উনার অপহরণ হয়েছে। কনো মুসলিম লোক, উনাকে গাড়িতে করে নিয়ে চলে গেছেন দেখা গেছে। ...

আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালে, মা আবার বললেন। ধাপার মাঠের কাছে সেই ওলা গাড়িকে ছেড়ে দেওয়া হয়, ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে জানা গেছে। ... তারপর আততায়ী মৌলবিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন, কনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছেনা।

আমি কিছু বললাম না। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার মাথা পুরোপুরি ঘেঁটে যাচ্ছে। কি হচ্ছে এসব! বাবাও কাছে নেই যে উনাকে প্রশ্ন করবো? ... কি মনে হলো, বাবা কাল রাত্রে যেই ব্যাগ নিয়ে গেছিলেন, সেই ব্যাগ সার্চ করলাম। কিচ্ছু নেই ব্যাগে। ... কি হচ্ছে এইসব। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে, শিবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে গেলাম। কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু ভাবছিলাম না। ভাবতে গেলেই কেমন সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল।

শিবুর বাড়ি গেলাম, যেমন বাবা বলে দিয়েছিলেন, তেমনই বললাম। বেশি কথা হয়নি। সহজ কথাতেই, একটা এসবিআই এর একাউন্টনম্বর ধরিয়ে দিলেন, শিবুর মা। বাবা বলে দিয়েছিলেন প্রশ্ন করতে। তাই প্রশ্ন করলাম, কোন ব্রাঞ্চ।

উত্তর এলো – এই তো কালীঘাট ব্রাঞ্চ।

আমি চলে এলাম বাড়িতে। বাবাকে দেখলাম আমার অপেক্ষা করছেন, আর ঘরে পায়চারি করছেন। আমি ঘরে এসেই ঘাম মুছতে মুছতে বললাম – মৌলবির অপহরণ হয়েছে, দেখেছ?

বাবা – হুম শুনলাম।

আমি – এর মানে কি?

বাবা – একাউন্ট নম্বরের পরীক্ষা করে বোঝা যাবে, কি হচ্ছে ব্যাপারটা।

আমি এমনিই ঘেঁটে ছিলাম, বাবা যেন আরো ঘেঁটে দিচ্ছেন। একাউন্ট নম্বরের সাথে একটা মরা মানুষের অপহরণের কি সম্পর্ক? কথা না বাড়িয়ে, একাউন্ট নম্বর আর ব্রাঞ্চ বলে দিয়ে, স্নানে গেলাম। স্নান থেকে এসে দেখলাম, বাবা আবার বেড়িয়ে গেছেন। একটু হতাশ লাগছিল। মা বোধহয় ব্যাপারটা বুঝেছেন । তাই সান্ত্বনা দিতে এলেন। বললেন – বাবা একাএকা চলে যাচ্ছেন, তোকে না নিয়ে?

আমি – বড় কেস ছাড়া বাবা হাত দেন না, আর বড় কেস হয়ে গেলে, আমি নিতে পারিনা। মাথায় সমস্ত চরিত্রই ধরাতে পারিনা। ... চিন্তার রেঞ্জেই আসে না, কোন দিকটা কে নিয়ে ভাববো, আর কোনটাকে নিয়ে নয়।

মা – হয়ে যাবে আসতে আসতে। ... বাবা তো কেসের নিষ্পত্তি বলেন সকলকেই আশা করি!

আমি – হ্যাঁ, তখন সমস্ত ক্লিয়ার হয়, তিনি কখন কোথায় কোথায় গেছিলেন, কি কি করেছিলেন, সব কিছু। তার আগে সবটাই ধুয়াশা।

মা – হুম, সেটার কারণেই তো উনি এতো সকলের কাছে রিলায়েবেল। ভেবে দ্যাখ, যদি কাছের মানুষটাই কিছু বুঝতে না পারে, তবে আসামি বা আততায়ী তো ভিগ্রি খাবেই। আর সেই জন্যই তোর বাবার জালে আসামি ধরা পরে যায়। ...

আমি – কিন্তু আমি যে ...!

মা – বাবা যেই ভাবে নিষ্পত্তি করেন কেসের, সেটাকে ভালো করে ফলো কর। বাবা কি ভাবে হিসাব করেছিলেন কেস শলভ করার জন্য, সেটা মেলা; কি ভাবে কেসকে ছোট যায়গা থেকে বড় যায়গায় ছড়ালেন, আর কি ভাবে সেটা গোটালেন, সেটার অঙ্ক কশ। ... তুই তো কেস শেষ হয়ে গেলেই, গায়ে এলা দিয়ে পরে পরে ঘুমোস। একটা কেসের পর অন্য কেস আসার সময়টা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে না নষ্ট করে, সেই সময়ে বাবার কেস শলভ করার মেকানিজিমটা ফলো কর। ... যেই কেস নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, সেই কেস নিয়ে তোর বাবাকে প্রশ্ন করলে, সব সময়ে উনি উত্তর দেন। প্রশ্ন কর, যেখানে আটকে যাচ্ছিস। আর কেসটাকে বাবার মত করে, নিজে নিজে শলভ করার প্র্যাকটিস কর। ... দেখবি অনেকটা এগিয়ে যাবি।

আমি – হুম, তপসে আর জটায়ুকেও বেড়ে উঠতে হয়, নাহলে ভাবো কাঠমুন্ডুর কেস তো ফেলুদা শলভই করতে পারতো না!

মা – হুম, দরকার তো। বড় বড় কেসে হাত দেন। শত্রুও বড় বড়, বেশ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। কখন ফেঁসে যাবেন, কেউ বলতে পারে! ... তুই তৈরি না হলে, একটা রিস্ক থেকেই যায়।

মা চলে গেলেন রান্নার ঘরের দিকে। চুপ করে ভাবলাম। মা ঠিকই বলেছেন। কেস শলভ হয়ে গেলেই কেমন যেন গা এলিয়ে দিই। সেই সময়টাই আমার কাছে বেড়ে ওঠার প্রাইম টাইম। আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময়টা নষ্ট করি। যদি না করতাম, এটা আমার বাবার সাথে সাতনম্বর কেস। বাবা তো না বললেও, বাবা কোন দিকে এগচ্ছেন, আমার একটা আন্দাজ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু না, কনো আইডিয়াই নেই।

বাবা ফিরলেন বিকেল বিকেল। একটাও কথা বললেন না। চুপ করে, টানটান হয়ে নিজের বিছনায় শুইয়ে পরলেন। চোখ বন্ধ, কিন্তু ঘুমাচ্ছেন না। একবার খালি কিছু প্রশ্ন করতে গেলাম, মায়ের হাত আমার কাঁধে। ঘুরে তাকালাম, মা পাশের ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন – কেস শলভ হয়ে গেছে। পুরো ঘটনাকে চোখের সামনে ভাসাচ্ছেন। কালই হয়তো সবাইকে ডেকে, কেসের নিষ্পত্তি করবেন। এখন উনাকে একা থাকতে দে।

কিছু বললাম না, কিন্তু মনে মনে একটাই কথা চলল। বাবার কেসে আমি সঙ্গে থাকি, তবুও আমি বাবার গতিবিধি কিচ্ছু বুঝিনা, কিন্তু মা কি করে বোঝেন?

সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে বাবা বললেন – আমি একটু বাইরে যাবো। বেশি দেরি হবে না ফিরতে। ফিরতি পথে খাবার কিনে আনবো। রাত্রে রান্না করতে হবে না কারুর। ...

মা – কনো মিটিং?

বাবা – হুম মুখ্যমন্ত্রীর সাথে, আর সিয়াইডি টিমের সাথে। ... রথিনই এরেঞ্জ করেছে সবটা। ...

মা – কেসের নিষ্পত্তি কবে?

বাবা – মুখ্যমন্ত্রী রেডি থাকলে, কালই। ... সিয়াইডি টিমের সহযোগও লাগবে। তাই এই মিটিংটা।

মা হেসে বললেন – ঠিক আছে। ... মিলিকে নিয়ে যাবে না!

বাবা – না, একটু গোপনীয়তা প্রয়োজন। এই কেসের জটটা একটু বেশিই গভীর, আর জটের মধ্যে যারা রয়েছে, তারা পশুরও অধম। আমি একা মুভ করছি বলে, আর ছন্নছাড়া ভাবে মুভ করছি বলে ওরা বুঝতে পারছেনা যে আমি কেসের জন্যই ছোটাছুটি করছি কিনা। ... কিন্তু মিলি সঙ্গে থাকলে, ওরা বুঝেও যাবে, আর মিলিকে আমার দুর্বলতা করে আমার উপর আক্রমণও করবে।

মা – হুম, আসলে ওরা কনফিডেন্ট যে ওদের কেউ ধরতে পারবে না; যদি তা না হতো, তবে তোমার উপর সন্দেহ আসতোই ওদের।

বাবা – একদম ঠিক, আর ওদের এই কনফিডেন্সটাই আমার জন্য সুরক্ষা কবচ। কিন্তু মিলি থাকলে, ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। আর এরা এমনই পশু যে, একবার এরা সতর্ক হয়ে গেলে, আমি বা মিলি, আমাদের সকলকেই আত্মসাৎ করে নিতে, এদের দুই দণ্ডও দেরি হবেনা।

বাবা আর কথা বাড়ালেন না। আর মা কেন বাবাকে আমার ব্যাপারে প্রশ্নটা করলেন, আমি বুঝে গেছি। আমার মধ্যে, আমাকে যে বাবা নিয়ে যাচ্ছেন না, সেই নিয়ে যেই ক্ষোভ জন্মাচ্ছিল, মা বাবার নিজমুখের কথা দিয়েই আমাকে সেটা শুনিয়ে শান্ত করে দিলেন।

বাবা ফিরলেন রাত্রি প্রায় ৯টা হবে। সঙ্গে আরসেলানের থেকে বিরিয়ানি নিয়ে এসেছেন। জমিয়ে খেলাম সকলে মিলে। খেতে খেতেই বাবা বললেন, কাল সকাল ৮টায় মৌলবি সাহেবের বাড়ি হলো আমাদের গন্তব্যস্থল। মিলি... ল্যাপটপটা নিয়ে যাবি। একটাই ভিডিও ডেস্কটপে আছে, ওটা চালাতে হবে। চালাতে বললে চালাবি, পজ করতে বললে, পজ করবি। ঠিক আছে?

আমি বাধ্য মেয়ের মত কথা শুনলাম। রাত্রে শুয়ে, সকাল সকাল উঠে স্নান করে রেডি। বাবা আমার থেকে আগেই রেডি। আমাকে নিয়ে আমাদের স্করপিও গাড়ি করে চলে গেলেন উনি। বাইপাস ধাবার সাইড দিয়ে ইএম বাইপাসে উঠে, মা ফ্লাইওভার না ধরে, সায়েন্সসিটির ধার দিয়ে, তপসিয়া হয়ে, মৌলবি সাহেবের বাড়ি। সামনে অনেক গুলো গাড়ি। বাবা গাড়ি পার্ক করতে, রথিন কাকু এগিয়ে এসে বললেন - সকলে হাজির। ...

বাবা – প্রজেক্টর?

রথিনকাকা – অল সেট। ল্যাপটপ কানেক্ট করলেই হবে।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে – ল্যাপটপটা প্রোজেক্টরের সাথে কানেক্ট করে, ভিডিওটা খুলে রেডি রাখবি। চালাতে বললেই চালাবি।

আমি, বাবা আর রথিনকাকা ভিতরে চলে গেলাম। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে, বাবা প্রশ্ন করলেন – রথিন উনি দেখছেন?

রথিন কাকা – হ্যাঁ সেট করা আছে। আমাদের কাজ শুরু হবার আগে একটা কল করে বলে দিতে হবে। উনি লাইভ দেখবেন সমস্ত কিছু।

বাবা – ওকে, ভেরি গুড।

আমরা ভিতরে চলে গেলাম।

হাতে হাতকড়া

ভিতরে ঢুকে, মৌলবি সাহেবের বাইরের ঘরের দিকে গেলাম আমরা। সকলেই সেখানে ছিলেন। আবার অনেকে সেখানে ছিলেন, যাদেরকে আমি চিনিও না। ... বাবা ধীরকণ্ঠে রথিনকাকাকে বললেন – মৌলবি সাহাব!

রথিন কাকা – আছেন, পাসের ঘরে।

বাবা এবার একটু গলা খাকরে শুরু করতে গেলেন, উনার কেসের বিবৃতি। কিন্তু শুরুতেই বাঁধা। এসে হাজির হলেন শিকদার। রথিনকাকার উদ্দেশ্যে বললেন – স্যার, এতো নাটকের কি প্রয়োজন ছিল? আমি তো কেস শলভ করে ফেলেছি।

রথিন কাকা – আচ্ছা? কে খুনি?

শিকদার – মৌলবি সাহেবের স্ত্রী। আজকে এই মিটিং ডাকা না হলে, আজই আমি এরেস্ট করতাম উনাকে।

বাবা – আর এই এরেস্ট করার জন্য কত টাকা পেয়েছেন? ২ লাখ?

শিকদার – কি আজে বাজে কথা বলছেন? আপনাকে আমাদের ডিপার্টমেন্ট পছন্দ করে বলে, আপনি যা মুখে আসবেন তাই বলেবন?

বাবা একটা মুচকি হেসে – শিবুর থেকে নিয়েছেন তো?

শিকদারের এবার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আসলে বাবার নামই শুনেছেন উনি। বাবার বুদ্ধির দাপট উনি কনোদিন সামনাসামনি করেন নি। ... বাবা বললেন – হজম করে ফেলেছেন না গচ্ছিত আছে?

শিকদার – আছে।

বাবা – জলদি গিয়ে নিয়ে আসুন। ... মুখ্যমন্ত্রী সবটা লাইভ দেখছেন। যদি না দেখা যায় টাকা, তাহলে আপনার চাকরি যেতে পারে।

শিকদার একটু ভয় পেয়ে গিয়ে – এখনি আসছি।

বাবা – একা যাবেন না, সিয়াইডি অফিসার আপনাকে নিয়ে যাবে, আর আপনার ফোন এখানে থাকবে।

শিকদার নিজের পকেট থেকে দুটো ফোন বাবার কাছে দিয়ে, সিয়াইডি অফিসারের সাথে চলে গেলেন। ফিরে এলেন প্রায় ১৫ মিনিট পর। উনি এসে গাড়ি থেকে নামছেন, সেই সময়ে রথিন কাকা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এই ঘরে একটা অডিওভিজিয়াল রেকর্ড করার ক্যেমারা লাগানো, সেটাকে জুরে দিলেন। এখন উনি সবটা লাইভ দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু সেটা আমি, বাবা, রথিনকাকা, আর শিকদার ছাড়া কেউ যানে না।

ঘরের মধ্যে অনেকে রয়েছেন, আর তাদেরকে ঘিরে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী, আর একটা প্রায় ২০ জনের সিয়াইডি টিম। বাবা সব দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে আব্রামের কাছে গেলেন বাবা, আর বললেন – শেষ রক্ষে তো হলো না মিস্টার আব্রাম?

আব্রাম সেই কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন – স্যার, আমি কুছ নেহি করেছি। ...

বাবা – ও তাই? ... রথিন?

রথিনকাকা হাঁক পারলেন – শুভ!

একজন সিয়াইডি অফিসার সামনে এগিয়ে এসে বাবার হাতে একটা কালো রঙের কিছু দিলেন। বাবা সেটা আব্রামের দিকে দেখিয়ে বললেন – কি আব্রাম সাহেব? আপনার বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে। চিনতে পারছেন তো? ... লোভ খুব ভালো জানেন তো, মানুষকে কর্মঠ করে দেয়। কিন্তু অতি লোভ! ভয়ঙ্কর। মৌলবি সাহাব তো আপনাকে আপনার মেয়ের বিয়ের পুরো ৫ লক্ষ্য টাকাই দিচ্ছিলেন। তারপরেও কেন?

আব্রাম – স্যার, আমি খুন করি নি। বিশ্বাস করুন। আমি খুন করি নি।

বাবা – জানি আপনি খুন করেন নি। কিন্তু যিনি খুন করেছেন, তার সঙ্গ তো দিয়েছেন। তাকে সাহায্যও করেছেন, আর তার সাথে দরকষাকষিও করেছেন। ... আরে আব্রাম সাহাব, যদি দরকষাকষিটা না করতেন, তবে আপনার ঘর থেকে এই ক্যামেরাটা পাওয়া যেতনা, কারণ আপনি তো সেটা তাকে দিয়েই দিতেন। ... কিন্তু পুরো ৫ লাখ হাতানোর লোভে, নিজের কাছে ক্যামেরাটা রেখে দিয়ে, নিজের গুনহার প্রমাণ দিয়ে দিলেন। এবার আপনার মেয়ের বিয়ের কি হবে জানিনা, তবে আপনাকে তো জেল খাটতেই হবে। ...

আব্রাম সরাসরি বাবার পায়ে পরে গেলেন – স্যার আমাকে বাছান স্যার। আমি কিছু করিনি। ... আসলে আসলে ...

বাবা – আসলে, মৌলবি সাহাব ৫ লাখ টাকা দিলে, সেই টাকা আপনাকে তো ফেরত দিতে হতো। হ্যাঁ, ফেরত দেবার জন্য কনো নির্দিষ্ট সময় থাকতো না, কিন্তু ফেরত তো দিতে হতো। ... সেইখানে ২ লাখ টাকা আপনার কাছে এমনিই এসে গেল, যেটা ফেরত দিতে হবেনা। আর তাকে চাপ দিলে যদি ৫ লাখই চলে আসতো, তবে তো পোয়াবারো। পুরোপুরি মুফতে মেয়ের বিয়েতা হয়ে যেত, কি তাই না!

বাবা আবার হেসে বললেন – আব্রাম, ফালতু ফালতু কেসটা আপনি খেলেন। আপনি জানেন, যদি আপনি এই ক্যামেরাটা যে আপনার থেকে চেয়েছিলেন, তাকে দিতেন, তাহলে আপনাকে মরতেও হতে পারতো! ... জানেন না তো? ... আব্রাম, এটা শুধু ক্যামেরা, এতে মৌলবি সাহেবের সাথে খুনির যেই কথা হয়েছে, সেসব কিচ্ছু নেই। সেইসব যাতে আছে, সেটা হলো মেমরি, আর সেটার ব্যাপারে তো আপনি জানেনই না। তাই সেটা আপনি নেনও নি। ... একবার ভেবে দেখুন, ওই ভিডিওতে যেই কথা আছে বলে, আপনি সেই খুনিকে সতর্ক করলেন যে ক্যামেরাতে সব বন্দি হয়ে গেছে। কি কথা হয়েছিলো, আপনি জানেন তো? বুঝতে পারছেন তো, কতটা ডেঞ্জারাস লোকটা! ... কি মনে হয়, মেমরি না দিলে, আপনাকে জ্যান্ত ছেড়ে দিতো?

বাবা এবার আব্রামের থেকে মুখ সরিয়ে, গোয়েন্দা সুমন্তের কাছে গিয়ে বললেন – আপনিই বলুন না, ছেড়ে দিতো সে? ... আপনাকেও তো সে শাসিয়ে টাকা দিয়ে এসেছিল। তাই না! ... দুই লাখ টাকা! ...

গোয়েন্দা সুমন্ত বাবার দিক থেকে এবার চোখ নামিয়ে নিলেন। বাবা উনার কাঁধে হাত রেখে বললেন – গোয়েন্দা আপনি, একটা শাসানি তে ভয় পেয়ে গেলে কি করে চলবে বলুন তো? ... একটা শাসানি তে, সরাসরি চেতলা চলে গেলেন বিনা নিমন্ত্রণে; সেখানে গিয়ে নাজিরের সাথে দেখা করে নিজের কার্ড দিয়ে এলেন। (হেসে) ডিটেকটিভ স্যার, খুন হবার আগের মুহূর্তে খুনের তদন্তকারি একজনের সাথে আলাপ হলে, তাকেই ডাকা হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না মিস্টার সুমন্ত!

সুমন্ত আমতা আমতা করলে, বাবা আবার বললেন – তো শাসিয়ে কি বলতে বলা হয়েছিল? এই যে বাড়ির লোক, বা উনার স্ত্রীই খুনটা করেছিলেন, তাই তো?

সুমন্তবাবু মস্তকহিলনে সম্মতি দিলে, বাবা হেসে বললেন – জানেন সুমন্ত বাবু, খুনি এই ক্ষেত্রে একটা বড় ভুল করে ফেলেছেন। কি ভুল জানেন?

সুমন্তবাবু – আমি না পাতি একজন টিকটিকি। মানে প্রেমিক এসে আমাকে বলে, তার প্রেমিকা কখন কোথায় যাচ্ছে, সেই খবর লাগবে, ওইসব খবর সংগ্রহ করি। এত জটিল ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না!

বাবা এবার হেসে শিকদারের কাছে এগিয়ে এসে বললেন – আপনি বলুন?

শিকদারকে দেখে বুঝতে পারা যায়, সে এই কেস নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাই ঘামায়নি। ... বাবা এবার একটা জোরে নিশ্বাস নিয়ে বললেন – পটাসিয়াম সায়েনাইড, এই বিষটা দিয়ে মারা হয় মৌলবি সাহেবকে, আর এখানেই বোঝা যায় যে, এই কেস সাধারণ কেস নয়। কারণ সাধারণ কেউ পটাসিয়াম সায়েনাইড হাতে পাবেনই না। অত্যন্ত ইনফ্লুএন্সিয়াল হলে, তবেই এই বিষ হাতে ঠেকতে পারে, কি জাকির, তোমার তো ওষুধের লাইসেন্স আছে। কিছু তো পড়াশুনা অবশ্যই আছে। ঠিক বলছি তো?

জাকির – হা জি। বিলকুল ঠিক।

কিন্তু এবার প্রশ্ন হলো এই ইনফ্লুএন্সিয়াল মানুষটি কে? ... মৌলবি সাহেবকে যিনি শাসিয়েছিলেন, যিনি ডিটেকটিভ সুপার ইনটেলিজেন্টকে শাসিয়েছিলেন, এমনকি পুলিশ অফিসার, শিকদারকেও যে টাকা খাইয়ে শাসিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি, কারণ তিনি আমাকে সমস্ত কথা বলে দেন, এবং যেই দুই লাখ টাকা খাইয়ে উনাকে শাসানো হয়েছিল, তাও ফিরিয়ে দেন, সেই লোকটা কে? এতোই কি ইনফ্লুএন্সিয়াল সেই লোকটা? ...

তার জন্য আমাদের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ আছে। ... মিলি, একটু ভিডিওটা চালিয়ে দে। ... সকলে দেখলেন একটা ইসলাম লোক মৌলবি সাহেবকে প্রচুর টাকা এগিয়ে দিয়ে কিছু বলছেন। কি বলছেন, শোনা গেল না, শুধুই দেখা গেল । ... আর দেখা গেল একটা গেরুয়া ফতুয়া আর জিনস পরা লোক ডিটেকটিভ সুমন্তকে কিছু টাকা দিয়ে শাসাচ্ছেন। সেখানেও কি কথা বলা হলো, কেউ শুনতে পেলো না। ...

ভিডিও শেষ। বাবা বললেন – কেউ চিনতে পারলেন লোকটা কে?

নাজির বললেন – এ তো ইমরান!

বাবা – একিউরেট। ... মিস্টার ইমরান। ... আচ্ছা নাজির, ইমরানের সম্বন্ধে কিছু বলো।

নাজির – ও আমাদের সবার খুব ভালো বন্ধু ছিল, মৌলবি সাহেব এমনকি আম্মিও ওকে খুব বিশ্বাস করতো। সুলেমানের তো গলায় গলায় বন্ধু হয়ে গেছিল।

বাবা – তো বেশ সুলেমানই বলুক ইমরানের অতীত সম্বন্ধে।

সুলেমান – ইমরান আগে হিন্দু ছিল। এই আট মাস হয়েছে, ও ইসলাম হয়েছে। ...

বাবা – আপনার সাথে ওর পরিচয় কি করে? ... অকস্মাৎ, আপনার সম্মুখে এসে, ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন, আর কিছুদিন পরে আপনার সামনে আচমকা উদয় হয়ে বলেন, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। এই তো সত্য?

সুলেমান – কিন্তু এই কথা তো আমি ছাড়া কেউই জানে না, আর আমিও কারুকে এই ব্যাপারে কারুকে বলিনি!

বাবা একটা বিচিত্র হাসি হেসে বললেন – গিরগিটি কি করেছে আপনার সাথে, সেটা আপনাকে বলতে হয়না। যে গিরগিটিকে চেনে, সে এমনিই জানে, কারপর কি কি করেছে গিরগিটি আপনার সাথে।

একটা জোরে নিশ্বাস নিয়ে, ঘরে পাইচারি করতে করতে, বাবা বললেন – হ্যাঁ ঠিকই হিন্দু ছিল আগে ইমরান, আর ওর নাম ছিল শিবু। কিন্তু জানেন কি কেউ, কে ছিল সে, বা কেমন ছিল সে? ... জানেন না তাই তো। ... আমিও জানতাম না।

বাবা বলতে থাকলেন – প্রথম সন্দেহ হয় আমার যখন জানলাম যে পটাসিয়াম সায়েনাইড দিয়ে খুন করা হয়, আর চাটনি খাওয়ার পরেই মৌলবি সাহেব লুটিয়ে পরেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে চাটনি টা দিয়েছিলেন সুলেমান। সুলেমানের বাড়ি গেলাম, আর সুলতানা বেগমকে চাটনির ব্যাপারে প্রশ্ন করতে জানলাম, তিনি চাটনি নয় ফিরনি করেছিলেন মৌলবি সাহেবকে দেবার জন্য। ফিরনি এসেছিল ইমরানের থেকে, এমনই দেখানো হয়। অর্থাৎ টিফিন ক্যারি পালটাপালটি করে, ইমরান নিজের বিষমেশানো চাটনিটা সুলেমানকে দিয়ে দেয়, আর নিজে সুলেমানের ফিরনিটা দেন, যাতে ফাঁসলে সুলেমান ফাঁসে। ...

কিন্তু শেষ রক্ষে হলো না ইমরান। ... সুলতানা বেগম যদি ধরেও নিই নিজেকে আর নিজের স্বামীকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যে কথা বলেছেন, কিন্তু ইমরান ... মানে শিবু, তোমার মা তো আর মিথ্যে বলবেন না, তাও নিজের ছেলেকে ফাঁসিয়ে দেবার জন্য। ... আমি যেদিন তোমাদের বাড়ি যাই, সেদিন তোমার মাকে

কায়দা করে প্রশ্ন করে নিয়েছিলাম, তিনি ফিরনি বানানো কোথা থেকে শিখলেন, যেমন কায়দা করে সুলতানা বেগমের থেকে চাটনির কথা জেনে নি, তেমনই করে। শিবু, তোমার মা অকপট ভাবে বলে দিলেন, তিনি চাটনি বানিয়ে তোমাকে দিয়েছিলেন। ... আর বিষটা কিসে ছিল? চাটনিতে। ...

বেশ, এ তো গেল ক্রাইমের পার্ট ওয়ান। এখনও ক্রাইমের বাকি অংশগুলি তো জানেনই না আপনারা। ... সিসিটিভিতে দেখলেন মৌলবি সাহেবকে প্রচুর টাকা দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু মৌলবি সাহেব সেটা ফিরিয়ে দেন। কি বলা হচ্ছিল জানেন? ... জানেন না তো? বলছি সেই কথা । না না আমি বললে কি করে হবে শিবু? ... তুমি যে আরো একজনকে সেই একই কথা বলেছিলে, তাই না? আর একই টাকা তাকেও দিতে চেষ্টা করেছিলে। একই ভাবে তিনিও সেই টাকা ফিরিয়ে দেন। ...

কি ভাবছেন আপনারা? তিনি কে? ... তিনি হলেন মৌলবি সাহেবের মৃত্যুর পর, উনার পরিবর্তে যিনি মৌলবি হন, তিনি। ... আল্লা মেহেরবান উনার উপর। যেইদিন উনি এই টাকা নিতে অস্বীকার করে, শিবুকে বললেন, তিনি পুলিশকে সব বলে দেবেন, সেইদিনই উনাকে অপহরণ করা হয়। ... কিন্তু শিবু! ... তুমি তো জানো, তোমার লোক উনাকে অপহরণ করতে পারে নি। ... কিন্তু কেন পারেনি জানো? কারণ আমি তাঁকে তাঁর সজ্ঞানে, তাঁকে অপহরণ করে নিয়েছিলাম। ... মৌলবি সাহেব, সামনে আসুন দয়া করে।

সবার সামনে এবার মৌলবি সাহেব এসে দাঁড়ালে, সকলের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো। ... বাবা সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আপনারা। আপনাদের কারুকে না জানিয়েই উনাকে আমি সরিয়ে নিয়েছিলাম। আপনারা ভেবেছিলেন উনাকে অপহরণ করা হয়েছে। ... কিন্তু আমি যদি সেদিন উনাকে না সরিয়ে নিতাম, তাহলে উনার পরিণতি আমাদের পরলোকগত মৌলবি সাহেবের মতই হতো। তাই সরিয়ে নিয়েছিলাম। যাতে কি হয়েছে, কেউ ধরতে না পারেন, তাই ইসলামের পোশাক পরে, উনাকে এখান থেকে ধাবার মাঠের পাসে নিয়ে যাই আমি ওলা করে। তারপর, আমি আমার গাড়িতে করে উনাকে নিয়ে চলে যাই বারাসাতে, যেখানে উনি সুরক্ষিত ছিলেন।

আর উনি যে শিবুর কীর্তির একমাত্র সাক্ষী। ... এবার বলুন মৌলবি সাহেব, কি বলেছিল আপনাকে শিবু?

মৌলবি সাহেব বললেন – আমার কাছে তো ইমরানই এসেছিল। এসে আমার হাতে ১০ লাখ টাকা দিয়ে বলেছিল, সামনের রাম নবমীতে হাঙ্গামা হবে, তাতে বেশ কিছু ঘরবাড়ি জ্বালানো হবে, বেশ কিছু দোকানপাঠ ভাঙা হবে, সেই সমস্ত ঠিক করার জন্য, এই অগ্রিম ১০ লাখ টাকা। ...

শিবু – মিথ্যা কথা। আমি আর হিন্দু নই। আমি ইসলাম এখন।

বাবা – তাই তো? সেই ব্যপারটা জানার জন্যই তো, আপনার বাড়ি গেছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, আপনার ছবি, তাও রথিন দত্তরায়ের সাথে, সেখানেও আবার আপনাকে জরিয়ে ধরে রয়েছেন উনি। মানে আপনি উনার খাস লোক, আর তা না হলে পটাসিয়াম সায়েনাইডের মত বিষ আপনি পাবেন কোথা থেকে? ... কিন্তু একটা ছবি আর কত কথা বলতে পারে? আপনার অতীত বলতে পারে, কিন্তু আপনার বর্তমান তো আর সেই ছবি বলতে পারেনা। তাই আমার মেয়ে আপনার মায়ের কাছ থেকে রথিনের নাম করে, একাউন্ট নম্বর নিয়ে আসে।

কি হতে চলেছে, আমার সম্পূর্ণটাই অনুমান ছিল। তাই আমি রথিন, মানে সিয়াইডি চিফ, রথিনকে নিয়ে কালীঘাট এসবিআই, যেটা আপনার ব্রাঞ্চ, মানে শিবু গড়েনর একাউন্টের হোম ব্রাঞ্চ, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। ... আটমাস হয়ে গেছে আপনি ইসলাম হয়েছেন। শিবু গড়েন নাম ছেড়ে, আপনি ইমরান। ... অর্থাৎ শিবুর ব্যাঙ্ক আকাউন্ট তো ৬ মাস ইন-অপারেটিভ থাকলে, ডরম্যান্ট থাকবে। ... তাই আপনার একাউন্টে রথিনের থেকে, মানে সিয়াইডির রথিনের নাম করে, ১০০০ টাকা ডিপোজিট করতে গেলাম। দেখলাম দিব্যি ক্যাশ জমা হয়ে গেল। যাই তেমন হলো, তাই আমাদের প্ল্যান মত, রথিন নিজের সিয়াইডি হবার কার্ড দেখিয়ে, শিবু গড়েনের একাউন্টের লাস্ট একমাসের স্টেটমেন্ট চাইলো। ...

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে – মিলি, ডেস্কটপে একটা স্টেটমেন্ট আছে। খোল ওটা। আমি খুলতে, বাবা সকলের নজর সেদিকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন। দেখুন রথিন দত্তরায়ের থেকে ১০ লাখ টাকা ঢুকেছে।

মৌলবি সাহেবকে যেইদিন ১০ লাখ টাকা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, সিসিটিভিতে এসেছে । সেই তারিখ কতো? ... ৮ই এপ্রিল। আর এই ১০ লাখ টাকা কবে ঢুকেছে? (মুচকি হেসে) ৭ই এপ্রিল। কে দিয়েছেন? রথিন দত্তরায়। ... কি জন্যে দিয়েছেন? দাঙ্গা হবে বলে। ... কেন টাকা দিচ্ছেন দাঙ্গা করানোর জন্য? ... কেননা, একযায়গায় পয়সা দিয়ে দাঙ্গা লাগিয়ে দিলে, সমস্ত যায়গায়, এমনিই দাঙ্গাকে ছড়িয়ে সম্পূর্ণ বাংলাকে জ্বালিয়ে রাজনীতি করা যাবে বলে।

আরো দেখুন, আমাদের এই মৌলবি সাহেব তো মিথ্যাও বলতে পারেন। ... দেখুন। যেই ১০ লাখ টাকা তুলেছিলেন, তার থেকে ৪ লাখ টাকা ফিরে এসেছে। বাকি ৬ লাখ কোথায় গেল? ... ২ লাখ ডিটেকটিভ সুপার ইনটেলিজেন্টকে দেওয়া হয়েছে; দুলাখ টাকা মৌলবি সাহেব খুন হবার পর ক্যামেরা ফিরিয়ে দেবেন বলে, আব্রামকে দেওয়া হয়েছে, আর দু লাখ টাকা মিস্টার শিকদারকে, পুরো কেসটা একটা

পারিবারিক কেস, এই ভাবে শাসানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। ... তাই বাকি ৪ লাখ একাউন্টে ফিরে গেছে।

কিন্তু কাজ তো শেষ হয়নি। তাই আবার ১০ লাখ টাকা ঢুকেছে, রথিন দত্তরায়ের কাছ থেকে। আর সেই টাকা নিয়ে আবার দেওয়া হয়েছে এখনকার মৌলবি সাহেবের কাছে। ... কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। ...

বাবা এবার ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্যারের উদ্দেশ্যে বললেন – স্যার, এই শিবু গড়েন, ৮ মাস আগে ইসলাম হয়েইছিলেন এই দাঙ্গাকে বিশাল আকার দেবার জন্য। ... প্রচুর টাকা সমস্ত বাংলায় ছড়ানো হয়েছে, এই দাঙ্গাকে বড় আকার দেবার জন্য। ... আর এই দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে, যেই মাথার থেকে, সেই মাথার নাম রথিন দত্তরায়, যিনি আপনার বিরোধী রাজনীতিবিদ। ... স্যার, শিবু গড়েন মৌলবি সাহেবের খুনের অপরাধী। তাই ওকে গ্রেফতার করা হবে। ... কিন্তু রথিন দত্তরায়ের উপর আপনি একশান না নিলে, এই দাঙ্গা করানো হবেই। ... প্লিজ স্যার এটাকে আটকান। হতে পারে শিবু অনেক কিছু জানে এই ব্যাপারে, কারণ ও পুরো কলকাতার এই রামনবমী মিছিলের হর্তাকর্তা। হ্যাঁ স্যার, শিবু গড়েনই লালবাজার থেকে এই র্যালির পারমিট করিয়ে তারপর শিকদারের কাছে ওকে শাসাতে গেছিল। ... তাই স্যার, ওর থেকেও অনেক খবর পেতে পারেন, কিন্তু এই দাঙ্গাকে আটকান স্যার।

বাবা কেসের নিষ্পত্তি করলেন। শিবু গড়েনকে এরেস্ট করলো সিয়াইডি, যাতে ওকে জেরা করে অনেক সত্য জানা যায়। খুনিকে সহযোগিতা করার অপরাধে এরেস্ট করা হলো আব্রামকে। আর ঘুস গ্রহণের জন্য সুমন্তকেও। সুমন্ত-এর বেলের ব্যবস্থা করা হলো, যাতে উনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হয়ে যান। ... আমাদের বাড়িতে এসে বাবার কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে গেছিলেন উনি, আর বলে গেছিলেন বাবা উনাকে খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ...

অন্যদিকে রথিন দত্তরায়কে সিয়াইডি কাস্টডিতে নেয়। ... শিবু আর রথিনের থেকে অনেক কথা বার করে, বড়ধরনের দাঙ্গাকে আটকানো গেছিল। তাও কিছু অনামা যায়গায় সামান্য কিছু বিক্ষিপ্ত দাঙ্গার চেষ্টা হয়েছিল বাংলায়। ... পরে কোর্টের কেসে শিবুর ১৪ বছরের, আর রথিনের আমৃত্যু জেল হয়। ... বাবাকেও এর ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছিল। বাবার কাছে কিছু ভুয়ো ফোন এসেছিল। সেই ফোনের কথা এই ছিল – তোর জন্য, আমাদের নেতাকে আমৃত্যু জেল খাটতে হয়েছে, তোকে এবার কে বাঁচায় আমরাও দেখবো।

তবে বাবা এসবে পাত্তা দেন না। ... শুধু বললেন, পাগলে কি না বলে। ... তবে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে বাবাকে পরে দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়। বাবাকে বহু কিছুদিয়ে সম্মানিত করা হয়, আর সঙ্গে ১০ লাখ টাকার সরকারি চেকও দেওয়া হয়। ... জাকির পরে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, বাবাকে পারিশ্রমিক দিতে।

বাবা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন উনাকে। বলেছিলেন – কেসটা বাবা নিয়েই ছিলেন, এই দাঙ্গাবাজরা এর সাথে যুক্ত বলে, যার পুরস্কার সরকার উনাকে দিয়েছে। তাই উনি এর কনো অন্য পারিশ্রমিক নিতে পারবেন না। ... তবে পারিশ্রমিক না নিলেও, ওই পরিবারের সাথে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, যেটা আজও আছে। ... জাকির সাহেবের মেয়ে, আমার একজন অনুগামী আজ। ... আমার সাথে সে কাজ করে। জারনালিজিম করে।

তবে আজ বাবা নেই। যখন ভাবি বাবার কথা, তখন বাবার অদ্ভুত বুদ্ধির কথা আমাকে এখনও স্তভিত করে দেয়। পরিবারের মধ্যে খাওয়ার সময়ে বিষ দেওয়া হয়েছে বলে মৃত্যু। কিন্তু সেই মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগ হয়েছে পটাসিয়াম সায়েনাইড। এই একটি জিনিসকে কেন্দ্র করে, একটা মানুষ কি করে, অত বড় একটা চক্র এর সাথে যুক্ত থাকতে পারে, এমনটা ভাবতেও পারে? ... বাবার এই অয়াইড ক্রাইম সেন্সই, উনার এতো বড় বড় কেস শলভ করার মুখ্য কারণ। ... উনি যেন গন্ধ পেয়ে জেতেন যে, এই কেসের সাথে বড় কনো র্যা□কেট জড়িত... কিন্তু আমি আজও সেই গন্ধটা পাইনা। তাই আজও বাবার মত, এতো সহজে কেসের সমাধান করতে পারিনা।

যদিও রথিন কাকা এখানে অন্য কথা বলেন। উনি বলেন – মিলি তোর বাবা, ক্রাইম কন্ট্রোলের একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ক্রিমিনালের মোটিভ ধরা হত। তোর বাবা একটা নতুন ধারা চালু করে দিলো যেখানে ক্রিমিনালের নয়, ক্রাইমেরই মোটিভ ধরে নেওয়া হয়। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা? ক্রাইমটা কেন করা হয় ধরে নেন উনি। ফলে সেই ক্রাইমের সাথে যারা যারা, যে যে ভাবে যুক্ত সকলে সামনে চলে আসে। চেষ্টা করেও গা ঢাকা দিতে পারে না। পলিটিকাল লিডার হোক, বা আশ্রমের মাথা; সিনেমার জগতের সাহেনশাহ হোক বা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। ক্রাইমের মোটিভ ধরে নেবার মানে হলো, গাছটাকেই ধরে নেওয়া। একবার গাছ কেটে ফেললে, সব ডালই নেমে আসে।

আমি এই কথার খুব বিচার করেছি। অনেক দিন বিচার করে বুঝেছি, একদমই সঠিক বলতেন কাকু। বাবা, যেকোনো ধরনের ক্রাইম কেন করা হয়, সেই রহস্যের সমাধান করতেন। ফলে যারা যারা ক্রাইমের সাথে যুক্ত, তারা এমনিই সামনে চলে আসতো।

আক্রোশ

মানানো গেলো

মৌলবি কেসের পর, মায়ের কথা অনুসারে, আমি বাবার সমস্ত ৭টা কেসকে ক্ষতিয়ে দেখছিলাম। বোঝার চেষ্টা করছিলাম, বাবা কি করে কেসে অগ্রসর হন। কোন দিশায় বাবার বুদ্ধি চলে; বাবার ধ্যানধারনা, সমস্ত কিছুকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করছিলাম। কতটা পারছিলাম বলা খুব মুশকিল, কারণ মাঝে মাঝেই মাথা হ্যাং হয়ে যাচ্ছিল। দুইতিনবার তো মাথা যন্ত্রণার ওষুধও খেতে হয়েছে।

এরই মধ্যে বাবাকে তিন তিনবার তলব করা হয়। কখনো মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে, তো কখনো সিয়াইডি দপ্তরে। বাবা যান, আর ফিরে আসেন। বাবার কেসগুলো ফলো করছিলাম বলে বুঝতে পারলাম কিনা জানিনা, তবে কেমন যেন বুঝে গেলাম যে বাবাকে একটা কেস দেবার চেষ্টা হচ্ছে, আর বাবা সেই কেসটা কিছুতেই নিচ্ছেন না। বাবা পারিবারিক কেস নেন না। হয়তো একটা পারিবারিক কেসই বাবাকে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। সেই কারণেই নিশ্চয় বাবা কেসটা নিচ্ছে না। না, আমি শিওর নই যে তেমনটাই হচ্ছে, মানে বাবাকে কেস দিচ্ছে, আর বাবা নিচ্ছেন না, এই ব্যাপারে আমি শিওর তো নই, তবে আমার অনুমান তেমনই।

এইসমস্ত ব্যাপারে মা বাবাকে একদমই ঘাঁটান না, আমিও না । তাই কি হচ্ছে, কেন তিনবার করে বাবা যাচ্ছেন আর বেজার মুখে ফিরে আসছেন, সেটা অজানাই থেকে গেল আমাদের। এরই মধ্যে, বেশ কয়েকদিন ধরে, বাবাকে দেখলাম, তিনটি পুরনো কাগজ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সময় খরচ করতে। অহেতুক সময় নষ্ট করা বাবার ডিএনএ তে লেখা নেই। তাই কিছু তো ব্যাপার হবে। উৎসাহ খুব হচ্ছিল জানার। কিন্তু বাবাকে প্রশ্ন করলে, বাবা উত্তর দেবেন না দেবেননা, তাই প্রশ্ন করি নি।

একদিন বাবা কাগজগুলো নিয়ে নাড়ছিল, সেই সময়ে মা চেঁচিয়ে উঠলেন – স্নানটান করার দরকার নেই আজ, নাকি!

অনেকক্ষণ ধরেই মা বলছেন, কিন্তু বাবা কর্ণপাতই করছিলেন না, তিনটে খবরের কাগজ নিয়ে মেতে ছিলেন। এবারে মা চেঁচিয়ে উঠতে, বাবাকে দেখলাম, কাগজগুলোকে না গুছিয়েই, স্নানে চলে গেলেন । শীতকাল, তাই ফ্যানের হাওয়ায় কাগজ উড়ে যাবার চিন্তা নেই। স্নানটা করে এসে হয়তো গুছিয়ে রাখবেন, কারণ এখন যদি গোছাতে যান কাগজগুলো, তাহলে মা রুদ্রমূর্তি ধরলেও ধরে নিতে পারেন, আর

একবার যদি তা হয়ে যায়, তবে সারাদিনটা মায়ের গজগজ এমনই ভাবে চলবে যে, আর কনো কাজে মন বসানো সম্ভব হবে না।

যা হয়, তা ভালোর জন্যই হয়। আমার কাছে বাবার এই কাগজ না গুছিয়ে স্নানে চলে যাওয়াটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। আমি কাগজতিনটে চোখ বোলাতে শুরু করলাম। দেখলাম, তিনটে কাগজই বহু পুরনো। একটি চার বছর আগের, একটি দুই বছর আগের, আর একটা আগের বছরের। ... যেই খবরটা বাবা ভাজ করে রেখে পড়ছিলেন, এবার সেগুলোর উপর চোখ বোলালাম। ... দারুণ ইন্টারেস্টিং। তিনটেতেই একটি একটি করে ক্লাস সিক্সে পড়া বাচ্চা-খুনের কথা লেখা আছে। অদ্ভুত মিলও তিনটে কেসে। তিনটে ক্ষেত্রেই, বাচ্চাটাকে আগে ঘুম পারানো হয়েছে, তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে। আরো একটা জিনিস পড়ে একটু আঁতকেই উঠলাম।

চার বছর আগের খুনের ক্ষেত্রে, মৃত বাচ্চার একটি আঙুল ছিলো না, দুই বছর আগেরটায় দুটো আঙুল ছিলনা, আর আগের বছরেরটায় তিনটে আঙুল। ... এ কেমন হিংস্রতা! ... ওইটুকু বাচ্চা খুন, সেটা নিজেই একটা হিংস্রতা, তার সাথে এই আঙুল কেটে নেওয়া!!

বাথরুমে জলের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। না, আর দেরি করা যাবেনা। যেমন করে বাবা বিছনায় কাগজগুলো রেখেছিলাম, সেটা দেখে রেখেছিলাম। ঠিক সেই ভাবে কাগজগুলো রেখে, সেই ঘর থেকে উঠে চলে গেলাম। ... বাবা কিছু বুঝেছিলেন কিনা জানিনা, তবে আমাকে কিছু বলেন নি সেই ব্যাপারে।

বাবা মাঝে মাঝে বলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে যা কিছু আসে, তা সময় আর প্রকৃতিই নিয়ে আসে, আর আমাদের সেই সমস্ত কিছুকে নিজেদের মস্তিষ্কে তুলে রাখতে বলে, কারণ তা হয় দূরভবিষ্যতে নয় শীঘ্রই কাজে লাগবে। ... বাবা খুব বলেন কথাটা, যা সামনে এসেছে, তাকে অস্বীকার করো না, আর যা সামনে আসেনি, তার প্রতি আসক্তি দেখিওনা। ... উনি এটিকে সুখী জীবনের মন্ত্র বলেন। এখন তো মাও এই মন্ত্রে বিশ্বাস করেন। ... আমি এখন তা মানলেও, তখন মানতাম বলা ভুল হবে, তবে হ্যাঁ, অভ্যাস করতাম সেটার।

তবে বাবা ঠিকই বলতেন। সত্যি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে যা আসে, তা প্রকৃতি আর সময়ই আনে। আর তার হাতেনাতে প্রমাণ পেলাম, সেই দিনই, যেইদিন বাবার থেকে লুকিয়ে খবরের কাগজগুলো পড়েছিলাম। আমি আর মা, দুপুরবেলা চুল এলিয়ে শুয়ে নবকল্লোলের পূজাবার্ষিকীর একটা গল্প পড়ছিলাম; মায়ের ফোনটা বেজে উঠলো। আমার দিকেই ফোনটা ছিল, তাই উঠিয়ে দেখলাম, রথিনকাকুর ফোন।

মাকে বলতে, মা আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে ধরে লাউডস্পিকারে দিলেন, যেমন মা সবসময়ে দিয়ে থাকেন।

মা – হ্যাঁ, হ্যালো! ... কি ব্যাপার? কনো ভালো খবর না কি? বিয়ে থাওয়া করছো এবার?

রথিনকাকা – আরে না না, ওই সব ঝক্কি আমি নিতে পারবো না। ওর জন্য অনেক ক্ষমতা লাগে। এতো শক্তি আমার নেই। ... একটা বিশেষ কারণে ফোন করলাম মধু। ... শোন না, মিলিকে নিয়ে আজকে একবার সন্ধ্যায় তোকে, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে যেতে হবে। আমি নিয়ে আসবো তোদের। গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমি এখানেই থাকবো।

মা – কি ব্যাপার! ... কনো গণ্ডগোল কিছু?

রথিনকাকা – আরে আর বলিস না। তিনবার বিজয়কে মুখ্যমন্ত্রী ডেকে একটা কেস নেবার জন্য রিকোয়েস্ট করছে। বিজয় কিছুতেই সম্মতি দিচ্ছেনা। ... শেষবার তো মুখের উপর বলে দিলো ও, একটু পড়াশুনা করছি কেসটা নিয়ে। যদি ঠিক বুঝি, তবেই কেসটা নেব। ... আর অন্যদিকে হিউজ প্রেশার। ... তাই তোদেরকে একবার মুখ্যমন্ত্রী ডেকেছেন। যদি হোমমিনিস্টারকে রাজি করিয়ে কেসটা বিজয়কে দেওয়া যায়। তাই একবার তলব।

মা আর কথা বাড়ালেন না। আমি আর মা, সন্ধ্যায় রেডি হলাম। বাবা খবরের কাগজ তিনটে থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন – মুখ্যমন্ত্রীর তলব!

মা – হ্যাঁ, রথিনদা গাড়ি পাঠাচ্ছে।

বাবা – হুম।

আমি – কেসটা নেবে না নেবেনা!

বাবা – তিনভাগের একভাগ কেস দিচ্ছে। তদন্ত করে সমাধান করা সম্ভবই হবে না। যদি পুরো কেস দেয়, তবেই নেব।

আমি আর মা চলে গেলাম। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে আমাদের রথিনকাকাই নিয়ে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – হ্যালো মিলি। ... মায়ের দিকে হাতজোর করে বললেন – নমস্কার মিসেস সিংহ।

মা যে এমন রসিকতা করতে পারেন আমি জানতাম না। তিনি হেসে বললেন – মিসেস সিংহ না বলে, একবারে সিংহী বললেই তো হয়। ... বলুন স্যার, আমি কি করতে পারি আপনার জন্য!

মুখ্যমন্ত্রী – আসলে, একটা কেস আছে। এক বছরের পুরনো। কেসের সমাধান তখন করা যায়নি, তাই কেস ক্লোজ করে দয়া হয়েছিল। কেসটা একটা বাচ্চা খুনের ব্যাপারে। ... কিন্তু কথাটা হচ্ছে, বাচ্চাটা মিস্টার বিজরিয়ার, ... জানেনেই তো, বড় ব্যবসাদার। ... আমাদের পার্টি ফান্ডে সব থেকে বেশি কন্ট্রিবিউশান উনারই থাকে। ... পরের বছরই নির্বাচন, হাতে আর মাত্র ৮-৯ মাস। এখন উনি এসে বলছেন, যদি উনার ছেলের কেস শলভ না করা হয়, তবে উনি পার্টিফান্ডে একটা টাকাও দেবেন না, আর অন্য ব্যবসাদের দিতেও দেবেন না। ...বড্ড চাপে পরে গেছি। ... আমার নিজের পার্টির শীর্ষকর্তারাও আমাকে চাপ দিচ্ছে। এককথায়, রাতের ঘুম খেয়ে নিয়েছে এই বিজরিয়া।

মা – রথিনদারা তো আছেন স্যার। উনিই কেন?

মুখ্যমন্ত্রী – পুলিশের কম্ম নয় এই কেস শলভ করা, সেটা তো এক বছর আগেই তারা প্রমাণ করে দিয়েছে। আর সিয়াইডিও নাজেহাল হয়ে গেছে কেসটা নিয়ে, কিন্তু কনো কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেনা। ... এখন একমাত্র বিজয়ই ভরসা মিসেস সিংহ।

মা – কিন্তু উনি আমার কথা এই সব ক্ষেত্রে একদমই শোনেন না। ... আসলে...

আমি মাঝখান থেকে বললাম – স্যার, আমি কিছু বলবো?

মুখ্যমন্ত্রী – হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তুমি তো বাবার এসিস্ট্যান্টও। বলো না কি বলবে।

আমি – স্যার, আপনি কি কেসটা সম্বন্ধে কিছু জানেন? নাকি শুধুই মিস্টার বিজরিয়ার ছেলে খুন হয়েছে, সেটুকুই জানেন?

মুখ্যমন্ত্রী – যা জানি, রথিনদের মুখ থেকেই জানি। সেই অনুসারে, উনার ছেলেকে ঘুম পারিয়ে, গলা কেটে খুন করা হয়েছে।

আমি – আর হাতের থেকে তিনতে আঙুলও কেটে নেওয়া হয়েছে!

মুখ্যমন্ত্রী – হ্যাঁ, হ্যাঁ ... আরে তুমি এই কেসের কথা জানো?

আমি – না আসলে, বাবা কেসটা নিয়ে বেশ কিছুদিন পড়াশুনা করছেন, সেই সুত্রেই, একটু জেনেছি। আর যা জেনেছি স্যার, ঠিকই বলেছেন, এই কেস শলভ করা পুলিশের কম্ম নয়, কারণ খুন একটি হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী আর রথিনকাকা একই সাথে বললেন – খুন একটি হয়নি? মানে কি?

আমি – বাবাকে দেখলাম একটি চার বছরের পুরনো, একটি দুই বছরের পুরনো আর একটি এক বছরের পুরনো পেপার নিয়ে একসাথে ঘাটাঘাটি করতে। বাবাকে না জানিয়েই একটু পেপারগুলো ঘাটতে দেখি, এই তিন সময়ে তিনটি একই বয়সের বাচ্চা খুন হয়েছে, আর মজার কথা একই ভাবে । ... অর্থাৎ এটি একটি সিরিয়াল কিলিং। ... কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, এই তিনটি খুনের মধ্যে এতটাই সময়ের গ্যাপ যে, পুলিশ এই তিনটি কেসকে এক সিরিজে আনার কথা ভাবতেই পারেনি। ... আর আমি আমার বাবাকে যতটা চিনি, সেই থেকে বলছি স্যার, বাবা এই কেস নেবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী – কেন?

আমি – কারণ শুধু মিস্টার বিজরিয়ার ছেলের খুনের তদন্ত করতে গেলে, মানে যেটা এক বছর আগের খুন, শুধু সেটার তদন্ত করতে গেলে, এই কেসের মীমাংসা করা অসম্ভব, কারণ সিরিয়াল কিলারকে ধরতে গেলে, তাঁর মোটিভ জানা আবশ্যক, আর তাঁর করা সমস্ত খুনকে মিলিয়ে না দেখলে, সেই মোটিভ জানা অসম্ভব। ... তাই যদি বাবাকে এই কেস দিতে হয়, তবে স্যার, আপনাকে এই তিনটে কেসই রি-ওপেন করতে হবে। তবেই বাবা কেসটা নেবেন। কারণ তখনই কেসটা যতটা ঘটেছে, সেটা পুরো হবে। যদিও কেসের এখনও অনেক কিছু ঘটা বাকি।

মুখ্যমন্ত্রী – মানে তুমি বলছো মিলি, এখনো খুন হবে?

আমি – হ্যাঁ স্যার, এখনও পর্যন্ত আততায়ী নির্বিঘ্নে খুন করে গেছে, আর তাকে ধরার চেষ্টাও কেউ দেখায় নি। কিন্তু যেই মুহূর্তে সে জেনে যাবে যে তাকে ধরার চেষ্টা করছে কেউ, সে নিশ্চয়ই নিজের মোটিভকে সামনে রাখতে চেষ্টা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী – কিন্তু মোটিভ সামনে রাখলে তো সে ধরা পরে যাবে?

আমি – না স্যার, সামান্য খুনি আর সিরিয়াল কিলারের মধ্যে যে এটাই পার্থক্য। সাধারণ খুনি নিজের মোটিভকে লুকিয়ে রাখতে চায়। আর সিরিয়াল কিলার সবসময়ে নিজের মোটিভটাকেই সামনে রাখতে

চায়। ... আসলে বাবার থেকে যতটা জেনেছি স্যার, সেই অনুযায়ী, একটি সিরিয়াল কিলারের খুন করার দুটি মোটিভ থাকে, প্রথমটি যেই মোটিভটা সে প্রদর্শন করতে চায়, আর দ্বিতীয়, যেটি সে প্রদর্শন করতে চায়না, অর্থাৎ যেটি ব্যক্তিগত মোটিভ। ... বাবা বলেন, একবার সিরিয়াল কিলারের পিছনে কেউ পরে গেলে, সিরিয়াল কিলার নিজের সেই মোটিভ, যেটা সে দেখাতে চায়, সেটা দেখানোর জন্য যেই ক্রাইমটা সে সময়ে নিয়ে নিয়ে করতো, এবার সে খুব ফ্রিকুয়েন্ট সেই ক্রাইম করে। ... এমন করার কারণ এই যে, যিনি তদন্ত করছেন, তিনি সেই মোটিভে ভিগ্রি খেয়ে গিয়ে, তার আসল মোটিভ থেকে, সমানে দূরে চলে যায়। ... তাই স্যার যাই এই কেস বাবা নেবেন, তাই আরো খুন হবে। আর সেই চিন্তা করেই, বাবা কেসটা নিতে চাইছেন না।

মুখ্যমন্ত্রী এবার একটু সিটে নিজের শরীরটা এলিয়ে দিলে, মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – তুই এতো কথা কি করে জানলি, বাবার সাথে তো তোর কথা হয়নি!

আমি – বোধহয় বাবার কেসগুলো নিয়ে এই মাস দেড়েক চর্চা করার ফল এটা। বাবার প্রতিটা কথা যেন আমার কানের কাছে বাজছে।

রথিনকাকাও এবার একটা চেয়ারে বসে পরে বললেন – মিলি তো পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে! ... (মুখ্যন্ত্রির দিকে তাকিয়ে) তবে স্যার, মিলি যেমনটা বলল, বা বলতে পারেন, মিলির মুখ দিয়ে বিজয় যেটা আমাদের বলল, সেটা একদামই সত্যি। এটাই একটা সিরিয়াল কিলারের হিডেন ক্রিমিনাল সাইকোলজি।

আমি আবার বললাম – হ্যাঁ স্যার, বাবা সবসময়েই বলেন সিরিয়াল কিলার সম্পূর্ণ অন্য ধারার খুনি হয়। সমস্ত খুনি সাইকোলজিকালি দুর্বল হয়, কিন্তু সিরিয়াল কিলারের কাছে সাইকোলজিকাল স্টেডিনেশই তার স্ট্রং পয়েন্ট, তাই দুধে অফিসারদেরকেও ঘোল খাইয়ে দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী – মিলি, তুমি তো আমাকে উভয় সঙ্কটে ফেলে দিলে! ... একদিকে বিজরিয়ার ছেলের মৃত্যুতদন্ত না করলে, কুর্সি ছাড়তে হতে পারার চিন্তা। ... অন্যদিকে, যদি এই কেস নিয়ে এগোনো হয়, তবে আরো খুন হলে, আওয়াজ উঠবে যে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেইই। ... কি করি এখন!

আমি এবার একটু সংযমী হয়ে বললাম – স্যার, যদি কিছু মনে না করেন কিছু কথা বলতে চাই। ... মানে কথাগুলো বাবার থেকেই শিখেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, এইখানে এই কথাগুলি আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ... তাই যদি অনুমতি দেন। ... আসলে কথাগুলো অপ্রিয়ও হতে পারে আপনার কাছে।

মুখ্যমন্ত্রী – বিজয়ের কনো কথাই আমার কাছে অপ্রিয় নয় মিলি। হ্যাঁ, বড্ড কড়াপাকের সত্য হয়, ওর কথাগুলো, কিন্তু অস্বীকার করার কনো জায়গা নেই যে ওর প্রতিটি কথা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য। ... তাই নিশ্চিন্তে বলো।

আমি অভয়লাভ করে বলতে শুরু করলাম – স্যার, এটা ঠিকই যে এই খুনের তদন্ত করতে গেলে, আরো খুন হবে। তবে আপনিও জানেন, বাবা নিশ্চিত ভাবে সফল হবেনই। তবে হ্যাঁ একটু সময় লাগবে এই কেসে। আন্দাজ মত, প্রায় মাস ছয়েক বা সাতেক তো সময় লাগবেই। ... হ্যাঁ এটাও ঠিক যে, সেই সময়ের মধ্যে বিরোধীরা আওয়াজ তুলবেই যে, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ... তবে স্যার, বাবা বলেন, ভোট জেতার উপায় হলো পুঁজিপতিদের ধনদান। ... আর সেটি করবেন বিজরিয়া। ...

আমি আবার বললাম - তাই স্যার বিজরিয়াকে এই কথা আপনাকে বোঝাতে হবে যে মাস ছয়েক সময় লাগবে, কিন্তু তিনি যেন পার্টিফান্ডে টাকা দেন। ... আর দ্বিতীয় কথা এই যে, বিরোধীদের আওয়াজ যে আইনশৃঙ্খলা নেই, সেই সমস্ত থেমে যাবে যদি, বাবা যখন কেসের মীমাংসা করবেন, সেটা ফলাও করে কাগজে লেখা হয়, বা নিউজে বলা হয়। ... তবে স্যার, হঠাৎ করে তো আর ভাইরাল নিউজ হয় না। ... তাই স্যার, বিরোধীরা যে কেম্পেনিং করবে যে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নেই, এতে আপনার ভোটব্যাঙ্কই শক্তিশালী হবে। ... অর্থাৎ কথা এই যে, বিরোধীদের এই কেম্পেন রাজ্যের সকল মানুষকে এই কেসের নিষ্পত্তির দিকে আকর্ষিত করে দেবে। আর তারপর নিষ্পত্তির খবর আপনার ব্যবস্থায়নে আইনশৃঙ্খলা যে কতটা শক্তিশালী, তা প্রমাণ করে দেবে।

মুখ্যমন্ত্রী রথিনকাকার দিকে তাকিয়ে বললেন – এই মেয়ে বলে কি? ... হ্যাঁ রে মেয়ে, এতো জটিল রাজনীতির অঙ্ক, তুই তোর বাবার থেকে জেনেছিস?

আমি – হ্যাঁ স্যার। যা কিছু শিখেছি, তা তো উনার থেকেই।

মুখ্যমন্ত্রী – হ্যাঁ রে, তোর বাবার রাজনীতিতে ইন্টারেস্ট নেই তো? ... যদি রাজনীতিতে বিজয়ের ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে তো আমাদের হাতে হ্যারিকেন! ... এই জটিল রাজনীতির অঙ্ক আমাদের বুঝতেই কালঘাম ছুটে গেছে। ...

আমি হেসে – না স্যার, বাবার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কনো ইন্টারেস্ট নেই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

রথিনকাকার দিকে তাকিয়ে – তাহলে রথিন একটা কাজ করো। বিজয়ের সাথে আলোচনা করে আমাকে দিনটা বলো। আমিও সেদিন বিজরিয়াকে নিয়ে, সিয়াইডি দপ্তরে পৌঁছে যাবো। সেদিন সেখানেই গোলটেবিল বৈঠক করে, সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যাবে। ...

রথিনকাকা – ওকে স্যার।

মা আর আমি উঠে পরলাম। ... মুখ্যমন্ত্রী বললেন – আরে, এককাপ চা তো খেয়ে যান!

মা – স্যার, উনি বাড়িতে চা না খেয়ে বসে আছেন। ... অন্য একদিন না হয়!

মুখ্যমন্ত্রী – বেশ, এই কেসের নিষ্পত্তির পর, আমার বাড়িতে, তোমাদের সকলের, ইঙ্কলুডিং রথিনের নিমন্ত্রণ রইল, তবে চায়ের নয়, লাঞ্চের। ... বিজয়কে বলে দিয়ো কিন্তু।

আমরা উঠে গেলাম। রথিনকাকা আমাদের গাড়িতে তুলে দিলেন, আর তুলতে তুলতে বললেন – আজ মিলি আমাকে চমকে দিয়েছে। পুরোপুরি ভাবে বিজয়ের ঝলক দেখতে পেলাম আজ মিলির মধ্যে। মা কথা না বাড়িয়ে শুধু হাসলেন।

তবে গাড়িতে মা আমাকে বললেন – দেখলি, বাবার কেস অনুসরণ করলে, কেমন হয়ে যায় মানুষ!

আমি – আমি নিজে দেখেও অবাক মা!

বাড়ি এসে বাবাকে সমস্ত কথা বললাম। বাবা নীরব দর্শকের মত সমস্তটা শুনলেন। শুনে একটু মুচকি হেসে চলে গেলেন জায়গা থেকে। মা রান্নাঘরে চলে গেলেন চা চাপাতে। আমি বাবার পিছনে পিছনে চলে গেলাম, আশা করছিলাম বাবা একটু প্রশংসা করবেন আমার । ... কিন্তু কিচ্ছু বললেন না। তাই অগত্যা আমিই বললাম – তুমি কি করে জানলে যে আমি তোমার কাগজগুলো পড়ে ফেলেছি?

বাবা – মাথায় কলুর মত তেল মাখিস, আর দিনরাত মাথা চুলকাস। হাতে তো সবসময়েই নারকেল তেলের চ্যাটচ্যাটে ভাব!

আমি সেই কথা শুনে খবরের কাগজগুলর দিকে এগিয়ে গিয়ে, একটা পেপার হাতে তুলে নিলাম। একটু খতিয়ে দেখতে হলো, তবে নজরে এলো, তেল চ্যাটচ্যাটে আঙুলের হাল্কা ছাপ। ... বিস্ময়ে বাবার দিকে

তাকালাম। আর মনে মনে বললাম, তুই প্রশংসার আশা করছিলিস! ... আর করিস! ... মনই উত্তর দিয়ে দিলো – এই মানুষটার সামনে তো কিছুতেই নয়।

রাত্রি নয়টা নাগাদ রথিনকাকুর ফোন এলো বাবার কাছে। হাত দেখিয়ে বাবাকে রিকুয়েস্ট করলাম, ফোনটা লাউডস্পিকারে দেবার জন্য। বাবা স্পিকারে দিলেন। তাই দুইজনেরই কথা বলছি –

রথিনকাকা – বিজয়, আমাকে বলো নি তো, এই কেসটা একটা সিরিয়াল কিলারের কেস!

বাবা – ঘটনাটার বিবৃতি তোমার মুখ থেকে শুনে, আমার কথাগুলো খুব শোনা শোনা লেগেছিল, কিছুতেই কানেক্ট করতে পারছিলাম না। ... শেষে, একদিন হঠাৎই মনে পরলো, এমন একটা কেস বছর চারেক আগেও ঘটেছে। ... ক্লাস সিক্সের বাচ্চাকে আগে ঘুম পারানো হয়েছে, তারপর গলার নলি কাটা হয়েছে। ... ইন্টারেস্টিং কেসের খবরের কাগজ, আমি একটা ডেস্কে স্টোর করে রেখে দিই। ... সেখান থেকে হাতরে চারবছর আগের সেই কেসটা খুঁজে পেলাম।

রথিনকাকা – তারপর?

বাবা – তারপর, সেই কেসের ক্ষেত্রে দেখলাম বাচ্চার মৃত্যুর পর, তার একটা আঙুল কাটা হয়েছে। আর তোমার কেসে তিনটে আঙুল। ... যদি সিরিয়াল কিলিং কেস হয়, তবে এই দুটোর মাঝেও আরেকটা খুন হতেই হবে, কারণ সিরিয়াল কিলার একটা আঙুল কেটে, তারপরের কেসে তিনটে আঙুল কিছুতেই কাটবেনা। ... কিন্তু সেই পেপার আমার কাছে ছিলো না। ... তাই, আমার পরিচিত ক্রাইম রিপোর্টারদের ফোন করে করে, খবর নিলাম যে এমন কনো কেস হয়েছে যেখানে ক্লাস সিক্সের বাচ্চা খুন হয়েছে, আর তার দুটো আঙুল কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে লাস! ... অখিল বলে একজন অমৃতলালে কাজ করা বন্ধু আমাকে বলল, হ্যাঁ আছে। ... দুইদিন পরে, সেই পেপারের একটা কপি খুঁজে আমাকে হস্তান্তর করলো।

রথিনকাকা – তারপর কি হলো?

বাবা – খবরটা পড়তে গিয়ে দেখি, একই ভাবে ক্লাস সিক্সের বাচ্চা, একই ভাবে স্কুল ইউনিফর্ম পরা, ঘুম পারানো হয়েছে, তারপর গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে । আর তার দুটো আঙুল কাটা হয়ে গেছে। অর্থাৎ এটা সিরিয়াল কিলারের কাজ। ... কিন্তু আমি এই কেসটাতে এগোতে চাইছিলাম না, কারণ সিরিয়াল কিলার যেই মোটিভ প্রদর্শন করার জন্য খুন করে, সেই মোটিভটা যখন কেউ ধরতে চেষ্টা করে,

যতক্ষণ না সেই মোটিভটা সে ধরে ফেলে, ততক্ষণ খুন করতেই থাকে। ... তাই চাইছিলাম যাতে আর খুন না হয়, আর তাই এই কেস নিয়ে এগতেই চাইছিলাম না!

রথিনকাকা – তুমি কি ধাতু দিয়ে তৈরি, আমাকে একটু বলবে? ... শালা, আমরা এতো পড়াশুনা করে এই চাকরি করি, দিনরাত এই সমস্ত নিয়ে চর্চা করছি, তারপরেও আমাদের মাথায় এইসব আসেনা কেন?

বাবা – সেই কারণেই তো আসেনা। ... তোমরা কি একটা কেস নিয়ে ব্যস্ত? না তো। একাধিক কেস নিয়ে চিন্তা হচ্ছে তোমাদের। চলতি কেস ছেড়ে, চার বছর আগে কে, কি করে খুন হয়েছিল, সেই চিন্তা কি করে আসবে!

রথিনকাকা – কিন্তু ভাই বিজয়, এই কেসটা করতেই হবে। ... জানি আরো খুন হবে। কিন্তু তাও।

বাবা – পরের বছর নির্বাচন। এমন খুন হলে, আইনশৃঙ্খলার অভাব বলা হবে। তখন মুখ্যমন্ত্রী বিগড়ে যাবেন, নয়তো উনার পার্টির ইনভেস্টাররা বিগড়ে যাবেন । ... না না, বুঝতে পারছো না রথিন। ... এর অনেক সাইড এফেক্ট।

রথিনকাকা – সেসব তোমার মেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি বসে, উনার মুখের উপর বলে দিয়েছে। জানো বিজয়, আজ মিলির মধ্যে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ... এক্সিলেন্ট তৈরি হচ্ছে মিলি। ... শোনো সেই সমস্ত কথা শুনে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সিয়াইডি দপ্তরে, উনি বিজরিয়াকে নিয়ে আসবেন, আর আমি তুমি মিলি থাকবো। ... সেখানে বসে, বিজরিয়াকে বলা হবে, যে আরো খুন হবে, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যে নেই, সেইসব স্লোগান উঠবে। তারপরে কি উনি ইনভেস্ট করবেন পার্টিতে? যদি রাজি থাকেন, তবে এই কেস রি-ওপেন করা হবে।

বাবা একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে – হুম, সে তো বুঝলাম ... কিন্তু অতো গুলো প্রাণ! ... ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। মৃত্যুর দেবী আরো মৃত্যু চাইছেন। আমি তুমি কে হই, উনার ইচ্ছার বিরোধিতা করার! ... ঠিক আছে। তুমি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে আমাকে জানাও। আমি আর মিলি ভবানীভবন পৌঁছে যাবো। ...

রথিনকাকা – আরে তুমি একটা তারিখ তো বলো?

বাবা – আমাদের হাতে কেস না থাকলে আমরা বেকার। ... যেদিন, যখন, যেখানে ডাকবে, পৌঁছে যাবো। ... বিজরিয়া বড় বিজনেসম্যান, মুখ্যমন্ত্রী হাজার কাজে ব্যস্ত। উনারা যেদিন সময় করবেন, সেদিনই আমি আর মিলি উপস্থিত হয়ে যাবো।

রথিনকাকা – ওকে, আমি কনফার্ম করে, জানাচ্ছি তোমাকে।

বাবা – ঠিক আছে। রাখলাম।

ফোনটা রেখে, আমার দিকে বাবা তাকিয়ে একটা হাসি দিলেন, আর কাছে এগিয়ে এসে বললেন – থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি – বাবা, যা কিছু, সব তো তোমার থেকেই!

বাবা – ও তুই বুঝবিনা। ... মা বাবার, বা গুরু-গুরুমাতার অন্যের মুখ থেকে নিজের সন্তান বা শিষ্যের গুণগান শুনতে যে কি ভালো লাগে, তোর সেটা এখনো বোঝার সময় হয়নি।

গোলটেবিল বৈঠক

মা আর বিদিপ্তাদিদি, চা আর তেলেভাজা নিয়ে, দাড়িয়ে দাড়িয়ে, আমাদের দুইজনের দিকে একটা মা-মা হাসি দিলেন। ... তেলেভাজা দেখে আমি লাফিয়ে উঠে বললাম – এরমধ্যে তেলেভাজা করা হয়েও গেল?

বাবা – তোদের এসে খিদে পেয়ে যাবে বলে, দিদি (বিদিপ্তাদিদি) তেলেভাজা করে রেখেছিলেন।

আমরা সকলে মিলে চা আর মুড়িতে সামান্য তেল দিয়ে, তেলেভাজা দিয়ে বেশ জমিয়ে জমিয়ে খেলাম। বাবা একদাম চুপ। মা বললেন – কি গো, এমন চুপ করে আছো কেন?

বাবা – মনের ভিতরটা কেমন যেন খচখচ করছে মধু। ... এই কেসে নামলে, কতগুলো প্রাণ বলি যাবে, কে জানে? ... এখানে তো খুন হয়, ১২ বছরে বাচ্চার। মানে, কতগুলো মায়ের কোল খালি হয়ে যাবে! ... মনটা ভারি ভারি লাগছে।

বিদিপ্তাদিদি – কর্ম ছাড়া কি কর্মফল হয়?

বাবা – না দিদি, কর্ম তো আসলে কর্মের অর্ধেক মাত্র; কর্ম তো সম্পূর্ণই হয় কর্মফল নিয়ে।

বিদিপ্তাদিদি – কেউ কি কারুকে মারতে পারে?

বাবা – না দিদি, তাও পারেনা। ... না তো কেউ কারুকে জন্ম দিতে পারে, না বিয়ে দিতে পারে আর না মারতে পারে। ... জন্ম তো আমরা কেবলই এই শরীরের দিই, তাও ভগবতী যদি নিজের সন্তানকে দেহ নিতে প্রেরণ করেন, তবেই সেই দেহ গঠন সম্ভব হতে পারে। এই দেহ যে চেতনার আধার। আত্মা যে চেতনার রাজপোশাক; মন-বুদ্ধি-প্রাণ-উর্জ্জা-শরীর এই পঞ্চভূত যে চেতনার অর্থাৎ ভগবতীর মন্দিরের পাঁচটি খিলেন।... চেতনা অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী চাইলে তবেই এই মন্দির গঠিত হয় অর্থাৎ শিশুর জন্ম হয়; তিনি চাইলে, তবেই এই শরীর নিজের সাথে সর্বক্ষণ অন্য আরেকটা শরীরকে রাখেন; আর তিনি চাইলে তবেই এই মন্দিরের নাশ হয়।

মা – কিন্তু ব্রহ্মময়ী কেন বলছো তুমি? ... ব্রহ্ম কেন বলছো না?

বাবা – তিনি অব্যাক্ত মধু। ... যতক্ষণ তাঁর ব্যাখ্যা করার স্পর্ধা আমরা দেখাই, ততক্ষণ তিনি ব্রহ্মময়ী, আর যখন সেই স্পর্ধা দেখাবার সাহস করতে পারিনা, তখন তিনিই ব্রহ্ম।

বিদিপ্তাদিদি – তাহলে, যেই প্রাণের উপর তোমার কনো নিয়ন্ত্রণই নেই, এমনকি যিনি আততায়ী, তাঁরও নিয়ন্ত্রণ নেই, তার প্রাণের প্রতি আসক্তি কেন দেখাচ্ছ বিজয়? ... সেই মন্দির গঠনও হয়েছে, তাঁর ইচ্ছায়; আর সেই মন্দির থেকে রাজপোশাক অর্থাৎ আত্মায় জরিয়ে চেতনা মুক্তও হবেন, তাঁরই ইচ্ছায়। ... তবে তুমি তাতে হস্তক্ষেপ করার স্পর্ধা কোন অধিকারে দেখাচ্ছ?

বাবা – ঠিকই কথা দিদি। ... কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো। ... জানি যে, যিনি খোরা, যিনি বোবা, যিনি অন্ধ, সমস্তই তাঁরই কর্মের ফল। কিন্তু তাবলে কি অন্ধের জন্য মন কাঁদবে না!

দিদি – যার জ্ঞান বলে মন সত্য, তাঁরই মন কাঁদবে। ... যদি তোমার জ্ঞান তোমাকে বলে যে চেতনা নয়, চেতনা যেই রাজপোশাক পরে থাকে, সেই আত্মা সত্য, তবে আত্মার রোদনও সত্য। তোমার জ্ঞান যদি বলে, চেতনা নয়, চেতনা আত্মারূপ রাজপোশাক পরে যেই রাজপ্রাসাদে থাকেন, সেই রাজপ্রাসাদের পাঁচ খিলেন, অর্থাৎ পঞ্চভুত সত্য, তবে তাঁদের রোদনও সত্য। ... আর যদি তোমার জ্ঞান বলে যে, এক চেতনাই সত্য, এক সেই সনাতন। ... রাজপোশাক আত্মাও তাঁরই মধ্যে শেষে বিলীন হয়ে গিয়ে নিজের পৃথক অস্তিত্বের ভ্রম হারায়। যদি তোমার জ্ঞান বলে, এক চেতনাই সেই পরমশূন্য পরব্রহ্ম, বাকি সমস্ত পঞ্চভূত তাঁর ধারনা করার জন্যই অস্তিত্বে এসেছিল, আর ধারনা হয়ে গেলেই, তাঁতে মিশে যায়, তাহলে সমস্ত পঞ্চভূতের ব্যাথা কি সত্য থাকে?

বাবা – না থাকেনা দিদি। ... ঠিকই বলেছ। অকারণই দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। আততায়ী খুনের চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু মৃত্যু হবে না হবেনা, তা নির্ভর করছে, সেই ভিক্টিমের দেহমন্দির থেকে পরব্রহ্ম পরম চেতনা মুক্ত হবে না হবেনা, তার উপর। তাই যে প্রাণ আমরা কারুকে দিতেও পারিনা, নিতেও পারিনা। দুই ক্ষেত্রেই চেষ্টা করি আমরা, কিন্তু শুধুই চেষ্টা করতে পারি, এর বেশি কিছু নয়। প্রাণ তো বায়ুর কারণে নয়। অক্সিজেন মৃত মানুষের মধ্যে ফুঁকে দিলেও যে প্রাণ আসে না তাঁর। প্রাণ তখনই আসে কারুর মধ্যে, যখন তাঁর মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বরী এসে চেতনাবেশে বিরাজ করেন আত্মারূপ রাজপোশাক ধারণ করে। ... আমি একটু স্নান করি বুঝলে।

মা – স্নান করি মানে, এত ঠাণ্ডার মধ্যে এই ভর সন্ধ্যাবেলায় স্নান! ... সামনেই কেস আছে, বড় কেস আশা করি। প্রচুর অনিয়ম হবে। এখন নয়। শোনো আমার কথাটা।

বাবা – একটু স্নান করতে দাও। ... মনের মধ্যে, দেহের মধ্যে অনেক অজ্ঞানতা বাসা বেঁধেছে। ধুয়ে বার করে না দিলে জীবনটাই অহেতুক হয়ে যাবে।

মা কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। এটা বলি কি সেটা বলি, এমন করে, শেষে বললেন। একটু গিজারটা চালিয়ে নাও। ... গরম জলে স্নান করো।

দিদি একটা কথাও বললেন না। শুধু মা আর বাবার সহজ সম্পর্কটা দেখলেন আর মিটিমিটি হাসলেন। ... মা দিদির দিকে তাকিয়ে, বাবাকে বোঝাতে অপারগ হয়েছেন, এমন একটা মুখ করলেন। দিদি হেসে বললেন – যাক স্নান করে নিক। হাল্কা হয়ে যাবে।

আমিও ঘরে চলে গিয়ে সোফায় বসে পরলাম। মনে একটাই কথা চলছিল – আমি কি ভাগ্যবান না! যেই সমস্ত গভীর সত্য মানুষ দেহের পর দেহ ধারণ করেও উপলব্ধি করতে পারেনা, আমার এই মা আর বাবার সন্তান হবার জন্য, নিত্য আমি সেই সমস্ত কথাই শুনি। কাঁধে একটা হাত অনুভব করলাম। দিদির হাত। মুখের দিকে তাকাতে দিদি বললেন – কনো কিছুই এমনি এমনি হয়না। কর্ম করেছ, তাই ফল পাচ্ছ।

দুদিন পরে, দুপুর ৩টের সময়ে ভবানীভবনে টাইম ফিক্স হলো। আমি আর বাবা গেলাম। বাবার পারমিশন নিয়ে, আমি আজ ড্রাইভ করেছি। বাবা বললেন, আমি উনার থেকে বেশি ভালো ড্রাইভ করি। শুনে খুব ভালো লাগলো। পৌঁছলাম ভবানীভবন। শঙ্করকাকু আমাদেরকে নিয়ে একটি ঘরে চলে গেলেন। ঘরের কাঁচের দরজা খুলতে, শুনতে পেলাম বিশাল হৈহৈ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। ... ঘরটা বোধহয় সাউন্ডপ্রুফ। বাইরে থেকে একটিও শব্দ আসছিল না।

বাবা একটু ইতস্তত করলেন ঘরে ঢুকতে। মুখ্যমন্ত্রী আর চোখে বাবার দিকে দেখে বললেন – আরে এসো বিজয়। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

একটি ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছিলেন সেই ঘরে। মুখ্যমন্ত্রী উনার দিকে তাকিয়ে বললেন – আপনি এখন আসুন। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করার আছে আমাদের।

ভদ্রলোক এবার বাবার দিকে তাকিয়ে উঠে বললেন – বিজয়, মানে বিজয় সিংহ! ... ওই সে, যে আশ্রম, তারপর সিনেমার স্টারদের, তারপর এই তো এলিয়ানদের কেস শলভ করেছে! ...

রথিনকাকা বললেন – স্যার, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। বিজয় আপনার কথা শুনবে। ... আগে আমাদের একটা আলোচনাটা সেরে নিই।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠে বললেন – আর কতদিন অপেক্ষা করবো আমি! ... সাত বছর ধরে অপেক্ষা করেই তো রয়েছি। ... আমি আমার মেয়েকে ফেরত চাই। ব্যাস। ...

ভদ্রলোক পাগলের মত বাবার দিকে ছুটে এসে, বাবার হাতটা খপ করে ধরে নিয়ে বললেন – বিজয়, বিজয় ... আমার মেয়েকে খুঁজে দাও, বিজয়।

মুখ্যমন্ত্রীর বোধহয় এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। ... উনি চেঁচিয়ে উঠলেন এবার। আমি উনাকে এইভাবে মেজাজ হারাতে আগে কনোদিন দেখিনি। চেঁচিয়ে উনি বললেন – থ্রো ডিস ম্যান আউট ফ্রম হেয়ার।

সেই ভদ্রলোকও এবার চেঁচিয়ে উঠে বললেন – ইউ ক্যান-নট ডু ডিস টু মি। আই এম এন এক্স সিবিয়াই অফিসার। ... আর আমার কাছে ইনফরমেশন আছে, আমার মেয়েকে এখানেই ওই হতচ্ছাড়া ডক্টরটা লুকিয়ে রেখেছে, ইয়েস এই বেঙ্গলেই। ... আই ওয়িল কল প্রেস। ... সবাইকে বলবো। আপনি একজন অপদার্থ চিফমিনিস্টার, আপনি আপনার রেস্পন্সিবিলিটি পালন করতেই জানেন না। ... আমার মেয়েকে আপনার পশ্চিমবঙ্গে লূকিয়ে রাখা হয়েছে, আর আপনার পুলিশ, সিয়াইডি কেউ তাকে খোঁজার চেষ্টাই করছে না!

বাবা এবার মুখ খুললেন – স্যার, আপনি সাত বছর ওয়েট করেছেন তো। প্লিজ আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। ... আমি আপনার কথা শুনবো। ... স্যার শুধু আমাকে কিছু কথা বলবেন বলে, এখানে ছুটে

এসেছেন। স্যারকে একটু ছেড়ে দিই। তারপর আপনার কথা শুনবো। আই প্রমিশ। ... আর যা করলে, আপনার মেয়ে ফিরে আসবে, সেই চিন্তাও আমরা করবো। ... আই কনফার্ম স্যার। ... আপনি প্লিজ আধঘণ্টা একটু বসুন বাইরে। ... আমি আপনার কাছে যাচ্ছি। ... প্লিজ স্যার।

ভদ্রলোক এবার একটু শান্ত হলেন। বললেন – ঠিক আছে, তুমি বলেছ, তাই বসছি। আই ট্রাস্ট ইউ। আদারঅয়াইজ আই ট্রাস্ট নবডি অফ ডেম।

শঙ্করকাকু ভদ্রলোককে নয়ে গিয়ে বাইরে বসালেন। আমি আর বাবা এবার এসে টেবিলের পাশে দুটো খালি চেয়ারে বসলাম। আমাদের অপরিচিত একটিই লোক ছিলেন সেখানে । উনিই নিশ্চয়ই মিস্টার বিজরিয়া হবেন। ... উনি মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন – এটা আবার কি কেস স্যান্যাল। তোমাকে ফলো করতে করতে, এখানে চলে এসেছে!

মুখ্যমন্ত্রী – আর বলো কেন! এ এক বিচিত্র কেস। ইনি একজন সিবিয়াই অফিসার। বছর তিনেক হয়েছে রিটায়ার করেছেন। যখন ক্রাইমটা হয়েছিল, তখন উনি সার্ভিসে। নিজে নিজের মেয়েকে খুঁজে বার করতে পারলো না, একজন সিনিয়ার সিবিয়াই অফিসার হয়ে, আমাদের কাছে এসে, মাথা নষ্ট করছে।

বিজরিয়া – ক্রাইম! ... উনি যে বলছিলেন, মেয়ে নিখোঁজ!

মুখ্যমন্ত্রী – নিখোঁজ হবার আগে, অনেক রক্তপাত হয়েছে। ... কি একটা বিদেশফেরত ডাক্তার আছে। সেই ডাক্তার নাকি ইনার বড়মেয়েকে আর বড়জামাইকে এসিড খাইয়ে মেরে ফেলেছে। তারপর, উনার ছোটমেয়েকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ... সাত বছর আগে থেকে নিখোঁজ। আজকে নাকি কি ভাবে ও খবর পেয়েছে যে ওর মেয়েকে এই বাংলায় আটকা রাখা হয়েছে। ব্যাস এখানে এসে হুজ্জতি শুরু করে দিয়েছে। ... ছাড়ুন অসব ফালতু কেস ... আলাপ করিয়ে দিই, এই হলো বিজয় সিংহ, আর ওর এসিস্ট্যান্ট কাম ডটার, মিলি সিংহ। ... আর বিজয়, ইনি হলেন মিস্টার বিজরিয়া। ... ইনারই ছেলে আজ থেকে এক বছর আগে খুন হয়েছিলেন। ... কিন্তু সেই তদন্ত করেও আমরা কনো কুলকিনারা পাইনি।

বিজরিয়া – ওয়েট ওয়েট ... ওয়েট ওয়ান মিনিট। ... উনি কে? কনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ, নাকি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স!

বাবা – সরি স্যার, আমি এগুলোর একটিও নই। প্রফেসানালি, আমি একজন ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার মাত্র।

বিজরিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে পরে, রেগে মেগে বললেন – আর ইউ অল জোকিং উইথ মি! ... ডু আই লুক লাইক আ জোকার!... যেই কাজ পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট করতে পারলোনা, সিয়াইডি করতে পারলো না, সেই কাজ একজন রিপোর্টার করবে! ... ইউ ... ব্লাডি!

মুখ্যমন্ত্রী একটু গলা চড়িয়ে বললেন – মিস্টার বিজারিয়া।

একরকম ধমকই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা। আবার বললেন উনি – দেখুন মিস্টার বিজরিয়া, গলা চড়াবার চেষ্টা করবেন না। ভুলে যাবেন না আমি একজন পলিটিকাল লিডারও। কনো সঙ্গীত শিল্পী নই। গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিয়েই আজ আমি এখানে। ... তাই গলার জোর আমার আপনার থেকে অনেক বেশি। ... আপনি একজনের সম্বন্ধে না জেনেই, এমন মন্তব্য করে দিলেন! ... আপনি জানেন, বিজয় কে? ... আপনি কি ভাবলেন! এমনি এমনি একটা রিপোর্টার আর তার মেয়েকে ডেকে নিয়ে এসে আমি এখানে চা খেয়ে ফুর্তি করতে এসছি!

বিজরিয়া এবার একটু থিতিয়ে গিয়ে বসলেন, তারপর মুখ্যমন্ত্রী রথিনকাকার দিকে তাকিয়ে বললেন – রথিন, বিজয়ের সম্বন্ধে উনাকে যা বলার আছে বলো।

রথিনকাকা, এবার মিস্টার বিজরিয়াকে বললেন – স্যার, পারসোনালি, ও আমার খুব কাছের বন্ধু। ... তাছাড়া, আমাদের সম্পূর্ণ সিয়াইডি টিমকে ও লিড করে, আশ্রমে একটা ট্র্যাফিকিং কেস হচ্ছিল, সারা দেশ জুরে, সেটা সর্ট আউট করে। ... আপনি ব্যস্ত মানুষ হয়তো, খবর রাখেন না এইসবের। ... তারপরেও অনেক কেসে, যা পুলিশ আর আমরা সিয়াইডি পারিনি, সেটা কখনো আমাদেরকে লিড করে, আবার কখনো একাহাতে বিজয়ই শলভ করে। ... স্যার, দাবি করে বলতে পারি, এই শহরে অন্তত, ওর থেকে বেটার কেউ নেই, যে আনশলভড় কেস শলভ করতে পারে।

বিজরিয়া – রিসেন্টলি কি ও এলিয়ান কেস শলভ করেছে?

রথিনকাকা – হ্যাঁ স্যার, শুধু এলিয়ান নয়; পার্কসার্কাসের মৌলবি কেসের সমাধান করে রায়ট লাগা থেকে পুরো বাংলাকে বাঁচিয়েছে ও।

বিজরিয়া এবার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন – আই এম সরি সিন। ... আসলে, আমার ওই একটাই ছেলে। ... হি হ্যাজ বিন কিল্ড সো ব্রুটালি। ... সিন্স ডেন, আই এম লস্ট।

বাবা – স্যার, আততায়ী কি আপনাকে কনো কল করে হুমকি বা কিডন্যাপ করার মূল্য, এইসব চেয়েছিল!

বিজরিয়া – না না না... ওইসব চাইলে তো বুঝতাম, আমারই কনো কম্পিটিটার, আমাকে ডাউন করার চেষ্টা করছে। ... বাট, নো কলস, নাথিং। ... একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলো না। ... রাতে পুলিশে খবর, সকালে ওর (কেঁদে উঠে) ডেড বডি...

বাবা – এই একবছরে কনো কল বা মেইল, যাকে এই ঘটনার সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে!

বিজরিয়া – নো ... নাথিং।

বাবা – হুম, কেমন ছিলো পড়াশুনায়, আপনার ছেলে!

বিজরিয়া – ব্রিলিয়ান্ট হি অয়াজ। ... ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলো। ... ড্যাট অয়াজ ডা ফার্স্ট টাইম, হি স্টুড সেকেন্ড।

বাবা – আর খেলাধুলায়!

বিজরিয়া – নো ওয়ে। ... পড়াশুনা করবে ও। খেলাধুলা ও করবে কেন? ... কম বয়সে খেললে, ফুটবল, ক্রিকেট, এইসব চিপ গেইমস খেলে বাচ্চারা। ... বড় হলে, গলফ, লনটেনিস, এসব খেলতো।

বাবা – সেকেন্ড হয়েছিল বলে, বাড়িতে বকাঝকা করা হয়েছিল নাকি!

বিজরিয়া – সেটা তো পার্ট অফ স্টাডি। তাই না! ... যদি বকাই না হয়, ডেন হোয়াট ইয়িল হি লার্ন! ... কি শিখবে ও যে সেকেন্ড হওয়াটা কনো ফেলিওর নয়। ... ওকে বোঝাতে হবেনা, যে সেকেন্ড আসে, সে ততটাই লুজার, যতটা যে ফেল করেছে। ...

বাবা সমস্ত কথা শুনলেন। একটা কথাও বললেন না। ... সমস্ত কথা হয়ে গেলে, বাবা বলতে শুরু করলেন – শুনুন মিস্টার বিজরিয়া, যিনি খুন করেছেন আপনার ছেলেকে, তিনি একাকী আপনার ছেলেকেই খুন করেননি। তিনি আপনার ছেলের আগেও আর দুইজনকে খুন করেছেন। ... কেন করেছেন, তদন্ত এগোলেই জানা যাবে, বাট হ্যাঁ করেছেন খুন, এটা কনফার্ম। আমি জানি, ইউ মাস্ট নট বি কন্সার্নড এবাউট ড্যাট, বাট আপনাকে এই কথাটা বলার একটা অন্য কারণ আছে। ... একটু ভালো করে শুনবেন, আর বোঝার প্লিজ চেষ্টা করবেন। ... ব্যাপারটা খুবই সেন্সেটিভ।

বিজরিয়া এবার একটু সিরিয়াস হলে, বাবা নিজের চেয়ারটাকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন – দেখুন স্যার, আপনার ছেলে আততায়ী মানে খুনির তৃতীয় খুন, কিন্তু অন্তিম খুন নয়। ... অর্থাৎ, খুনি এখন চুপ করে রয়েছে, কিন্তু সারাজীবন চুপ করে থাকবেনা। ... যেই মুহূর্তে আপনার ছেলের তদন্তে হাত দেব আমরা, সেই মুহূর্তে খুনি আবার জেগে উঠবে, আর নতুন খুন করা শুরু করবে। ... এটাই সিরিয়াল কিলারদের সাইকোলজি। ... ইন ড্যাট কেস, গভার্নমেন্টের উপর এই প্রেশার আসবে যে, রাজ্যে কনো আইন শৃঙ্খলা পালন হচ্ছে না। ...

বাবা আবার বললেন – আই ক্যান এসিওর ইউ ড্যাট, আই উইল ক্যাচ হোল্ড অফ ডি ক্রিমিনাল। কিন্তু প্রথম কথা, এমন কিলারকে হুট করে ধরা যায়না। ওর খুন ধরে ধরে এগোতে হয় ওর কাছে। তাই মাস ছয়েক মত সময় লাগবেই, বাট ধরে তাকে ফেলবোই। ... দ্বিতীয় কথা, এই সময়ের মধ্যে যেই অরাজগতা বিরোধীরা সরকারের এগেন্সটে ছড়াবে, তার আপনার পার্টিফান্ডে ডনেশনের উপর কি প্রভাব পরবে?

বিজরিয়া – হুম, দেয়ার উইলবি মোর ডেথ, এন্ড মোর ... নো প্রব্লেম। ... আই এসিওর, আমার বা কনো বিজনেস পারসেনের ডনেশন একটুও কমবে না। ... এন্ড মোর দেন ড্যাট, যদি খুনি ধরা পরে, তবে আই উইল ডনেট ডবল। আর আই উইল পে ইউ ওয়ান ক্রোর।

বাবা এটা একদমই আশা করেন নি। বাবা বলে উঠলেন – না স্যার, ... আই হ্যাভ নো ডিম্যান্ড।

বিজরিয়া – সেই জন্যই তো দেব। ... থাকলে দিতাম না।

মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন বিজরিয়া - মাই প্রমিজ ঈশ প্রমিজ। ... এন্ড ইয়া, থ্যাংকস... আমি শিওর আমার ছেলের আত্মা এবার শান্তি পাবেই। ... আই ট্রাস্ট ইয়োর ম্যান।

এতো বলে উঠে চলে গেলেন উনি। মুখ্যমন্ত্রী বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন – বিজয়, তুমি উনাকে এটা বলতে গেলে কেন? ওটা তো আমি বলতাম!

বাবা – স্যার, উনি বিজনেস ম্যান। আমি না বলে, আপনি বললেও উনি বুঝতেন, কেন আপনি এখানে এসেছেন আজ। আর আমি বললেও উনি বুঝলেন, আপনারই কথা ছিল শেষের কথাটা । ... বাট, আমি কথাটা বললাম, উনাকে এটা বোঝাতে যে, আমাদের মধ্যে পুরো জিনিসটাই ট্রান্সপ্যারেন্ট। (একটা মুষ্টি হাসি)

মুখ্যমন্ত্রী – মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমায় বাড়িতে ডেকে, তোমার থেকে হিউম্যান সাইকোলজি শিখি। ... বাট ইউ নো, আই ক্যাননট এফর্ড ইউ। ... হুম, ঠিকই বলছি, তোমাকে গভার্নমেন্ট এফর্ড করতে পারে, আমি পার্সোনালি পারবো না।

এই কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে সেই সিবিয়াই অফিসার ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করলে, শঙ্কর আরো দুইজন উনাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছিলেন। ... মুখ্যমন্ত্রী উনাকে পাস কাটিয়ে চলে গেলেন। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন – আপনি কথা দিয়ে কথা রাখেন না, আপনি বলেছিলেন মিটিং হয়ে গেলে, আপনি আমার কথা শুনবেন।

বাবা এগিয়ে গিয়ে বললেন – স্যার, আপনার কথা শুনবো, উনি নন, আমি বলেছিলাম। ... চলুন আমরা বসি একযায়গায়, আর আপনার কথা শুনি। ... চলুন।

রথিনকাকা আমাদেরকে নিয়ে আর সেই ভদ্রলোককে নিয়ে একটা ফাঁকা টেবিলে চারটে চেয়ার যোগ করে বসে, চারটে চা-সিঙ্গারা অর্ডার দিলেন। ... বাবা বললেন – আপনার ছোট মেয়ে নিখোঁজ, আর ডাক্তারও নিখোঁজ। ... আপনার বড় জামাই, আর বড় মেয়ে খুন হয়েছে। ... এই তো? ... আচ্ছা স্যার, বাবা হিসাবে নয়, একজন সিবিয়াই অফিসার হয়ে ভাবুন। কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছেনা, সেই ডাক্তার আপনার বড় মেয়ে আর বড় জামাইকে মেরে, ছোট মেয়েকে নিয়ে ফেরার হয়েছে?

ভদ্রলোক বললেন – সন্দেহ তো হয়, কিন্তু একজন বাবার মন মানতে চায়না। তার এক মেয়ে, অন্যমেয়েকে খুন করে দেবে?

বাবা – আর ভেবে দেখুন, সেই ডাক্তার বাইরে প্র্যাকটিস করতো তাই তো?

ভদ্রলোক – হ্যাঁ, মস্কোতে।

বাবা – তাহলে, আপনার মেয়ে এখানে কি করে থাকবে? ওরা নিশ্চয়ই মস্কোতেই সেটেল হয়ে গেছে। ... তাও আপনার কাছে যখন বলছেন খবর আছে যে, এখানেই আপনার মেয়ে আছে, তাহলে একটা ছবি দিয়ে দিন আপনার মেয়ের। ... রথিন, এই ছবিটা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি থানায় পাঠিয়ে দাও, এমনকি বনদপ্তর আর প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলোতেও। কখনো না কখনো, কোথাও না কোথাও তারা যাবেই, অফ কোর্স যদি এখানে থাকে ওরা। তাহলেই ধরা পরে যাবে।

ভদ্রলোক মোবাইল হাতড়ে, একটা ছবি দেখিয়ে বললেন – এটা হাই গ্রাফিক্সের ফ্যামিলি ফটো। এটার থেকে এই মেয়েটি, এটি আমার ছোট মেয়ে, এটাকে আলাদা করে নেওয়া যাবে?

রথিনকাকা ডাকলেন একজনকে বরুণ বলে। উনি আসলে, উনাকে ছবিটা দেখানো হলো। ... ভদ্রলোক জুমটুম করে দেখে বললেন – হয়ে যাবে?

এই বলে, ছবিটা নিজের একটা ডিভাইসে ট্রান্সফার করে নিয়ে চলে গেলেন। ... বাবা বললেন, এটা আপনার ফ্যামিলি!

ভদ্রলোক – আমার স্ত্রী বাদে সবাই আছে, স্ত্রী প্রায় ২০ বছর হয়ে গেছে মারা গেছেন। ...

বাবা – বাহ, সুন্দর পরিবার ছিল আপনার। দুটি বাচ্চা কার?

ভদ্রলোক এবার ছবিতে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে বললেন – এটা আমার ছেলে আর ছেলের বউ, আর এটা ওদের একমাত্র ছেলে। এটা আমার ছোট মেয়ে, আর এটা আমার বড় মেয়ে-জামাই আর ওদের ছেলে, যদিও ছেলেটা আমার ছোটমেয়ের গর্ভেই হয়। অর্থাৎ শি বিকেম ডা সেরোগেটেড মাদার অফ হার সিস্টার।... এই হলো আমাদের পুরো চাড্ডা ফ্যামিলির ফটো।

বাবা – হুম, ছেলেটা অনাথ হয়ে গেল!

মিস্টার চাড্ডা – মেয়েজামাই খুন হবার আগের দিনই বাচ্চাটা এক্সিডেন্টে মারা যায়। হি ওয়াজ আ ব্রিলিয়ান্ট বয়। আমার ছোট মেয়েই একমাত্র আমাদের পরের জেনারেশানে ব্রিলিয়ান্ট ছিলো, আর ওই ছেলে। ... অল লস্ট।

ছবি প্রিন্ট হয়ে এসে গেল। বাবাকে এনে দেখানো হলো। বাবার মুখে একটা ভাব – আমি দেখে কি করবো? ... তারপর সেই ভাব চেপে নিয়ে বললেন বাবা – দেখুন ঠিক আছে ছবি?

মিস্টার চাড্ডা – হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে।

বাবা – কনো চিন্তা করবেন না। যদি আপনার মেয়ে পশ্চিমবঙ্গে থাকেন, তবে আপনি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। এখন শান্তিতে বাড়ি ফিরে যান।

ভদ্রলোক যেন তৃপ্ত হলেন আর চলে গেলেন।

রথিনকাকু বাবার উদ্দেশ্যে বললেন – ছবিটা!

বাবা – আহ রথিন! উটকো ঝামেলাকে ঝামেলা বললে, মাথায় চেপে বসে। সর্ট আউট করে বার করে দাও। ... ভদ্রলোক কি সব জায়ায় গিয়ে গিয়ে দেখবেন, কোথায় কোথায় তাঁর মেয়ের মিসিং ফটো লাগানো হয়েছে? ... উনাকে বলে, উনাকে উনার সামনে, উনার জন্য একটিভ দেখিয়ে, শান্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দাও ... মিটিয়ে দাও ঝামেলা। ... যাই হোক, রথিন, আমাকে এই তিনটি কেসের সম্বন্ধে পুলিশের কাছে, সিয়াইডির কাছে, হাসপাতালের কাছে, ফরেনসিকের কাছে, যেখানে যা রিপোর্ট আছে, সব কবের মধ্যে দিতে পারবে?

রথিনকাকা – দুদিনের মধ্যে দিচ্ছি। প্রায় সমস্তই রেডি করা আছে। একবার চোখ বুলিয়ে দুইদিনের মধ্যে সমস্ত এরেঞ্জ করে, তোমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

বাবা – ওকে, আজ তাহলে আসি। দুইদিন একটু ভালো করে ঘুমিয়ে নিই। তারপর তো ঘুম উঠিয়ে দেবে ওই সিরিয়াল কিলার, এঁরা সুপার ইনটেলিজেন্ট হয়, জানোই তো।

আমি আর বাবা বাড়ি ফিরে এলাম। গাড়িতে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম – মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে চলে গেল একবারে পাগলটা!

বাবা – সরকারি পোস্ট অদ্ভুত জিনিস মিলি। একবার সেই পোস্ট পেয়ে গেলে, নিজেকে প্রাইম মিনিস্টার মনে করতেও ছাড়েনা লোকে। এ তো সিবিয়াই অফিসার। সিবিয়াই অফিসার, তাই এমনিই রাজ্যগুলোর উপর বিশ্বাস নেই। তাই হয়, রাজ্যসরকারের কর্মী মনে করে কেন্দ্রসরকারের কর্মীরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমায়, আর কেন্দ্রসরকারের কর্মী মনে করে রাজ্যসরকারের কর্মী বাঁশবাগানে জীবন কাটায়। ... আর তাছাড়া, একই সঙ্গে দুই মেয়ে, জামাই, নাতি হারানো, সামান্য শোক নয়। এখনও হজম করতে পারেন নি ভদ্রলোক। ... বড় ব্যাঙ্কের সিবিয়াই অফিসার ছিলেন, তাই মনে করেন, সিয়াইডি, পুলিশ অকম্মার ঢেঁকি। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকে ডিরেক্ট বললেই কাজ হবে; তাই এই পাগলামি।

আমি – না পাত্তা দিলে আবার একশান নিয়ে নেবে, তাই না!

বাবা – হুম, সব থেকে বেশি কোর্টে কেস করে আর পেন্ডিং পরে থাকে সরকারি কর্মীদের করা কেস। সরকারের গুলাম, তাই সরকারের উপর খুব বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থেকে হুট বলতেই কেস ঠুকে দেয়

কোর্টে গিয়ে। আর চাকরি থাকা পর্যন্ত উকিল কেস ঝুলিয়ে রেখে দেয়, শেষে রিটায়ার করে গেলে, আর কেস চালাতে পারেনা, বা চালাবার সাহস করেনা, তাই পেন্ডিং কেস হয়ে যায়। ... কিন্তু সেই সমস্ত কিছু ছাড়াও, এস আ হিউম্যান, উনাকে সান্ত্বনা দেবার মত দুটো কথা বলাটা আবশ্যক মনে হলো আমার। এতো বড় শোক পেয়েছে। অন্তত কিছু করার চেষ্টা চলছে, এতটুকু বললেই উনারা একটু স্বস্তি পান।

আমি – আচ্ছা একজন তদন্তকারীর কি এই মনুষ্যত্ব ব্যাপারটার উপর এতো কন্সেন্ট্রেট করা ঠিক?

বাবা – অবশ্যই ঠিক। ... পেশাগত ভাবে আমরা যাই হই না কেন, তার আগে আমরা একজন মানুষ। তাই যদি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলি, তবে সেই পেশাদারী হয়েও আমরা নিজের সাথেই নিজেরা দ্বিচারিতা করছি। ... মনুষ্যত্ব হারিয়ে ঈশ্বরত্ব ধারণ করা যায়, কিন্তু ঈশ্বরত্ব লাভ করা ছাড়া, অন্য কনো কারণে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলা আমার মতে শ্রেষ্ঠ ক্রাইম।

আমি – ঈশ্বরত্ব কেন?

বাবা হেসে বললেন – বিদিপ্তাদিদি কি বললেন শুনলি না! ... সেই চেতনা, সেই ব্রহ্ম আমাদের এই দেহমন্দিরে আস্তানা নিলে, তবেই আমরা জীবন্ত হয়ে উঠি। ... অর্থাৎ কি? ... অর্থাৎ আমরা সকলেই সেই ব্রহ্ম, সেই ঈশ্বর। সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারার কারণেই আমরা কেউ মনে করে, আমরা মানুষ, কেউ মনে করি আমরা বাঘ, আবার কেউ মনে করি আমরা জীব। ... কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে তিনি দেহ নন, মন; আবার কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে তিনি ব্রহ্ম নন, ব্রহ্মের রাজপোশাক অর্থাৎ আত্মা। ... অর্থাৎ কি? অর্থাৎ আমাদের স্বরূপ হলো ঈশ্বর, আর আমাদের গন্তব্য হলো সেই ঈশ্বরত্বকেই উপলব্ধি করা। তাতেই সমাধি, তাতেই মুক্তি। ... তাই, মনুষ্যত্ব ত্যাগ তখনই করা যায়, যখন ঈশ্বরত্ব অনুভব হয়ে গেছে। তার আগে, মনুষ্যত্ব ত্যাগ হলো নিজের সাথে দ্বিচারিতা, ঈশ্বরের সাথে ধোঁকাবাজি।

চার নম্বর

বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবাকে দেখলাম, চুপচাপ খালি শুয়ে থাকেন। দুদিনের পর রথিনকাকা এসে বাবাকে সমস্ত কেসের ডিটেলস্ দিলেন। তারপর বাবা উঠলেন।

রথিনকাকা প্রশ্ন করলেন – এই দুইদিন কি করলে?

বাবা – সম্ভাবনাগুলোর তালিকা তৈরি করছিলাম।

রথিনকাকা – কিসের সম্ভাবনা?

বাবা – মোটিভের।

রথিনকাকা – কোন মোটিভ, প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ?

বাবা – প্রত্যক্ষ। যতক্ষণ না সেটার হদিশ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পরোক্ষের কনো ছাপও অনুভব করতে পারবে না।

রথিনকাকু ভ্রুকুঁচকে – মানে?

বাবা – মানে এই যে, পরোক্ষ কারণটা খুনির ব্যক্তিগত জীবনের সাথে যুক্ত হয়। আর সেই পরোক্ষ নিজজীবনের ঘটনার থেকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে, খুনি যেই কষ্ট নিজে পেয়েছেন বলে মনে করেন, সেই কষ্ট সবাইকে দেবার চেষ্টা করে, এটাই সিরিয়াল কিলারের সাইকোলজি। ... তাই যতক্ষণ না, প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ ভিক্টিমকে কি ধরনের বা কি মোটিভের কষ্ট দিচ্ছে আততায়ী, সেটা না ধরতে পারছো, ততক্ষণ তার নিজের পার্সোনাল লাইফের সেই ঘটনা, যেখানে রয়েছে পরোক্ষ মোটিভ, সেটার নাগালও পাবেনা।

রথিনকাকু – আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো তো! এই এতো ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং তুমি পেলে কোথা থেকে? ... না ডিটেকটিভদের রচয়িতারা, অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়, সরবিন্দুবাবু, আরথার কোনান ডোয়েল, ইনারা প্রচুর বই পড়তেন, আর তাই নিজেদের ডিটেকটিভ চরিত্রকেও দেখিয়েছেন প্রচুর বই পড়তে। কিন্তু ভাই, আমি তো তোমাকে চিনি। তুমি তো বই বেশি পড়ো না, আর বেশি পড়তে পছন্দও করো না!

বাবা – রথিন, একটা জিনিস জানো কি, পুরাণে বর্ণিত যেই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করার জন্য একই আত্মা, তিনগুনে বিভক্ত হয়ে ত্রিদেব হয়েছেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বটা কোথায়?

রথিনকাকু – যা বাবা! আমি কি কথা বলছি, আর তুমি কি উত্তর দিচ্ছ! ... বললেই হয়, সিক্রেটটা সিক্রেটই রাখবে। আমায় বলবে না!

বাবা – আহা বড্ড অকারণ মাথা খাটাও তোমরা। ... যেটা প্রশ্ন করলাম, সেটার উত্তর দাও না।

রথিনকাকা – অতো জানিনা ভাই।

বাবা – হুম, সেই ব্রহ্মাণ্ডটা হলো (নিজের শরীরের দিকে উপর থেকে তলা পর্যন্ত আঙুল দেখিয়ে) এটা। ... রথিন, এর মধ্যে স্থিত চেতনা হলেন তিনি যাকে পুরাণ কি বলেছে? বিষ্ণুমায়ে, অর্থাৎ যার কারণে বিষ্ণু মায়া করতে পারেন। ... এর মধ্যে স্থিত আত্মাই হলেন ত্রিদেবের স্বরূপ, আর এর মধ্যের ত্রিগুণ হলেন ত্রিদেব স্বয়ং। এর মধ্যে থাকা মন হলেন আকাশতত্ত্ব অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র; এর মধ্যের বুদ্ধি হলেন জলতত্ত্ব অর্থাৎ বরুণ; এরই মধ্যের প্রাণবায়ু সহ পঞ্চবায়ু হলেন পবন, এরই মধ্যে অনল বা উর্জ্জা হলেন অগ্নি; আর এই মাটির শরীর হলো ধরিত্রী। ... আর এতে যা যা ২৪ গুন রয়েছে, যা দিয়ে সমস্ত দেহ ও পঞ্চভুত চলতে থাকে, তাই হলো চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। ... আর দেবতারা যে হোম থেকে আহার পায়? ... হোম কি? বিশ্বাস, আস্থা, বাসনা, কামনার অঙ্গিকার। ... ভেবে দেখো, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জ্জা, সমস্ত কিছু তাদের প্রতিই আশ্রিত। ... আর অসুর কারা? ... বিকার রথিন, বিকার। ... বিকার কাকে আক্রমণ করে? প্রথম মন, বুদ্ধি অর্থাৎ দেবতাদের, তারপর ত্রিদেবকে ... আর বিকারকে কে দমন করে? ত্রিগুণ যদি না পারে, তবে স্বয়ং চেতনা। ... এই তো পুরাণের ব্রহ্মাণ্ডের কথা, তাই না রথিন?

রথিনকাকা – অরে বিজয়! আমার না সমস্ত ঘেঁটে যাচ্ছে। ... আচ্ছা এসব আমায় কেন শোনাচ্ছ বলো তো! ... বেশ পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ড হলো এই সম্পূর্ণ শরীর, মন, বুদ্ধি, আত্মা চেতনার জগত। ... তার সাথে আমার প্রশ্নের কি সম্পর্ক একটু বুঝিয়ে বলবে?

বাবা একটু মৃদু হেসে – ভাই রথিন, যদি ব্রহ্মাণ্ডটাই এটা হয়, তবে তোমার অজানা কি থাকতে পারে? ... এমন কি আছে ব্রহ্মাণ্ডে, যা তুমি জানো না? ... (আবার হেসে) বই আমাদের জ্ঞান নয় রথিন, জ্ঞান অর্জনের মার্গ দেখায়। ... কোন মার্গে চললে, জ্ঞান অর্জন হবে, তা বলে। জ্ঞান প্রদান করার ক্ষমতা, মন, বুদ্ধি, শরীর, আত্মা কারুর নেই। ... স্বয়ং ঈশ্বরীই হলেন জ্ঞানদা। ... অর্থাৎ একমাত্র তোমার আমার চেতনাই আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন। ... বই আমাদের বলে দেয়, কি ভাবে তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা যায়। জ্ঞান প্রদান করে না বই।

রথিনকাকা – বাবা, আমার ঘাট হয়েছে। ... আর কোনোদিন এইরকম প্রশ্ন করবো না! ... উত্তর তো পেলাম, কিন্তু যা উত্তর দিলে তুমি, এর মানে উদ্ধার করতে আমাকে আরেকবার মানুষ হয়ে এসে তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। তবে যদি বুঝি। আজ চললাম।

বাবা – ঠিক আছে, এসো। কেসটা স্টাডি করে নিয়ে, আমি খুব শীঘ্রই তোমাকে পরবর্তী প্ল্যানের কথা বলছি।

রথিনকাকা চলে গেলেন। আর বাবাও সমস্ত নথিকে এদিক সেদিক করে দেখতে শুরু করে দিলেন। মা মাঝে বললেন – এখানে ছড়িয়ে বসা যাবেনা। ... যাও নিজের ঘরে গিয়ে বসো; ওখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।

বাবাও দেখলাম চলে গেলেন নিজের ঘরে। আর তারপর সেই রাত্রে ঘুমিয়ে ছিলেন কিনা জানিনা। আমার তো মনে হয়, দুইতিনদিন ঠিক করে ঘুমানই নি। ... বাবাই আমাদের বাড়িতে সকালে প্রথম উঠতেন ঘুম থেকে। এখন বিদিপ্তাদিদি ওঠেন। ... কিন্তু এই তিনদিন দেখলাম, মা বাবাকে রোজ সকালে ডেকে দেন। উনিও জানেন, বাবা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকছেন, তাই আটটার সময়ে, চা চাপাবার ঠিক আগে বাবাকে ডেকে বলতেন – উঠে পর, চা চাপাবো।

তিনদিন ধরে আমি বাবার আশেপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, যদি বাবা কিছু মুখ ফাঁক করে কেসের ব্যাপারে বলে দেন। জানি সেটা বাবার স্বভাববিরুদ্ধ। উনি যেই কাজ করেন, তাতে এতটাই মনযোগী থাকেন যে, আশেপাশে কে ঘুরছে, কি করছে, সেই ব্যাপারে সমস্ত হুঁশ তো থাকে, কিন্তু মনোযোগ দেন না। ... মানে ব্যাপারটা এরকম যে, এই দুইদিন কখন কখন আমি বাবার ঘরে গেছি, কি জামা পরে গেছি, আমার মনে নেই, কিন্তু বাবার সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্মৃতি থাকে। ...

অদ্ভুত এই স্কিল, যেটা কপি করেও করতে পারিনা আমি। বাবার ইন্দ্রিয়ের সামনে যা কিছু আসে, বাবা নিজের স্মৃতিতে অকপটে স্টোর করে রেখে দেন, কিন্তু কনো বিচারই করেন না সেগুলোর। যখন সেগুলোর প্রয়োজন পরে, বাবা স্মৃতি থেকে সেগুলো বার করে করে, রোমন্থন করে নেন। ... অনেকটা কম্পিউটারের মতন। যা কপি পেস্ট করা হয়, সমস্ত স্টোর করে রেখে দেয়, কিন্তু কনো ভাবে তাদের ট্র্যাক রাখেনা। যখন প্লে করা হয়, তখন দিব্যি খুলে দেয়। ... কিন্তু এখানে একটা কম্পিউটারের সাথে বাবার পার্থক্যও আছে। কম্পিউটারের মেমরির লিমিট আছে, কিন্তু বাবার নেই; আর কম্পিউটারের মেমরির অনেক কিছুই সময়ের সাথে সাথে কোরাপ্ট হয়ে যায়, কিন্তু বাবার তা হয়না।

যাইহোক, এই তিনদিন পরে, আমার আশেপাশের উপস্থিতিকে বাবা গুরুত্ব দিলেন। তাই আমি কাছে গিয়ে বসলাম। বাবা জানেন আমি কি জানতে চাইছি; তাই বিবৃতি দিতে থাকলেন কেসের।

উনি বললেন – সিরিয়াল কিলারের সিরিয়াল মার্ডারের মোটিভ জানতে গেলে, কি খুঁজতে হয় তাঁর করা ক্রাইমের থেকে?

আমি – কমন ফ্যাক্টরগুলো। কারণ সেই কমন ফ্যাক্টরগুলো সব মিলিয়েই তাঁর সিগনেচার হয়।

বাবা – ভেরি গুড। এই তিনটে খুনের ব্যাপারে কি কি কমন ফ্যাক্টর তুই জানিস ইতিমধ্যে?

আমি – এই তো, সব কটা বাচ্চা, মানে তিনটে বাচ্চাই ক্লাস সিক্সে পড়তো। তিনজনেরই ডেডবডি স্কুল ইউনিফর্মে পাওয়া যায়, আর ... আর ... আর কি? আর তো কিছু জানি না?

বাবা – হুম। যা জানিসনা সেগুলোর মধ্যে প্রথম হলো এই যে, তিনটে বাচ্চার ক্ষেত্রেই কনোরকম বাড়ির লোকের সাথে যোগাযোগ করা হয়নি, বা কনো টাকা চাওয়া হয়নি। ... অর্থাৎ কেন খুন করা হয়েছে?

আমি – খুন করার জন্যই খুন করা হয়েছে। ... মানে অন্য কনো উদ্দেশ্য নেই, খুন করাটাই উদ্দেশ্য।

বাবা – উমহুম, ভুল হলো। অন্য কনো উদ্দেশ্য নেই, এমন বলা সম্ভব নয়। বা বলা উচিত, উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু তা তো আছেই, কারণ সিরিয়াল কিলার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যা ঘটেছে, সেই মোটিভকে পিছনে রাখে, আর সমাজের কনো একটা অভ্যাসের বিরোধিতা করছে সে, সেটাই সামনে রাখে। ... কিন্তু এখনও সেই উদ্দেশ্য সামনে আসেনি আমাদের। ... হ্যাঁ, যোগাযোগ বাড়ির লোকের সাথে করা হয়নি, এবং কনো রকম টাকা চাওয়া হয়নি বা হুমকি দেওয়া হয়নি। এর মানে টাকার জন্য কাজ করা হচ্ছে না। অজানা অন্য কনো উদ্দেশ্য আছে।

একটু থেমে গিয়ে, আবার বললেন – পরবর্তী কমন ফ্যাক্টর একটা রয়েছে। হতে পারে সেটা কাঁকতলিয়, বা হতে পারে কিলার ইন্টেন্সানালি বা মোটিভ বোঝানোর জন্যই এমন স্যাম্পেল তুলেছে। ... সেটা হলো, যেই তিনটি বাচ্চাকে মারা হয়েছে, সবকটা ক্লাসের কৃতি ছাত্র। ... সকলে ভীষণ ভালো স্টুডেন্ট, এবং ক্লাসে ফার্স্ট হতো, এমন বয়ান দিয়েছে, তাদের মাবাবা।

আমি – বিজরিয়ার ছেলে ফার্স্ট হতো, সেইবারে সেকেন্ড হয়েছিল, আর তার জন্য বাড়িতে বকাঝকা করা হয়েছিল।

বাবা – হুম, ... আরো বল... এই ব্যাপারে।

আমি – আর কি ... হ্যাঁ, বিজরিয়া বললেন, সেকেন্ড হওয়া আর ফেল করা, দুটোই এক। ... মানে ...

বাবা – মানে কি, বল।

আমি বুঝতে পারলাম আমি কনো ক্লু-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তাই বাবা আমাকে আরো বলতে বলছেন। তাই একটু ভেবে বলার চেষ্টা করলাম – মানে এই যে, সন্তানের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হতো।

বাবা – একজ্যাক্টলি। সন্তানের উপর মাবাবা অত্যন্ত চাপ সৃষ্টি করতো। আর এটাই হলো তিনটে খুনের মধ্যে আরো একটা, আর লাস্ট খুঁজে পাওয়া কমন ফ্যাক্টর।

আমি – কিন্তু খুনি জানলো কি করে সেটা?

বাবা – ভেরিগুড কয়েসচেন। খুনি কি করে জানছে যে কার উপর তাদের বাবামা বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করছে? সোর্সটা কি?

আমি – আচ্ছা বাবা, বাচ্চাগুলো কি একই স্কুলের?

বাবা – না, সেটা হলে তো মিটেই যেত। সরাসরি সেই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত টিচার, হাউজকিপার সবার উপর সন্দেহ পরতো।

এই বলে বাবা মাথাটা সোফায় এলিয়ে দিলেন। আমি আবার বললাম – এর মানে, কিলারের এটা আপত্তি যে মাবাবা বাচ্চাদের উপর অমানুষিক প্রেশার সৃষ্টি করে, তাদের ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগী করে তোলেন। ... তাই তো?

বাবা – হুম, কিন্তু এখন সেটা ভাবার বিষয় নয়। ওটা লাস্টে ভাবার বিষয়, মানে সিরিয়াল কিলার কেন সিরিয়াল কিলিং শুরু করলেন, সেই তথ্য উদ্ধারের সময়ে এটা ভাবার। এখন ভাবার হলো কি ভাবে স্কুলগুলোর সাথে, আর বাচ্চাগুলোর সাথে কিলার কানেক্টেড। ... বাড়ির খবর পাচ্ছে, মানে বাড়িতে কি বলা হচ্ছে সেই খবর পাচ্ছে। আবার স্কুলে ফার্স্ট না হয়ে সেকেন্ড হয়েছে, সেই খবরও পাচ্ছে। ... কি করে?

আমি – বাড়ির কাজের লোক? সে তো বাড়িতেই এই খবর পাচ্ছে, তাই না!

বাবা – হুম, গুড পয়েন্ট। ... তিনটে বাড়ির কাজের লোক আর ড্রাইভারদের তুলতে বলি প্রথমে, তারপর দেখতে হবে যে তারা কনো একই মানুষের সাথে কানেক্টেড কিনা। যদি কানেক্টেড হয়, তবেই আমরা ঠিক দিকে এগচ্ছি।

বাবা দেরি না করে, রথিনকাকাকে ফোন করে বলে দিলেন, কাজের লোক আর ড্রাইভারদের কাস্টডিতে একসঙ্গে করার জন্য। একদিনের মধ্যেই রথিনকাকা কাজ করে ফেললেন। আর বাবার কথা মত, একটু মিডিয়াকে জানিয়েই করলেন কাজটা। ...

আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম – মিডিয়াকে জানিয়ে করতে বললে কেন বাবা?

বাবা – যদি কিলার এই পরিবারগুলোর ক্ষতি করার মানসিকতা থেকে তাদের বাচ্চাকে খুন করার চেষ্টা করে, তবে এই পরিবারগুলোর উপর সে নজরদারি তো করছেই। ... আর তাই যদি হয়, তবে এই পরিবারের উপরে সে কনো রকম একটা প্রেশার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবেই। ... আর যদি তা না হয়, তবে আমরা ভুল পথে যাচ্ছি, সেটা বোঝাতে সে আরো একটা খুন করবে।

আমি – এটা কেরকম খেলা বাবা! ... তুমি আর খুনি, দুইজন দুইজনকে জানোও না, চেনোও না; কিন্তু দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা মেরুতে বসে, একে অপরের সাথে গেম খেলে যাচ্ছ!

বাবা – হুম, গেম না খেললে, তার কাছে আমরা কনোদিনও পৌছাতে পারবোনা মিলি। ... চল, একটু ভবানীভবন থেকে ঘুরে আসি।

আমরা সেখানে গিয়ে জানলাম, কাজের লোকরা সকল পরিবারের নিজের এপয়েন্ট করা, আর তাদের মধ্যে কনোরকম যোগসূত্র নেই। না তারা একে অপরকে চেনে; না তাদেরকে কেউ একই ব্যক্তি সাপ্লাই করেছে, আর না যারা সাপ্লাই করেছে, তারা একে অপরের সাথে কনোভাবে কানেক্টেড।

আর একই জিনিস ড্রাইভারদের ক্ষেত্রেও। ... কেউ কনোভাবেই একে অপরের সাথে কানেক্টেডই নয়। না প্রত্যক্ষ ভাবে, না পরোক্ষ ভাবে। ... আমাদের সন্দেহ ভুল দিকে যাচ্ছে। ... বাবা সকলকে ছেড়ে দিতে বলল। সবটাই বেকার হয়ে গেল।

বাবা ভয় পেলেন কিনা জানিনা, তবে আমি এবার একটু ভয় পেয়ে গেলাম। আমরা ভুল পথে গেলে, আবার খুন করবে, বাবা বলেছিলেন। আবার একটা বাচ্চা খুন হবে! ... এইটা ভেবেই হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বাবা বাড়িতে এসে সোফায় বসে পরলো। ... আমি অনেকক্ষণ পরে উনার কাছে যেতে, উনি বললেন – অদ্ভুত ভাবে খুন না! ... ঘুম পারিয়ে, ঘুমের মধ্যে গলার নলি কেটে খুন। ...

আমি – এই অদ্ভুত পদ্ধতি কেন?

বাবা – হয়তো এটা ওর সিগনেচার। ... আর তা না হলে ...

আমি – তা না হলে কি?

বাবা – তা না হলে ... বাচ্চাদের কষ্ট দিতে না চাওয়া। (বাবার ভয়েস নেমে গেল; যেন কনো একটা নতুন আলো দেখতে পেলেন উনি)... মানে, বাচ্চাদের প্রতি খুনি দুর্বল। ... আসলে ... আসলে খুনি বাচ্চার বাবামাকে শিক্ষা দিতে চায়! ...

আচমকা বাবা উঠে পরে বললেন – চল তো মিলি, চার বছর আগের খুন হওয়া বাচ্চার পরিবারে, আর দুই বছর আগের খুন হওয়া বাচ্চার পরিবারের সাথে একবার কথা বলতে হবে। চল।

আমি – এখনই?

বাবা – শুভস্র শীঘ্রম।

আমি আর বাবা চলে গেলাম সল্টলেক। বাড়ির এড্রেস ক্রাইম ফাইল থেকেই পেয়েছিলাম । তাই সরাসরি বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল বাজালাম। নেমপ্লেট লাগানো, অনুপ মাহাতো, সিএ, এফএস, আরো কি লেখা। বেল বাজতে বাড়ির কাজের লোক বেড়িয়ে এলেন। বাবাকে উনি চেনেন। সিয়াইডির দপ্তরে রিসেন্টলি বাবাকে দেখেছেন।

আমাদের নিয়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে বসালেন। বেশ বিত্তবান পরিবার দেখেই বোঝা গেল। আমরা বসে রয়েছি, তখন একজন মহিলা সামনে এলেন।

বাবা – সুপ্রতিম মাহাতোর মা!

ভদ্রমহিলা – হা, আপ ঈশ কেসকো রি-ওপেন কিউ কিয়ে?

বাবা – আপনার কনো আপত্তি!

ভদ্রমহিলা – না না আপত্তি তো একদমই নয়। ... একমাত্র সন্তান আমাদের। ... এমনিই সর্বহারা হয়ে গেছি, সে চলে যেতে। যেই রাক্ষস আমার ছেলেকে খেয়ে নিয়েছে, আমি তো তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখতে চাই।

বাবা – কেস বন্ধ হয়ে গেল কেন?

মিসেস মাহাতো – পুলিশ বলেছিল, কনো কূলকিনারাই পাচ্ছে না তারা। ...

বাবা – কি কি করেছিল পুলিশ?

মিসেস মাহাতো – যেই স্কুল বাসে করে সুপ্র স্কুল যেত, তার ড্রাইভারকে ধরেছিল। কিন্তু ড্রাইভার বলে, সে কি করতে পারে? সুপ্র সেদিন বাসে ওঠেই নি। ... বাসের মধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা দেখা হয়, সেখানেও দেখা যায় যে সুপ্র সেদিন স্কুল থেকে ফেরার সময়ে বাসে ছিলই না। ... স্কুল অথরিটিকে জেরা করা হয়। তারাও সিসিটিভি দেখায় যে, সেদিন সুপ্র স্কুলের কম্পাউন্ড থেকে বেড়িয়ে বাসে ওঠার লাইনে ছিলই না।

বাবা – মানে স্কুল থেকেই গায়েব?

মিসেস মাহাতো – হ্যাঁ।

বাবা – ঠিক আছে, দেখছি আমি। ... আর আপনার হাসব্যান্ড কে দেখছি না তো?

মিসেস মাহাতো – পুলিশ যখন হাল ছেড়ে দিল, তারপর থেকে সর্বক্ষণ মনে তোলপাড় করতে করতে, উনার স্ট্রোক হয়। এখন উনার বাঁদিকটা পুরোপুরি প্যারালাইজ হয়ে গেছে, আর ডান দিকেরও বেশ কিছুটা। ডান হাত চলে, তাই সই করতে পারেন। সেই কারণেই সিএ ফার্মটা চলছে এখনো।

বাবা – অনেক ধন্যবাদ। ... আর নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার ছেলের খুনি ধরা পরবেই। একটু দেরি হতে পারে, তবে পাওয়া যাবেই।

মিসেস মাহাতোর চোখটা একটু ছলছল আর একটু জ্বলজ্বল করে উঠলো। আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম, ভবানীভবনে। বাবা আর আমি গেলাম রথিনকাকার চেম্বারে। আমাদের দুইজনকে ওখানে সকলে

চেনে। আর বাবার বিশাল খাতিরদারি ওখানে। আমরা ঘরে ঢুকতে, রথিনকাকা ল্যাপটপ থেকে মুখ উঠিয়ে – কি ব্যাপার পিতাপুত্রি একসাথে। ... কনো দিশা পেলে নাকি?

বাবা – খুনির দিশা পবো না এর থেকে, তবে খুনির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবো। ... মানে খুনি কি করতে পারে, কি করতে পারেনা, এই সব।

রথিনকাকা – একটু খুলে বলোতো!

বাবা – আমি নই, চারবছর আগে, মিস্টার মাহাতোর ছেলের খুনের তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ছিলেন, সমীর খাঁ। উনি এখন কোথায় আছেন, একটু দেখে বলো।

রথিনকাকা – দাঁড়াও বলছি।

প্রায় পনেরো মিনিট রথিনকাকা ল্যাপটপে মুখ গুজে থেকে, মাথা তুলে বললেন, এখন তিলজলাতে পোস্টিং। ...

বাবা – একবার ডেকে পাঠাও।

রথিনকাকা ফোন করে সরাসরি খাঁ সাহেবকে ফোনে ধরলেন, তারপর রিপোর্ট করতে বললেন ভবানীভবনে। প্রায় আধঘণ্টা পরে, এই বছর ৪০-৪৫ এর এক পুলিশ অফিসার ঘরে এসে, স্যালুট করে বললেন – ইয়েস স্যার, এক্সপেক্টর খাঁ রিপোর্টইং।

রথিনকাকা – মিট হিম। বিজয় সিংহ। উনি মিস্টার মাহাতোর ক্লাস সিক্সের বাচ্চা খুনের তদন্ত করছেন। উনি কিছু বলবেন আপনাকে।

খাঁ সাহেব আমাদের দিকে মুখ করে বসে বললেন – স্যার সিন, আমি আপনার একজন ভক্ত। বলুন স্যার, কি করতে পারি আমি। ... আচ্ছা কোন কেসের কথা বলছেন আপনি?

বাবা – ক্লাস সিক্সের বাচ্চা, স্কুল থেকে উধাও। তারপরে লাস পাওয়া যায়। ঘুম পারিয়ে গলার নলি কেটে খুন, আর একটা আঙুল কাটা।

খাঁ – ওকে ওকে, সল্টলেকের কেস, মিস্টার মাহাতো, সিএ ফার্ম আছে উনার।

বাবা – একজ্যাক্টলি। ... আচ্ছা একটা কথা বলুন, স্কুল থেকে উধাও হয়েছিল বাচ্চা। তো স্কুলে নিশ্চয়ই আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। কি জেনেছিলেন? স্কুলে সেদিন কনো প্রগাম, বা সেই ধরনের কিছু ছিল?

খাঁ – হ্যাঁ স্যার ছিল। সেদিন ওদের স্কুলে একটা সায়েন্স সো ছিল।

বাবা – তাহলে নিশ্চয়ই যারা সায়েন্স সো করতে এসেছিলেন, তাঁদের সাথেও যোগাযোগ করেছিলেন আপনি!

খাঁ – হ্যাঁ স্যার করেছিলাম, ওদের একটা পেটি মিসিং হয়েছিল সেদিন। ... যতদূর মনে আছে স্যার, একজন ওদের মহিলা কর্মী স্কুল থেকে ফেরার সময়ে, ওদের ইনফর্ম না করেই চলে যায়। তার সাথে যেই কিট ছিলো, সেটা মিসিং হয়ে যায়।

বাবা – পরে নিশ্চয়ই স্কুলের বাথরুম থেকে সেটা উদ্ধার হয়, তাই তো?

খাঁ – হ্যাঁ স্যার, তবে কিট পাওয়া যায়নি, অনলি কিটের ভিতরে যা যা ছিল, সেগুলো পাওয়া গেছে।

বাবা – আর সেই কর্মী যে মাঝখান থেকে চলে গেছিল?

খাঁ – স্যার, উনি নাকি সেদিন অসুস্থ ছিলেন, আর উনার কথা হল উনি সেদিন আসেনই নি। ... তবে সেই ট্রুপের মালিক এবং অন্য কর্মচারীদের থেকে জেনেছিলাম, সে এসেছিল। ... আমরা জেরা করে জেনেছি, সেই এমপ্লয়ির ফুড পয়েজেন হয়েছিল, এবং উনি সেদিন বিছনা থেকে উঠতেও পারেন নি, উনার বাড়ির লোকও একই কথা বলেন। ... আর সেই থেকে একটা কনফিউসান তৈরি হয়। আর শেষে কোম্পানির মালিক, সেই কর্মীকে কোম্পানি থেকে তারিয়ে দেয়।

বাবা – হুম। ... তারপর আর কি করেছিলেন আপনি?

খাঁ – স্যার, এরপর তো কেসের কনো দিশাই দেখতে পেলাম না। ... কি করবো, কাকে ধরবো, কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। ... সেই মেয়েটিকে থানায় তুলে এনেছিলাম। মহিলা পুলিশ দিয়ে ওর মুখ থেকে কথা বার করারও চেষ্টা করি। ... তবে আমার শেষে মনে হয়, মেয়েটা সত্যিই বলছিল, ওর সেদিন ডিসেন্ট্রিই হয়েছিল। ওষুধের দোকানেও খবর নিয়ে জেনেছি যে মেয়েটির ভাই, মেয়েটির কথা বলে ওষুধ নিয়ে গেছিল।

বাবা – ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। ... আমার আর কিছু জানার নেই।

খাঁ চলে গেলেন। বাবার দিকে রথিনকাকা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন । বাবা বললেন – কি? ওই ভাবে তাকিয়ে রইছো কেন?

রথিনকাকা – আরে! কিছু বলো, কি বুঝলে সেই ব্যাপারে।

বাবা – ও হ্যাঁ! ... প্রস্থেটিক্স।

রথিনকাকা – প্রস্থেটিক্স!

বাবা – হুম, আততায়ী প্রস্থেটিক সার্জারি জানে।

রথিনকাকা – ভাই তোমার না এই স্টেপজাম্প আমি কিচ্ছু বুঝিনা। ... খাঁ যা বলল, তার সাথে প্রস্থেটিক্সের কিসের সম্বন্ধ!

বাবা – সেই সায়েন্স গ্রুপের কর্মীকে আগের দিন কনো ভাবে খাবারের মাধ্যমে ফুড পয়েজেনিং করা হয়, তারপর প্রস্থেটিক্স ব্যবহার করে, সেই কর্মীর রূপ ধরে চলে যায় আততায়ী। তারপর, বাথরুমে বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া হয়, মানে মিস্টার মাহাতোর ছেলেকে, আর সেখানে খুমের ওষুধ বা ইনজেকশন দেওয়া হয়। ... তারপর, সেখানে কিটের সমস্ত সামগ্রী খালি করে, সেই কিটব্যাগে করেই মাহাতোর ছেলের ঘুমন্ত দেহকে স্কুলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তাই মাঝরাস্তায় সে কেটে পরে। মাঝখান থেকে সেই কর্মচারীটি মিথ্যা অভিযোগে চাকরিটা হারায়। ... আরে ওয়েট ওয়েট... একবার খাঁকে ফোন লাগিয়ে আমাকে দাও। একটা কথা জানার আছে।

রথিনকাকা – বুঝলাম।

বাবা – পরে বুঝবে, আগে ফোনটা লাগাও।

রথিনকাকা – হ্যাঁ হ্যাঁ, লাগাচ্ছি। ...

ফোন করে, রথিনকাকা বললেন – খাঁ, সিন তোমার সাথে একটা কথা বলতে চায়। একবার বাইক পার্ক করে, ফোনে কথা বলে নাও।

বাবাকে ফোন দিলে, বাবা প্রশ্ন করলেন – আচ্ছা ইন্সপেক্টর খাঁ, আপনি তো সেই কর্মীটিকে থানায় তুলে এনেছিলেন না! ...

(উল্টো দিকের কথা)

বাবা – আচ্ছা, মেয়েটার গায়ের রঙ, চেহারা আর হাইট কেমন ছিল?

(উল্টো দিকের কথা)

বাবা – আচ্ছা ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ। সেটাই খালি জানার ছিলো।

বাবা ফোন রেখে দিলেন। রথিনকাকা – কি চলছে বলো তো তোমার মাথায়?

বাবা – আততায়ী প্রস্থেটিক্স করে নিজের মুখ ঢেকে দিতে পারেন, কিন্তু চেহারা তো ঢাকা সম্ভব নয়। তাই নিশ্চয়ই আততায়ী, সেই পুরো গ্রুপের মধ্যে যার চেহারা নিজের সাথে সব থেকে বেশি মেলে, তাকেই টার্গেট করেছিল। অর্থাৎ সেই কর্মীর চেহারা জেনে গেলে, আততায়ীর চেহারাও জানা হয়ে গেল, তাই না!

রথিনকাকা – হুম, রাইট। ... এতো ফাস্ট মাথায় এসব আসে কি করে তোমার! ... যাইহোক, তা কি জানলে?

বাবা – আততায়ী ফরসা, লম্বা, তা প্রায় ৫ ফুট ৮-৯ ইঞ্চি, আর ভারি চেহারার। ... অর্থাৎ, আততায়ী মহিলা না হয়ে, পুরুষ! ... হুম পুরুষ হবার সম্ভাবনাই বেশি। ... এই চেহারার মহিলা তো রেয়ার তাই না। ... আর লম্বা যদি হয়েও যায়, মানে যদি গুজরাটি বা পাঞ্জাবি হয়েও যায়, তারা তো ডায়েট কন্সার্ন, তাই চেহারা ভারি হবে না। ... অর্থাৎ পুরুষই হবে আততায়ী।

রথিনকাকা – না মিলি, মানতেই হবে। ... আমি এতো মানুষ দেখেছি, এরকম ইনটেলিজেন্ট খুব কম দেখেছি, বা বলতে পারিস, দেখিই নি।

বাবা – হুম, দেখো নি ঠিকই। কিন্তু আছে। ... আমাদের আততায়ীই সেই প্রকার ইনটেলিজেন্ট। ... ঠিক আছে, আজ উঠি রথিন। পরের খুন হয়েছে, মিস্টার মহাপাত্রের ছেলের। সেখানে গিয়ে দেখি, গল্পটা কি।

আমরা বাড়ি চলে এলাম। সন্ধ্যায় যাবো ঢাকুরিয়া। সেখানে মিস্টার মহাপাত্রের ফ্ল্যাট। ... বাবা ফোন করে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিলেন। এখানে ভদ্রলোকের ওষুধের ব্যবসা। ... ডিস্ট্রিবিউটার। ... আর উনার ছেলের মৃত্যুর শোকে, উনার স্ত্রী আজ দেড় বছর হয়েছে দেহত্যাগ করেছেন।

আমরা সন্ধ্যায় সেখানে গেলাম। দরজা খুললেন ভদ্রলোকের কাজের লোক। বাবাকে আগে দেখেছেন উনিও সিয়াইডি দপ্তরে। ... আমাদের বসাতেই, ভদ্রলোক পাসের ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন। বয়স ৪০ এর বেশি নয়। কিন্তু বার্ধক্য যেন তাড়াতাড়ি উনার জীবনে এসে গেছে।

বাবা – আপনার এমন শরীরের অবস্থা!

ভদ্রলোক – আর শরীর! ... সবই তো চলে গেছে। ... মরিনি, তাই বেঁচে রয়েছি খালি।

বাবা – হুম, একটু ডিস্টার্বই করছি। আপনার পুরনো অপ্রিয় স্মৃতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হয়তো, সেগুলোকে ভুলে থাকছিলেন। আমার প্রশ্নের জন্য হয়তো, দুইতিন রাত সেই স্মৃতি আপনাকে ঘুমাতে দেবে না!

মিস্টার মহাপাত্র – ঘুম আর এমনিই নেই। ঘুমের ওষুধ আজ দুই বছর হয়ে গেছে, লাগাতার চলছে। মাঝে মাঝে তো মনে হয়, একদিন বেশি করে খেয়ে নিয়ে মরে যাই। ... স্মৃতি রোমন্থন করতে হবেনা মিস্টার সিন। আপনিও তো একজন বাপ। বাবার স্মৃতি থেকে সন্তানের স্মৃতির একটি দিনও কি কখনো মুছতে পারে!

বাবা – ঠিকই। ... আমার প্রশ্ন কি আমি করতে পারি!

মহাপাত্র – হ্যাঁ করুন।

বাবা – আচ্ছা, আপনার ছেলেও কি স্কুল থেকে বেপাত্তা? ... নাকি স্কুল থেকে সে বেড়িয়েছিল?

মহাপাত্র – না, স্কুলের মধ্যে থেকেই। ... স্কুলবাসে না আসার জন্যই তো আমার স্ত্রীকে স্কুলবাসের ড্রাইভার ফোন করেছিল যে আমাদের বাচ্চা স্কুল থেকে আসেনি, আমরা আগে গিয়ে নিয়ে এসেছি কিনা।

বাবা – আপনার ছেলে ভারতীয় বিদ্যাভবনে পড়তো না!

মহাপাত্র – না না, পাঠভবন।

বাবা – হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি। ... আচ্ছা ভারতীয় বিদ্যাভবনের সাথে আপনার ছেলে কি কনো ভাবে যুক্ত ছিল? ... মানে আগে কি ওই স্কুলে!

মহাপাত্র – না তো? ভারতীয় বিদ্যাভবন আমাদের এখান থেকে অনেকটাই দূরে। ... আমরা সেখানে ছেলেকে এডমিশন করানোর কনো চেষ্টাই করিনি কনোদিন।

বাবা –ওকে। ... আচ্ছা আপনার ছেলের স্কুলে, সেইদিন কনো ফাংসান ছিলো?

মহামাত্র – উমম, ... হ্যাঁ ছিলো তো। ফুড ফেস্ট ছিলো। ... অনেকেই খাবার স্টল দিয়েছিল সেদিন।

বাবা – ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ।

আমরা বেড়িয়ে গেলাম। বাবা আমাকে বললেন – পেটার্ন এক। ... একবার রথিনের সাথে কথা বলতে হবে। ফোন করে বাবা বললেন, মহাপাত্রের ছেলের খুনের তদন্ত কে করছিলেন?

রথিনকাকা – পাণ্ডে। ... কিছু লাগবে?

বাবা – কাল অফিসে একটু ডাকো।

রথিন – সকাল সকাল চলে এসো। ওকে বলে দিচ্ছি।

আমরা সকাল ৯টায় ভবানীভবনে হাজির। পাণ্ডেও এসে গেছিল। বাবার সাথে হাইহ্যালো হবার পর বাবা বললেন – মহাপাত্রের ছেলে খুন হবার দিন পাঠভবনের স্কুলের বাথরুম থেকে কিছু উদ্ধার হয়!

পাণ্ডে – হ্যাঁ স্যার, প্রচুর চাউমিন উদ্ধার হয়।

বাবা – কোন স্টলের প্রডাক্ট, জেনেছিলেন?

পাণ্ডে – হ্যাঁ স্যার, তবে স্টলের মালিক বলেন যে তিনি স্টল দিতেই পারেন নি, কারণ উনার মেয়ের উপর কনো একটা অ্যাটাক হবার জন্য, মেয়ের হস্টেলে, অর্থাৎ বীরভূমে উনি চলে গেছিলেন। ... আমরা খবর নিয়ে দেখেছিলাম, ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। আর উনিও সেদিন ওখানেই সারাদিন ছিলেন।

বাবা – হুম, ভদ্রলোককে কেমন দেখতে? মানে... উচ্চতা, চেহারা, গায়ের রঙ?

পাণ্ডে – ফরসা, উচ্চতা এই ৫ ফুট ৯ হবে... হ্যাঁ, ... আর চেহারা বেশ ভালো।

বাবা – ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ। আমার আর কিছু জানার নেই।

রথিনকাকা – প্রস্থেটিক্স... আর সেই একই লোক, তাই তো?

বাবা – হুম, একই রঙ, একই হাইট, একই চেহারা। (একটা জোরে নিশ্বাস)

রথিনকাকার ফোন বেজে উঠলো। রথিনকাকা ফোনে কথা বলে, উঠে দাড়িয়ে পরলেন। ফোন রেখে বললেন – চলো বিজয়, ফর্থ ক্রাইম হয়ে গেছে। ... স্পটে যেতে হবে।

বাবা – সে কি! ... ওকে ... হুম, থার্ড কওয়ারটারলি পরীক্ষার রেজাল্ট কবে আউট হয়েছে যেন?

রথিনকাকা – এটা আবার কি প্রশ্ন! ... হয়েছে, এই দিন ১৫ আগে। কিন্তু কেন?

বাবা – আবার কেউ ফার্স্ট হতো, সেকেন্ড হয়েছে। ... চলো স্পটে যাই।

পঞ্চম

আমরা স্পটে গেলাম। স্পটটা হলো টালার ভাগার। প্রতিবারই লাশ এমন কনো ভাগারেই পাওয়া যায়, আগেই সেটা জেনেছি। ... এবারে যে খুন হয়েছে, সে হলো রানাঘাটের বিডিওর মেয়ে, বীণা সাহা। ... এও কৃতি ছাত্রী। ফার্স্ট হয়, এবারে সেকেন্ড হয়েছিল। বাকিটা একই, চারটে আঙুল কাটা। একিভাবে ঘুম পারিয়ে, গলার নলি কেটে খুন। ... স্কুলের নাম বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন।

স্কুলে কালকে নার্সারি সো ছিল। পাঁচটা সংস্থা এসেছিল সো করতে। ... একজন মালিকের গাড়ি মালিকের কাছে পৌছায়নি। সেই গাড়ি এই ভাগারের পাসেই পার্ক করা ছিল। আর স্কুলের বাথরুম থেকে কিচ্ছু পাওয়া যায়নি এবারে। খবর নিয়ে জানা গেল যে, যিনি সো দেখাতে এসেছিলেন, তিনি বহুদিনের কর্মী, পাঞ্জাবী মহিলা। গায়ের রঙ ফরসা, চেহারা ভারি, আর উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। ... আর খবর নিতে জানা গেল যে, আসল কর্মী পরশু রাত্রে হসপিটালে এডমিট হয়েছে। মাথায় কিছু ভারি জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। এখনো সেন্স ফেরেনি। ... অর্থাৎ যিনি সো দেখাতে গেছিলেন, তিনিই আততায়ী।

রথিনকাকা আজ সন্ধ্যায় বাবার কাছে এসেছেন। খুব চিন্তিত। বলছেন — কি করে যে সমাধান সুত্রে পৌঁছান যায়, কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না বিজয়! ... আমাদের চোখের সামনে, নাকের ডগা দিয়ে খুনি পালিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা কিচ্ছু করতে পারছিনা। ... কোথা থেকে আসছে! ... কি ভাবে খবর পাচ্ছে!... কনো কিচ্ছু বুঝতে পারছিনা! ... শুধু কি ভাবে খুন করছে, সেটা জানছি, আর কিচ্ছু করার নেই, তাই বসে থাকছি!

বাবা - ভারতীয় বিদ্যাভবন, স্কুলে সায়েন্স সো, পুরো প্ল্যান করে প্রস্থেটিক্স করা একজন এলেন, বাথরুমে ঘুম পারালেন বাচ্চাকে, কিট ব্যাগে ভরে নিয়ে চলে গেলেন, মেরে ফেললেন। ... পাঠভবন, স্কুলে ফুড ফেস্ট, আবারও পুরো প্ল্যান করা, প্রথেটিক্সের সাহায্য নিয়ে বাথরুম থেকে ঘুম পারিয়ে চাউমিনের ব্যাগে করে নিয়ে চলে গেলেন। ... বিজরিয়ার ছেলে, সেন্ট থমাস, ম্যাজিক সো, ... ম্যাজিকের সরঞ্জাম বাথরুমে খালি করে, তাতে করে... আর এখানে, বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন নার্সারি সো। ... গাড়ি আছে, তাই কিচ্ছু খালি করতে হয়নি বাথরুমে!

রথিনকাকা — এবার কি শহরের সমস্ত ৫ফুট ৯ ইঞ্চির ভারিসাস্থের সমস্ত মানুষকে কাস্টডিতে নেব! ... সম্ভব এটা! ... নাকি, সমস্ত স্কুলে, সমস্ত প্রগাম ক্যান্সেল করা বন্ধ করার অর্ডার দেওয়া হবে! ... কি করবো, আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না!... একটা স্কুলও নয় যে হ্যাঁ স্কুলের ম্যানেজমেন্টকে ...

বাবা — স্কুল এক না হতেই পারে, কিন্তু স্কুলে প্রভাইড করা হাউজকিপিং স্টাফ, বা ... বা ... হ্যাঁ, রথিন একটা জিনিস খেয়াল করেছ! ... সমস্ত বাচ্চা, যারা খুন হয়েছে, তারা স্কুল বাসে যাতায়াত করতো! ... মে বি... মে বি, এটাই সেই যোগসূত্র। ... রথিন, চারটে বাসের ডিটেলস বার করো। ... দেখো তো, এই চারটে বাসের মধ্যে কনো কানেকশন আছে কিনা। ... সমস্ত কানেকশন দেখবে। ... এমন কি বাস কার নামে রেজিস্টার্ড, সেটাও দেখবে। ... ফাস্ট রথিন। ... আমার মন বলছে, সমাধান সূত্র পেয়ে গেছি। মুভ।

রথিনকাকা তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে গেলেন। ... সন্ধ্যার মধ্যে খবর দিলেন — বিজয়, ইউ অয়ের কারেক্ট। ... চারটে বাসের মালিকই সম্রাট গিল।

বাবা — হুম, পাঞ্জাবী। ... এড্রেস পেয়েছ? ...

রথিন — না, এখনো পাইনি। বাসের ড্রাইভারদের তুলে আনতে বলেছি। ... আজই জেরা করে এড্রেস পেয়ে যাবো।

বাবা – আমি আসছি অফিসে।

আমি আর বাবা বেড়িয়ে গেলাম। রাত্রি তখন ৯টা। ... ড্রাইভারদের সবাইকে তুলে আনা হলো প্রায় ১২টায়। ... জিজ্ঞাসাবাদ করতে জানা গেল এড্রেস। নিউটাউন ন্যাকা ২। ... চেহারার হদিশও পাওয়া গেছে, ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি, ভারি চেহারা, ফরসা। ... কিন্তু মুখে চাপ দাড়ি আর মাথায় পাগড়ী।

রথিনকাকা বিশাল ফোর্স নিয়ে, আমাদেরকে নিয়ে ছুটলেন নিউটাউন। ঘর খুঁজতে খুব দেরি হয়নি। নিউটাউন প্ল্যান সিটি বলেই হয়তো। ... আমাদের সমস্ত গাড়ি বাড়িটার থেকে একজিটের সমস্ত রাস্তা ব্লক করে দিল। আমরা চলে গেলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। সামনে গিয়ে দেখি দরজা খোলা। আমরা তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে একটা গোঙানির আওয়াজ পেলাম।

গোঙানির আওয়াজ ফলো করে, আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে দেখলাম একটা লোক কাতরাচ্ছেন। মাথাকপাল রক্তময়। আমরা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখলাম, মিস্টার চাড্ডা। ... কেউ ভারি কিছু দিয়ে উনার মাথায় আঘাত করেছে। উনাকে তড়িঘড়ি বসানো হলো। ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য ডাক্তার এসে, ট্রিটমেন্ট করলেন। ঘরের তল্লাসি নিয়ে, একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে। ট্র্যাঙ্কুইলাজার দেওয়া হয়েছে বাচ্চাটাকে। এখনো ঘুম ভাঙেনি বাচ্চার।

মিস্টার চাড্ডার হুঁশ এসেছে। ... বাবা প্রশ্ন করলেন – মিস্টার চাড্ডা, আপনি এখানে কি কারণে?

মিস্টার চাড্ডা – আমার পোতা কাহা হে!

বাবা – ট্যাঙ্কুলাজার দিয়েছে কেউ। ঘুমাচ্ছে। হি ঈশ সেফ। ... আপনি কি ...

মিস্টার চাড্ডা – আমার পোতা, আজ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরেনি। ... স্কুলে ফোন করে জানলাম, বাসে উঠেছে। বাসের ড্রাইভারকে ফোন করে জানলাম, বাসের মালিক ওকে হুমকি দিয়ে, ওর কাছে বাচ্চাকে দিয়ে যেতে বলেছে। সে তাকে দিয়ে ফিরছে। ... বাড়ির মালিকের এড্রেস জেনে, আমি এখানে চলে আসি। বাড়িতে একটা গাড়ি পারকিং করা ছিল। নাম্বারটা ডাবলু বি ০৪ডি ৫৪৬২ ... ঘরে ঢুকতে দেখলাম আমার পোতা আসতে আসতে ঘুমের দেশে চলে যাচ্ছে। ... আমি ওকে জাগানোর চেষ্টা করলাম, আর সেই সময়ে আমার মাথায় প্রচণ্ড ভারি জিনিস দিয়ে কেউ আঘাত করলো। ... পিছন ঘুরে একজন পাগড়ী পরা, দাড়ি দেওয়া লোককে দেখতে পেলাম, কিন্তু তারপর আপনাদের দেখলাম।

বাবা – হুম, আচ্ছা আপনার নাতি তো ইস্কুলে ফার্স্ট হতো না, তাই না!

মিস্টার চাড্ডা – না, ক্লাস ফাইভের মামুলি স্টুডেন্ট। পড়াশুনায় মন নেই একদম। ... বাট, তাতে কি!

বাবা – হুম... না না ... কিছু নয়। ... (ফিসফিস করে) সিরিয়াল ব্রেক! কিন্তু কেন?

বাড়ির বিভিন্ন ঘরের তল্লাসি নিতে থাকলেন রথিনকাকু ও আরো কিছু সিনিয়ার সিয়াইডি অফিসার, আর বাবাও। খানিক পরে বাবা একটা ঘর থেকে, হাতে একটা কিছু নিয়ে এসে দেখিয়ে বললেন – মিস্টার চাড্ডা! আপনি এই লোকটাকে দেখেছিলেন!

মিস্টার চাড্ডা একটু চোখ এদিক সেদিক করে, দেখে বললেন – এই রকমই কিছু। পাগড়ীটা এই রঙেরই ছিল।

রথিন কাকা – তারমানে, সম্রাট গিলও ভুয়ো!

বাবা – হুম তাই তো দেখা যাচ্ছে।

এই বলে বাবা বসে পরলেন, খানিকক্ষণ। ... তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পরলেন। আবার মিস্টার চাড্ডার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন – আচ্ছা, আপনার নাতি, মানে বড়মেয়ের ছেলে যেন শিলিগুড়ির কোন স্কুলে পড়তো! ...

মিস্টার চাড্ডা – শিলিগুড়ি সেন্ট জেভিয়ারস।

বাবা আবার বসে পরলেন সোফাতে। তবে এবার বাবার মুখের ভাব পালটে গেল। একটা মুচকি হেসে বললেন উনি – মিস্টার চাড্ডা, আপনাকে এখানে পেয়ে যাবো ভাবিনি। আসলে, আপনাকে খুব শীঘ্রই আমি কন্ট্যাক্ট করতাম। ... আপনার জন্য একটা ভালো খবর আছে। ... আপনার ছোট মেয়ে, কি যেন নাম ... ডক্টর সুনেইনা চাড্ডা, তাই না। ... হ্যাঁ, গাইনোকলজিস্ট। ... উনাকে পাওয়া গেছে। আপনার শিলিগুড়ির বাংলোতেই আছেন উনি। ... আপনি নিজের এড্রেসে না দেখে, এদিক সেদিক কোথায় কোথায় খুঁজছিলেন উনাকে। ...

মিস্টার চাড্ডা (আনন্দের সাথে) – আর ইউ শিওর!

বাবা – হ্যাঁ একদম। পাক্কা খবর। আচ্ছা, রথিন, শঙ্করের সাথে মিস্টার চাড্ডাকে শিলিগুড়ি পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে তিনটি ড্রাইভারও পাঠিও। ... একেবারে মিস্টার চাড্ডা নিজের মেয়েকে নিয়েই এখানে ফিরবেন। ...

রথিনকাকা একটু বিরক্ত হয়ে – হ্যাঁ দিচ্ছি। কিন্তু তিনটে ড্রাইভার কি হবে?

বাবা – বা রে, এতটা পথ, একজন চালিয়ে যাবে, একজন চালিয়ে আসবে। ... আর উনার মেয়েও তো এখান থেকে ফিরবেন না কি! ... তাই উনার গাড়িটাও তো কেউ চালিয়ে নিয়ে আসবে। ... বাবার সাথে এতদিন পরে দেখা। বাবার সাথে থাকবে না গাড়ি চালাবে। ... রথিন তোমারও না, এইসব কাজ করতে করতে, ফ্যামিলি সেন্সটা পুরো চলে গেছে। ... যাও যাও, তাড়াতাড়ি করো... শঙ্করকে পাঠিয়ে দাও। ... অনেকদিন ওখানে আছেন। আবার ওখান থেকে চলে গেলে, আবার খুঁজে পাওয়া যাবেনা। ...

রথিনকাকা বাবা যেমন বললেন, সেটা খুব বিরক্তির সাথে করলেন। তারপর বাবার সামনে এসে বললেন – এবার কি! আততায়ী আমাদের হাতে এসেও ...

বাবা – হুম, ... আবার কি ... অপেক্ষা। আবার কবে একটা ক্রাইম করবে, তারপর মুভ করা যাবে। ...

রথিনকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন – কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে আমি কি জবাব দেব! ...

বাবা – হুম, আজ, কাল ... এই শঙ্কর, কালকের বিকেলের মধ্যে তুমি ফিরে যাবে, তাই না!

শঙ্কর – হ্যাঁ স্যার। একদম।

বাবা – ভবানীভবনে একবারে হ্যাঁ। ডক্টর চাড্ডা একজন গাইনো। এই কেসে একজন গাইনোর খুব দরকার। ... নাহলে একটা ছেলে আর মেয়ের গণ্ডগোল থেকেই যাচ্ছে। ... বি ফাস্ট, ঠিক হে!

শঙ্কর – ওকে স্যার।

রথিনকাকাকে এতটা বাজে ভাবে বাবার সাথে কথা বলতে কনোদিন শুনিনি। উনি চেঁচিয়ে উঠে বললেন – ওই শালা চাড্ডাকে ছাড়ো বিজয়। কন্সেন্ট্রেট অণ ডা মেন কেস!

বাবা – আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। ... সিরিয়াল কিলিঙের কেস কি অত সহজে শলভ হয় নাকি! ... তুমি এক কাজ করো, কাল রাত্রি ৮টায়, একবার মিসেস মাহাতো, মিস্টার মহাপাত্র, মিস্টার বিজরিয়া, মিস্টার সাহা, আর মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটা মিটিং ডাকো। ... তোমাকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কিচ্ছু বলে মেনেজ করতে হবে না। ... আমি কথা বলে নেব। ঠিক আছে। ... আমার আর একটু সময় লাগবে। ... খুব শীঘ্রই আততায়ী আরো একটা খুন করার চেষ্টা করবে। আর আমরা ওকে ধরে ফেলবো।

রথিনকাকা – কিন্তু কি করে? যেই মুখোস পরে ও কাজগুলো করছিলো, সেটা ও ছেড়ে দিয়েছে। ... এবার ও নতুন মুখোস ধরবে। ... বিজয়, এটা ছেলেখেলা হচ্ছেনা। ... এখানে একটা একটা করে প্রাণ চলে যাচ্ছে। ... আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ড্যাট!

বাবা – রথিন, ট্রাস্ট মি। আমরা শেষের দিকে এসে গেছি এই কেসের।

রথিনকাকা – না বিজয়, আমারই এখানে তোমাকে ইনক্লুড করা ঠিক হয়নি। ট্রাফিকিং একরকম, চুরি বা একটা খুন একরকম। সিরিয়াল কিলিং আমরা কেউ ধরতে পারিনি, তুমি ধরে দিয়েছ; তারজন্য থ্যাঙ্ক ইউ। ... বাট, আমারই ভুল হয়েছে; সিরিয়াল কিলিং মানে মৃত্যুর তাণ্ডব। ... সেখানে আমার তোমাকে ইনক্লুড করা ঠিক হয়নি।

বাবা রথিনকাকার কাঁধে হাত রেখে বললেন – তুমি এখন বাড়ি যাও রথিন। কাল আর্লি মর্নিং আমি তোমাকে ফোনে কিছু কথা বলছি। ... এখন তুমি অত্যন্ত ডিস্টার্বড আছো। ... কালকে সকালে যা বলবো, সেটা শুনলে, তুমিও বুঝে যাবে আমরা কেসের শেষের দিকে আছি। ... খুব বেশি হলে আর একটা লাশ পরবে, বা সেটাকেও আমরা আটকে দিতে পারবো। ... বিলিভ মি। ... নাউ প্লিজ গো হোম।

আমি আর বাবাও চলে এলাম। বাবাকে বেশ রিল্যাক্সড দেখাচ্ছে। কেন, বুঝলাম না। ... বাড়ি এলাম তখন রাত্রি তিনটে। খুব ঘুম পেয়েছিল, শুয়ে পরলাম। আর মনে মনে বললাম, ঠাকুর কাল সকাল সকাল তুলে দিও। বাবা রথিনকাকাকে কি বলে আমার শুনতে হবে।

সকালে আমি যেমন উঠি, তার থেকে আগেই উঠলাম। বাবার সন্ধান করলাম। বাবা ব্যালকনিতে। কাছে যেতেই বাবা ফোন কেটে দিলো। শেষ কথাটা শুনতে পেলাম খালি। বাই আর হ্যাঁ, সন্ধ্যায় এসো কিন্তু, উইথ ডিটেলস। ... আর হ্যাঁ, থ্যাঙ্ক ইউ অতনু।

অতনু আঙ্কেল! ... বাবার তো রথিনকাকাকে ফোন করার ছিল!

বাবাকে কিছু প্রশ্নও করতে পারলাম না, কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে এসেছিলাম। তাই সন্ধ্যার অপেক্ষা করলাম। বাবা এই প্রথম একটা মিটিং করতে চলেছেন, যেই মিটিংএর উদ্দেশ্য হলো আততায়ীকে ধরার ছক করার জন্য। ... বুঝলাম, অত্যন্তই জটিল কেস।

সিয়াইডি দপ্তরে

ঘরে সকলেই এসেছেন। আমরা ঢোকার সামান্য পরে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় এলো। সকলে সেই ঘরে গিয়ে বসলাম, যেই ঘরে প্রথমদিন এসে বসেছিলাম। খানিকক্ষণ পরে, অতনুকাকু এসে উপস্থিত হলেন। বাবা বললেন – বাবাই ডেকেছেন উনাকে। এখানে উনার সাহায্যও আবশ্যক।

কি যে হচ্ছে, কেউই ঠিক করে বুঝতে পারছি না। ... মুখ্যমন্ত্রী বললেন – বিজয় আর কারুর জন্য কি অপেক্ষা করার আছে আমাদের!

বাবা – না না, শুরু করা যাক। ...

এই বলে বাবা সবে শুরু করতে যাবেন, অমনি শঙ্কর দরজা নক করে এসে বললেন – বিজয় স্যার, চলে এসেছি।

বাবা – আরে উনাদের পাঠিয়ে দাও। ... মুখ্যমন্ত্রী স্যারও এখানে রয়েছেন। চাড্ডা একবার উনাকে থ্যাঙ্কইউ তো বলে যাক। ... আর উনার মেয়ে খুব বড় গাইনো। উনার মতামতটা আমাদের একটু প্রয়োজন। উনাকেও পাঠিয়ে দাও।

মিস্টার চাড্ডা, আর উনার সুকন্যা ঘরে ঢুকলে, বাবার দিকে তাকিয়ে উনি আনন্দের সাথে বললেন – কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব বিজয় স্যার। ...

বাবা হেসে – আরে আমাকে নয়, চিফ মিনিস্টার স্যারকে থ্যাংকস জানান। উনি যদি তেড়েফুঁড়ে না উঠতেন, এই খবর আমি পেতেই পারতাম না। ... আহা আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

দুটি চেয়ারে উনারা দুইজন বসলে, মুখ্যমন্ত্রী বললেন – বিজয়, এই কেস অত্যন্ত কনফিডেন্সিয়াল; বাইরের কারুর উপস্থিতি কি এখানে থাকা উচিত!

বাবা – বাইরের কেউ তো এখানে নেই স্যার! ... হ্যাঁ মিস্টার চাড্ডা আছেন। উনি পুরো ব্যাপারটা থেকেই অনভিজ্ঞ ঠিকই। তবে এখন অভিজ্ঞ হয়ে যাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী রথিনকাকা আর আমার মুখের দিকে তাকালে, আমরা দুইজনেই মুখের ভাবে বুঝিয়ে দিলাম, বাবার কথার সাথে আমরা দুইজনেও অনভিজ্ঞ।

বাবা – আহা, বুঝতে পারলেন না তো। ... এক মিনিট স্যার। ... আরে মিস্টার চাড্ডা, আপনি যেই গাড়িটার নম্বর দেখেছিলেন না কাল। সেই গাড়িটা আজকে পাওয়া গেছে। ... আপনি বাইরে গিয়ে একবার নম্বরটা মিলিয়ে আসুন। বাইরেই রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী একটু ঝাঁঝিয়ে – বিজয়, মিস্টার চাড্ডা উনার মেয়েকে পেয়ে গেছেন। ব্যাস, উনার কেস শেষ। ...

বাবা – হ্যাঁ স্যার। সরি স্যার। ... আমি আসল কথায় আসি এবার। ... অতনু, সব কিছু এনেছ সাথে!

অতনু আঙ্কেল – হ্যাঁ।

বাবা – রথিন একটু ওর ল্যাপটপতা প্রোজেক্টরের সাথে কানেক্ট করে দাও না!

রথিনকাকা সেই কাজ শেষ করে, বাবার দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকালেন। মুখ্যমন্ত্রীরও দৃষ্টিভঙ্গি তেমনই। আমারও সত্যি বলতে বাবর উপর বিরক্ত লাগছিল। আসল কেস ছেড়ে, ওই চাড্ডার মেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছেন উনি।

বাবা এবার সত্যি সত্যিই স্টার্ট করতে গেলে, ধরমরিয়ে ঘরে মিস্টার চাড্ডা ঢুকলেন। এবার উনাকে দেখে সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু উনি কনোদিকে না তাকিয়ে বললেন – বিজয় স্যার, ওই গাড়িটাই তো ...

বাবা রথিন কাকার দিকে তাকিয়ে ঈসারা করে, কাঁচের দরজাটা লক করিয়ে দিলেন। আর বললেন – হ্যাঁ, আপনি একদমই ঠিক মিস্টার চাড্ডা, ওই গাড়িটাই আপনাদের সাথে শিলিগুড়ি থেকে এসেছে। কারণ ওই গাড়িটা আপনার মেয়ের নয়, ওটা মিস্টার সম্রাট গিলের। ...

এবার আমরা সকলে বাবার দিকে চমকে গিয়ে তাকালাম। বাবা হেসে বললেন – হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। ... আর আরো বড় ঠিক হলো এই যে, এখন এই ঘরে, সেই সম্রাট গিল বসে রয়েছেন।

রথিনকাকা – বিজয় তুমি রসিকতা করছো!

বাবা – রসিকতাই তো করছি, তাই না মিস চাড্ডা!

মিস চাড্ডা - আমি এইসবের কি জানি!

বাবা – ঠিকই তো, আপনি এই সবের কিই বা জানেন। ... আপনি তো এমবিবিএস করেছেন পাঞ্জাব মেডিকাল কলেজ থেকে, তাই না!

মিস চাড্ডা – হ্যাঁ

বাবা – আর গাইনকলজিতে এমডি করেছেন দিল্লি এইমস থেকে। ... তাই তো?

মিস চাড্ডা – হ্যাঁ।

বাবা – কোন সালে পাস করেছেন আপনি যেন?

মিস চাড্ডা – ২০১৪

বাবা – হুম। কিন্তু ২০১৪এর রেকর্ডে আপনার নাম নেই কেন গাইনো ডিপার্টমেন্টের লিস্টে? ... অতনু লিস্টটা একটু দেখাও।

বাবা লিস্ট দেখিয়ে – দেখুন, কোথাও আপনার নাম নেই। কেন? ... কিন্তু মজার কথা জানেন, আপনার নাম নেই তা নয় কিন্তু। ২০১৪তেই আপনার নাম রয়েছে, প্রস্থেটিক ডিপার্টমেন্টে! ... কি করে হলো বলুন তো এমন?

মিস চাড্ডা এবার গলা চড়িয়ে বললেন – আপনি কি বলতে চাইছেন! আমি প্রস্থেটিক ব্যবহার করে, এই সমস্ত খুন গুলো করেছি!

বাবা – আরি বাপরে! ... আপনি কি করে জানলেন, এই খুনগুলো প্রস্টেটিক্স ব্যবহার করে করা হয়েছে! ... অবশ্য আপনি জানবেন না তো কে জানবেন! ... খুনগুলো তো আপনিই করেছেন!

মিস চাড্ডা এবার ধরফরিয়ে পালানর চেষ্টা করলে, বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন – দরজা বন্ধ, আর সকলে আপনার দিকেই বন্দুক তাক করে রয়েছেন। পালাবার চেষ্টা করলে, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবেন। ... আর আমি চাইনা, আপনার এই ভাবে মৃত্যু হোক।

মিস্টার চাড্ডা এবার গলা উঁচিয়ে কিছু বলতে গেলেন – আমার মেয়ে!

এতক্ষণ সকলে বাবার উপর চেঁচাচ্ছিলেন, এবার বাবা গলা ওঠালেন। ... উচ্চস্বরে বললেন – যে যেখানে আছেন, একপাও নড়বেন না। এখন শুধু আমি বলবো। আর সকলে শুনবে।

সকলে কেমন যেমন থতমত হয়ে গেলেন, মুখ্যমন্ত্রীও। সকলের মুখ খোলা কি খোলা রয়ে গেল। আমারও। বুঝতেই পারছিলামনা, বাবা এই অসাধ্য সাধনতা করলেন কি করে!

বাবা এবার সকলের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন – আসলে কি জানেন তো মিস চাড্ডা, আপনি নিজেকে বড্ড চালাক মনে করেন। এটাই সমস্ত ক্রিমিনালদের দোষ জানেন তো। এরা নিজেদের এতো চালাক আর অন্যকে এতো বোকা মনে করে না! সেই জন্যই এরা ধরা পরে যায়। ... আচ্ছা মিস চাড্ডা বা মিস্টার গিল, আপনিই দুটো, ... তাই যেকোনো নামে আপনাকে ডাকলেই হলো। আমাকে একটা কথা বলুন তো, আপনাকে পাকামো মেরে, আপনার বাবাকে মস্কোর ওই হাসপাতালের নাম বলার কি দরকার ছিলো, যেখান থেকে ডক্টর জোন্স এসেছেন!

মিস চাড্ডা মাথা নামিয়ে নিলেন – ম্যাডাম, ডাক্তার জোন্স তো নেই। কাল্পনিক একজন। তো হাসপাতালটাও কাল্পনিক একটা নাম দিতে পারতেন। তাহলে তো আমরা সেখানে খবর নিয়ে জানতেই পারতাম না যে আপনি ৭ বছর আগে সেখানে গিয়ে, নিজের ব্রেস্ট অপারেট করে বাদ দিয়েছেন, আর ইউটেরাসও। ... কি দরকার ছিলো, মিথ্যের মধ্যে একটু সত্যির ছোঁয়া দেবার! ... বাবাকে পুরো মিথ্যে বলতে বিবেকে লাগছিলো নাকি!

মিস চাড্ডার মুখ লাল। আর মুখই তুললেন না উনি। সকলের মুখ হা। কি হচ্ছে, কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না। ... সেই মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন – আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। এমন করে আমার দিকে তাকাতে হবেনা; আমি প্রথম থেকে সবটা বলছি। ... তো শুরু করি শিলিগুড়ি থেকেই। ইন শর্ট আগে বলে দিই, খুন এখানে মিসেস মাহাতো, আপনার ছেলের থেকে শুরু হয়নি। ... খুনের লীলা শুরু হয়েছিল, মিস্টার আর মিসেস কাপুর থেকে, অর্থাৎ মিস্টার চাড্ডা আপনার বড় মেয়ে আর বড় জামাইয়ের থেকে। ... সুনেইনা, আমি যদি কিছু ভুল বলি, প্লিজ রেক্টিফাই মি। ... প্লিজ। যেই দোষ আপনি করেন নি, সেই দোষ আপনি নিজের মাথায় প্লিজ নেবেন না।

বাবা আবার সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন – এই সমস্ত কিছুর শুরু হয় তখন থেকে যখন মিস্টার চাড্ডার বড়মেয়ের আর বড়জামাইয়ের একটা সেরগেটেড মাদারের প্রয়োজন পরে। ... নিজের গর্ভ দিতে রাজি হয়ে, মিস সুনেইনা চাড্ডা চলে এলেন শিলিগুড়িতে, নিজের দিদি আর জামাইবাবুর কাছে। ... গর্ভ

ধারণ করেন, একটি ফুটফুটে ছেলের জন্ম দেন। একপ্রকারে মা তিনিই। তাই মায়ের মতই নিজের সন্তানের দেখভাল করতেন। ... কিন্তু মায়ের অধিকার উনাকে দেওয়া হতো না। ... তবে তাতে উনার কনো আপত্তি ছিল না।

বাবা একটু ঘরের মধ্যে পাক খেতে খেতে বলতে থাকলেন – কিন্তু আপত্তি তখন হতে শুরু করলো যখন থেকে উনার সন্তান, বা উনার দিদির সন্তান স্কুল যেতে শুরু করলো। সিবিয়াই অফিসার মিস্টার চাড্ডার পরের জেনারেশনে, একমাত্র সুনেইনাই ইনটেলিজেন্ট। তাঁর গর্ভে থাকার কারণেই হোক, বা অন্য কারণেই হোক, উনার ছেলে হন ইনটেলিজেন্ট। আর তাই স্কুলে ফার্স্ট আসতে শুরু করার থেকেই, প্রেশার ক্রিয়েট করতে শুরু করে দেয় ওর বাবামা, মানে অফিসিয়ালি যারা ওর বাবামা। ... আর তখন থেকে সুনেইনার মাথা খারাপ হতে শুরু করে।

একটা হাফ ছেড়ে বাবা চেয়ারে বসে বলতে থাকলেন – নিজের গর্ভে ধারণ করা ছেলে, তার উপর দিনের পর দিন প্রেশার বাড়তে দেখে, সুনেইনার মধ্যে কিলার ইন্সটিংটের জন্ম হতে শুরু করে। একটা সময়ের পর, সেই প্রেশার এতটাই বেড়ে গেল যে, সুনেইনার মধ্যে দিদি জামাইবাবুকে খুন করার বিচারও এসে যায়। ... যাতে খুনের দোষ উনার ঘারে না আসে, তাই উনি গল্প ফাঁদতে শুরু করলেন। ...

না না, নিজেকে বাঁচানোর জন্য নয়। বাবামাকে খুন করে ফেলার পর, উনিও যদি জেলে চলে যান, তবে তো উনার ছেলে অনাথ হয়ে যাবে। সেই কারণেই এই গল্প ফাঁদলেন। মস্কোতে উনি দুইবছর প্র্যাকটিস করেছিলেন, যেই মেডিকাল কলেজে, সেই কলেজেরই নাম নিলেন, আর বলতে থাকলেন যে সেখান থেকে একটা গাইনো ডাক্তার এসেছে, ডক্টর জোন্স, আর তিনি এখানে থাকছেন।

বড় জামাই আর বড় মেয়ে দুইজনেই কর্পোরেটএ কাজ করেন। প্রচণ্ড প্রেশার, তাই বাবার সাথে তেমন কথাই হয়না। তাই বাবা, অর্থাৎ মিস্টার চাড্ডা নিজের ছোট মেয়ের কথাকেই বিশ্বাস করতে থাকেন। ... কিন্তু ছোট মেয়ে, মানে সুনেইনা খুন করবে ঠিক করলেও, কিছুতেই খুন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। ... ভয় হয় উনার, হাত কাঁপে। ... আগে কনোদিন করেন নি না, আর খুন করা কি চাড্ডি খানি ব্যাপার! কিন্তু সেই সুযোগও হয়ে গেল।

বাবা একটু মুচকি হেসে – সুযোগ বলা ভুল হবে, বলা উচিত, উনার ভয়টা একদিন হঠাৎই একটা ঘটনার কারণে উড়ে গেল। ... উনার ছেলে, ক্লাসে সেকেন্ড হলো। ... বাড়িতে বাবামায়ের ভয়ঙ্কর বকুনি, হয়তো মারও পরে। হয়তো কেন, সাতবছর আগে, উনার ছেলে, সম্রাট কাপুরের মৃতদেহে একদিন পুরনো মারের দাগ পাওয়া গেছিল, একরডিং টু পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট। ... কি করে মারা গেল সে! ... বাড়িতে মার খেয়ে,

মনের দুঃখে রাস্তায় অসংযত ভাবে চলছিল। অজান্তেই গাড়ির সামনে এসে যায়, আর আর্মির ট্রাকের ধাক্কায় স্পটডেড।

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে – সুনেইনা আর নিজের ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না। ... তাঁর মাতৃত্বে আঘাত লেগেছিল। ... তাঁর মমতায় আঘাত লেগেছিল। এবার তার কিলার ইন্সটিংট সপ্তমে উঠে যায়, আর সে নিজের দিদি আর জামাইবাবুকে এসিড খাইয়ে মেরে ফেলে। ... কিন্তু আমি এই সব জানলাম কি করে, তাই না! ... সুনেইনা, মানে মিস্টার গিল বাচ্চাদের খুন করে আঙুল কেটে দিতো। ... তাই আমি সার্চ করি যে এমন কি কি কেস আছে, যেখানে মৃতের আঙুল কেটে দেওয়া হয়েছে। ... সেই কেস পড়তে পড়তেই, আমি মিস্টার কাপুর আর মিসেস কাপুরের মৃত্যুর খবর পাই। সাত বছর আগে এসিড খাইয়ে মেরে ফেলা হয়। ...

প্রথমে মনে করা হিয়েছিল, সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে স্বামীস্ত্রী এসিড খেয়ে মরেছেন। কিন্তু দুই দেহের পাশাপাশি মৃতদেহকে রাখা হলে, নজর যায় পুলিশের যে, মহিলা ও পুরুষটির, দুইজনেরই একটি করে হাতের পাঁচটি আঙুলই কাটা। ... অর্থাৎ সেটা মার্ডার। ... ইনভেস্টিগেট স্বয়ং মিস্টার চাড্ডা করেন, কারণ তখনও তিনি রিটায়ার করেননি। ... উনি জানতেন যে সেখানে একটা ডাক্তার থাকতেন। তাই তিনি কেসের রিপোর্ট সাবমিট করেন যে সেই ডাক্তার এই খুন করে, উনার ছোট মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়। দীর্ঘদিন উনি মস্কোতে খুঁজেও পাননি, তাই শেষে বিশ্বাস করেন যে এখানেই পশ্চিমবঙ্গে সেই ডাক্তার উনার ছোট মেয়েকে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। তাই এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে চাপ দিতে থাকেন যে তাঁর মেয়েকে খুঁজে দেবার জন্য।

কিন্তু সেই ডাক্তার তো নেই। খুনটা তো করেছেন, ইনিই। কিন্তু সেটা তো তিনি জানেন না। মেয়ের উপর বিশ্বাসের জন্য, তিনি এটাও ভাবতে পারেন নি যে তাঁর মেয়ে খুন করেছে, বা তাঁকে মিথ্যা বলেছে। নাহলে একজন সিবিয়াই অফিসার একটু খবর লাগালেই ডাক্তার জোন্স বলে কেউ নেই, সেটা জানতে পারতেন না! ... কিন্তু সন্তানমোহ! ... হায়।

আবার একটা নিশ্বাস নিয়ে – যাই হোক। এই খুন করার সময়েই সুনেইনার মধ্যে একটা অন্য প্রতিক্রিয়া হয়। উনার মনে হয়, এমনটা তো শ্রেফ উনার সাথেই হয়নি। প্রচুর এমন বাচ্চা আছে, যারা পড়াশুনায় বেশ ভালো, আর তাদের বাড়ি থেকে বিশাল প্রেশার আসে, আর তাদেরকে রেসের ঘোড়া করে দেওয়া হয়। তাই উনি ঠিক করেন যে, এবার তিনি সেই বাচ্চাগুলোকেই মেরে দেবেন, যাদের উপর এমন প্রেশার ক্রিয়েট করা হয়। বাচ্চারাও সেই প্রেশার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, আর মাবাবা বুঝতে পারবে যে, যেই সন্তানের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করছিলেন তাঁরা, সেই সন্তানই যদি না থাকে, তবে কেমন লাগে।

আর সেই কারণে তিনি কলকাতায় চলে আসেন, কারণ কলকাতায় তেমন বাচ্চার আর তেমন মাবাবার সংখ্যা অনেক বেশি। ... নিজের কাজ করার জন্য, প্রথম নিজের একটা ফেক আইডেন্টিটি তৈরি করেন – কি যেন! সম্রাট গিল। ... তারপর সমস্ত ফেক আইডেন্টিটি করিয়ে, পয়সা তো ছিলই, আর প্রস্থেটিক্সও ছিল। উনি একটা অনন্য মেকআপ নিলেন। ... কি ভাবে?

মাঝে উনি মস্কোতে, নিজের পরিচিত মেডিকাল কলেজ গিয়ে, নিজের ব্রেস্টকে শরীর থেকে অপরেট করে বাদ দিয়ে আসেন, আর নিজের ইউটেরাসও, যাতে উনার প্রতি মাসের দুর্বলতা ফেস করতে না হয়, আর পুরুষ বা স্ত্রী, যা কিছু উনি সাজতে পারেন। ... তারপর, বেশ কিছু স্কুলবাস নামালেন। সিসিটিভি তাতে থাকে, আর সর্বক্ষণ তাতেই মুখ গুজে থাকতেন উনি। বাচ্চাদের কথা শুনতেন। আর সেই কথা থেকেই, উনি একটা একটা করে ভিক্টিম সিলেক্ট করতে থাকলেন।

কন্ডিশান উনার ছেলের মতই হতে হবে, মানে ক্লাস সিক্সে পড়বে, ফার্স্ট হবে, সেকেন্ড হয়েছে বলে বাড়িতে মারধর করা হবে। তবেই তিনি তাঁকে ভিক্টিম করবেন । তাই তাঁর সিরিয়াল কিলিংএর কনো সময়ের ঠিক থাকে না, কারণ কখন এমন ভিক্টিম পাওয়া যাবে, তার তো কনো ঠিকই নেই। ... সেই কারণে উনার করা খুনগুলোকে সিরিয়াল মার্ডার বলে পুলিশ আইডেন্টিফাই করতেই পারলো না। ... আর উনি প্রস্থেটিক্স-এর সাহায্য নিয়ে, একের পর এক বাচ্চাকে, স্কুলের বাথরুমে ঘুম পারিয়ে, বাড়িতে নিয়ে এসে, ঘুমন্ত অবস্থায় গলা কেটে, আঙুল কেটে বাদ দিয়ে, ভাগারে গিয়ে পাচার করে আসতেন।

আমি যে এই কেস নিয়েছি, সেই খবর উনি পেয়ে যান। কিন্তু উনার আন্দাজও আমি পাইনি। তাই উনি নিজের মত করেই চতুর্থ খুন, অর্থাৎ মিস্টার সাহার ছেলেকে হত্যা করলেন। ... কিন্তু তারপরেই আমি আর সিয়াইডি টিম যখন উনার বাসের ড্রাইভারদের একসাথে কাস্টডিতে নিই, তখনই সে বুঝে যায় যে, এবার আমরা তাঁর কাছে পৌঁছে যাবো । ... তাই উনি উনার লাস্ট ক্রাইম করার সিদ্ধান্ত নেন। ... আর লাস্ট ক্রাইম হলো উনার নিজের ভাইয়ের ছেলে, অর্থাৎ মিস্টার চাড্ডার নাতি। ... কেন?

বাবা একটু মুচকি হেসে – আসলে, এই ছোট ভাই আর ছোট ভাইয়ের বউই তো, ওঁর বড়দি আর জামাইবাবুকে শিখিয়েছিল যে ছেলের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করতে। ... তাই এই ছেলে কৃতি না হলেও, এর বাবামাকে যে সন্তান হারানোর কষ্ট দেবেনই উনি, সেটা তো উনি ঠিকই করে রেখেছিলেন। ... তাই, মিস্টার গিলের পোশাক ছাড়ার আগে, উনি এই শেষ ক্রাইমটা করে নিতে চাইছিলেন। ... কিন্তু দুটো ভুল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পরে – প্রথম, ভুলে যাওয়া যে ওর বাবা একজন এক্স সিবিয়াই অফিসার ছিলেন। তাই উনি যে ড্রাইভারের থেকে এড্রেস নিয়ে উনার কাছে পৌঁছে যাবেন, সেটা তিনি ওভারলুক করে গেলেন।

... আর দ্বিতীয় এই যে, উনি নিজের ক্রাইমের সিরিয়াল ভেঙে সেই বাচ্চাকে মারার চেষ্টা করলেন, যে ক্লাস সিক্সে নয় ক্লাস ফাইভে পড়ে, আর যে কৃতি ছাত্র বা ছাত্রী নয়। ...

রথিনকাকা – তুমি বুঝলে কি করে, গিলই সুনেইনা!

বাবা – হুম, বিগ কয়েশ্চেন। ... ওই যে বললাম, সিরিয়াল ব্রেক। ... সিরিয়াল ম্যাচ করছেনা, অথচ মাস্টার চাড্ডাকে খুনের চেষ্টা করে, ঘুম পারিয়ে অপহরণ। ... এটা প্রথম সন্দেহ। সন্দেহ হয় যে, খুনি তারমানে এই মাস্টার চাড্ডার সাথে সংযুক্ত, কনো না কনো ভাবে তো পার্সোনাল কানেকশান আছে এই বাচ্চার সাথে খুনির। ... তারপরে! ... তারপর আমার মাথায় সমস্ত কিছু ক্লিক করে গেল। ... শিলিগুড়ি সেন্ট জেভিয়ারসের ব্যাজ নিজের মিস্টার গিলের পাগড়ীতে লাগিয়ে ঘুরতেন। ... মনে পরে রথিন, সেইদিন মিস্টার চাড্ডাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার বড় মেয়ের ছেলে কোন স্কুলে পড়তেন? ... লাস্ট, ওই যে কেসটা আগে দেখে রেখেছিলাম, স্বামীস্ত্রীর মিলিয়ে দশটা আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছিল। ... ছেলেটির নাম সম্রাট ছিল। ... সুনেইনা, এখানে এসেও নিজের নাম রাখে সম্রাট গিল।

তারপর, আর কি। ... এতক্ষণ ধরে যেই গল্প বললাম, সেই গল্পটা পুরোপুরি মাথায় খেলে গেল। ... কিন্তু যদি এরেস্ট করতে শিলিগুড়ি যাওয়া হয়, তবে পাখি উড়ে যাবে, প্রস্থেটিক্স-এর সাহায্য নিয়ে এমন রূপ ধরবে, আর চেনাই যাবেনা । ... তাই মিস্টার চাড্ডাকে বললাম, আপনার মেয়েকে পাওয়া গেছে। শিলিগুড়ি ফার্ম হাউজে সে আছে। ... শঙ্করকে উনার সাথে পাঠাই, আর উনাকে সহ, উনার গাড়িটাও নিয়ে আসি, যেই গাড়ির নম্বর মিস্টার চাড্ডা দেখে রেখেছিলেন, আর সেটাই সুনেইনা বা মিস্টার গিলের গাড়ি বলে এখন উনি আইডেন্টিফাই করে এলেন।

খানিকক্ষণের জন্য নীরবতা ঘরে। তারপর মিস্টার বিজরিয়া বলে উঠলেন – ব্র্যাভো বিজয়। ... আই মাস্ট সে, ইউ আর সিমপ্লি ব্রিলিয়ান্ট। ...

সকলে তারপর বাবার তারিফ করতে শুরু করলেন, শুধু মিস্টার চাড্ডা, আর সুনেইনা ছাড়া। ... রথিনকাকু বাবার কাছে গিয়ে বললেন – আই এম সরি বিজয়। আমি তোমাকে ভুল বুঝছিলাম।

বাবা – ইটস ওকে। ... মিস্টার চাড্ডা, আই এম সরি।

মিস্টার চাড্ডা – ইউ মাস্ট নট বি। ... ইউ আর গুড, রিয়েলি ভেরি গুড। ... আমি এরকম মাস্টারমাইন্ড কখনো স্বচক্ষে দেখিনি, আমার এন্টায়ার সিবিয়াই কেরিয়ারে।

বাবা – আই এম সরি মিস সুনেইনা চাড্ডা। ... আই এম রিয়েলি সরি।

বাবার এই কথাতে সকলে বাবার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন। আমিও ছিলাম তালিকায়। এই ক্রিমিনালটাকে বাবা কেন সরি বলছেন!

বাবা আবার বললেন – আমি বুঝতে পারছি, আপনার মনের মধ্যে দিয়ে কি গেছে। সন্তানকে তো তখনই হারিয়েছেন, যখন জন্ম দিয়েছেন। নিজের সন্তান আপনাকে ম'সি বলে ডাকে। ... তারপর তার উপর অত্যাচার দেখেছেন। মৃত্যু, বা যাকে হত্যাই বলা চলে, সেটাও দেখেছেন। ... আপনার মন সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে গেছিল, বুঝতেই পারছি। ... আপনি সঠিকই অনুভব করেছেন যে, এই কৃতি সন্তানদের উপর, ভয়ঙ্কর ধরনের প্রেশার ক্রিয়েট করে বাবামা। আর শুধু কৃতি ছাত্র কেন, সকল ছাত্রদের উপরই। একপ্রকার নিজদের পোষা জিব করে রেখে দেন। উঠতে বললে উঠবে, শুতে বললে শোবে, পড়তে বললে পড়বে, সাতার কাটতে বললে সাতার কাটবে। ... কিন্তু ম্যাডাম, আপনার বক্তব্য যতই ভালো হোক, আপনার প্রসেস একদমই খারাপ, বা বলা উচিত জঘন্য এবং ঘৃণ্য।

সুনেইনা বাবার দিকে মুখ তুলে তাকাতে, বাবা বললেন – আপনি পালাতে যাচ্ছিলেন। পালালে আপনাকে সকলে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিতেন। ... এমনকি আমি যদি কালকে রথিনকে বলে দিতাম যে মিস্টার গিল আপনিই, আর আপনি শিলিগুড়িতে, তাহলে শঙ্কর নয় রথিন নিজে যেত, আর আপনার ডেডবডি নিয়ে আসতো। ... এতটাই আক্রোশ আপনার উপর সকলের তৈরি হয়ে গেছিল। ... তাই কাল রথিনকেও বলিনি, আর আজকে এই ঘরে ঢোকার আগে, সম্পূর্ণ কেস আমি কারুকেই বলিনি। ... কারণ, আমি চাইছিলাম, আপনি জীবিত থাকুন।

হ্যাঁ ম্যাডাম। ... আপনার লম্বা জেল হবে; হয়তো ১৬-১৭ বছরের জেল হবে। কিন্তু আপনি এখন নিজের থারটিস-এ। ১৬ বছর পর ফিফটিসে যাবেন। তখনও আপনার কাছে আপনার ভুল ঠিক করার সুযোগ থাকবে।

সুনেইনা এতক্ষণের প্রথম কথা বললেন – আমি কিই বা আর করতে পারতাম!

বাবা – খুন করে, কিই বা করতে পারলেন? সেই বাবা মায়ের মনের থেকে এই নিজের সন্তানদের পোষা কুকুর মনে করা বন্ধ করতে পারলেন! ... না ম্যাডাম, হিংসা দিয়ে কখনোই কনো সমস্যার সলিউসান হয়না। এক্ষেত্রেও হয়নি। ... আপনার কাছে প্রচুর পয়সা আছে। ... আপনি চাইলেই ৫-৬টা অনাথকে নিজের কাছে রেখে, সেই মাতৃত্ব দিতে পারতেন। আপনি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। নিজে তাঁদেরকে পড়িয়ে, বড়

করে, সমাজের সামনে নিদর্শন রাখতে পারতেন, কি ভাবে সন্তানের সাথে ব্যবহার করতে হয়। ... কি পারতেন না!

সুনেইনা – সরি স্যার। ... এই বলে কেঁদে ফেললো সে।

বাবা – জেল থেকে বেড়িয়ে, আমি তোমাকে সেই রূপে দেখতে চাই সুনেইনা। তাই তোমাকে কারুর গুলিতে মরতে দিতে চাইনি। ... বাট আই এম সরি, তোমার বিচার সঠিক হলেও, তোমার পদ্ধতি এতটাই খারাপ যে আমাকে তোমায় ধরিয়ে দিতে হলো।

সুনেইনা – স্যার, যা করেছি, তার ফল তো আমাকে ভোগ করতেই হবে। কিন্তু আমার মনে মাতৃত্ব ছিল। তাই বাচ্চাদের মারার সময়ে কষ্ট দিতে চাইনি। ঈশ্বর সেটাও দেখেছেন। তাই তো আপনাকে আমার সামনে এনে, আমার ভুল আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। স্যার, আই প্রমিস, যদি আমার ফাঁসি না হয়, তবে আমি আপনাকে নিরাশ করবোনা। আপনি যেমন বলেছেন, তেমনই করবো।

রথিনকাকারা সুনেইনাকে এরেস্ট করলো। আর সেখান থেকে নিয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী বাবার কাছে, বাবাকে জরিয়ে ধরে বললেন – আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ।

মিসেস মাহাতো, মিস্টার মহাপাত্র সকলেই তেমন বলে চলে গেলেন। মিস্টার বিজরিয়া একটা চেক কেটে বাবার হাতে ধরিয়ে দিলেন, আর বললেন – কথা, কথা। ... এন্ড আই মাস্ট সে, ইউ আর সিমপ্লি এক্সিলেন্ট। ...

বাবা চেকের দিকে তাকিয়ে বললেন – এক কোটি টাকা!!

মিস্টার বিজরিয়া – তেমনই তো কথা দিয়েছিলাম। ... ইউ ডিজার্ভ ইট অলসো।

রথিনকাকা বাবার হাত ধরে বললেন – আই এম সরি বিজয়। ... আই এম রিয়েলি সরি।

বাবা – তোমার যায়গায় আমি থাকলেও, আমিও এমনই করতাম। কিন্তু যদি বলে দিতাম, এতোটাই আক্রোশ জন্মে গেছিল তোমাদের সকলের, যে তুমি সুনেইনাকে এঙ্কাউন্টার করে দিতে। ... তাই বলিনি। ... আই এম সরি ফর ড্যাট।

মুখ্যমন্ত্রী – কিন্তু একজন ক্রিমিনালের প্রতি এমন সহানুভূতি কি ঠিক বিজয়?

বাবা – স্যার, পয়সার জন্য যারা খুন করে, খ্যাতি, নাম যশ, পাওয়ার, এই সবের জন্য যারা খুন করে, তাদের জন্য নো মার্সি। ... কিন্তু সুনেইনা অপরাধী তো অবশ্যই; এতগুলো খুন করেছে। কিন্তু সমস্তটাই করেছে মাতৃত্বের জন্য। ... আর সমাজের একটা নোংরা দিককে দেখে, চোখ ফেরাতে পারেনি বলে। ... স্যার, এরা মন থেকে ক্রিমিনাল নন। এদেরকে পথ দেখালে, এরা সমাজকে অন্য চেহারা দিয়ে দিতে পারে। ভাবুন স্যার, যে মাতৃত্বের জন্য এতো বড় ক্রাইম করে ফেলল, সে চাইলে সমাজে নতুন হিল্লোল তুলতে পারেনা। ... ব্যাস এদেরকে একটু সাপোর্ট করার দরকার। কিছু দিয়ে নয়, মেন্টাল সাপোর্ট। বাকি এরা একাই একশো।

মুখ্যমন্ত্রী – এটাই তোমার বিশেষত্ব বিজয়। অসাধারণ বুদ্ধির সাথে সাথে, তোমার ভিতরের মানুষটা সদাই জাগ্রত থাকে। ... এমনই থেকো সব সময়ে।

সকলে চলে গেলেন। এবারে আমাদের বাড়ি ফেলার পালা। সাথে রয়েছে এক কোটি টাকার চেক । ... সুনেইনার ১৮ বছরের জেল হয়েছিল। ছাড়া পেয়ে সত্যিই সে অনাথাশ্রম খুলেছিল। এড্রেস খুঁজে খুঁজে আমাদের বাড়িতেও এসেছিল সে। কিন্তু বাবা তখন আর জীবিত ছিলেন না। ... তাই আমাকেই নিমন্ত্রণ করে গেছিল। ... বাবা ঠিকই ছিলেন; সুনেইনা আজ একজন সমাজে নামকরা সমাজসেবিকা। ... অনাথআশ্রমের সাথে সাথে বাবামায়েদেরকেও উনি শেখান, কি ভাবে সন্তানকে স্নেহ করে, তাকে সঙ্গ দিতে হয়। ... সেটা দেখে বাবার কথা খুব মনে পরছিল সেদিন।

ট্র্যাপ

বাড়িতে অতিথি

বছর দুয়েক আগে, মায়ের যখন মাথা গরম হয়ে যেত, তখন চেঁচিয়ে উঠতেন – প্রতিভা! এত এত প্রতিভা নিয়ে বসে রয়েছেন, এদিকে মাসের শেষে হেঁসেলে একটা কিচ্ছু নেই, যা দিয়ে সংসার চালাবো।

আসলে বাবা ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার, আর সেই দিয়ে তেমন ভাবে সংসার চলতো না। কনো মাসে কেস পেতেন; সেই মাসে ২৫ হাজার ইনকাম, আবার কনো মাসে কনো কেসই নেই, অর্থাৎ কনো ইনকামই নেই। এখন মায়ের সেই অভিযোগ আসা বন্ধ হয়ে গেছে। ... দুইবছর হলো বাবা একটা একটা করে ৮টা কেসের তদন্ত করেছেন, আর এই ৮টা কেসে লাখ নয়, এবার তো কোটি টাকা ইনকাম হয়ে গেছে। সঙ্গে গাড়ি। প্রচুর ইনকামের থেকে বাড়ি বেড়ে দোতলা হয়েছে।

দোতলায় আমার একটা আলাদা পড়ার ঘর। পড়ার ঘরের পাশে বিদিপ্তা দিদির ঘর। আর আমাদের দুইজনের একটা কমন বাথরুম। আর সামনে একটা বড় ব্যাল্কনি। সেখানে সব সময়ে হাওয়া, আর রোদের সময়ে রোদ। নিচের তোলায়, রান্নাঘর, বাথরুম, খাবার জায়গা, বসার ঘর, আমার আর মায়ের শোবার ঘর, আর তার কোলে বাবার ছোট্ট ঘর।

কত বললেন মা, উপরের ঘরটা বাবা নিয়ে নিক, আর নিচের ছোট ঘরটা বিদিপ্তাদিদিকে দিয়ে দিক। ... আসলে বাবার ঘরটা খুবই ছোট। তার মধ্যে একটা সোফাটাইপ বেড, আর তাকে ঘিরে কাঠের টেবিল, যার নিচেগুলো সব পাল্লাদেওয়া, যেখানে বাবার সমস্ত কেসের নথি, ইন্টারেস্টিং কেসের খবরের কাগজ, সমস্ত থাকে। ... এতই ছোট ঘরটা যে, ঘরে একটা এক্সট্রা চেয়ার নিয়ে যে বাবার সোফার সামনে বসা যাবে, সেই ব্যবস্থাও নেই।

বাবা কিছুতেই কথা শুনলেন না। শেষে মা একদিন জোরাজুরি করতে, বাবা যা কথা বললেন, তারপর আর মা দ্বিতীয়বার উপরের ঘরে বাবাকে চলে যাবার কথা একবারও বললেন না। ... বিরক্ত হয়ে বাবা শেষে বলেছিলেন, দিদি নামে ডাকো বলে ভুলে যেও না, তিনি আমাদের আরাধ্যার সমান। আরাধ্যা নিচে থাকবেন, আর তার মাথার উপর আমরা চলে বেড়াবো! ... মা আর কথা তো বাড়ালেনই না, উপরন্তু নিজের প্রস্তাবে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

সেই সূত্রেই একদিন সন্ধ্যায় চা খাবার সময়ে যেদিন বাবা অনুপ আঙ্কেলের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে গেছিলেন, কেউ উনার সাথে আলাপ করতে চান বলে, তখন মা আমাকে বলছিলেন – তোর বাবাকে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন সংসারের কিছুই বোঝেন না। আমি জোরাজুরি করেছি বলে সংসার করেন। কিন্তু উনি যখন মুখ খোলেন তখন বুঝতে পারি, আমি সংসার করছি ঠিকই, কিন্তু সংসারের সূক্ষ্ম জ্ঞান, আমার নয়, উনারই আছে। ... আমি উত্তরে কিছু বলতে যাবো, একটা গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে পারকিংএর আওয়াজ পেলাম।

দিনের বিশ্রী গরমটা গিয়ে, একটু ঠাণ্ডা হওয়া দিচ্ছিল। তাই জানলার পর্দাগুলো সরানোই ছিল। উকি মেরে দেখলাম, একটা বেশ দামি গাড়ি পারকিং করা হলো, আর তার ভিতর থেকে একজন বেশ সম্ভ্রান্ত মহিলা বেড়িয়ে আমাদের বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে এলেন।

মায়ের দিকে তাকালাম। মা বললেন – নতুন কেস।

বাড়ির কলিংবেলে আওয়াজ হতে, আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। একজন তাম্রবর্ণের পার্লারের কৃপায় খুব টিপটপ একটি মহিলা, পড়নে জিন্স, টি-সার্ট, আর একটা ব্লেজার পরে, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – এটা মিস্টার বিজয় সিংহের বাড়ি!

আমি – হ্যাঁ, বলুন।

ভদ্রমহিলা – হাই, আমি অনিন্দিতা চক্রবর্তী; একটা কেসের ব্যাপারে উনার কাছে এসেছিলাম।

আমি – আচ্ছা, ভিতরে এসে বসুন। বাবা একটু বাইরে গেছেন। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই এসে যাবেন।

ভদ্রমহিলা ভিতরে আস্তে, মা হাতজোড় করে আলাপ করে নিলেন, আর বিদিপ্তাদিদির সাথেও আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি দরজা বন্ধ করে এসে বললাম – আপনিই কি এন্ট্রাপ্রিনিয়ার অনিন্দিতা!

ভদ্রমহিলা – হ্যাঁ, আমিই সে। ...

আমি – ও সো নাইস টু মিট ইউ। ... আপনার মত মহিলারা, আমাদের মত মেয়েদের জন্য এক বিশেষ প্রেরণা। ... এনিঅয়েজ, আমি মিলি। মিলি সিংহ, আমার বাবা বিজয় সিংহের একমাত্র কন্যা, এবং উনার কাজের ক্ষেত্রে এসিস্ট্যান্টও।

অনিন্দিতা – ও, ভেরি নাইস। ... আচ্ছা কেসের কথা কি আপনাকেই বলতে হবে?

আমি – না না, বাবা আসছেন। আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি। ... (আমার ফোনে নোটিফিকেশনের আওয়াজ হলে, ফোনের দিকে তাকিয়ে বললাম) ... উনি রিপ্লাইও দিলেন। ড্রাইভ করছেন। ৫ মিনিটের মধ্যেই আসছেন।

উনার ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলছি, এমন সময়ে বাবার গাড়ির আওয়াজ হতে, আমি বললাম – বাবা এসে গেছেন। আমার বলার মিনিট তিনেকের মধ্যেই বাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। বাবা বসার সময়ে বললেন – নমস্কার।

অনিন্দিতাদি – নমস্কার, আমি অনিন্দিতা চক্রবর্তী।

বাবা – খুনের হুমকি!

অনিন্দিতাদি – হ্যাঁ স্যার। আপনি কি জানেন বিষয়টার ব্যাপারে?

বাবা – না, আপনি তো পুলিশকে জানাননি। ... আপনার মুখের মধ্যে উদ্বিগ্ন ভাব, আর আপনার সাকসেস, আর আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কারুর না থাকা। ... এইতিনটে মেলালে তো এটাই পরে থাকে যে কেউ বা কারা আপনাকে খুনের হুমকি দিচ্ছেন। ... তা কে সে? আপনার পরিচিত?

অনিন্দিতাদি – জানিনা স্যার। ট্রেস করতে পারিনি।

বাবা – হুম, ... তা কিসের মাধ্যমে দিচ্ছে হুমকি? ... মেলে না মেসেজে?

অনিন্দিতাদি – না স্যার, কাগজে ... হাতে লিখে।

বাবা – হুম, তারমানে কনো ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি, যে ইন্টারনেটের ব্যাপারে জানে আর এও জানে যে কনো না কনো ভাবে ট্রেস হয়েই যাবে যদি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে।

অনিন্দিতাদি – কিন্তু ইন্দিভিজুয়াল কি করে বলছেন?

বাবা – ইন্দিভিজুয়াল না হলে, হাতে লেখা হতো না । হুমকি যিনি দিচ্ছেন, তিনি কারুকে বিশ্বাস করেন না। আর কনো সফটকপি রাখতে চান না, নিজের কাজের। ... তাই হাতে লিখে, কাগজে ... এতই যখন অবিশ্বাস, তখন কারুকে সঙ্গে নিয়ে সে কাজ করবে না। ... অর্থাৎ কাগজটা আপনাকে দিয়েছে, সে নিজেই। ... কি ভাবে দেওয়া হয়েছে কাগজগুলো? কারুর হাত দিয়ে নিশ্চয়ই নয়, মোস্ট প্রবাব্লি, দলা পাকিয়ে, ভিতরে ইট ভরে, তাই তো?

অনিন্দিতাদি – হ্যাঁ স্যার। আপনার সম্বন্ধে অনেক শুনেছিলাম। আজ প্রত্যক্ষ করলাম। ... আপনি জায়গায় বসে বসে, এত কিছু দেখে ফেললেন? ... আই এম রিয়েলি ইমপ্রেসড্‌।

বাবা – কিন্তু ইমপ্রেসড্‌ হলেই তো হলো না; আপনি যদি প্রটেকশন চান, তবে সেটা দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই। ... না আমি লাইসেন্সড্‌ ডিটেকটিভ, আর না আমার কাছে কনো অস্ত্র বা ইত্যাদি আছে। ... আপনাকে সেই ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য নিতেই হবে।

অনিন্দিতাদি – কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি আমি সত্যিই সুরক্ষিত থাকবো? ... স্যার, কাগজগুলো আমার দিকে ছোড়া হয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে। প্রথমবার আমি যখন গাড়িতে উঠছি, তখন আমার কোলে এসে কাগজটা পরে। আর দ্বিতীয়বার, গাড়ি থেকে নামার সময়ে, আমার গায়ে কাগজটা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পরে যায়। যে এমন সাহস নিয়ে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে হুমকি দিচ্ছে, আমি কি সিকিউরিটি নিলে বাঁচতে পারবো?

বাবা – হুম, সম্ভাবনা কম। ... স্রেফ তখনই হবেন, যখন আততায়ীকে ধরে ফেলা সম্ভব হবে। ... কি কি হুমকি দেওয়া হয়েছে? কাগজগুলো এনেছেন?

অনিন্দিতাদি এবার নিজের ব্যাগ হাতরে, দুটো কুঁকড়ে যাওয়া কাগজ বার করে দিলেন বাবার হাতে। ... আর বললেন – এটা প্রথমটা, দেওয়া হয়েছিল প্রায় তিন মাস আগে, আর এটা কাল। ...

বাবা চোখ বোলালেন কাগজগুলোতে। আমি পাস থেকে দেখলাম। প্রথমটায় লেখা – কাজবাজ বন্ধ করে, বিয়ে থাওয়া করে, ঘর সামলান। নাহলে ঘোর বিপদ।

দ্বিতীয়টায় লেখা – কথা কানে গেলো না! ... বয়ফ্রেন্ড জয়জিতের স্ত্রী হয়ে, হাতে শাখাপলা পরে, মাথায় সিঁদুর পরে, শাড়ীর আঁচল কোমরে গুঁজে সংসার কর, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে, আমার হাতে কাগজগুলো ধরিয়ে ভল্লেন – কি বুঝলি?

আমি – জয়জিতের সাথে কানেক্টেড।

অনিন্দিতাদি – না না, অসম্ভব। জয়জিত নিজে এই ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। আমিই বরং ওকে বলেছি বিয়ে করার কথা। ও বলেছে, আরেকটু সময় চাই ওর। ... ও নাকি একটা অন্য প্রফেশান খুঁজছে, এই প্রফেশান নাকি ওর ভালো লাগছে না।

বাবা – হুম, ম্যাডাম ...যে লিখেছেন এই কাগজগুলিতে, তার বাংলা অদ্ভুত, কারণ এতে প্রচুর বানানভুল । আর দ্বিতীয়ত, সে নিজের পেন দিয়ে লেখেই কম। ... ইনফ্যাক্ট, প্রথম লেখাটা, মানে তিন মাস আগের লেখাটা লেখার সময়ে, তার বাড়িতে যেই পেন ছিল, সেই পেনের কালিই ছিল না। ... এই দেখুন, প্রথম অক্ষর লেখার সময়ে, অস্পষ্ট ভাবে একটা নীল কালির ছাপ, আর তারপর বেশ কয়েকবার খোঁচান হয়েছে জায়গাটা, অর্থাৎ পেনের কালি শেষ। তারপরের লেখাটা কালো কালি দিয়ে লেখা। ... আর সেই কালিটাও নতুন ডট পেনের, অর্থাৎ যখন বলপেনের বলটা সড়গড় হয়নি, তখনের। ... আর দ্বিতীয় লেখাও সেই একই পেনে লেখা। আর তিন মাসের গ্যাপের পরেও, পেনের বল সড়গড় হয়নি, অর্থাৎ মাঝে পেন দিয়ে কিচ্ছু লেখা হয়নি।

সোফায় নিজের পিঠটা এলিয়ে দিয়ে বাবা – অর্থাৎ, ... হুম। ... আচ্ছা জয়জিত কি করে?

অনিন্দিতা দি – সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ইনফিনিটি তে কাজ করে। তবে ওই কাজ ও ছেড়ে দিতে চাইছে। ... একটা এনজিও খুলতে চাইছে।... ও আমাকে বলে, আমায় দেখে ও এতটাই ইমপ্রেসড় যে ও আরো মেয়েদের স্বনির্ভর করতে আগ্রহী। বিস্তর পড়াশুনাও করেছে, এই বিষয়ে।

আবার বললেন অনিন্দিতা দি – আপনি কি জয়জিতকে সন্দেহ করছেন নাকি? ... না মিস্টার সিন, জয়জিতের বাংলা খুব ভালো। ও তো বাংলায় সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখে। ... বাংলায় ওর খুব দখল। ...

বাবা – বাহ, খুব গুনি ব্যক্তিতো তাহলে। ... আর কি কি করেন উনি?

অনিন্দিতা দি – এখন তো ও আর ওর এসিস্ট্যান্ট পুরপুরি এনজিওর কাজে মনযোগী।

বাবা – আবার এসিস্ট্যান্টও আছে?

অনন্দিতাদি – এসিস্ট্যান্ট ঠিক নয়। ... মানে, আমি আর জয়জিত যখন কলেজে পরি, তখন অনুপদা আমাদের এক বছরের সিনিয়ার ছিল, আর জয়জিতের খুব ভালো বন্ধুও। জয়জিতের গুণমুগ্ধ ফ্যান হয়ে যান উনি। আসলে উনিই প্রথম গল্প লিখতেন। তারপর উনার দেখা দেখি, জয়জিত গল্প লিখতে শুরু করে। আর উনিই ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। সেই থেকেই জয়জিত এরকম। ... তারপর, আমি যখন কগ্নিজেন্টের এপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে রিজেক্ট করে, এন্ট্রাপ্রিনিয়ার হয়ে উঠি, তখন জয়জিতের উপর একটু চাপ দিয়ে ফেলি আমি। আসলে ও তখনও কিছু করছিল না। আমি এস্টাব্লিসড হয়ে গেলে, আমরা বিয়ে করবো কি করে, সেই নিয়ে একটু চাপ দিয়ে ফেলি।

তারপর জয়জিত অনুপদার সাথে যোগাযোগ করে। তখন অনুপদা ইনফিনিটিতে চাকরি করছেন। রেকমেন্ডেশন ইত্যাদি করে, জয়জিতের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন উনি। ... কিন্তু উনি একবছরের মধ্যেই চাকরি ছেড়ে দেন। উনার সেই চাকরি করতে ভালো লাগছিল না। ... কিন্তু জয়জিত উনার উপকার ভুলতে পারে না। তাই উনাকে এসিস্ট্যান্ট করে রেখে, উনার গাইডেন্সে স্ক্রিপ্ট লিখতে আরম্ভ করে, আর বেশ কিছু ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট প্রগামের সাথে যুক্ত হতে শুরু করে। ...

ইন্দানিং ও বলছে, এখন ও স্ক্রিপ্ট লিখে বেশ ভালো পয়সা কামায়। এবার ও এনজিও একটা খুলে, সেটাকে এস্টাব্লিস করে, তারপর বিয়ে করবে।

বাবা – হুম বুঝলাম। ... আচ্ছা, জয়জিতের কনো লেখা স্ক্রিপ্ট আমাকে দিতে পারবেন?

অনিন্দিতাদি – উমম, স্ক্রিপ্ট তো ও কম্পিউটারেই লেখে। ... উমম, ... হ্যাঁ, কলেজে থাকতে আমাকে ও লাভ লেটার লিখে দিতো। প্রায় ৫টা মত আছে আমার কাছে। ... সেগুলো আপনাকে দিতে পারি ... মানে আজকে তো নিয়ে আসি নি। ... পরে একদিন।

বাবা – অসুবিধা নেই। আমার মেয়েকে আপনি নিয়ে যান। আর ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিন।

অনিন্দিতাদি – তারমানে আপনি কেসটা নিচ্ছেন, তাই তো? ... মানে আমি শুনেছিলাম, আপনি পারসোনাল কেস নেন না... তাই একটু চিন্তায় ছিলাম।

বাবা – যদি আপনি একটা সামান্য ব্যক্তিত্ব হতেন, তবে কেসটা হয়তো নিতাম না। কিন্তু আপনি একজন মহিলা, যিনি অনেক মেয়েদের উৎসাহ প্রদান করেছেন। আপনার এই উঠতি খ্যাতির যেমন প্রশংসকও আছে, তেমন কিছু নিন্দুকও থাকতে পারে। ... সেইজন্যই কেসটা নেবো আমি।

অনিন্দিতা দি – তাহলে আপনার ফিজটা স্যার।

বাবা – আমার কনো ফিজ নেই। ... আমি কনো ডিটেকটিভ নই। ... কেসের সমাধান হলে, যেটা আপনার ঠিক মনে হবে, সেটাই আপনি দেবেন। ... আপাতত মিলিকে নিয়ে গিয়ে, ওর হাত দিয়ে চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিন।

আমি বাবার কথা মত অনিন্দিতাদির সাথে গাড়িতে করে গেলাম। দিদির চিঠিগুলো খুঁজতে একটু সময় লাগলো। তারপর, পাঁচটা চিঠি নিয়ে, আমি হাইল্যান্ড পার্কের সামনে থেকে বাস ধরে ফিরে এসে বাবাকে চিঠিগুলো দিলাম।

ট্র্যাপের প্রয়োজন

বাবা চিঠিগুলো ভালো করে দেখলেন। দেখে একটা মুচকি হাসি দিলেন, আর সোফাতে মাথাটা এলিয়ে দিলেন। আমি বাবার থেকে ওই চিঠিগুলো নিলাম। আর সামান্য দেখতেই বুঝেগেলাম বাবা কেন হাসলেন। ... চিঠির লেখা আর হুমকির লেখার হাতেরলেখা সম্পূর্ণ এক। ...

আমি বললাম – এর মানে তো পরিষ্কার বাবা! জয়জিত।

বাবা – হুম।

আমি – তাহলে অনিন্দিতাদিকে বলে দাওয়া উচিত না! ... উনি পুলিশে কমপ্লেন করে, জয়জিতকে ধরিয়ে দিলেই তো কেসের সমাধান হয়ে গেল।

বাবা – সেটা করতে গেলে, আজরাত্রের মধ্যেই তোর অনিন্দিতাদি খুন হয়ে যাবে। ... আর কিচ্ছু করা যাবেনা।

আমি – তাহলে করনিয় কি?

বাবা – একটা ট্র্যাপ বেছাতে হবে, সবার অজান্তেই। অনিন্দিতারও অজান্তে। ... এমন ট্র্যাপ ছড়াতে হবে যাতে আততায়ীর মনে হয়, এর থেকে ভালো খুন করার সুযোগ আর হতে পারেনা। ... আর তখন আমাদের হাতেনাতে ধরে ফেলতে হবে আততায়ীকে। ... তবেই অনিন্দিতাকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

বাবার ফোন বেজে উঠলো। ফোনটা চার্জ হচ্ছিল। উঠে গিয়ে দেখলাম, রথিনকাকার ফোন। বাবাকে এনে দিলাম। আর বললাম লাউডস্পিকারে দিতে।

বাবা ফোন ধরে লাউডস্পিকারে দিলেন। রথিনকাকা বললেন – বিজয়, একবার আসতে হবে বারাসাত থেকে টাকির দিকের রাস্তায়। ... ইমিডীয়েট।

বাবা – কি হয়েছে বলবে তো?

রথিনকাকা – প্রখ্যাত মুভি ডিরেক্টর, মঞ্জুশ্রি সাহা খুন হয়েছেন। ... কভারেজও করবে, আর একটু দেখেও নেবে। কারণ মাথায় কিছুই ঢুকছে না আমার।

বাবা – আচ্ছা যাচ্ছি। ... আমি আর বাবা আমাদের গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম হাসনাবাদের রাস্তায়। বারাসাতের মোর থেকে, শঙ্করকাকু আমাদের গাড়িতে উঠে পরলেন আর আমাদের স্পটে নিয়ে গেলেন। গাড়ির একটা কাঁচই খোলা। ভিতরটা একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। অর্থাৎ এসি চলছিল। সরকারি ডাক্তার বললেন, দুই ঘণ্টা হয়েছে খুন করা হয়েছে। ... তখন বাজে রাত ১১টা। অর্থাৎ ৯টা নাগাদ খুন হয়েছে। ...

আশেপাশের লোকেরা কেউ ছিলনা স্পটে। একটা বাচ্চাছেলে প্রথম দেখে লাসকে, তারপর গ্রামে খবর দিতে, পুলিশ আসে, আর তারপর রথিনকাকা, ডাক্তার, আর এখন আমরা। ... ফরেনসিক দেখে বললেন, যে খুন করেছে, সে গ্লাভস পরে খুন করেছে। তাই কনো ট্রেস নেই, কনো ক্লু নেই।

বাবাকে রথিনকাকা বললেন – কি হতে পারে বলো তো?

বাবা – কি সিনেমার শুটিং চলছিল এখন?

রথিনকাকা – তুমি বলছো সিনেমাকে কেন্দ্র করেই?

বাবা – হবার সম্ভাবনাই বেশি। গাড়ি থেকে সিনেমার স্ক্রিপ্ট মেরামত হয়েছে না!

রথিনকাকা – হ্যাঁ।

বাবা – একবার দেখতে পারি?

রথিনকাকা একটু পিছিয়ে গিয়ে, একটা ফাইল নিয়ে এলেন। তারপর বাবার হাতে দিতে, বাবা মোবাইলের টর্চে খানিক উলটেপালটে দেখলেন, আর বললেন সিনেমার নাম, জাঁদরেল। প্রযোজক কে জানো?

রথিনকাকা – না ভাই, সেটা আমার তো জানা নেই।

একজন পুলিশঅফিসার বললেন – অতিশ বর্মণ। উনার বসিরহাটের আগে একটা বাংলো আছে স্যার।

বাবা – হুম সেখানেই যাচ্ছেন।

তারপর আরো একটু পাতা উল্টে দেখে, একজায়গায় বাবা একটু থমকে গেলেন।

রথিনকাকা – কি ভাই, কিছু পেলে নাকি?

বাবা – উমম, একটা কাজ করতে পারবে! ফাইলের এই একটি পাতা, আমাকে খুলে দিতে পারবে? আমি কাল ফটোকপি করে নিয়ে আসবো। সেটা এখানে এটাচ করে দিও। ...

রথিন কাকা – ওকে দাঁড়াও। এই বলে যেই পাতাটা বাবা চাইছিলেন, সেটি খুলে দিয়ে দিলেন।

বাবা - কাল সকালে একবার উনার বাড়ি গিয়ে দেখলে কেমন হয় রথিন? এই সিনেমার সাথে কারা কারা যুক্ত, একটা তালিকা পাওয়া হয়ে যাবে।

রথিনকাকা – মন্দ হয়না। ... কিন্তু এখন, এখানে কিছু কি করনিয় আছে?

বাবা – উমম... দ্যাখো। আততায়ী কনো ভাবে গাড়িকে দাঁড় করায় মিস মঞ্জুশ্রির। তারপর, কাঁচ খোলেন উনি, আর তারপর গলা কেটে দেওয়া হয়। ... নাকে কিছু দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। ... স্ট্রাগেল করেছেন, কিন্তু গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করেন নি। তারমানে, আততায়ী উনার চেনা। আর আততায়ী আচমকাই ছুরি চালায়। ... স্ট্রাগেলটা ছুরি চালানোর পরের স্ট্রাগেল, মানে মৃত্যু যন্ত্রণা। ... আর নাকে চাপা দেওয়া হয়েছে, যাতে আওয়াজ আশেপাশে শোনা না যায়। ...

বাবা একটু থেমে বললেন – আচ্ছা, ডাকবাংলোতে রাস্তায় সিসিটিভি আছে না! ... ওটা একবার চেক করো না। মিস সাহার গাড়ি টাকির দিকে যাচ্ছিল। তাই মোস্ট প্রবাব্লি, আততায়ীর গাড়ি টাকির দিক থেকে ডাকবাংলোর দিকেই গেছে। ... নাহলে উনার গাড়ি থামতো না।

রথিনকাকা – কতক্ষণ আগের টিভি দেখবো?

বাবা – দুঘণ্টা আগে খুন হয়েছে। আর এখান থেকে ডাকবাংলো, ২০ মিনিটের পথ। যতগুলো গাড়ি এই ৯-১৫ থেকে ৯-৪০এর মধ্যে এখান থেকে বেড়িয়েছে, সমস্ত বাইক, সমস্ত চারচাকার ট্র্যাক করো। ... আর সেই গাড়ি কার কার নামে লাইসেন্সড, সেটার তালিকা বার করো।... কালকে উনার বাড়ি গিয়ে, জাঁদরেল সিনেমা নিয়ে যারা কাজ করছিলেন, সেই সিনেমার ইউনিটে কে কে আছেন, সেই ব্যাপারে তদন্ত করলে, একটা দিশা পাওয়া যাবে।

রথিনকাকা – ভাই বিজয়। ... আমার যদি এফোর্ড করার পয়সা থাকত না, আমি তোমাকে আমার এসিস্ট্যাট করে রাখতাম। ... এনিঅয়েজ। চলো ডাকবাংলো।

আমরা সেখান থেকে ডাকবাংলো গিয়ে, সেখানের ট্র্যাফিক পুলিশের থেকে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ বার করলাম। রথিনকাকা, ওদেরকে দিয়েই একটা এক্সেল সিট তৈরি করালো, আর সেই কপি লালবাজারে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন – এই ১২টি বাইক, আর ৮টা চারচাকা গাড়ি, কার কার নামে রেজিস্টার্ড, কালকে আর্লি মর্নিংএর মধ্যে উনার লাগবে। আমরা চলে এলাম। কথা হলো, কাল দেশপ্রিয়পার্কে সকাল ৮টায় দেখা হবে। ... মিস সাহার বাড়ি ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে। আমরা সেখান থেকে একসাথে উনার বাড়ি যাবো।

বাড়ি গেলাম আমরা, আর সেখানে অনেক নথিই ঘেঁটে দেখা গেল। ... ইউনিটের সকলের নাম পাওয়া গেল। আর রথিনকাকু নিজের কাছে একটা তালিকা ছিল, সেই তালিকার সাথে নাম মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে থাকলো। সমস্ত কিছু দেখার পরে, বাবাকে বললেন রথিনকাকা – বিজয়, সিনেমার সাথে কানেকশন নেই বুঝলে। ইউনিটের কারুর নাম এই তালিকার সাথে মিলছে না।

বাবা বললেন, তালিকাতে কি রয়েছে? একবার বলো।

রথিনকাকা – ১২টা বাইক, তাদের কারুর সাথে লিংক নেই সিনেমার। সকলেই সাধারণ মানুষ। নিত্য যাতায়াত করেন বারাসাতে, নিজেদের দোকানের মাল তুলতে। আর ৮টা চারচাকা। তার মধ্যে ৫টা ওলা উবার। তিনজনের একজনের সাথেও এই তালিকার নামের কনো মিল নেই।

বাবা – তিনটে নাম কি কি?

রথিন কাকা – সুকান্ত সামুই। মিলন কুণ্ডু, আর জয়জিত চৌধুরী।

বাবা আর আমার, দুইজনেরই ভ্রুকুঁচকে গেল। আমি বাবার দিকে তাকালাম। ... বাবা বললেন – জয়জিত চৌধুরীর সাথে এই সিনেমার কানেকশন কাছে রথিন।

রথিনকাকা – কি ভাবে? এই তালিকায় কই নাম নেই তো!

বাবা নিজের ছোট্ট সাইড ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বার করলেন। কাগজটা স্ক্রিপ্টের। কাল রাতে বাবা রথিনকাকার থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন যেটা। ... বাবা বললেন – এই স্ক্রিপ্টটা জয়জিত চৌধুরীর লেখা। ... এখানে একটা কারেকশান করা দেখতে পাচ্ছ। ... হাতের লেখাটা মোস্ট প্রবাবলি জয়জিত চৌধুরীর। ... রথিন, একটা কাজ করো, তুমি এই জয়জিতের গাড়ির সমস্ত কাগজ বার করো। ... এর এড্রেস, ইত্যাদি সমস্ত কিছু। ... শহরে আরো অনেক জয়জিত চৌধুরী থাকতে পারে তো। আমাদের কনফার্ম হতে হবে যে এই জয়জিত চৌধুরীই সেই স্ক্রিপ্ট রাইটার জয়জিত চৌধুরী।

রথিনকাকা – তাহলে একে এরেস্ট করা দরকার।

বাবা – এখনই এরেস্ট করলে, কিচ্ছু করতে পারবে না। ...

রথিনকাকা – কিন্তু ওইদিকে জয়জিত কি জন্য গেছিল। শুধুই খুন করার জন্য!

বাবা – অতিশ বর্মণের কাছে সে কাল গেছিল, স্ক্রিপ্টের কনো একটা অংশ নাকি ডিরেক্টর রাখছেন না, সেই অভিযোগ করতে। ... আমি অতিশ বর্মণের সাথে ফোনে কথা বলে জেনেছি।

রথিনকাকা – কিন্তু এই জয়জিতকে তুমি চিনলে কি করে?

বাবা – সে অনেক কথা রথিন। ... রথিন এই জয়জিত অত্যন্ত ধুরন্ধর। একে ধরা অত সহজ হবেনা। আমাদের একটা ফাঁদ পাততে হবে। ট্র্যাপ ছাড়া, একে ধরা যাবেনা। ... তুমি আজ সন্ধ্যায় আমার কাছে এসো। সেই ট্র্যাপের ব্যাপারে একবার আলোচনা করা প্রয়োজন। ... (একটু থেমে) আচ্ছা রথিন, ফুটেজে গাড়ির ভিতরে কে আছে, দেখা যাচ্ছে?

রথিনকাকা – আমার সাথে একবার অফিস চলো। চালিয়ে দেখাচ্ছি। দেখলেই বুঝতে পারবে।

বাবা আর আমি রথিনকাকার সাথে ভবানীভবন গেলাম। ফুটেজ চলল। জুম করে দেখা গেল, গাড়ির ভিতরে একজনই রয়েছেন, যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন। ... বাবা বললেন, এই ছবিটা উনার লাগবে। ... রথিনকাকুর অফিসের এক্সপার্টরা জুম করা ছবিটাকে একটা কালার প্রিন্ট করে বাবাকে দিলেন। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। আসার শুধু বাবা বলে এলেন – সন্ধ্যায় কখন আসছো।

রথিনকাকা – ডট ৮টা।

আমরা বেড়িয়ে এলাম। তবে বাড়ি গেলাম না। সরাসরি হাইল্যান্ড পার্কে অনিন্দিতাদির অফিসে। সেখানে নেবে বাবা যেই ছবিটা নিয়ে এসেছিলেন, সেটা অনিন্দিতাদিকে দেখিয়ে বললেন – দেখে এই মানুষটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছেন?

অনিন্দিতাদি বেশি সময় নিল না। একবার দেখেই বললেন – এতো জয়জিত। ... কালকে এই জামা পরেই ও বেরিয়েছিল। তবে ও একা কেন? ... তাহলে এটা ফেরার সময়ে হবে। ... ও আজকে সকালে বলল আমাকে, রাস্তায় অনুপদাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

বাবা – হুম, আপনার সাথে জয়জিতের আলাপ কোথায় হয়?

অনিন্দিতাদি – আমরা হেরিটেজে পড়তাম। একসাথে। দুজনেই কম্পিউটার সায়েন্সে বিটেক। ... ওখানেই।

বাবা – ওকে। একটা কথা। ... একটা প্রগাম করা হবে, আপনাকে নিয়েই। ... ইউ, বিং আ সাকসেসফুল অম্যান এজ এন্টারপ্রিনার, কিছু মেয়ে যারা ইন্টারপ্রিনার হতে চায়, তারা আপনার সাথে দুদিনের ওয়ার্কসপ করতে চাইছে। ... সঙ্গে জয়জিতকেও নিয়ে নিতে পারো। ও-ও তো এনজিও কাজও করতে চাইছে এই সবের উপর। ... তো ওরও ইন্টারেস্ট থাকতে পারে। ... একবার কথা বলে আমাকে জানাও। ... দুদিনের মধ্যেই এরেঞ্জমেন্টটা করে নিতে হবে, কারণ মেয়েগুলো উত্তরবঙ্গ থেকে আসছে, শুধু এই ওয়ার্কসপের জন্য। ... এরেঞ্জ করেছে, আমার এক বন্ধু, রথিন। ... না করবেন না। আমি কিন্তু ওকে কথা দিয়ে দিয়েছি।

অনিন্দিতাদি রাজি হয়ে গেল। ... আমি বুঝে গেছিলাম, বাবা রথিনকাকা যে ট্র্যাপের কথা বলছিলেন, সেই ট্র্যাপ বেছানো আরম্ভ করে দিয়েছে বাবা। ... চুপ করে থাকলাম।

বাবা বললেন – জয়জিত কি সকালে এসেছিল আপনার কাছে?

অনিন্দিতাদি – হ্যাঁ। আসলে ওর একটা স্ক্রিপ্টে কাজ হচ্ছিল সিনেমায়। সিনেমার নাম, কি যেন ... জাঁদরেল, হ্যাঁ জাঁদরেল। ... কিন্তু কাজটা বন্ধ হয়ে গেল। সেই জন্যই দুঃখ করছিল।

বাবা – সিনেমার ডিরেক্টর কাল মার্ডার হয়েছেন।

অনিন্দিতাদি – হ্যাঁ, সেটাই বলছিল।

বাবা – আর কি বলছিল?

অনিন্দিতাদি – বলছিল, মঞ্জুশ্রি সাহার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল ওর। অসামান্য ব্যক্তিত্ব তিনি। অনেক কিছু শিখছিল, উনার সংস্পর্শে এসে। কাজটা না হয়েই উনি চলে গেলেন...। এই সব।

বাবা – হুম। ঠিক আছে, আজ উঠি। ... আপনি কিন্তু ফাইনাল করলেন, ওই এম্পাওয়ারমেন্ট প্রগামের ব্যাপারে।

অনিন্দিতাদি – ওকে। কালকের দিনটাতে স্রেফ রাখবেন না।

বাবা – ওকে, পরশু তাহলে। ... একটা হোটেলে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই রাত্রিটা হোটেলেই সকলে থেকে যাবেন। পরবর্তীদিন সকালে সকলকে এড্রেস করে, আপনার ছুটি।

অনিন্দিতাদি হেসে – ওকে ডান।

আমি ভাবলাম, বাবা এইসব প্ল্যান করেন কখন! গাড়ি চালাতে চালাতে! পথ চলতে চলতে! নাকি কথা বলতে বলতে! ... যদিও কিছু বলিনি, কারণ কিছু বলতে ইচ্ছা করছিলনা।

বাবাই বললেন – কি ব্যাপার, মিলি চুপচাপ! ... রাগ হচ্ছে জয়জিতের উপর! ...

আমি – কিরকম শয়তান দেখেছ! ... নিজে খুন করে, নিজেই দুঃখ করতে এসেছে!

বাবা হেসে – সেই জন্যই তো বললাম। ট্র্যাপ না ফেললে, ওকে ধরা অসম্ভব।

বাড়ি চলে গেলাম। স্নানখাওয়া করে ঘড়ির দিকে বারবার দেখতে থাকলাম। কখন ৮টা বাজবে, আর কখন রথিনকাকু আসবেন। কিন্তু ৮টা বেজে গেল। রথিন কাকু এলেন না। ... রথিনকাকু তো এমন দেরি করেন না!

কাকুর আসতে, ঘড়ির দিকে তাকালাম, বাজে নটা। ... কিছু প্রশ্ন করতে হলো না। রথিনকাকু নিজেই বললেন – একটু দেরি হয়ে গেল। বেরতে যাবো, একটা খুনের খবর এলো।

বাবা – কে খুন হলো আবার?

রথিনকাকু – হেরিটেজ কলেজের মালিক, মিসেস সিপ্রা ঘারেওয়াল।

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। রথিনকাকু নিজের থেকেই বললেন – একটা এক্সস্টুডেন্টদের এলুম্নির কথা চলছিল। আজ দুপুরে। উনি উনার জোঁকার বাড়ি থেকে ড্রাইভ করে আসছিলেন। গাড়ি প্রায় বাড়ি থেকে ১৫ মিনিট পেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় থেমে যায়। ব্রেক ওয়েল নাকি লিক করছিল। ... গাড়ি থামাতে। পিছন থেকে কেউ গলা কেটে খুন করেছে। ... কালকের মতই । গলা কাটার পর, কেউ মুখটা রুমাল দিয়ে চেপে ধরেছিল। তাই উনি চেঁচাতে পারেন নি। জায়গাটা ফাঁকা, কনো বাড়িঘর নেই। গরমের দুপুর, রাস্তাঘাটও সুমসান। কেউ আততায়ীকে দেখেইনি।

বাবা – বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে, আজ সকালে নিশ্চয়ই জয়জিতের ফুটেজ পেয়েছ। তাই না!

রথিনকাকু – জয়জিত! ... এখানেও জয়জিত! ... দাঁড়াও তো, ফুটেজটা আমার ফোনে লোড করে দেখছিলাম। ... ফোনে আছে। ... দেখি তো!

রথিনকাকু ফুটেজ চালালেন। আর বাবা যেমন বললেন, আজ সকালে জয়জিতের ফুটেজ দেখা গেল।

রথিনকাকু – এই জয়জিত তো ভয়ানক ক্রিমিনাল! ... একে আমরা এরেস্ট করছিনা কেন?

বাবা – কারণ এর নামে এরেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু হবার পরে পরেই, মিস অনিন্দিতা চক্রবর্তী খুন হয়ে যাবেন।

রথিনকাকু – অনিন্দিতা চক্রবর্তী, মানে এন্টারপ্রিনার! ... আমরা উনাকে পুলিশ প্রটেকশন দিয়ে দিচ্ছে আগে থেকে।

বাবা – তাও আটকাতে পারবে না। ... আততায়ী অত্যন্ত ধূর্ত।

রথিনকাকা – তাহলে কি আমরা হাতে চুরি পরে বসে থাকবো?

বাবা – আততায়ীকে ধরার জন্যই তো একটা ট্র্যাপ পাতা দরকার। ... শোন, আমি ইনিশিয়াল কাজ করে রেখেছি। ... একটা ভালো দেখে হোটেলে তিনটে ডবল রুম, আর একটা ডরমেটারি বুক করো। একটা রুমে, আমি তুমি মিলি থাকবো। একটা রুমে মিস অনিন্দিতা। একটা রুমে জয়জিত, আর ডরমেটরি তে, তোমার পুলিশের ৪-৫জন মেয়েকে রাখতে হবে। হোটেলের সেমিনার রুম বুক করো। সেখানে অনিন্দিতা এই ৪-৫টা মেয়েকে এড্রেস করবে পরশু। ... রাত্রিটা ওখানেই থাকা হবে, আততায়ী এর থেকে ভালো সুযোগ পাবেনা অনিন্দিতাকে খুন করার। তাই সে ট্রাই করবে, আর আমরা সেই সুযোগে তাকে ধরে নেব।

রথিনকাকা – তাহলে তো অনিন্দিতাকে এই ব্যাপারে বলে রাখা প্রয়োজন।

বাবা – যতটুকু বলার, বলা আছে। ... কালকের দিনটা সময় আছে। মহিলা পুলিশদের সিলেক্ট করে, ট্রেন করতে হবে। ট্রেনিং যা দেবার আমি দিয়ে দেব। আর হোটেল বুকিংটা তোমাকে কালকের মধ্যেই করে নিতে হবে।

রথিনকাকা – ঠিক আছে। আমি আজ রাতের মধ্যেই মেয়েদের সাথে কথা বলে, তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। কালকে তুমি ওদেরকে শিখিয়েপড়িয়ে দেবে। আমি কালকের মধ্যে হোটেলের ব্যবস্থা করছি। তিনটে রুম, একটা ডরমেটারি, আর সেমিনার হল। ... ডান। আজ উঠি।

মা চা নিয়ে হাজির। রথিনকাকা – মধু খুব টেন্সানে আছি।

মা – বাড়ি গিয়ে তো শুয়ে পরবে, চা টা খেয়ে যাও। টেনশন কমে যাবে।

মায়ের নির্দেশ ফেলার ক্ষমতা রথিনকাকুর কনোকালেই নেই। ... চা খেয়ে রথিনকাকু চলে গেলেন।

ওয়ার্কসপ

রথিনকাকার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। মহিলা সিয়াইডিদের যা বোঝানোর বাবা বুঝিয়ে দিলেন। সঙ্গে আমিও ছিলাম। ... সন্ধ্যার সময়ে, অনিন্দিতাদিকে বাবা জানিয়ে, কালকে সকাল ১০টায় হোটেল প্যালেস

ভেনু কনফার্ম করে দিলেন। অনিন্দিতাদি বললেন – উনার সাথে জয়জিত আর জয়জিতের এসিস্ট্যান্ট, অনুপও থাকবেন। বাবা বলে দিলেন নো প্রবলেম। অনিন্দিতাদির জন্য একটা রুম বুক করা হয়েছে, আর তাছাড়াও আরেকটা রুম বুক করা হয়েছে, সেখানে এসিস্ট্যান্ট সহ জয়জিত থাকবে।

সমস্ত প্রগাম সেট হয়ে গেলে, আমরা পরের দিন সকালে চলে গেলাম হোটেলে। প্রথমেই সকলে চেকইন করলাম। তারপর ৫জন সিয়াইডি মহিলার সাথে আলাপ করানো হলো। বলা হলো তারা উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছেন, অনিন্দিতাদির কথা শুনবেন বলে। আর তারপরে, সেমিনার রুমে, অনিন্দিতাদি একটা অসাধারণ ভাষণ দিলেন। তারপরে হোটেলের রুমেই সকলে খেলাম। আবার সন্ধ্যায় একটা সেশন হবে। সেখানেও অনিন্দিতাদি দারুণ একটা ভাষণ দিলেন। আর তারপর ওই শয়তান জয়জিতটা স্টেজে উঠে, একটা অসাধারণ ভাষণ দিল।

আমার তখন যা রাগ হচ্ছিল না! ... মনে হচ্ছিল, মুখে মুখোশ পরে, ভালোমানুষ সাজা, আর পিছনে খুন করা! ... দাঁড়া, আজ আমার বাবা আর রথিনকাকু তোকে ধরার জন্য ট্র্যাপ ফেলেছে। তুই কিছুতেই পালাতে পারবি না। ধরা পরার পর, আমি এই প্রথম একজনকে একটা সপাটে থাপ্পড় মারবো। আমার এই ইচ্ছাতে, বাবা ও রথিনকাকু দুইজনেই রাজি।

ট্র্যাপের ভিতরের অংশ কি, সেটা আমি জানিনা। সমস্ত প্রগাম শেষ। সন্ধ্যার চা-টা একসাথে সকলে বসে খেলাম। তারপর যে যার ঘরে। ... রাত্রে আমরা ডিনার খেলাম একটু তাড়াতাড়ি। আমরা সকলে প্রস্তুত, কিছু ঘটবে, আর আমরা ঝাঁপিয়ে পরবো। ... ঘটলোও ঘটনা, তবে একটু রাত্রি করে। ... আমরা সকলে জেগেই ছিলাম। প্রায় ১টা, আমাদের ঘরে টকটক করে আওয়াজ।

বাবা গিয়ে দরজাটা খুলতে, জয়জিতের এসিস্ট্যান্ট অনুপ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বোলন – স্যার, স্যার, বাছান অনিন্দিতাকে। জয়জিত ওকে মেরে ফেলবে।

বাবা চিন্তিত হয়ে বললেন – কেন কি হয়েছে?

অনুপ – দাদা, আমি নিজে চোখে দেখেছি, জয়জিত একটা কোল্ডড্রিঙ্কসের বোতলে, বিষ... এই এই ... এই দেখুন, (পকেট হাতরে) এই দেখুন, এই জিনিসটা মিসিয়ে, সেটা নিয়ে অনিন্দিতার ঘরে গেল।

রথিনকাকু সেই ফয়েলটা দেখে বলল – বিজয় এখুনি চলো। এটা একটা চোরাই ড্রাগ। ... এতে এমন বিষ থাকে যে খাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মারা যায়। বিজয়, এতে ব্ল্যাক মাম্বার বিষ মেশানো হয়। ... ফাস্ট

ফাস্ট। ... মিলি, তুই ওই মেয়েদের নিয়ে আয়, তাড়াতাড়ি রুমে। ... চলো বিজয়, ... অনুপ তুমিও এসো।

এই বলে বাবা, কাকু আর অনুপ ছুটে গেলেন অনিন্দিতাদির রুমের দিকে। আমি হোটেলের কর্তৃপক্ষ আর মেয়েদের নিয়ে সেখানে যেতে দেখলাম, জয়জিতের হাত থেকে সেই বোতল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর সে গালে একটা বেঘোরে পুলিশের থাপ্পড় খেয়ে থরথর করে কাঁপছে। ... মেয়েরা গিয়ে, জয়জিতকে একটা চেয়ারে বসিয়ে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন – তোমার খেলা শেষ জয়জিত। একের পর এক খুন করে চলেছ তুমি হ্যাঁ!

জয়জিত থতমত খেয়ে গিয়ে বলল – খুন! আমি! ... কি সব বলছেন!

আমার সেই কথা শুনে মাথায় এত রাগ উঠে গেছিল যে, আমি তেড়ে গিয়ে জয়জিতকে দুটো গালে দুটো থাপ্পড় কষাতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বাবা আমার হাতটা শক্ত করে ধরে নিলেন। আমি বাবার দিকে বেশ ক্রুদ্ধ হয়েই তাকালাম, কিন্তু বাবার মুখের গম্ভীর ভাব দেখে আমি একটু থিতিয়ে গেলাম।

বাবা ক্রোধমিশ্রিত গাম্ভীর্য নিয়েই বললেন – ন্যাকা সাজা হচ্ছে? চিঠি লিখে নিজের গার্লফ্রেন্ডকে হুমকি দিয়ে হয়নি! ... প্রখ্যাত ডিরেক্টর, মঞ্জুশ্রি সাহাকে খুন করতেও হাত কাঁপল না! ... আর নিজের কলেজের ওনারকে!

জয়জিত এখন চেয়ারে বাঁধা, হাতে হাতকড়া। নড়ার ক্ষমতাও ওর নেই। কিন্তু এর মধ্যেও, ও এতই বেয়াদপ যে একই ভাবে বলে চলল – আমি খুন করি নি, বিশ্বাস করুন। ... আমি খুব ভিতু মানুষ। আমার পক্ষে খুন করা সম্ভবই নয়।

রথিনকাকা এবার উগ্র হয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন – ইয়ার্কি মারা হচ্ছে আমাদের সাথে! ... মঞ্জুশ্রি সাহা খুন যেখানে হয়, সেখান থেকে ডাকবাংলো মোর মাত্র ২০ মিনিটের পথ। আর যখন উনি খুন হয়েছে, ঠিক তার ২০ মিনিটের মাথায় একাকী নিজের গারি চালিয়ে যেতে দেখা গেছে তোমাকে জয়জিত! এবার কি বলবে?

বাবা বললেন – প্রমাণ চাই? এই দ্যাখো প্রমাণ।

এই বলে বাবা নিজের ব্যাগ থেকে একটা ছবি বার করলেন, যেই ছবিটা অনিন্দিতাদিকে বাবা দেখিয়ে কনফার্ম করেছিলেন যে ওটা জয়জিতই।

জয়জিতের মুখ কাঁচুমাচু। এখনও কিছু নাকি বলার আছে ওর। কিন্তু কারুর আর ওর কথা শোনার নেই। ... তাই মাথা এদিক সেদিক করে একটা ভাব করতে চাইলো বেয়াদপটা যেন ও পুরো ব্যাপারটাইয় ফেঁসে গেছে। ... যেই পরিমাণ রাগ হচ্ছিল না আমার ওই জয়জিতের উপর। ইচ্ছা করছিল, যেঁটুকু কুস্ফু জানি, পুরোটা ওর উপর উগড়ে দিই।

রথিনকাকা আবার বললেন – এলুমনির কথা বলার জন্য আপনি আপনার কলেজের ওনারের বাড়ি যাননি! ... সেখান থেকে বেড়িয়ে কোথায় গেছিলেন! ... মিস্টার জয়জিত, যেই যেই সিগনালে, মিসেস সিপ্রা ঘারেওয়ালের গাড়ি দেখা গেছে, ঠিক তার ৪-৫ মিনিট আগেই আপনার গাড়ি দেখা গেছে। ... কি করে মিস্টার জয়জিত? ... আসলে আপনি উনার গাড়ির সামনে সামনে ছিলেন আর যেই সময়ে দেখেন যে একটা জায়গা নিরিবিলি, কনো জনমানুষ নেই, কনো সিসিটিভি নেই, অমনি উনার গাড়িকে দাঁড় করিয়ে, উনার খুন করে দিলে!

জয়জিতের মুখের ভাব এমন যেন ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পরছে। এমন চোখ মুখ করছে যেন মনে হচ্ছে – এ বাবা! এরা কি সব বলছে! ... আমি তো দুধুভাতু ছেলে! আমাকে এমন কি করে বলছে! ... মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, দি একটা কষিয়ে থাপ্পড়, মুখের সব দাঁত ফেলে দিই মেরে।

বাবা এবার গম্ভীর ভাবে পায়চারী করতে করতে অনুপের পিছনে গিয়ে, অনুপের কাঁধে হাত রেখে বললেন – কেন জয়জিত বাবু! ... এই খুন গুলো করার উদ্দেশ্য কি? ... স্ত্রীরা বাড়ির হেঁসেল ছেড়ে, এই সমস্ত কিছু করলে, আপনার আপত্তিটা কোথায়? কেন এই আপত্তি! ... কেন আপনি স্ত্রীদের এই উচ্চপদে দেখলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন! ... কি করেছে তাঁরা আপনার! ... তাঁরা অনেক স্ত্রীদের প্রেরণা হলে, আপনার অসুবিধাটা ঠিক কোথায়! ...

এবার অনুপের উদ্দেশ্যে বাবা বললেন – আচ্ছা অনুপ বাবু! আপনি তো উনাকে অনেকদিন চেনেন! উনি কি বরাবরই এরকম, মানে স্ত্রীদের বাড়বাড়ন্ত দেখলে উনার এমন গাজ্বালা করে ওঠে!

অনুপ – জানিনা দাদা, ওর যে এমন বিকার আছে, সেটাই তো আমি জানতাম না! ... ও আমাকে ঘনাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি কনোদিন। ... আর অনিন্দিতাও ওকে অনেকদিন চেনে। ইনফ্যাক্ট, আমরা দুইজন একই সময় থেকে জয়জিতকে চিনি। ... বরাবরই ওকে একজন অত্যন্ত সাধাসিধা মানুষ মনে হয়েছে। ওর পেটে পেটে এত কিছু যে রয়েছে, সেটা আমরা কেউ টেরই পাইনি!

বাবা – হুম, রথিন এরেস্ট হিম।

রথিনকাকু এবার হাতকড়ায় চাবি পরাতে গেলে, বাবা বলে উঠলেন – ওকে নয়, একে। এই বলে অনুপকে সামনে এগিয়ে দিলেন।

অনুপ চেঁচিয়ে উঠলেন – আমি! আমি কি করলাম আবার! আমায় ... এটা কি হচ্ছে! ... চক্রান্ত! ... কি করছেন আপনারা, ওই ক্রিমিনাল আপনাদের কত টাকা দিয়েছে, আমাকে ফাঁসানোর জন্য!

রথিনকাকাও একটু অবাক হয়ে গেলেন। আর আমার তো সমস্ত হিসাবই এলোমেলো হয়ে গেল! কি বলছে বাবা!

বাবা বললেন – রথিন, তাড়াতাড়ি ওকে হাতকড়াটা পরাও, না হলে, বুঝতে পারছ তো, এটা ভোলাভালা জয়জিত নয় যে, তুমি বসিয়ে রাখবে আর ও বসে থাকবে। ... এ দুটো খুনের আসামি।

রথিনকাকা কনো কথা না বারিয়ে আগে অনুপকে হাতকড়া পরালেন। তারপর বললেন – কি হচ্ছে বলো তো বিজয় এইসব!

বাবা মুচকি হেসে – রথিন, যদি জয়জিতই আততায়ী হতো, তাহলে এই ট্র্যাপের কি দরকার ছিল! ওর বিরুদ্ধে তো যথেষ্ট প্রমাণ ছিল আমাদের হাতে ওকে গ্রেফতার করার জন্য। ... কিন্তু আসল আসামীর বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কনো প্রত্যক্ষ প্রমাণই নেই, তাই তো এই ট্র্যাপ। ... জয়জিতকে ছেড়ে দাও রথিন, ও সম্পূর্ণ ভাবেই নির্দোষ।

অনুপ চেঁচিয়ে উঠলো বাবার উদ্দেশ্যে – এই যে মিস্টার, আপনি কে আমি জানিনা, আর জানতেও চাইনা! ... আমাকে আপনি মিথ্যা দোষ দিচ্ছেন। আমি রেহাই পেয়ে গেলে আপনার যা অবস্থা করবো না!

বাবা – কেমন অবস্থা করবেন? যেমনটা মঞ্জুশ্রি সাহাকে করেছিলেন, নাকি যেমনটা সিপ্রা ঘারেওয়ালের সাথে করেছিলেন। ... না নাজেহাল করে রেখেছিলেন আপনি তো আপনার কাঙ্ক্ষিত, অত্যন্ত ভাবে কাঙ্ক্ষিত অনিন্দিতা চক্রবর্তীকে। ... আর বোকা পাঁঠা করে রেখেছিলেন আপনার অনুগামী জয়জিতকে! আমার সাথে কোনটা করবেন মিস্টার অনুপ মিত্র!

রথিনকাকা – বিজয়, প্লিজ আমাকে একটু ডিটেল করো। আমি সত্যি বলছি কিচ্ছু বুঝতে পারছিনা।

অনিন্দিতাদি – হ্যাঁ স্যার, প্লিজ একটু খুলে বলুন না। ... আমার যেন সমস্ত হিসাব এদিক সেদিক হয়ে যাচ্ছে।

খোলসা

বাবা হেসে বললেন – বেশ তবে প্রথম থেকেই বলি। ... তবে তার আগে, রথিনকে সেই প্রথম থেকে বলি, যখন থেকে আমি এই কেসের মধ্যে প্রবেশ করলাম। ... রথিন, আজ থেকে প্রায়য় এক-দেড় সাপ্তাহ আগে, মিস অনিন্দিতা চক্রবর্তী আমার কাছে আসেন, এবং বলেন উনি দুটো হুমকির চিঠি পেয়েছেন। ... চিঠিগুলো ... মিলি, রথিনকাকুকে চিঠিগুলো দাও।

আমি রথিনকাকুর হাতে চিঠিগুলো দিলে, বাবা আবার বললেন – ভদ্রলোক বাংলা তেমন লেখেন না, বানানের গণ্ডগোল, আর সত্যি বলতে গেলে, উনি নিজে থেকে তেমন লেখেনই না, অর্থাৎ নিজের কাছে পুরাতন যেই পেন, তাতে কালিই ছিল না। ... বুঝতে পারছো তো রথিন, লেখার ধরন দেখে।

রথিনকাকু – হ্যাঁ বুঝতে পারছি।

বাবা – এমন কার হয়? কনো কম্পিউটারে সর্বক্ষণ লিখতে থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হয়। তাই অনিন্দিতার বয়ফ্রেন্ড যখন জানলাম কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, স্বাভাবিক ভাবেই ওর উপরেই নজর এসে পড়লো। ... তবে হ্যান্ডরাইটিং টা একটু মিলিয়ে দেখে নেবার দরকার। তাই অনিন্দিতার কাছে জয়জিতের হাতের লেখা কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে, কলেজে থাকার সময়ে যেই ৫টি লাভ লেটার লেখা হয়েছিল, সেটা পেলাম। ... মিলি, কাকুকে চিঠিগুলো ...

আমি – হ্যাঁ দিচ্ছি।

রথিনকাকুর কাছে, চিঠিগুলো দিলাম।

বাবা – কি রথিন, হাতের লেখা এক্কেবারে এক। তাই না!

রথিনকাকা – হ্যাঁ, এ তো পরিষ্কার যে জয়জিতই হুমকি গুলো দিয়েছে!

বাবা – এটাই তো অনুপ চাইছিল। কাজ করবে ও, আর ফাঁসবে জয়জিত। লাভ! ... লাভ এই যে জয়জিত ফেঁসে চলে যাবে জেলে, আর কলেজের সময়ের ক্রাশ অনিন্দিতাকে বিয়ে করবে ও। ... তাই তো অনুপ! ... জানি না বলবেন। তাই আপনার উত্তরটা কাউন্ট করলাম না।

বাবা আবার বললেন – রথিন, আসলে চিঠির হাতের লেখা জয়জিতের নয়ই। হাতেরলেখা অনুপের। ... আসলে গল্প জয়জিতের মাথায় আসেনা। গল্প আসে অনুপের মাথায়। তাই লেখে সে-ই, কিন্তু নিজের ঘরে বসে লেখে না, লেখে জয়জিতের ঘরে বসে, জয়জিতের পেন দিয়েই। ... কিন্তু হুমকি তো আর জয়জিতের ঘরে বসে লেখা সম্ভব নয়, তাই নিজের পেন ব্যবহার করতে যায়, কিন্তু তাতে কালি ছিলনা, আর তাই নতুন বলপেন নিয়ে এসে লেখে। ...

একটু হেসে – তুমি বলবে, তাহলে জয়জিতকে নিজের কাজের সাথে ঢোকানো কেন? নিজেই স্ক্রিপ্ট লিখে, সমস্ত পয়সা, পসার নিজেই কামাতে পারতো! ... না রথিন, অনুপের বাংলা বানান এমনই যে, ওর স্ক্রিপ্ট ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। ... অন্যদিকে জয়জিতের মাথায় গল্পের প্লট না থাকলেও, ওর বাংলা বানান অসাধারণ। তাই সমস্ত স্ক্রিপ্ট ওকে দিয়েই লেখাতো। ... আগে নিজে জয়জিতের ঘরে বসে, জয়জিতের পেন ব্যবহার করেই গল্প লিখতো। আর সেগুলোকে জয়জিত কম্পিউটারে লিখতো, সমস্ত বানানের ভুল ঠিক করে। ... কি জয়জিত বাবু, ঠিক বলছি তো!

জয়জিত একটু মাথা নামিয়ে নিয়ে – আমি সেই কথা সকলকে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ...

বাবা – কিন্তু অনুপই আপনাকে বারণ করে দেন, আর আপনাকে বলেন, নাম আপনার হোক, এটা উনিও চান। এমনও বলেন আপনাকে যে এই নামের বলে আপনি অনিন্দিতাকে ইমপ্রেস করতে পারবেন, কারণ অনিন্দিতা নিজেও ক্রিয়েটিভ আর ক্রিয়েটিভিটি পছন্দ করেন। ... কি ভুল বললাম!

জয়জিত মাথা নামিয়েই মাথা নাড়িয়ে বাবার কথায় সায় দিলেন।

বাবা হেসে – রথিন, চিঠিগুলো দেখা মাত্রই এই সত্য বুঝে যাই আমি। কিন্তু আমি বুঝে তো আর হবেনা, প্রমাণ দরকার। ... তাই চুপ করে ছিলাম, আর অনুপ যেমন দেখাতে চাইছিল, তেমনই দেখতে থাকছিলাম। ... আসলে রথিন, চিঠিগুলোতে দেখ, যিনি চিঠিটা লিখেছেন, তিনি পেন ব্যবহার করেই লেখেন। হাতের লেখার টান দেখে বুঝতে পারছো! ... আর দেখো, বেশ কিছু জায়গায় বানান ঠিক করা আছে। সেগুলো জয়জিতের করা। হাতে করে মানে পেন ব্যবহার করে লেখেনই না প্রায় উনি। তাই

হাতের লেখা তেমনই। বর্গিজ লখতে গিয়ে, ডাণ্ডি লাগানোর জায়গা ছাড়েন নি; পরে আলাদা করে যোগ করেছেন।

রথিনকাকা – হ্যাঁ, একদমই।

বাবা – এবার পুরো কেসের কথা বলি রথিন। প্রথম থেকে । ... জয়জিত অনুপবাবুর কলেজেই পড়তেন আর অনিন্দিতাও। অনিন্দিতাকে প্রথম নজরে দেখেই অনুপের তথাকথিত আসক্তিযুক্ত প্রেম হয়ে যায়। কিন্তু জয়জিত আর অনিন্দিতা একই ক্লাসে পড়ার কারণে খুব কাছের বন্ধু হয়ে যায়। জয়জিত সরলমনা, আর সেটাই অনিন্দিতার কাছে জয়জিতের সবথেকে আকর্ষণীয় গুণ মনে হয়। অনুপ বুঝে যায়, সে কিছুতেই অনিন্দিতার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না, জয়জিতকে সরিয়ে। ...

আবার মুচকি হেসে – তাই জয়জিতকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করলেন অনুপ। ... গল্প উনি লিখতেন, আর জয়জিত গল্প পড়তে ভালোবাসে। তাই জয়জিতকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেওয়া খুব কঠিন হয়না অনুপের। কিন্তু জয়জিতের বক্তব্য, অতিরিক্ত বানান ভুল। ... উপায় বাতলে দেন অনুপ। ... তিনি বলেন, তিনি লিখবেন, আর জয়জিত সেগুলোকে কম্পিউটারে ছাপাবে, বানান ভুল ঠিক করে। তারপর সেটা প্রিন্ট করে, স্ক্রিপ্ট হিসাবে দেওয়া হবে সিনেমা পাড়ায়। নাম আর পয়সা দুটোই হবে।

বাবা বলতে থাকলেন – প্রথমে জয়জিত এই প্রস্তাবে রাজি হয়না। সে বলে, গল্পের লেখক অনুপ, কিন্তু নাম কেন তার হবে! ... অনুপের জটিল বুদ্ধি। সে জয়জিতকে বুঝিয়ে দিল যে অনিন্দিতাকে সে বন্ধু থেকে প্রেমিকা করে পেতে গেলে, এই নাম ওকে নিতেই হবে, কারণ অনিন্দিতা ক্রিয়েটিভিটি পছন্দ করে। ... অনিন্দিতার প্রতি জয়জিতের ভালোবাসা মুরগী পোষা ছিল না। তাই সে ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেয়। ... কিন্তু অনুপের মন্তব্য সে বুঝতে পারে না। ... অনুপ যে জয়জিতকে অনিন্দিতার সাথে ভিড়িয়ে, নিজেকে অনিন্দিতার কাছাকাছি রাখছিল, যেই সম্ভাবনাই ওর ছিলনা, সেটা জয়জিত বোঝেনি।

বাবা পায়চারী করতে করতে – এরপর অনিন্দিতা তো জয়জিতে ফিদা। সরল তাই ভালো লাগতো, আর ক্রিয়েটিভ মানুষ, তাই একটা গুণমুগ্ধ ভাবও এসে যায়। ... সেই সুযোগে, জয়জিতকে অনুপ বলে, এবার অনিন্দিতাকে প্রপোস করতে। ... কিন্তু জয়জিত যে নিজের থেকে গুছিয়ে প্রেমপত্রও লিখতে পারেনা। ...তাই অনুপই সেই প্রেমপত্র গুলো লিখে দিল। ... প্রেমপত্র তো আর কম্পিউটারে টাইপ করে দেওয়া যায়না। আর জয়জিতের নিজের হাতের লেখা যা, তাতে তো প্রেমপত্রটা পড়বেইনা অনিন্দিতা। তাই অগত্যা অনুপের লেখা চিঠিই দিতে হলো। কিন্তু তাতে বেশ কিছু বানান এমনই, যে না কারেকশন করে দেওয়া যায়না। ... তাই রথিন চিঠিগুলোতে দেখ, কিছু যায়গায় বানান কারেকশন করা আছে।

বাবা নিজের দুটো কনুইকে বাঁধা থাকা অনুপের চেয়ারের পিছনে ঠেকান দিয়ে – চিঠিগুলো দেখে আমি সমস্তটা বুঝে গেলেও, কারুকে বোঝাতে পারবো না আমি যে, চিঠিটা আসলে অনুপের লেখা। তাই চুপ করে ছিলাম। ... কিন্তু এরই মধ্যে মঞ্জুশ্রি সাহা খুন হলেন, পাওয়া গেল উনার কাছ থেকে জাঁদরেল সিনেমার স্ক্রিপ্ট। ... কম্পিউটারে লেখা। আর তাতে, বেশ কিছু লাইন অ্যাড করা হয়েছে, হাতে লিখে, যাতে অজস্র বানান ভুল, আর যার হাতের লেখা চিঠি আর হুমকির সাথে এক। ...

মিস্টার অনুপ, জয়জিত তো স্ক্রিপ্ট প্রথমবার দেওয়ার পর, আর ডিরেক্টরের কাছে যেতেনও না। ... তা কারেকশনগুলো কার করা! ... জয়জিতের!

অনুপ এবার মাথা নামিয়ে নিলো । ... অর্থাৎ প্রমাণ হলো তো রথিন যে চিঠিগুলো আর হুমকিটা জয়জিতের নয়, অনুপের দেওয়া। ... বেশ এটা গেল পার্ট ওয়ান। ... এখনও আসল কাহানীতে তো আসিই নি।

রথিনকাকু – হ্যাঁ খুনগুলো।

বাবা – রাইট। অনুপ সেইদিনকেই ঠিক করে নেয় যে ও কি করতে চলেছে, যেদিন জয়জিতকে দিয়ে ও স্ক্রিপ্ট লেখাতে শুরু করে। ... স্ত্রীদের বিকাশে জয়জিতের সমস্যা নয়, সমস্যা অনুপের। ... আর তাই অনুপের প্রথম রাগ হয় হেরিটেজ কলেজের ওনার কাম ডিরেক্টর, শ্রীমতী সিপ্রা ঘারেওয়ালের উপর। ... কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করলেন যে, সকলকে তিনি সরাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন জয়জিতের উপর, আর একবার সেই দোষে জয়জিতের জেল হলে, যেই অনিন্দিতার প্রতি তার ক্রাশ, উনার আর সেই ক্রাশের মধ্যে আর কেউ থাকবে না। ... তাই তখন তো সম্পূর্ণ ভাবে চেপে গেলেন অনুপ। ... কিন্তু জয়জিত কেবল সরল নয়, অত্যন্ত বোকাও। ...

সামান্য হেসে – কলেজের ফাইনাল সেমিস্টারের সময়ে যেখানে ক্যাম্পাস ইন্টার্ভিউতে মনোনিয়োগ করার দরকার ছিল, তখন অনুপ ওকে স্ক্রিপ্টে মাতিয়ে রেখেছিল। ... আর তাই চাকরি পেল না জয়জিত। ... অনুপ জয়জিতকে সর্বদা নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে রাখতে চেয়েছিল। তাই এমন কাজ করে, একটি বছর ওকে বেকার রেখে, অকস্মাৎ একদিন সামনে এসে, ওকে নিজে রেকমেন্ড করে, ইনফিনিটিতে চাকরি করিয়ে দেয়, আর নিজে চাকরি ছেড়ে, আবার জয়জিতের মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট পাবলিশ করে, বিপুল অর্থ রোজগার করেন।

বেকার ছেলেকে চাকরি দিয়ে জাতে তুলে দিয়েছে। অনিন্দিতা সমানে পাজেলড হয়ে যাচ্ছিল, কি ভাবে একটা বেকার ছেলেকে বিয়ে করবে, তার সমাধান করে দিল। ... আগে প্রেমপত্র লিখে, ওদের সম্পর্ক জুরে দিয়ে জয়জিতের কাছে অনুপ হিরো ছিলই, আবার নতুন করে হিরো হয়ে উঠলো, একই কারণে। আর তাই জয়জিত অন্ধের মত বিশ্বাস করতে শুরু করলেন অনুপকে।

এরই মধ্যে, স্ত্রীদের বহিরমুখি ভাবের তিনটে মুখ চলে আসে অনুপের কাছে। নিজের কলেজের ডীরেক্টার সিপ্রা ঘারেওয়াল তো ছিলই। আর এখন এসে যায় ডিরেক্টর মঞ্জুশ্রি সাহা। দুটো খুনেরই দায় চাপাবে জয়জিতের উপর। তাই অকারণে প্রযোজক অতিশ বর্মণকে বললেন স্ক্রিপ্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দিয়ে দিচ্ছেন মঞ্জুশ্রি। উনার ডাক পড়লো বসিরহাটে। ডাকবাংলো থেকে বসিরহাটের রাস্তায় কোন সিসিটিভি নেই। তাই সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে, মঞ্জুশ্রির গাড়ির সামনে হাত নাড়িয়ে উনাকে দাঁড় করানো হলো। জয়জিতকে ফিরে যেতে বলা হলো, আর অনুপ এমনও বলল যে ম্যাডাম মঞ্জুশ্রির সাথে উনি ঝামেলা চুকিয়ে আসছেন। ...

জয়জিত একাকী এলো, আর ডাকবাংলোর সিগনালে ওর একার ছবি উঠে, ওকে সাস্পেক্ট করে দেওয়া হলো। আর অন্যদিকে, ফাঁকা রাস্তায় গলার নলি কেটে অনুপ খুন করলো মঞ্জুশ্রিকে। কারণ! ... কারণ উনি মহিলা হয়ে সাকসেসের পিছনে কেন ছুটছেন, আর কেন অন্য মেয়েদের একই কাজের প্রেরণা দিচ্ছেন! খুন করে এগিয়ে এসে, একটা ওলা করে ফিরে এলেন অনুপ। কনো সন্দেহই তার দিকে গেল না। ... রথিন গাড়ির নম্বর ডাবলু বি ০৩ডি ৭৮৫২, এই ওলা গাড়িতে অনুপ ফিরেছিল। অনুপের ছবি দেখে সে আইডেন্টিফাই করেছে। যোগাযোগ করে নিও, কোর্টের কেসে সাক্ষী পেয়ে যাবে।

একবার রক্তের ছোঁয়া পেয়ে গিয়ে, পরের দিনই এলুম্নির কথা বলার জন্য জয়জিতের সঙ্গে জোকায় অনুপ গেলেন মিসেস সিপ্রার কাছে। জয়জিতকে একা বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, আর নিজে মিসেস ঘারেওয়ালের গাড়ির পিছনে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু তার আগে, ব্রেক ওয়েলের ক্যাপটা লুজ করে রেখেছিলেন, যাতে সামান্য দূরে গিয়ে, ফাঁকা জায়গাতে মিসেস ঘারেওয়ালের গাড়ির ব্রেকডাউন হয়।

অনুপ মিত্র, মিস সাহাকে মারার সময়ে আপনি উনার গাড়ির বাইরে ছিলেন, তাই মৃত্যুযন্ত্রণায় স্ট্রাগেল করার সময়ে উনি আপনার নাগাল পাননি। ... কিন্তু মিসেস ঘারেওয়ালের ক্ষেত্রে আপনি গাড়ির ভিতরে ছিলেন, উনি তো স্ট্রাগেল করার সময়ে, আপনার হাত খিমছে রক্ত বার করে দিয়েছিলেন। তাই না! ... উনার হাতে রক্তের ট্রেস পাওয়া গেছে। ... রথিন তুমি ওভারলুক করলেও, ফরেনসিক ওভারলুক করেনি। ... আমার চেনা একজন আছে ফরেনসিকে। ... সেই আমাকে এই ইংফরমেশন দেয়। ...

বাবা এই বলে, অনুপের কাছে গিয়ে – আপনি তো ফুল হাতা সার্ট পরেন না। খিমচানোর দাগ লুকনোর চেষ্টা! ... এই বলে বাবা অনুপের হাতার বোতাম খুলে উপরে তুলে দিলে সকলে স্পষ্ট ভাবে দেখলাম, অনুপের বা হাতের কবজির নিচে গভীর খিমচানোর ক্ষতচিহ্ন।

সেখান থেকে এবার সরে এসে – আর অনিন্দিতাকে হুমকি! ... প্রথমত জয়জিত যখন জেলে যাবে, তখন জয়জিতের সম্বন্ধে বিষ গুলে দেবার জন্য ওটা করা। আর দ্বিতীয়তো, স্ত্রীদের সমাজে অগ্রগতির বিরোধী অনুপ। ওর সমস্ত স্ক্রিপ্টে, সমস্ত গল্পে স্ত্রী গৃহবধূ, আর যখন তা নয়, তখন তাকে নিজের স্ক্রিপ্টে মেরে দিয়েছে অনুপ। ... অর্থাৎ অনিন্দিতা তার আকর্ষণ হলেও, অনিন্দিতার এই সমাজে বাড়বাড়ন্ত, অনুপের কাছে অপ্রিয়, তাই তাকে সেই রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার জন্য এই হুমকি। আর যখন এর পরেও দেখে যে অনিন্দিতা সেই হুমকিকে ডোন্ট কেয়ার করে এই ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট প্রগামে এসেছে, তখনই ওকে খুন করার প্ল্যান করে ফেলে।

বাবা একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে – কোল্ডড্রিঙ্কসের বোতলে বিষ মিশিয়ে, সেটা ধরিয়ে দিয়েছে জয়জিতের হাতে, আর আমাদেরকে বলতে এসেছে যে জয়জিত অনিন্দিতাকে মেরে ফেলবে, যাতে আমরা হাতেনাতে জয়জিতকে ধরে ফেলি, অনিন্দিতাকেও বিষ গ্রহণ করতে না হয়, আর অনিন্দিতাকে ও নিজের স্ত্রী করে নিতে পারে, জয়জিত জেলে গেলে। ... আমার কথা অনুমানের ভিত্তিতে বলা কথা নয়। ... অনুপ আর জয়জিতের ঘরের বিছনায় একটা হিডেন ক্যামেরা লাগানো আছে। আর তার ক্লিপ আমার মোবাইলে উঠছে। ... এই দেখো ক্লিপ।

এই বলে বাবা সবার সামনে নিজের মোবাইলের স্ক্রিন ধরলে, সকলে দেখলো, অনুপ কোল্ডড্রিঙ্কসে কিছু একটা মিশিয়ে, বোতলটা ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিলো। ...

রথিনকাকু হেসে – অনুপ চাইছিল জয়জিতকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবার। আর সে সেই চালটা যাতে চালতে পারে, আর নিজে ধরা পরে যায়, তাই তুমি ট্র্যাপ বেছালে এই ভাবে। ... হুম, এক্সিলেন্ট। ... গার্লস, এরেস্ট হিম।

অনুপ, জয়জিত আর অনিন্দিতা অবাক হয়ে গেলে, বাবা বললেন – আসলে এই মেয়েরা উত্তরবঙ্গ থেকে আসেননি। এরা সকলেই সিয়াইডি অফিসার। আমাদের প্ল্যান মত ছদ্মবেশে ছিল।... যাই হোক, মিস্টার অনুপ, এবার আপনাকে আমার একটিই প্রশ্ন, কেন আপনি এমন স্ত্রীদের উন্নতির বিরোধী!

অনুপ রাগে গজগজ করতে করতে বলে উঠলো – এই বাইরে বেড়িয়ে সমস্ত সমাজকে নষ্ট করে দিচ্ছে মেয়েরা। ... কেন? কেন? কিসের দরকার ওদের নাম যশ টাকা খ্যাতির! ... কেন প্রয়োজন! ... ওরা কি টাকা না কামালে, ওদের কেউ নিন্দা করবে? ... না করবে না, কিন্তু ওরা যেই ছেলেদের চাকরি খেয়ে নিচ্ছে, তারা টাকা না কামাতে পারলে, সমাজ থেকে তাদের বহিষ্কৃত করে দেবার মত অবস্থা হয়। ... কার কারণে এমন হয়! ... এই মেয়েদের কারণে। ... ঘরে বসে সংসার করলে, ছেলেরাও কাজ পায়, আর সংসারও টেকে। কাজ করতে বেড়িয়ে সংসার টেকাতে পারছে! ... না! যেদিকে তাকাও ডিভোর্স। ... বাইরে চাকরি নেই, অশান্তি; ঘরে ডিভোর্স। শান্তি ... সমস্ত ছেলেদের থেকে শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছে মেয়েরা। ... আই হেট ওয়ার্কিং ওমেন। ... অ্যান্ড আই বেট, মেনি আর দেয়ার লাইক মি।

রথিনকাকা এবার রেগে গিয়ে এগিয়ে যেতে গেলে, বাবা উনার হাত ধরে নিলেন। বাবা এবার বললেন – ঠিক বলেছেন আপনি, কোথাও শান্তি নেই। ... সুন্দরি মেয়েদের দেখে বস, তার প্রতি আসক্ত, আর পুরুষদের দুচ্ছাই করে। বাড়িতে কাজ করে না, তাই অশান্তি, ডিভোর্স। ... ঠিক বলেছেন। ... কিন্তু বলতে পারেন মিস্টার অনুপ মিত্র, কেন মেয়েরা এমন করলেন? আগে তো এমন করতেন না!

অনুপ সেই রাগের মুখে – বিকজ দে আর ইডিয়টস।

বাবা – না মিস্টার মিত্র, এখানটাতেই আপনি ডাহা ফেল করে গেলেন। ... বেসিক্যালি আপনি বা আপনি যেমন বললেন না, আপনার মত অনেকেই আছে, তারা সবাই ... (হেসে) স্ত্রীজাতিকে কনোদিন চেনার চেষ্টাই করলেন না। ... মিস্টার মিত্র, স্ত্রীদের স্বভাবই হলো নেপথ্যে থেকে, সম্মুখে পুরুষদের এগিয়ে দেওয়া। ... এটা ওদের ইন্সটিংট। নিজে সর্বক্ষণ গৃহবধূর কাজে ব্যস্ত থেকে, সর্বক্ষণ সেই সমস্ত কিছু করতেন, যা একটা পুরুষ চেয়েও করতে পারেন না, আর যাতে পুরুষটি বাইরে গিয়ে নিজেদের আদর্শকে স্থাপন করতে পারেন। ...

একটা ধিক্কারের হাসি হেসে, আবার বাবা বললেন – কিন্তু তাঁদের এই সেক্রিফাইসের গুরুত্ব দিয়েছেন কনোদিন! ... না, দেন নি। ... বছরের পর বছর, জেনারেশনের পর জেনারেশন এই আত্মত্যাগ করেছেন স্ত্রীরা। কি প্রতিদান দিয়েছেন তাদের! ... কিচ্ছু না; উপরন্তু কি বলে গেছেন, ঘর সামলানো ছাড়া তমরা কিছু পারো না, তাই সেটাই করো। ...

বাবা আবার বললেন – মিস্টার অনুপ, আপনারা এই ভাবে যেই দিনেরপরদিন স্ত্রীদের অপমান করে গেছেন, তার ফল হলো এই আজকে উনারা বাইরে বেড়িয়ে জগতকে জয় করছেন। ... আপনাদের করা প্রতিটি অপমানের উত্তর দিতেই ওরা আজকে সেই সেই কাজ করছেন, যা পুরুষরা দাবি করে এসেছেন যে

তাঁরা ছাড়া কেউ করতে পারেন না। ... চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন আজ যে, তাঁরা যেমন ঘর সামলাতেও পারেন, তেমন বার সামলাতেও পারেন। ... আপনাদের মুখে জুতো মেরে বলে দিচ্ছেন তাঁরা যে, তাঁরা ঘর সামলাতেন, কারণ পুরুষ ঘর সামলাতে পারেনা। ... আর বলে দিলেন যে, তাঁরা দুটোই পারেন।

আগের সময়ে যদি আপনারা স্ত্রীরা যেই আত্মত্যাগ করে, আপনাদেরকে বাইরের কাজে নিঝঞ্ঝাট ভাবে এগোতে দিতেন, তার কদর করতেন; উনাদের প্রাপ্য সম্মানটা দিতেন, তাহলে আজ উনারা বাইরে বেরতেনই না, পুরুষদের পিছিনে ফেলে জগতকে জয়ও করতেন না। ... মিস্টার অনুপ, আজ যে স্ত্রীরা পুরুষদের দুর্দশার কারণ, তার কারণ স্ত্রীরা নন, তার কারণ পুরুষদের অহংকার। ... অনেক পুরুষই আজকে বুঝে গেছেন যে তাঁদের অহংকার মিথ্যা ছিল। স্ত্রীরা ঘরবার দুই সামলাতে পারে, কিন্তু পুরুষ ঘর সামলাতে অক্ষম। ... কিন্তু আপনাদের মতও অনেক পুরুষ আছে, যারা এখনও বোঝেন নি এই সত্য। ... যেদিন আপনারাও বুঝে যাবেন, সেদিন আবার স্ত্রীরা ঘরে চলে যাবেন। ... উনারা যে নেপথ্যে থেকেই আনন্দ পান। ... নিজে নাম করে উনারা আনন্দ পান না। অন্যের নামে, আর তাঁকে সাহায্য করাতেই উনাদের আনন্দ। ...

বিশ্বাস হচ্ছেনা আমার কথায়। অনিন্দিতাকেই প্রশ্ন করে নিন। ... প্রতিবার জয়জিত সামনে এগিয়েছে, প্রতিবার উনার আনন্দ হয়েছে। ... আমার সাথে উনার দুই থেকে তিনবার দ্যাখা হয়েছে। একটিবারও উনি নিজের বিস্তারের কথা বলেন নি, বলেছেন জয়জিতের প্রতিভার কথা। ... এটাই স্ত্রীদের স্বভাব। ... যেদিন এই মহান উদারতাকে অনুভব করতে পারবে সম্পূর্ণ সমাজ, সেদিন আবার স্ত্রীরা ঘরসামলাতে ঘরে চলে যাবেন। ... উনারা খুব ভালো করেই জানেন, বোঝেনও যে উনারা আগে এগচ্ছেন তাই পুরুষদের অসুবিধা হচ্ছে। যতটা না কষ্ট এতে পুরুষদের হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্ত্রীদের হচ্ছে। ...

কিন্তু যতক্ষণ না পুরুষ সমাজ এই সত্য বুঝে যাবে যে স্ত্রীশক্তি আসলে ঈশ্বরের পূর্ণপ্রকাশ, ততদিন তাঁরা পিছনে যাবেন না। আর যাওয়াটা উচিতও না। যেই লড়াই করতে নামা হয়েছে, তা শেষ হবার আগে, পিছনে যাওয়ার অর্থ, জীবনকেই ছোট করে দেওয়া। ... তাই মিস্টার অনুপ, এই ঈর্ষা মন থেকে মিটিয়ে ফেলুন, আর অন্তত একটি কি দুটি নারীর পাসে নিজেকে রাখুন, তাঁর সাথে আপনি আছেন, আর থাকবেন এটা বলার জন্য। যদি সত্যিই মন থেকে কনো নারীর প্রতি এই আচরণ দেখাতে পারেন, তখন অনুভব করবেন, প্রেম কাকে বলে। ... দেহরূপরস ভোগ করা প্রেম নয়, কাম, যা সম্পূর্ণ মানবজাতির প্রধান শত্রু। যেদিন নারীর প্রেম দেখবেন, সেদিন বুঝতে পারবেন প্রেম কাকে বলে। ... স্নেহ মমতা কাকে বলে,

সেদিন বুঝবেন। আর সেদিন এও বুঝে যাবেন যে এতটা স্নেহ মমতা না পুরুষ কনোদিন নিজে ধারণ করতে পেরেছে আর না পারবে। ... যাও রথিন, এই মানসিক রোগীকে নিয়ে যাও।

রথিনকাকা অনুপকে সিয়াইডি ভ্যানে তুলে দিলেন। তারপর বাবাকে এসে বললেন – তুমি আমাকেও দ্বন্ধে রেখে দিলে যে জয়জিতই আসল খুনি!

বাবা হেসে – বলে না মৃত্যুর আগে মানুষের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে হয়; অনুপের তো শেষ ইচ্ছা এটাই ছিল। তাই সেটাই পূর্ণ করলাম মাত্র।

রথিনকাকা – তবে যাই বল, তুমি যদি না থাকতে, আমি কিন্তু জয়জিতকেই এরেস্ট করে নিয়ে যেতাম। সত্যি বলছি। ... চলো, তুমি এসো মিলিকে নিয়ে। আমি ওই শয়তানটাকে নিয়ে কাস্টডিতে যাই।

রথিনকাকা চলে গেলে, অনিন্দিতাদি বাবার সামনে এসে, বাবার চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। ...

বাবা একটু লজ্জা পেয়ে গিয়ে বললেন – আহা, এসব আবার কি!

অনিন্দিতাদি – না স্যার, কেসের মীমাংসা করার জন্য এটা ছিল না। স্যার, নারী জাতির স্বভাব, কর্তব্য, আর ভূমিকা আপনার কাছ থেকে যেমন শুনলাম, এমন কখনও শুনিনি, এমন কনোদিনও ভাবিনি। ... এতটা আমি স্ত্রী হয়েও বুঝিনি। ... সত্যি বলতে কি জানেন তো, খ্যাতি একটা নেশা। একবার এই নেশার ছোঁয়া মনে লেগে গেলে না, কি, কেন, কি জন্য সব ভুলে যায় মানুষ। ... স্যার, আপনার মেয়ে আমার থেকে খুব একটা ছোট নয়, তাই আমি আপনার মেয়ের মতই। আর সত্যি বলছি, আমার বাবার থেকে আজ আমি জীবনের সেরা শিক্ষাটাই পেলাম। ...

ব্যাগ হাতরে, একটা চেকবই বার করে। অনিন্দিতাদি বাবার নামে একটা ১০ লাখের চেক কেটে দিলেন। ... বাবা বললেন – এমাউন্টটা একটু বেশি হয়ে গেল না!

জয়জিত সামনে এসে বললেন – এতে আমারও অর্ধেক ভাগ আছে ধরে নিন। ... যার খপ্পরে পরেছিলাম, জানিনা আমাকে মাধ্যম করে, আর কত মানুষের প্রাণ নিতো। সেই দায় থেকে আমাকে মুক্ত করার জন্য, এই এমাউন্টের অর্ধেক ধরে নিন। ... আর হ্যাঁ স্যার, আমরা শীঘ্রই বিয়ে করবো। ... আপনাকে কিন্তু সপরিবারে আসতে হবে আমাদের বিয়েতে। ...

বাবা হেসে বললেন – নিশ্চয়ই আসবো।

বাবা আর আমি চলে এলাম। রাস্তায় একটা কথাও বলিনি। শুধু বাবার কথাগুলো ভাবছিলাম। বাবা যা বললেন সত্যিই অক্ষরে অক্ষরে মায়ের ক্ষেত্রে পালন করেন। ... মাও বলেন, বাবা যেই প্রমাণ সম্মান আর স্নেহ দিয়েছেন উনাকে, খুব ভাগ্যবান স্ত্রীই তা পেয়ে থাকে। ... বাবার বুদ্ধির জন্য গর্ব তো হয়ই, আজ বাবার উদার দর্শনের জন্যও খুব গর্ব হচ্ছিল।

দেশপ্রেম

টিংটং

দুদুটো বড় বড় কেসের পর, আমরা বাড়ির চার সদস্য অনেকদিন পরে খুবই রিল্যাক্সড ভাবে চায়ের টেবিলে বসে চা আর বাড়িতে বানানো পপকর্ণ খাচ্ছিলাম, আর বাবার বিভিন্ন কেসের ব্যাপারে কথা বলছিলাম।

মা বাবার উদ্দেশ্যে বললেন – আচ্ছা তুমি আসামিকে ধরে ফেলার পরেও, তোমার সঙ্গে যারা রয়েছে, যেমন মিলি, রথিনদা, এঁদেরকেও আসামির ব্যাপারে আন্দাজ দাও না। ... এইটার কারণ আমি ঠিক বুঝিনা। ... মানে, আমি এত ধরনের রহস্য গল্প পড়েছি, কিন্তু এমনটা আমি কখনোই পড়ি নি। ... শার্লক হোমসও অয়াটসানকে ক্লু দিতেন; ফেলুদাও তোপসেকে দিয়ে কেস শলভ করানোর চেষ্টা করতেন; এমনকি ব্যোমকেশও অজিতকে সঠিক দিশায় চালিত করতেন। ... কিন্তু তুমি এমন ব্যতিক্রমী কেন?

বাবা একটু হেসে বললেন – মধু, তুমি যাদের কথা বললে, সেগুলো গল্প, সত্যি নয়। ... একবার ভেবে দেখো না, সম্পত্তি নিয়ে মনমালিন্য তো কমবেশি প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে, কিন্তু সম্পত্তির জন্য খুনোখুনি শুনেছ! ... না মধু, মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়, আলাদা বাড়ি করে চলে যায়, মোকদ্দমা চলে পারটিসানের, আবার প্রচুর টাকার সম্পত্তি হলে, একটু পারিবারিক রাজনীতি চলে, খুব বেশি হলে একটু চোরাগোপ্তা হুমকি চলে। এর থেকে বেশি কিছু হয় কি?... কিন্তু গল্পে সেগুলো হয়। ... আর আমি তো আর গল্পের লেখক নই। রিয়েল টাইম ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন, এখানে কনো গল্প নেই, আছে বাস্তব। শুধুই বাস্তব।

আমি বললাম – তারমানে বাস্তবে কি ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য খুনোখুনি হয়ইনা!

বাবা – খুব রেয়ার। ... আসলে কি বলতো, খুন করা সব থেকে কঠিন কাজের মধ্যে একটা। চরম ধরনের ইন্সিকিউরিটি কাজ করে একজন খুনির মনের মধ্যে। ... মানে ধর, ধরা পরে যাবার ইসিকিউরিটি, ধরা পরে গেলে যেই অশান্তির নাশ করার জন্য খুন করা হলো, সেই অশান্তি চরমে চলে যাবার ভয়। ... তা ছাড়াও... ভেবে দ্যাখ, যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য খুন করতে চাইছে, সে নিশ্চয়ই প্রথমবারই খুন করতে এগোচ্ছে। ... তার তো সেই কাজের মধ্যে কনো কনফিডেন্সই থাকে না। ... থাকে কি! না থাকতে পারে!

মা আবার বললেন – তার মানে বাস্তবে খুন করে একটা চক্রই। ... মানে উদ্দেশ্য অন্যরকম থাকে, আর কাজ অন্য হয়। ... মানে যেমন তোমার কেসগুলোতে দেখলাম, ক্রাইম হচ্ছে ওমেন ট্রাফিকিং নিয়ে, বা ড্রাগ পাচার নিয়ে, বা হেরিটেজ প্রপার্টি চুরি নিয়ে, বা কিছু সেন্তিমেন্ট নিয়ে, তেমনই হয়!

বাবা – হুম, একদমই তাই। বাস্তবে ব্যক্তিগত কারণে কনো খুনোখুনি হয়ই না, ইনফ্যাক্ট কনো ক্রাইমই হয়না। একটা ড্রাগের চক্র আছে, বা ট্রাফিকিং-এর চক্র আছে, বা ধরো বিজনেস প্লট আছে। আর সেখানে অন্য কেউ ঢুকে যাবার চেষ্টা করে, মানে যেটাকে বলে অনুপ্রবেশ। ... সেই অনুপ্রবেশ হয়ে গেলে, যেই ক্রাইমের জগতটা সাজানোগছানো অবস্থায় রয়েছে, তা নষ্ট হয়ে যাবে। ... আর তা যাতে নষ্ট না হয়, সেই জন্যই যতরকম খুনোখুনি, চুরি, এমনকি রেপও। ...

মা – রেপও!

বাবা – হুম একদমই তাই। ... মানে যিনি অনুপ্রবেশ করেগেছেন সেই চক্রে, তাকে প্রথম জীবন থেকে সরিয়ে ফেলার চিন্তাই আসে, সেই আগ্রাসী ক্রিমিনাল চক্রের মনে। ... কিন্তু সবসময়ে তো আর তা সম্ভব হয়না। ... মানে যেমন ধরো, আমরা সেই অভিনেত্রীর কেসে দেখেছিলাম, মনে আছে! উনি ড্রাগ চক্রের ব্যাপারে জেনে যাবার কারণেই খুন হন। একই ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর শালার খুন হয়েছিল আমেরিকার হেরিটেজ প্রপার্টি চুরির চক্রকে জেনে ফেলার জন্য। কি তাই তো?

আমরা সকলে সম্মত হলে, বাবা আবার বললেন – কিন্তু সবসময়ে তো সেই খুন করা সম্ভব হয়না। ... এই মুখ্যমন্ত্রীর শালার কেসটাই দেখো না। উনার গোপাল চুরি হতো, কারণ ওটা সেই হেরিটেজ প্রপার্টি চুরির চক্রের টার্গেট ছিল। ... ম্যেন ক্রাইম কিন্তু সেটাই। কিন্তু ভদ্রলোক উনাদের চক্রের ব্যাপারে জেনে ফেলার জন্য খুন হলেন। ... এবার ভেবে দেখো, উনি যদি সামান্য ব্যবসাদার না হয়ে, খোদ মুখ্যমন্ত্রী হতেন, তাহলে কি হতো। বা সেই চক্রটা যদি মূল চক্র না হয়ে, মূল চক্রের শাখাপ্রশাখা হতো, তাহলে কি হতো?

মা – মুখ্যমন্ত্রী হলে, টাকা খাওয়ানোর চেষ্টা হতো, কারণ উনার সিকিউরিটি ভেঙে উনার খুন করা প্রায় অসম্ভব তাই।

বাবা – একদমই ঠিক। আর উনি যদি ঘুষ না নিতেন! ... কি হতো, যেই বিজনেস ম্যানরা উনার পারটিফান্ডে টাকা দিয়ে উনার ভোটে জেতার কাণ্ডারি, তাদেরকে হাত করে, প্রথমে উনাকে ভোটে হারানো

হতো, তারপর হুমকি, খুন ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হতো। ... বেশ এবার যদি সেই ক্রিমিনাল গ্রুপটা মূল গ্রুপের শাখা প্রশাখা হতো!

আমি বললাম – তাহলে তো এত কিছু করার ক্ষমতা থাকতো না। ... তখন তারা উনার পরিবারের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করতো।

বাবা – একজ্যাক্টলি, আর সেই চেষ্টাতেই যত রাজ্যের ছোট ক্রাইম, অর্থাৎ রেপ, মেরে হাতপা ভেঙে দেওয়া অর্থাৎ আততায়ী আক্রমণ, এইসব চলে।

মা – মানে, সাধারণ মানুষ ক্রাইমের সাথে কখনোই যুক্ত নয়! ... হ্যাঁ তাই তো, কোমরের জোর না থাকলে, কারুর জমি জবরদখল করে নিতেও ভয় লাগে, তো কারুকে মেরে ফেলা তো... হুম সত্যিই। ঠিকই বলছো। অর্থাৎ বড় কিছু চুরি মানেই কনো চক্র আছে পিছনে! খুন মানেই, এই চক্রগুলির মধ্যে কেউ ঢুকে পরছে, নয়তো সেই চক্রের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্তের জন্ম হচ্ছে ভিক্টিমের কারণে! আর রেপ মানেই, যেই পরিবারের কারুর রেপ হচ্ছে, সেই পরিবারের কারুকে এই বড় বড় গ্রুপগুলো আক্রমণ করছে!

আমি – আর যখন এই খুন, রেপ, ইত্যাদির তদন্তের জন্য খুব চাপ পরে প্রশাসনের উপরে, তখন যাদেরকে পয়সা দিয়ে এই ক্রাইম গুলো করানো হয়, তাদেরকে গ্রেফতার করে, পাবলিককে দেখানো হয় যে আসামি ধরা পরে গেছে, কিন্তু বাস্তবে আসল ক্রিমিনাল অধরাই থাকে!

বাবা হেসে বললেন – একদমই তাই। এই হলো ক্রাইম জগতের আসল ছবি।

মা আবার বললেন – কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি এখনও পেলাম না। বেশ ফেলুদা, ব্যোমকেশ, শার্লক হোমস না গল্পের চরিত্র; তাই নিজেদের এসিস্ট্যেন্টের সাথে কেসের ব্যাপারে কথা বলতেন, বা কেসের সত্যতার ব্যাপারে আলোকপাত করতেন। ... কিন্তু তুমি সেটা করো না কেন?

বাবা – উত্তেজনা চাপা যায়না মধু। ... ধর এলিয়ানের কেসে, যদি আমি মিলিকে সমস্ত কথা বলে দিতাম, তাহলে মিলির মধ্যে একটা উত্তেজনা আসতো, আর তা আসলেই, পিলসিমা গ্রামে যেই ইনফরমার ছিল, সে মিলির খবর দিয়ে দিতো, আর মিলি হয়ে যেত প্রাইম টার্গেট। ... কিন্তু যেহেতু ও সম্পূর্ণ সত্য জানেনা, ওর মধ্যে একটা উদাসীনতা, আর সন্দেহের জন্য আবশ্যক উত্তেজনা থাকেনা। তাই ওকে ইনোসেন্ট হিসাবে ট্রিট করা হয়, আর ও সুরক্ষিত থাকে।

মা – আর রথিনদাকে কেন বলো না!

বাবা এবার একটু জোরেই হেসে বললেন – আসলে কি জানো তো মধু, পুলিশের উপর সবসময়ে একটা গ্রেফতার করে কেসের সমাধান করার চাপ থাকে। এর দুটো কারণ। প্রথম কারণ এই যে ক্রিমিনাল যেই হোক না কেন, তার সাথে পলিটিকাল লিডাররা অবশ্যই যুক্ত থাকে। ইনফ্যাক্ট কথাটা এই যে পলিটিকাল লিডাররা সমাজটাকে এমনই ভাবে করায়ত্ত করে রয়েছেন যে, তাদের চোখ এড়িয়ে ক্রাইম করা প্রায় অসম্ভব, আর আরো একটা ব্যাপার এই যে ক্রাইম করা সম্ভবই হয়, এই পলিটিকাল লিডারদের লোক দিয়েই, কারণ সমস্ত অস্ত্রধারী যে উনাদেরই করায়ত্ত। আর আরো একটা কথা এই যে, যাকে ধরা হবে, তাকে জেল থেকে ছাড়াতে গেলে যে পলিটিকাল পাওয়ার আবশ্যক। ... এনি অয়েজ, এই কারণে পলিটিকাল লিডাররা কমবেশি সমস্ত ক্রাইমে যুক্ত থাকেন, ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি। আর তাই, তারা পুলিশকে সমানে চাপ দেয় যাতে গ্রেফতার তাড়াতাড়ি করা হয়, আর চার্জসিট তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়। কারণ দেরি হলেই, আসল আসামির কাছে পুলিশ পৌঁছে যাবে, আর সেখানে পৌঁছে গেলেই, সেই পলিটিকাল লিডারকে নিয়েও টানাটানি শুরু হয়ে যাবে। ...

মা – মিডিয়ার প্রেশারও তো থাকে যে ক্রাইম হচ্ছে, ক্রিমিনাল ধরা পরছে না। সাধারণ মানুষ সরকারের উপর ভরসা রাখতে পারছে না, রাজ্যে কনো আইনশৃঙ্খলা নেই। এইসব!

বাবা আবার হেসে – মিডিয়া, মধু, মিডিয়া পয়সা ছাড়া একপাও নড়ে না। (আবার হেসে) মিডিয়া যেই চাপটা প্রশাসনের উপর দেয়, সেই চাপটাও প্রশাসনের ফান্ডিং-এর কারণেই মিডিয়া দেয়। যাতে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে বলা যায় যে, মিডিয়ার চাপ বাড়ছে, তাড়াতাড়ি কারুকে চার্জসিট দিতে হবে, সেই কারণেই মিডিয়াকে দিয়ে প্রেশার ক্রিয়েট করা হয়। ...

আমি – তারমানে, সমস্তই একাকটা ইউনিট, যারা একসঙ্গে একই মিশনে কাজ করছে, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন তারা বিরোধিতা করছে!

বাবা – একদমই তাই। ... আর সেই কারণেই পুলিশ, সিয়াইডি, বা সিবিয়াই-এ যারা চাকরি করে, তাদের একটা মেন্টালিটিই হলো, তাড়াতাড়ি কারুকে গ্রেফতার করে, কেসের সমাধান হয়ে গেছে, এমন ডিক্লেয়ার করে দেওয়া। ... অর্থাৎ! ... অর্থাৎ এই যে আসল ক্রিমিনালের কাছে পৌছতেই না পারা। ... যাতে আসল ক্রিমিনালের কাছে পৌঁছানো যায়, সেই কারণে আমি রথিনকে একদম শেষে কেসে ইনভলভ করি। ...

আর যদি কেসের শুরু থেকেই ও সঙ্গে থাকে, তবে সত্য গোপন করে যাই, যাতে ও ওর স্বভাবমত ধারায় ধরপাকড় না করে।

আমরা সকলেই চুপ করে গিয়ে, বাবার বলা কথাগুলোর একটু বিচার করে বুঝছিলাম যে, বাবা কতটা দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজগুলো করেন। ... তাই চায়ের টেবিল তখন পুরপুরি শান্ত। সেই শান্তি ভঙ্গ করেই, বাবা হেসে মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন – রথিন নিশ্চয়ই আমার এগেন্সটে কমপ্লেন করেছে তোমার কাছে, তাই না!

মা – ঠিক কমপ্লেন নয়, তবে দুঃখ করছিল। ... আমি বললাম ওঁকে, আসল কারণ তো আমি জানিনা, তবে আমার বিশ্বাস আসল আসামি যাতে যথাযথ ভাবে ধরা পরে, আর যথাযথ ভাবে তথ্যপ্রমাণসহ ধরা পরে, সেই কারণেই নিশ্চয়ই তুমি এমন করো। ... রথিনদা শেষে হেসে বললেন, শেষ মুহূর্তে পুরো স্টান্ট দিয়ে বেড়িয়ে যাও তুমি, আর তখন ওর মনে হয় যেন, ও বেকারই রাজ্যের সিয়াইডি চিফ। ... তুমি একটু কথা বোলো রথিনদার সাথে। ওর মনে একটা কথা ঘুরছে যে, ও অযোগ্য। ... এই কথা যদি ওর মনে বাসা বেঁধে ফেলে, তবে ও ... কি বলি।

বাবা – হুম ঠিকই বলেছ। এই কথা যদি ওর মনে বাসা বেঁধে ফেলে, তবে ও ডিপ্রেশনে চলে যাবে। ... আমি শীঘ্রই কথা বলছি ওর সাথে, এই ব্যাপারে।

আমি এই কথার পৃষ্ঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, অকস্মাৎ কলিংবেল বেজে উঠলো, টিংটং। আমি উঠে গিয়ে আইহোল দেখে দরজা খুলতে, একজন বিধবা মহিলা, এই ৫০এর আশেপাশে বয়স হবে, আমার দিকে হাতজোর করে বললে – নমস্কার, এটাকি বিজয় সিংহের বাড়ি!

আমি বললাম – আসুন ভিতরে রয়েছেন উনি।

উনাকে নিয়ে এসে চায়ের টেবিলে বসালে, বাবার উদ্দেশ্যে উনি বললেন – নমস্কার, আপনিই বিজয় সিংহ?

বাবা – হ্যাঁ, নমস্কার।

ভদ্রমহিলা – আমি পারমিতা সান্যাল, লেট ব্রিগেডিয়ার সুধীর সান্যালের স্ত্রী।

বাবা – ব্রিগেডিয়ার সান্যাল! ... উনি তো আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে, কাশ্মীরের একটা টেররিস্ট এট্যাকে শহীদ হয়েছিলেন, তাই না!

মিসেস সান্যাল – হ্যাঁ, আমি উনারই স্ত্রী।

বাবা – দাঁড়ান দাঁড়ান, ব্রিগেডিয়ার সান্যাল তো আমাদের চিফ মিনিস্টারের খুড়তুত ভাই, তাই না!

মিসেস সান্যাল সামান্য হাসিমুখে – হ্যাঁ, আমি উনার থেকেই আপনার কথা জেনে, আপনার এড্রেস নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

বাবা – আচ্ছা আচ্ছা, তা বেশ। ... বলুন, আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?

মিসেস সান্যাল – না না, আমি এখানে কনো কেসের তাগিদে আসিনি। এসেছিলেম আপনাদের চারজনকে একত্রে একটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানাতে।

বাবা – নিমন্ত্রণ!

মিসেস সান্যাল – হ্যাঁ মিস্টার সিন, দাদা মানে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। উনি শেষ বার যখন দার্জিলিং গেছিলেন, তখন কিছুদিনের ছুটি কাটাতে আমার বাড়িতে উঠেছিলেন, নামচিতে। তখনই তিনি আপনার কথা বলছিলেন। আসলে আমার স্বামীও একজন অন্যধারার দেশপ্রেমী ছিলেন। সেই কথা উঠতেই, উনি আপনার কথা বলে বলেন যে, উনার মতন একজন আছে। ... সেই সঙ্গে আপনার দেশপ্রেম সংক্রান্ত কিছু দর্শনের কথাও উনি বলছিলেন।

বাবা – আচ্ছা! তাই আপনি এত দূরে...!

মিসেস সান্যাল – না না, আসলে পেলিং-এ, যেখানে উনার দুই ব্রিগেডিয়ার বন্ধু, রিটায়ার হবার পরে থাকেন, সেখানে আমার স্বামীর মৃত্যুর ১০ বছরের উপলক্ষে একটি আয়োজন করা হয়েছে। উনার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার গৌতম গতি আর ব্রিগেডিয়ার মুখেশ সিং এই আয়োজনটা করেছেন। আসলে আমার স্বামীর দেহাবসানের পর থেকে, আমিও কেমন যেন একটা উনার ভাবধারাতেই বেড়ে উঠতে শুরু করি। আর তাই ব্রিগেডিয়ার গতি আর ব্রিগেডিয়ার সিং, আমার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপলক্ষে কিছু ছেলেমেয়েকে একত্রিত করেছেন পেলিংএ। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার স্বামীর দেশপ্রেমের ভাবধারাকে বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে। ... সেই অনুষ্ঠান যেহেতু আমাকে কেন্দ্র করেই, তাই আমাকে চারটে ইনভিটিশন কার্ড দিয়েছেন, যা দিয়ে আমি আমার অতিথিদের নিমন্ত্রণ করতে পারি।

একটু থেমে, আবার মিষ্টি মুখেই মিসেস সান্যাল বললেন – আমি প্রথমে দাদার কাছেই গেছিলাম। দাদা বললেন, উনি এখন ইলেকশন নিয়ে খুব ব্যস্ত। আর বললেন, আপনি হলেন এই অনুষ্ঠানের যোগ্য নিমন্ত্রিত। তাই উনার থেকে আপনার এড্রেস নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনারা চারজনই যদি সেই অনুষ্ঠানে আমার নিমন্ত্রিত হয়ে যান, তবে খুব ভালো লাগবে।

বাবা – পেলিং-এ ভালো হোটেল তো এভেলেবিল না!

মিসেস সান্যাল – এমা! আপনি হোটেলে কেন থাকবেন? আমার অতিথি হয়ে যাচ্ছেন, আমার বাড়িতেই থাকবেন। ... আপনার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। ... আপনার মত মানুষের স্ত্রী ও পরিবারও তো সেইরকমই হন। আর তার সাথে, বিদিপ্তা দেবীর কথাও আমি দাদার থেকে শুনেছি। আপনাদের সঙ্গে সামান্য সময় কাটাতে পারলে, আমারও খুব ভালো লাগবে। ...

বাবা – বেশ তবে, নিশ্চয়ই যাবো। ... কবে অনুষ্ঠানটি!

মিসেস সান্যাল – আজ থেকে ১৫ দিন পরে, ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর। ৪ঠা অক্টোবর আমার স্বামীর মৃত্যুদিবস। সেইদিনেই উনাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে। ... আমি প্লেনের টিকিট করিয়ে, স্পিড পোষ্টে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। ... বাগডগ্রা এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে বেরোলেই, আমার ড্রাইভার, মিস্টার প্রভাস সিংহ প্ল্যাকার্ড নিয়ে উপস্থিত থাকবে। সে সরাসরি আপনাদেরকে আমার পেলিং-এর বাড়িতে নিয়ে চলে আসবে।

বাবা – আচ্ছা... আপনার পেলিং-এও বাড়ি আছে একটা!

মিসেস সান্যাল – পেলিং আমার স্বামীর প্রিয় নিবাসস্থান। ... তবে পেলিং-এ ছেলের পড়াশুনা ইত্যাদি একটু অসুবিধা ছিল। তাই নামচিতে উনি একটা বাড়ি করেন। তবে ছুটি পেলেই, উনি আমাকে আর আমাদের ছেলে মনিষকে নিয়ে পেলিং-এ চলে যেতেন। তাই ওখানে একটা সুন্দর বাংলোবাড়ি করে রেখেছিলেন। ... জানেন, আমাদের ছেলেও ঠিক বাবার মতন হয়েছে। পেলিং ওর খুব প্রিয়। কলেজে পরার সময় থেকেই ও পেলিং যাতায়াত শুরু করে। অনেককাল ওখানেই ছিল ও।

বাবা – আচ্ছা, তা আপনার ছেলে কি করে?

মিসেস সান্যাল – চোখের পাওয়ারের জন্য আর্মিতে জয়েন করতে পারেনি। ... অনেকদিন চেষ্টা করেছিল, তাও হলো না। শেষে এখন বিজনেস করছে। কিসের বিজনেস বলতে পারবো না। তবে বেশ পয়সা উপার্জন করছে এখন।

বাবা – আর কি চাই। ... ঠিক আছে মিসেস সান্যাল। তাহলে আপনার সাথে পেলিংএই দেখা হচ্ছে, ২৭সে সেপ্টেম্বর।

মিসেস সান্যাল – আপনাদের ডিটেলস গুলো একটু দেবেন, প্লেনের টিকিট কাটতে যতটুকু লাগে আর কি।

বাবা – হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে সেই সমস্ত।

মা সমস্ত কিছু দিয়ে দিলেন আর মিসেস সান্যাল চলে গেলেন। বাড়িতে একটা হুলুস্থুল লেগে গেল। ব্যাগ গোছানোর হিড়িক। আমি আর মা, দুইজনেই প্রচণ্ড শীতকাতুরে। আর পেলিং এক্কেবারে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদতলের ভ্যালি। ... অর্থাৎ ভয়াবহ ঠাণ্ডা পাবো। তাই, আমার আর মায়ের ব্যাগ গোছানো আর শেষ হয়না। উলের টুপি, মাফলার প্রায় তিনজোরা করে নিয়েছি। সঙ্গে হাতমোজা তিনজোরা; ফুল সোয়েটার, বড় ফারের জ্যাকেট। ... আমার আর মায়ের একটা একটা করে দুটো বড় বড় ট্রলি লেগে গেল। ... বাবা আর বিদিপ্তাদির যেন ঠাণ্ডার বালাই নেই। ... লাগেজ কম রাখার জন্য, উনারা দুইজনে মিলে একটা ট্রলি করলেন।

এরই মধ্যে এসে গেল কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বাগডগরা যাবার প্লেনের টিকিট। ২৬ তারিখ মধ্যরাত্রের প্লেন। পৌঁছাবে ২৭ তারিখ ভোর পাঁচটা। বাবা বললেন, সেখান থেকে পেলিং প্রায় ৫ থেকে ৬ ঘণ্টার রাস্তা। রাস্তার শেষের দিকটা খুব খারাপ হাল হবে। তাই মাকে কোমরের বেল্টটা হাতের কাছে রেখে দিতে বললেন। না স্পন্ডেলাইটিস বা আরথারাইটিস, দুটোই মায়ের নেই। তবে লাগাতার জারকিং পেলে, মায়ের কোমরে খুব ব্যাথা হয়। দুইতিনদিন বিছনা ছেড়ে উঠতে পারেন না। তাই বাবা কোমরের বেল্টটা সামনে রাখতে বললেন।

আমাদের সকলেরই খুব আনন্দ। বাবার কেসের চক্করে একটু দূরে ঘুরতে যেতেই পারছিলাম না। তারাপীঠ দিয়ে ঘোলে সাধ মিটিয়েছিলাম। থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস সান্যাল। উনার জন্য এটলিস্ট একটু দূরে যাওয়া তো হচ্ছে।

দেখতে দেখতে কবে যে ২৬সে সেপ্টেম্বর এসে গেল বুঝতেই পারলাম না। ... ৪ তারিক পর্যন্ত ওখানেই থাকবো। রিটার্ন প্লেনের টিকিটও পেয়েছি, ৫ তারিখ রাত্রের প্লেন। ... ৭ তারিখ এখানে দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী। উফ, ঘুরে এসেই আবার আনন্দ। ... মনটা খুব ফুরফুরে। বাবাকে এসিস্ট করার পর থেকে, অনেক জায়গাতেই গেছি। কিন্তু এই প্রথম একটা দূরে যাচ্ছি সকলে একসাথে, শুধুই ঘুরতে। কথাটা ভেবেই মনটা আনন্দে ভরে উঠছিল।

একটা ক্যাব বাবা আগেভাগে, মানে প্রি-বুকিং করে রেখেছিলেন। আসলে প্লেনের টাইমিংটা এমনই যে, বাবা দিনের দিন ক্যাব পাবার রিস্ক নিলেন না। রাত্রি ২টো ১৫তে প্লেন। গারি এলো, ১টায়, ক্যাবে উঠে এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম ১টা ২০তে। তারপর বিমানবন্দরে গিয়ে চেকিং করে, সমস্ত পাস নিয়ে, লাউঞ্জে এই ১৫ মিনিট বসার পরেই, আমাদের প্লেনের এনাউন্সমেন্ট হয়ে গেল। ... ভিতরের কাঁচের গেটের সামনে দাঁড়াতেই একটা এয়ারপোর্ট অথরিটির বাস আমাদের প্লেনের কাছে নিয়ে গেল। প্লেনে উঠতে, এয়ার ইন্ডিয়ার মেঘবালিকারা আমাদেরকে আমাদের সিটের কাছে নিয়ে গেলেন।

সামনে দুটো সিট, পিছনে দুটো সিট। ... সামনের সিটের উইন্ডো সাইডে বাবা মাকে বসিয়ে, নিজে উনার পাশে বসলেন। আর পিছনের উইন্ডো সাইডে আমি বসলাম, আর আমার পাশে বিদিপ্তাদি। এই একটা ভদ্রমহিলা, প্রথমবার প্লেনে চরছেন, কিন্তু তাও উনার কনো রকম উত্তেজনা নেই। কি ধাতু দিয়ে তৈরি কে জানে!

প্লেন কটায় ছেড়েছিল, আর কটায় পৌঁছেছিল, আমার কাছে তার কনো রেকর্ড নেই। প্লেনের বাইরে খালিই অন্ধকার, রাত্রি বেলার জার্নি, তা অন্ধকারই তো হবে। ... কিন্তু তাও, কি যেন সমানে দেখে গেলাম একটা। কি দেখলাম, তাও ঠিক জানিনা। খানিকটা রাত্রির কলকাতা দেখলাম। তারপরে রাত্রে গঙ্গাকে কেমন দেখতে লাগে দেখলাম। ... আকাশের মেঘগুলোকে রাত্রের অন্ধকারে কেমন দেখতে লাগে দেখলাম, আর শেষে ভোরের আলোতে এনএইচ ১২ দেখলাম। ... কিন্তু তেমন কিছু না দেখলেও, আমার আর মায়ের উত্তেজনার শেষ নেই। ... প্লেন থেকে নেমে, পেলিংএর রাস্তায় যাবার সময়ে, পুরো রাস্তাটাই আমি আর মা, আমরা কি কি দেখলাম, সেই আলোচনা করতে করতেই গেলাম।

বাবা আর বিদিপ্তাদিদি পুরো চুপ, আর মাঝে মাঝে মুখটিপে টিপে হাসে তাঁরা কেবল। মাঝে বিদিপ্তাদিদি বাবাকে হেসে হেসে বলেছিলেন শুনেছি যে, বাবা উনার দুই মেয়েকে নিয়ে ভালোই সংসার করছেন। ... বাবা কথাটা শুনে খুব হেসেছিলেন। ... তখন এই রসিকতার মানে বুঝিনি, আসলে ভাবিই নি সেই কথাটা নিয়ে। পরে ভেবে আমিও হেসেছিলাম। আসলে দিদি বাবাকে এটাই বলছিলেন যে, আমি তো বাবার মেয়ে বটেই, তবে একমাত্র মেয়ে নই; আমার মা-ই হলেন বাবার বড় মেয়ে।

পেলিং দর্শন

বাবা একদমই ঠিক বলেছিলেন। আমাদের গাড়ি পেলিং পৌছাতে ঘড়ি ধরে ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট নিয়েছিল। আর সত্যিই শেষের দিকের রাস্তাটায় মা যদি বেল্ট না পরতেন, তাহলে পুরো বেড়ানোটাই মাটি হয়ে যেত।

পেলিং-এর কাছাকাছি আস্তেই, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেল, তবে দার্জিলিঙের ভিউ নয়। এ যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। যেন একজন দৈত্যকায়, শুভ্র চাদর গায়ে দিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যত দিনের বিভিন্ন সময় হতে থাকলো, ততই সেই শুভ্র চাদর কখনো লাল, তো কখনো হলুদ হতে থাকলো। সূর্যাস্তের সময়ে তো মনে হচ্ছিল, লাল আর ধুসর রঙের বেনারসি পরা নতুন কনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের থেকে সামান্য দূরে। আর রাত্রে! যেন মনে হচ্ছিল সদ্য রবিন ব্লুতে ছোপানো কনো সাদা কাপর পরে, একজন বিধবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

কি অদ্ভুত রূপ কাঞ্চনজঙ্ঘার! ... যেন দশমহাবিদ্যাকে দেখছিলাম। ভোরে, মেঘের কারণে গলা দেখা যায়না, যেন ছিন্নমস্তা; তো বেলা বারতেই হলুদ শাড়ীতে মোরা মা বগলা। আবার বিকেল হতেই লাল বেনারসিতে মোরা ভুবনেশ্বরী; তো পড়ন্ত রোদে, বাঘছাল পরিধিত মা তারা। রাত্রের ঘনঅন্ধকারে যেন মা কালি, তো গভীর রাত্রে, চাঁদের আলোতে মা ধূমাবতী। ... না শুধু যে কাঞ্চনজঙ্ঘাই দেখেছি, তা নয়, আমরা সেইদিনেই এগিয়ে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলস্ দেখলাম; আর সেই ফলসের উপরের দিকে বাঁশের মই দিয়ে উঠে, সাখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পূর্ণাঙ্গ রূপে দেখে স্তম্ভিত হলাম। আর দেখলাম মাউন্টেনিয়ারিং সেন্টার, আর সেন্সোর ব্রিজ। ... কি উঁচু ব্রিজ! তলার দিকে তাকালে মাথা ঘোরে!

বাবা বললেন – এশিয়ার উচ্চতম ব্রিজগুলির মধ্যে একটি এই সেনসোর ব্রিজ। সমস্ত কিছু দেখে, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সেদিনের মত ঘুমিয়ে পরলাম। পরের দিন যেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমরা এসেছি, তার ইনোগোরেশন। ... সকাল ৯টার মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। ঠাণ্ডার মধ্যে, গরমজলে স্নান করে, ময়াসচারাইজার মেখে তৈরি হতে সময় লাগবে। তাই মা আমাকে একরকম টেনেই তুলে দিলেন সকাল ৭টায়। ... বাবা আর বিদিপ্তাদিদি এই ঠাণ্ডার মধ্যে একচক্কর ঘুরে, চা খেয়ে এসেছেন! ... মা ঠিকই বলেন, বাবা হলেন এস্কিমোদের দেশের মানুষ। ঠাণ্ডার কনো বালাই নেই। ... একটা হাফসোয়েটার আর তার উপর, একটা উইন্ডচিটার পরে দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছেন। ... আর বিদিপ্তাদিতো অষ্টম আশ্চর্যের অন্যতম! একটা পাতলা শাল খালি রয়েছে গায়ে, কিন্তু তাতেও কি কম্ফরটেবেল! কি করে যে এঁদের ঠাণ্ডা লাগেনা, বুঝিনা আমি!

আমি উঠে সবে দাঁত মেজে গরম গরম কফি ফু দিয়ে দিয়ে খাচ্ছি, এবার স্নান করে, ড্রেস করবো; বাবাকে দেখলাম স্নান করে বেড়িয়ে আবার সেই হাফ সোয়েটার আর উইন্ডচিটার গলিয়ে, বিদিপ্তাদির সাথে আরেকচক্কর মেরে, চা খেয়ে এলেন।

মায়ের তো একবার সন্দেহই হয়ে গেল। বাবার মুখের কাছে নিজের নাক নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুবার গন্ধ শুঁকলেন। বাবা সেই দেখে হেসে বললেন – এই ঠাণ্ডায় ব্র্যান্ডি খেতে হয়না। ... নাথুলা গিয়ে থাকতে হলে, খেতে হতো।

মা একটা বিচিত্র মুখ করে স্নানে চলে গেলেন। মায়ের স্নানের পর আমার স্নান। তারপর আমরা দুই মামেয়ে মিলে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ময়াসচারাইজার নিয়ে ত্বকচর্চা করে, মিসেস সান্যালের গাড়িতে আমরা চারজন ও মিসেস সান্যাল একত্রে আমাদের ভেনুতে গেলাম। ভেনু হলো ব্রিগেডিয়ার সিং ও ব্রিগেডিয়ার গতির বাড়ি। বিশাল বাড়ির বিশাল হলঘরটা একটা ছোটখাটো অডিটোরিয়ামই।

সেখানে পৌছাতেই, মিসেস সান্যাল সকলের সাথে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন। আর আমাদের সকলের হাতে একটা করে ব্রেকফাস্টের বাক্স এসে উপস্থিত হলো। এই ব্রেকফাস্টের সাথে সাথেই, প্রথম সেই হলঘরে করা অস্থায়ী মঞ্চে উঠলেন দুই ব্রিগেডিয়ার। তাঁরা ব্রিগেডিয়ার সান্যালের বীরত্বের কথা বললেন, আর বললেন কি ভাবে কাশ্মীরি আতঙ্কবাদী মোরচার মাথার চেজ করতে গিয়ে, আততায়ীদের গুলিতে উনি বিদ্ধ হয়ে শহীদ হন সেই কথা।

ঘরে উপস্থিত ছিলেন, প্রায় জনা ২০ জন যুবক, আর ৫-৬ জনের মত যুবতি, আমাদের পাঁচজন, অর্থাৎ আমরা চারজন আর মিসেস সান্যাল ছাড়া। সকলেই সেই কথা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ব্রেকফাস্ট শেষ করে, একজন একজন করে এবার সকল যুবকযুবতি ডাইসে গিয়ে, নিজেদের পরিচয় দিলেন আর বলতে থাকলেন যে তারা সকলেই ইন্ডিয়ান আর্মিতে জয়েন করে দেশের সেবা করতে চান।

এই ২৬ জন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। কেউ কাশ্মীর থেকে, তো কেউ রাজস্থান থেকে; কেউ পাঞ্জাব থেকে, তো কেউ মধ্যপ্রদেশ থেকে; কেউ উত্তরখণ্ড থেকে তো কেউ নাগাল্যান্ড থেকে। তাই সকলে যাতে বুঝতে পায় সকলের কথা, সেই উদ্দেশ্যে ইংরাজিই সেই অনুষ্ঠানের ভাষা হয়ে ওঠে। ... তবে নাগাল্যান্ড আর দক্ষিণ ভারত ছাড়া, বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে, যারা বাংলা, বিহার, কাশ্মীর, রাজস্থান থেকে এসেছিলেন, তারা আধো আধো ইংরাজি বলে, বেশিটা হিন্দিতেই বললেন।

সকলেরই মুখে একই কথা, তারা দেশের জোয়ান হয়ে দেশের সেবা করতে চান। ... সকলের কথার শেষে ব্রিগেডিয়ার গতি ডাইসে উঠে ইংরাজিতে বললেন – আপনারা সকলেই দেশের সেবা করার জন্য

আগ্রহী। আর সেই কারণেই, আপনাদেরকে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। ... আপনাদের মাঝে আজকে রয়েছেন সেই শহীদ ব্রিগেডিয়ার সান্যালের স্ত্রী, মিসেস সান্যাল। ... উনি আপনাদের এই দেশসেবার ব্যাপারে কিছু বলবেন। আজকে আমাদের সভা লাঞ্চের সময়ে পৌঁছে গেছে। ... তাই আজকে উনি বেশিকিছু তো আপনাদের বলতে পারবেন না। তবে লাঞ্চের পর, প্রথম উনাকে সংবর্ধনা দিয়ে, তারপর উনার মুখ থেকে কিছু প্রেরণার কথা শুনে নেবেন আপনারা। কালকে উনি আপনাদের সকলকে দেশসেবার ব্যাপারে কিছু বলবেন।... আপনারা এখন লাঞ্চের জন্য যান। ফিরে এসে, মিসেস সান্যালকে সংবর্ধনা দিয়ে, উনার ভাষণ শুনে, টি-স্ন্যাক্সের মাধ্যমে, আজকের সভা শেষ করবো।

আমরা লাঞ্চ ব্রেকে গেলাম। ভেজ-ননভেজ, সব রকম ব্যবস্থা ছিল। বেশ ভালোই খেলাম। বাবা প্রশ্ন করলেন মিসেস সান্যালকে – আচ্ছা, এতগুলো ছেলেমেয়ে, থাকছে কোথায়?

মিসেস সান্যাল – এই যে বাড়ি দেখছেন, দুই ব্রিগেডিয়ার একসঙ্গে এই বাড়িটা করেছিলেন। এর নিচের তোলায় খালি গ্যারেজ আর এই হল। আর এর উপরের তোলায় রয়েছে চারটে ডরমেটারি টাইপের ঘর। ... একটা ডরমেটারি তে মেয়েরা। বাকি তিনটেতে মেয়েরা। ...

বাবা – আর ব্রিগেডিয়াররা থাকেন কোথায়?

মিসেস সান্যাল – ব্রিগেডিয়ার গতি, আজ তিন বছর হলো বিপত্নীক। উনার ছেলে বিদেশে থাকে, সেন ফ্রান্সিস্কোতে। আর ব্রিগেডিয়ার সিং –এর স্ত্রীর সাথে প্রায় ১২ বছর হয়ে গেছে ডিভোর্স হয়ে গেছে। উনার একটি মেয়ে, সে মায়ের সাথেই থাকে। ... আর উনারা, তিনতোলায় থাকেন। দেখে মনে হবে রাজপ্রাসাদ।

বাবা – এখানে তিনতোলা বাড়ি এলাউড!

মিসেস সান্যাল – না না, এখানে তিন তোলা মানে, ছাদের উপর ঘর নয়। পাহাড়ের তিনটি তোলা একসাথে কেনা। আর তার একাকটাতে একাক তোলা। ... তিনটে তোলারই নিজের নিজের রাস্তা আছে, যেটা এই মেন রোডে এসে পরে।

বাবা – বাকি সময়ে তাহলে এই দুই তোলা ফাঁকা থাকে?

মিসেস সান্যাল – না, কখনোই প্রায় ফাঁকা থাকেনা। ... আমি যতদূর জানি, কিছু স্পেশাল আর্মি রেজিমেন্টকে দুই ব্রিগেডিয়ার এক সঙ্গে ট্রেনিং দেন। ... সম্ভবত ব্যাটেল কমব্যাটের নয়, স্ট্র্যাটিজিকাল কমব্যাটের ট্রেনিং দেন উনারা। ... এই আগস্ট থেকে নভেম্বর, মানে ফেস্টিভ টাইমটা, খালি থাকে ঘর। তাই এই সময়েই ওরা এই এরেঞ্জমেন্টটা করেছে।

আমাদের লাঞ্চ ব্রেক হয়ে গেল। বিদিপ্তাদিদির কাছে গিয়ে বললাম – খুব বোর হচ্ছ না তুমি! ... একজনও তোমার ধারার নেই এখানে, তাই না!

বিদিপ্তাদি হেসে – কে বলেছে নেই! ... আমাদের যিনি নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, তিনি তো এখনও বক্তব্যই রাখেন নি। তিনি বক্তব্য রাখলে, বুঝতে পারবে, কেউ আছেন কিনা এখানে।

বিদিপ্তাদিদি যেন আগেভাগেই সমস্ত কিছু জেনে যায়। উনাকে তাই কিছুতেই চমকাতে পারিনা আমি। ... পাল্টা, আমিই চমকে যাই উনার কথায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।... লাঞ্চের পর, সেশন শুরু হতে, প্রথমেই মিসেস সান্যালকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। আর তার পরে, উনাকে কিছু বলতে বলা হলো সবার উদ্দেশ্যে, যার শুরুটাই আজ হবে, বাকিটা কাল হবে।

মিসেস সান্যাল নিজের বক্তৃতা রাখলেন। উনি বললেন – আমি পারমিতা সান্যাল, লেট ব্রিগেডিয়ার সুধীর সান্যালের স্ত্রী। ... আর্মি জেনারাল উনিই ছিলেন, ব্রিগেডিয়ারও উনিই ছিলেন, স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স স্কোয়াডের নেতৃত্ব উনিই করতেন। আর শহীদও উনিই হয়েছেন। ... আমার তাতে একটিই অবদান ছিল, আমি সর্বদা উনার গুণমুগ্ধ ফ্যান হয়েই ছিলাম। উনি যখন জীবিত ছিলেন তখনও, আর উনার মৃত্যুর পরেও। ... তবে আমাকে এই বক্তৃতা দিতে বলা হচ্ছে কেন? ...

উনি বলতে থাকলেন – আমার ছোট ছোট ভাইবোনেরা, আমাকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হচ্ছে কারণ, আমি উনার গুণমুগ্ধ অনুগামী হবার কারণে, উনার দেশপ্রেমের দর্শন, উনার দেশসেবার দর্শন, সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। অর্থাৎ আমি এখানে উনারই দর্শন বলতে এসেছি। আর তাই আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়েছি।

সামান্য হেসে উনি আবার বললেন – তোমরা সকলে বললে, আমি শুনলাম যে আপনারা দেশের সেবা করতে চাও, তাই আর্মিতে জয়েন করতে চাও। ... খুব ভালো লাগলো কথাগুলো শুনে, আর তার থেকেও বেশি ভালোলাগলো, তোমাদের দেশপ্রেমের মানসিকতা দেখে। ... তবে কি জানো আমার ছোট বন্ধুরা,

তোমাদের আঙ্কেল, ব্রিগেডিয়ার সুধীর সান্যাল আমাকে একটা কথা বলেছিলেন একবার। সেই কথাটা খুব মনে পরেগেল, তোমাদের কথাগুলো শুনতে শুনতে।

উনি বলতে থাকলেন – সত্যি বলছি, ব্রিগেডিয়ার সাহেব বেঁচে থাকা অবস্থায়, আমি তাঁর বলা কথাগুলো একদমই সিরিয়াসলি নিই নি, যেমন হয়ে থাকে আরকি। প্রতিটি গুণী ব্যক্তির স্ত্রীই আমার মত হয়ে থাকে। কেন, তা বলতে পারবো না, তবে এমনই হন। ... স্বামীর গুণ তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়, যদি তাঁর স্বামী সেই গুণের পরিবর্তে মান সম্মান বা সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ... আর যদি সেই গুণ স্বামীকে সমাজের চোখে গুণী না করে, তবে সেই গুণকে প্রথম যিনি অবজ্ঞা করেন, তিনি হলেন তাঁর স্ত্রী। ...

একটু হেসে – আর মজার কথা হলো এই যে, সমাজ স্বামীকে গুণী বললে স্ত্রীর ছাতি চওড়া হয়ে যায়, আর না বললে ছাতিতে বিরক্তির তিল গজিয়ে ওঠে। ... কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই কমন ব্যাপার যেটা, সেটা হলো, স্বামীর মতাদর্শ স্ত্রী কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না, বিশেষ করে সেই স্বামীর মতাদর্শ যদি অন্য সকলের থেকে আলাদা হয়, তবে তো আর কথাই নেই। ... আমার ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়েছে। ... সমাজ আমার স্বামীর গুণকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তাই আমার ছাতি চওড়া হয়ে গেল। ... কিন্তু উনার মতাদর্শ শুনলেও, সেই নিয়ে বিচার করার চিন্তা পর্যন্ত করিনি। ... ওই বলে না, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝেনা। আমারও একই দশা। ... উনি চলে যেতে, উনার স্মৃতির মধ্যে সবথেকে বড় অংশ, যেটা ছিল উনার মতাদর্শ, সেটিই আমার জীবনী হয়ে উঠতে থাকলো।... আর সেই কথা সম্বন্ধে বিস্তারে কালকে বললেও, আজকে একটিই কথা বলবো।

একটু নিশ্বাস নিয়ে, মিসেস সান্যাল বললেন – আমি প্রায়শই আমার স্বামীর কাছে দুঃখ করে বলতাম, তুমি তো দেশসেবা করছো; আমার তো আর সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু তুমি যখন থাকো না, তখন বড্ড একা একা লাগে। একটা কিছু করলে ভালো হতো। ... তোমার মত দেশসেবা না করতে পারলেও... একটা কিছু!

উনি আমাকে একটা স্কুলের চাকরি করে দিয়েছিলেন । নামচি, যেখানে আমি থাকি, সেখানের টিচার হয়েছিলাম আমি। এখনো টিচিং করি সেখানে। ... কিন্তু এই কাজটি দেবার আগে, আমাকে উনি একটা মজাদার কথা বলেছিলেন। সেটাই আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই। ... উনি আমাকে প্রশ্ন করেন – আচ্ছা, এই পরিবারে তুমি কে?

আমি বললাম – হাউজ ওয়াইফ!

উনি বললেন – বেশ, তোমার কন্ট্রিবিউশান কি এই পরিবারের খরচাখরচে?

আমি বললাম – আমার তো কনো কন্ট্রিবিউশান নেই! ... আমি তো খালি এই পরিবারের এডমিনিস্ট্রেশন করি, আর সুরক্ষিত রাখি তোমাকে, মানে যতক্ষণ এখানে থাকো, যাতে তোমার উপার্জনে কখনো ঘাটতি না হয়। উপার্জন মানে প্রোডাক্টিভিটি তো তোমার!

উনি বললেন – বেশ, তবে আমাকে এটা বলো যে দেশের যত পলিটিকাল লিডার আছে, তাদের প্রোডাক্টিভিটি কি? বা যত আইএএস বা আইপিএস আছে, তাদের প্রোডাক্টিভিটি কি?

আমি বললাম – দেশের ব্যবস্থায়ন করেন উনারা। আলাদা করে কনো প্রোডাক্টিভিটি...!

উনি আবার প্রশ্ন করলেন – আমি বলতে চাইছি, দেশের জিডিপিতে উনাদের অবদান কি?

আমি বললাম – আলাদা করে কিছু না। ব্যবস্থায়ন না করলে, জিডিপির যেই ঘাটতি হতো, সেটা থেকে উনারা সুরক্ষা প্রদান করেন।

উনি আবার প্রশ্ন করলেন – আচ্ছা এবার বলো দেশের আর্মির তরফ থেকে জিডিপিতে অবদান কি?

আমি বললাম – কিছুই না। উনারা দেশের সুরক্ষা করেন। মানে ঠিক করে বলতে গেলে, যারা জিডিপিতে যোগদান করেন, তাঁদের সুরক্ষিত করেন।

উনি হেসে বললেন – তাহলে দেখলে তো, আর্মি, পলিটিকাল লিডার, আইএএস, আইপিএস, ইউপিএসসি ক্লিয়ার করা সকলে জিডিপিতে কনো যোগদান করেন না। যারা যোগদান করেন, তাদের সুরক্ষা প্রদান করেন আর ব্যবস্থায়ন করেন। অর্থাৎ, তুমি এই পরিবারে যেই কাজটা করো, ব্যবস্থায়ন আর সুরক্ষা, সেটাই করেন। ... তাহলে কি বুঝলে?

আমি উত্তর দিতে না পারলে, উনিই উত্তর দিলেন – একটা দেশের হাউজ ওয়াইফের কাজটা করে এরা সকলে, আমরা আর্মির সকলে। ... এবার উনি বললেন – এবার বলো, যারা জিডিপিতে যোগদান করেন, তাঁরা যদি না কাজ করতেন, তবে আমরা কি দেশ চালাতে পারতাম! ... না পারতাম না। ... অর্থাৎ তোমার এই যে ভাবনা যে আমরাই দেশপ্রেমী, এটি একটি ভুল ধারনা। ... দেশের প্রতিটি মানুষ যারা জিডিপিতে যোগদান করছেন, তারাই দেশপ্রেমী। আর আমরাও দেশপ্রেমী, কারণ আমরা তাঁদের সুরক্ষা প্রদান করি, যারা দেশপ্রেমী।

এবার হেসে মিসেস সান্যাল বললেন – তাহলে কি বুঝলেন আমার ছোট বন্ধুরা! ... যদি এমন ধারনা রাখেন আপনারা যে কেবল মাত্র আর্মিতে যোগদান করলেই, আপনারা দেশপ্রেমী, তাহলে সেই ধারনাকে খারিজ করে দিন। ... যেই ব্যক্তি কৃষক হয়ে, কেবল নিজের পরিবার চালানোর মত শস্য উৎপাদন করে থেমে না থেকে, আমাদের সকলের খাবারের ব্যবস্থা করছেন, তিনিও দেশপ্রেমী; যিনি অমানুষিক পরিশ্রম করে ফ্যাক্টরিতে আমরা যাতে পরিষ্কার আর রোগমুক্ত থাকতে পারি তার জন্য সাবান, তেল, শ্যাম্পু নির্মাণ করছে তারাও দেশপ্রেমী। যারা সেই সমস্ত ফ্যাক্টরির জিনিস আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে ডিস্ট্রিবিউটার, বা সেলসম্যান, তারাও দেশপ্রেমী। সমস্ত কৃষকদের উৎপাদন করা শস্য আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে, যারা আরদ্দার বা যারা রেশন ডিলার, তারাও দেশপ্রেমী।

যে আমাদের চুল কেটে নাপিতের কাজ করে, সেও আমাদেরকে দেশের জিডিপিতে যোগদান করার জন্য প্রস্তুত করছে, তাই সেও দেশপ্রেমী; যেই দরজি আমাদের সকলের লজ্জা ঢাকছে, সেও দেশপ্রেমী। যে দিনরাত রোদে বৃষ্টিতে মাঠে নেমে খেলে আমাদের বিনোদন দিচ্ছে, সেও দেশপ্রেমী; যে থিয়েটার সিনেমা করে আমাদের বিনোদন দিচ্ছে, সেই দেশপ্রেমী। যেই লেখক আমাদের মনে দেশপ্রেমকে সতেজ করার জন্য কলম ধরেছে, সেও দেশপ্রেমী। কে নয় দেশপ্রেমী। সকলেই দেশপ্রেমী। ... সকলে যা যা করছে, তা দিয়ে যেমন নিজেদের পেট ভরছে, নিজেদের পরিবারের পেট ভরছে, তেমনই আমাদেরকেও নিজেদের জীবন চালিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে, আমাদের দেশের জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশান যাতে ঠিক থাকে, সেই চিন্তা করার জন্য দেশপ্রেমী। আর এই সমস্ত দেশপ্রেমীদের যেই মায়েরা, যেই স্ত্রীএরা, যেই বোনেরা নিঃশব্দে সেবা করে তাদের দেশের জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশান ঠিক রাখতে সাহায্য করে, তারা তো সব থেকে বড় দেশপ্রেমী।

আবার একটু হেসে মিসেস সান্যাল বললেন – উনি বলতেন, আর্মিতে কাজ করলে দেশপ্রেমী ট্যাগটা গায়ে লাগে মাত্র। কারণ আর্মির লোকেরা জীবনকে বাজি রেখে দেশের সুরক্ষা করে। কিন্তু যারা দিননেই রাতনেই, গ্রীষ্ম নেই বর্ষা নেই, ক্ষেতে পরে পরে চাষ করছেন, তারা জীবন দিচ্ছেন না! ... যারা লোডশেডিংএও মোবাইলের টর্চ জ্বেলে দরজির কাজ করছেন, যাতে সকলের লজ্জা নিবারণ হয়, তিনি জীবনকে প্রতিমুহূর্তে পণ করছেন না! ...

সামান্য হেসে – তাই আমার ছোট বন্ধুরা, আপনারা সকলেই দেশকে ভালো বাসেন, সেই ব্যাপারে কনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ধারনা রাখবেন না যে দেশকে ভালো বাসেন বলে, আপনাদের আর্মিতে জয়েন করতেই হবে। ... যেই কাজই আপনারা করুন না কেন, তার দ্বারাই আপনারা দেশের সেবা করতে

পারেন। ... ব্রিগেডিয়ার সাহেব বলতেন, যেদিন দেশের প্রতিটি মানুষ নিজের নিজের কাজকে দেশের সেবা করা বলে অনুধাবন করতে পারবে, সেদিন দেখবে আর দেশের মধ্যে কনো ক্রাইম হবেনা। ...

উনি বলতেন, দেশে ক্রাইম হবার কারণই এই যে, যাদেরকে খুন করা হয়, তাদেরকে দেশপ্রেমী বলে মনে করা হয়না, আর একই সঙ্গে যারা ক্রাইম করছেন তারাও নিজেদের দেশপ্রেমকে চিহ্নিত করতে পারছেন না। ... যেদিন সকলে নিজের নিজের জায়গায় দেশপ্রেমী, এটি উপলব্ধি করতে পারবেন, সেদিন একটিও দেশের মানুষ, নিজের দেশের মানুষের উপর জোরজুলুম, ঠকানো, বা খুন করবে না। ... আরো অনেক কথা ব্রিগেডিয়ার সাহেব বলতেন, দেশের ব্যাপারে। সেই ব্যাপারে তোমাদের নয় কালকে বলবো। ... আজকে এটুকুই বলার ছিল যে, আর্মি মানেই দেশপ্রেম আর অন্য প্রফেশান মানে দেশপ্রেম নয়, এই ধারনা থেকে বেড়িয়ে আসো তোমরা। যতটা দেশপ্রেম বর্ডারে দাঁড়িয়ে থাকা জোয়ান দেশকে করেন, ততটাই দেশপ্রেম একটি কৃষক বা একজন সামান্য অফিসে কাজ করা কর্মচারীও করেন।

তাই এমন ভাবনা নিয়ে আর্মিতে জয়েন করো না যে, এটিই দেশপ্রেম স্থাপন করার একমাত্র উপায়। হ্যাঁ এখানে দেশপ্রেমের ট্যাগ দেওয়া হয় মানুষকে। কিন্তু এই দেড়শ কোটি মানুষের দেশে, মাত্র ১৫ লক্ষ্য দেশপ্রেমীই যদি থাকতো, তবে এতদিনে দেশটা বেশ কয়েকবার অন্য কনো শক্তির কাছে পরাধীন হয়ে যেত। তা যে হয়নি, তা এই প্রমাণই করে যে, দেশে মাত্র ১৫ লক্ষ্যই দেশপ্রেমী নেই, দেশে অন্তত একশ কোটি দেশপ্রেমী আছেন। ... তাই যদি দেশপ্রেমী ট্যাগটার প্রতি আকর্ষণ থাকে তবে আমার আর কিছু বলার নেই, আর তা না হলে আর্মিতে তখনই জয়েন কর, যখন নিজেকে দেশের হাউজ ওয়াইফের ভূমিকায় দেখতে পছন্দ করছ। ... অন্ধের মত পথ চলো না বন্ধুরা। এই অন্ধত্ব যদি থাকে, তাহলে সেই অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দাও। কারণ এই অন্ধত্ব যদি থেকে যায়, তবে বেশিদিন সময় লাগবে না, দেশের পঙ্গু অবস্থা সামনে আস্তে।

মিসেস সান্যাল নিজের কথা শেষ করে ডাইস থেকে নেমে এলেন। প্রথমেই করতালি পরেনি। একটু পরে একজন করতালি দিলেন। তারপর আসতে আসতে পুরো ঘর করতালি দিতে শুরু করলেন। বিদিপ্তাদিদি আমার পাশে উঠে এসে বসে বললেন – কি দিদিভাই, কেউ আছে এখানে?

আমি দুষ্টু হেসে বললাম – আমি কি আর তোমার মত ত্রিকালদর্শী!

ঘরে চলে গেলাম চা-টা খেয়ে। বাবাকে দেখলাম দারুণ মেজাজে রয়েছেন। বিদিপ্তাদি আর আমি মা বসেছিলাম, এমন সময়ে বাবা বললেন – এই ব্রিগেডিয়ার সান্যালের সম্বন্ধে আরো জানতে ইচ্ছা করছে দিদি। ... অদ্ভুত দৃষ্টিকোণ ভদ্রলোকের। এতো উদার দৃষ্টিকোন সরকারি কর্মীদের থাকেনা বললেই চলে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, উনি নিজের সরকারি কর্মচারী বা আর্মি জেনারালের ট্যাগেই নিজেকে আটকে

রাখেন নি। ... একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী। ... হ্যাঁ দিদি, প্রকৃত দেশপ্রেমী বলেই তো দেশের প্রতিটি প্রফেশানের মানুষকে দেশপ্রেমী বলতে পেরেছেন। ... আর এই কথাই বলে দেয় যে উনি দেশের আর্মিতে থেকে নিজেকে বড় মনে করতেন না, বরং মনে করতেন যে তিনি সেই সমস্ত দেশপ্রেমীদের সুরক্ষা প্রদান করে দেশকে প্রেম করছেন। ... কি বিরাট দৃষ্টিভঙ্গি। ... এটাই তো সেবা ভাব, না দিদি!

বিদিপ্তা দিদি হেসে বললেন – হ্যাঁ বিজয়। যখন সামনের ব্যক্তিকে অসামান্য আর নিজেকে তার কাছে নগণ্য মনে হয়, তখনই তো সেবা ভাব। যদি সামনের ব্যক্তিকে অসহায় মনে হয়, আর নিজেকে মনে করা হয় যে আমি না দেখলে একে কে দেখবে, তখন তো দম্ভ কাজ করে, সেবা ভাব আর কোথায় থাকে তখন!

বাবা হেসে বললেন – করিতে পারি তোমারও সেবা, ধন্য হইল জীবন মোর। তোমা কর্ম করিতে দিলে, আনন্দে করি করজোর। অজস্র তোমা সন্তান মাঝে, বাছিলে অতি তুচ্ছ আমারে। তোমা করুণা অপার মারে, লহ হে প্রণাম বারে বারে।

বিদিপ্তাদি – ঠিক বাবা। একদম ঠিক। ... তাঁর অজস্র সন্তান। সমস্ত মুখ তাঁর, সমস্ত হাত তাঁর, সমস্ত চরণ তাঁর। সেই সকলের মাঝে, তুমি আমারে বেছে নিলে তোমার কর্ম করার জন্য। ধন্য করে দিলে আমাকে। আমার ইহজীবন পরজীবন, সমস্ত জীবনকেই ধন্য করে দিলে। ... এটাই তো সেবাভাব। সেবা করে আমি কিচ্ছু উপকার করি নি। সেবা করতে পরেছি যে, সেটা আমার উপর উপকরা করা হয়েছে। এটাই তো সেবা ভাব।

এই কথাগুলো বাবা যখন বলেন, বিদিপ্তাদিদির সাথেই বলেন। ... মায়ের সাথে নয়। তবে মাকেও দেখেছি যখন এই ধরনের কথা হয়, তখন মশগুল হয়ে কথাগুলো শোনেন। যেন একটা অন্য দেশে হারিয়ে যান। ... কি অদ্ভুত পরিবার আমি পেয়েছি। সেবা করার সুযোগ এখনও পর্যন্ত আমি পেয়েছি কিনা জানিনা, তবে হ্যাঁ, এমন পরিবারে জন্মাতে পেরেই আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।

লেজার রশ্মি

পরের দিন সকালে আমি নিজেই তাড়াতাড়ি উঠে পরলাম। বেশ আগ্রহ লাগছিল মিসেস সান্যালের কথা শোনার জন্য। ব্রিগেডিয়ার সান্যালের কথা শুনতে যেন খুব ইচ্ছা করছিল। তাই-ই হয়তো তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল। লক্ষী মেয়ের মত সেদিন নিজের স্নানটান ঠিক সময় মত করে নিয়ে, ৮তা ৪৫এই আমি আর মা রেডি। মাকেও আজ দেখলাম, একটু তাড়াতাড়ি করছেন। ... আসলে সংসর্গের দোষগুণ সব। বাবার

সংস্পর্শে থেকে এই সমস্ত উচ্চদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এমনিই আমি আর মা এডিক্টেড হয়ে গেছিলাম। তারপরে আবার বিদিপ্তাদির আসার পরে, তো সেই সম্বন্ধে আর কিছু বলার প্রয়োজনই পড়েনা।

গাড়িতে যেতে যেতে বাবা বললেন – কালকে আপনার বক্তৃতা শুনে আমরা সকলে মুগ্ধ হয়ে গেছি ম্যডাম সান্যাল।

মিসেস সান্যাল – কথাগুলো সবই উনার। আমি তো কেবল কথক মাত্র।

বাবা হেসে বললেন – উনি বলেছেন। আপনিও তো এডপ্ট করেছেন। এডপ্ট করেছেন বলেই, যথার্থ ভাবে কথাগুলোকে পরিবেশন করে, সকলের মনের দরজা খুলে দিতে পারছেন। তাই না!

মিসেস সান্যাল – সুখ্যাতি শুনতে ইচ্ছা করে না আর জানো। ... উনি ব্রিগেডিয়ার হিসাবে বা আর্মি জেনারাল হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাত অর্জন করেছেন, কিন্তু উনার এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উনি কনো সুখ্যাতই পেলেন না। ... তাই সেই সুখ্যাত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেনা। আমার সেই কথা পরিবেশনে কনো প্রতিভা কাজ করছে কিনা, আমি জানিনা, আর সত্যি বলতে জানতেও চাই না। যখন কালকে হাততালি পরলো, তখন অন্তরমনে কেবলই উনার উদ্দেশ্যে বললাম, দেখো তোমার সুখ্যাত হচ্ছে। ... এই সমস্ত হাততালি তোমার জন্য।

মা মাঝে বললেন – উনি আপনার হিরো ছিলেন তাই না!

মিসেস সান্যাল হেসে উত্তরে বললেন – তোমার কাছেও তো তোমার কর্তা হিরো, কি তাই না! ... আসলে কি জানো তো, আমরা সকলেই হিরো খুঁজি আমাদের মনে মনে। ঠিকঠাক হিরো পাইনা, তাই বারেবারে হিরো পালটে যায়। আর একবার যদি ভাগ্যক্রমে পেয়ে যাই, মনে হয় জীবনটাই তাঁর জন্য বাঁচি। (হেসে) কি ঠিক তো?

মাকে আর উত্তর দিতে হলো না, আমরা এসেগেলাম সেই বিরাট বাড়ির সামনে । গাড়ি থেকে আমরা সকলে নেমে পরলাম। ... সেই বড় হলঘরে চলে গেলাম সকলে। কালকের মতই ঘরে ঢোকার দরজাতেই সকলের হাতে একটা করে ব্রেকফাস্টের বক্স ধরিয়ে দেওয়া হলো। সেই বক্স নিয়ে, আমরা চারজন মিলে একটা সামনের দিকে টেবিল দখল করে, চারটে চেয়ার যোগ করে বসলাম। ব্রিগেডিয়ার সিং ও গতি সকালের একটা সম্ভাষণমার্কা বক্তৃতা দিয়ে, মিসেস সান্যালকে তাঁর কথা বলার জন্য স্টেজে ডাকলেন। এর মধ্যে আমাদের ব্রেকফাস্ট করাটাও হয়ে গেছে। টেবিলে টেবিলে, রেড ওয়াইন, চা আর কফি সার্ভ করা

হচ্ছিল। আমি আর মা কফি নিলাম। বাবা আর বিদিপ্তাদি চা নিলেন। অন্যদিকে মিসেস পারমিতা সান্যাল তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন।

উনি বললেন – তোমরা সকলেই আমার ছোট ছোট ভাইবোন, দেশের ভবিষ্যৎ। তাই লেট ব্রিগেডিয়ার সুধীর সান্যাল এই দেশের ব্যাপারে কি কি বলেছিলেন, সেই সম্বন্ধে আজ তোমাদের বলি, শোনো তবে। উনি বলতেন, দেশপ্রেম কেন থাকা উচিত সেই ব্যাপারে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, এই যে শরীর, কি দিয়ে তৈরি এটা? মাটি আর মাটির সাথে থাকা সমস্ত খনিজ থেকে। কি করে পাওয়া গেল এই শরীর? এই দেশের মাটির থেকেই এই শরীর নির্মিত। আমাদের এই শরীর নির্মাণ হয়েছে, আমাদের বাবার বীর্য থেকে, আমাদের মায়ের ডিম্ব থেকে, আর তাঁরা এই দুইই পেয়েছেন, এই মাটি থেকে, আর এই মাটির সমস্ত খনিজ মিলে যেই ফসল উৎপাদন করেছেন তার থেকে। ... তাহলে এই শরীর কার কারণে পেয়েছি আমরা? এই দেশের কারণে।

তিনি আরো বলতেন, এই দেশের উপরে যেই আকাশ, সেই আকাশই আমাদের সমানে প্রাণবায়ু জুগিয়ে যাচ্ছে; এই দেশের যত নদী, তারাই আমাদের পিপাসা মিটিয়ে, আমাদের শরীরের যে ৭০ শতাংশ জল, তার পরিমাণকে অক্ষুণ্ণ রেখে যাচ্ছেন। তাই এই দেশ আমাদের মা আর বাবা দুটিই। যিনি সৃজন করার সামগ্রী প্রদান করেন, তিনি বাবা; আর যিনি সৃজন করেন তিনি মা। আর বাবামা উভয় মিলেই সৃজিতকে লালনপালন করতে থাকেন। এই দেশ নিজের মাটিকে সামগ্রীরূপে দান করে এই দেহ সৃজন হতে দিয়েছেন। আর এই দেহকে জল ও বায়ু দিয়ে, আর দাঁড়িয়ে থাকার ভূমি দিয়ে লালনপালন করে চলেছেন। তাই এই দেশ আমাদের মাবাবা দুইটিই।

কিন্তু এই কথার সাথে সাথে উনি হতাশাও প্রকাশ করতেন। উনি বলতেন, কিন্তু আমরা আমাদের বাপমায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিদান দিই না। ... আমি প্রশ্ন করলে, উনি বলতেন, কোথায় দিই প্রতিদান! ... তিনি বলতেন, একবার ভাবো, তোমার যিনি জন্মদাত্রী, তাঁর মাটির দেহ কেটে, তার থেকে সমস্ত খনিজ তুলে নিলে কেমন লাগতো? আমরা তো তাই করছি না! ... যতটা আমাদের প্রয়োজন, তার থেকে অনেক অনেক বেশি কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, ইত্যাদি খনিজ তুলে নিয়ে, এই দেশকে যেমন শূন্য করে দিচ্ছি, তেমনই এর মাটির যেখানে যেখানে সোনা পাচ্ছি, আমরা তুলে নিচ্ছি।

উনি এই সূত্রে বলতেন, প্রকৃতির কনো কিছুই অহেতুক নয় । গ্রীষ্মের ভয়ানক গরম। কি তার গুরুত্ব? মাটির নিচের সমস্ত খনিজকে ব্যবহারিক অবস্থায় উন্নীত করার জন্যই এই গ্রীষ্মকাল। তিনি বলতেন, চাষিরা জানেন, সোনা, রুপা, ইত্যাদি মহামূল্যবান খনিজই হলো সুস্বাস্থের কারণ। শুধু চাষিই জানেন না

এটা। উনি বলতেন, আরো অনেকে জানেন। আর জানেন বলেই চ্যবনপ্রাস ইত্যাদিতে সোনা রুপার জল দেওয়া হয়। ... চাষিরা জানেন যে এই সোনা রুপা তাঁদের ফসলকে সেই পুষ্টি দেবে, যা সেই ফসলের খাদক অর্থাৎ আমরা দেশের মানুষেরা খেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠবো। তাই, অনেক জায়গার চাষিরাই বুঝতে পারেন যে মাটির নিচে সোনা রয়েছে, তাই এত সুন্দর ফসল হচ্ছে। কিন্তু তারা সেই কথা কারুকে বলে না। কেন? কারণ তারা জানে, সোনা আছে জানলেই, হামরে পরে, সমস্ত সোনা হাতিয়ে নেওয়া হবে, আর আমাদের এই দেশের মাটিকে, দেশের শরীরকে নগ্ন করে দেওয়া হবে। তাই বলেন না।

উনি এই সমস্ত কথা বলে বলতেন, কোনটা সেবা? কোনটা দেশের সেবা! এই সমস্ত সোনা তুলে নিয়ে, অহেতুক খনিজকে উত্তোলন করে বিদেশে বিক্রি করাটা, নাকি এই সমস্ত কিছুকে যথার্থ ভাবে মাটিতে রেখে দিয়েই, মাটিকে উর্বর হতে দিয়ে, দেশের সমস্ত মানুষকে একটি উজ্জ্বল সুস্বাস্থ উপহার দেওয়াটা! ...

আরো বলতেন উনি। উনি বলতেন, এই এতো নদী আমাদের সমস্ত সময়ে জল দিয়ে যাচ্ছে। ... আমরা কি আমাদের জননীর জলধারার উপর বাঁধ দিয়ে দিই? না... কিন্তু দেশমাতার উপরে নিশ্চয়ই দিই। ... উনি বলতেন, তুমি বলবে চাষিদের সুবিধার জন্য এইসমস্ত কিছু। ইরিগেশনের প্রয়োজন না! গঙ্গা থেকে যমুনার, যমুনা থেকে নর্মদার, নর্মদা থেকে গঙ্গা, নর্মদা থেকে কৃষ্ণা, কৃষ্ণা থেকে গদাভরি পরিখা করা যেত না! ... চাষি নিজের জমিতে জল দেয় । বাঁধ করে জল দেয়? না, পরিখা কেটে জমিতে জল আনে। ওরা ভূমির সাথে থাকে। ভূমিকে ভালোবাসে। তাই ওরা বাঁধ দেয়না, ওরা খাল কাটে। তারা কিন্তু একবারও দাবি করেন না যে তাঁরা দেশপ্রেমী। আর আমরা, যারা নিজদের দেশপ্রেমী বলে সর্বক্ষণ দাবি করে থাকি, তারা কি করি? নিজেদের মায়ের জলধারাকে আমরা বাধিত করে দিই। এটাই কি দেশপ্রেম!

তিনি আরো বলতেন, যেই আকাশ আমাদেরকে প্রাণবায়ু প্রদান করে জীবিত রাখে, আমরা সেই আকাশকেই দিনরাত্রি চিড়তে পছন্দ করি। ... যেখানে আমার দেশে প্লেনে যাত্রা করার লোকের সংখ্যার থেকে ট্রেনে যাত্রা করা লোকের সংখ্যা প্রায় একশ গুণ বেশি, সেখানে একটা শহর থেকে অন্য শহরে দিনে প্লেনও যাচ্ছে ৪টি, আর ট্রেনও যাচ্ছে ৪টি। ... আর সেই বিলাসিতা প্রশ্রয়দানকারিদের না ছেড়েই দিলাম, দেশের মানুষকে পরিসেবা দিতে একটা স্যাটেলাইট ছাড়া হলো, ঠিক আছে মানা যায়, কিন্তু চন্দ্রযান, মঙ্গলযান কি কারণে? ... কেন এত বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে, ছোট ফ্যাক্টরি আর ছোট ছোট গাড়িদের পরিবেশদূষণের দোষারোপ করা! ...

উনি বলতেন, কি পেলাম আমরা একটা চন্দ্রজান পাঠিয়ে? কি যোগ হলো আমাদের জিডিপিতে এই চন্দ্রজানের জন্য! ... চন্দ্র থেকে প্রচুর খনিজ নিয়ে এলাম আমরা! ... না প্রচুর পেট্রোল ডিজেল নিয়ে এসে

দেশের ডিজেল পেট্রলের সঙ্কটকে নষ্ট করে দিলাম! ... কি কারণে এতো হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে, কিছু পুঁজিপতি দেশের সাথে ইঁদুর দৌরে নেমে দেখানো যে আমরা কারুর থেকে কম নই! বেশ, সব করলাম আমরা, কিন্তু যেই আকাশ আমাদের সেবা করে চলেছে, সেই আকাশের বুক চিড়ে এই অপচয় করা কি দেশপ্রেম! ... নিজের মায়ের ছাতিটা এইভাবে চিড়ে দিতে পারবে, যারা এই রকেট ছোড়াকে দেশপ্রেম বলেন! ... যদি না পারেন, তারমানে ওরা কি খালি দেশমাতাকেই প্রেম করেন, নিজের জন্মদাত্রীকে প্রেম করেন না!

উনি বিরক্ত হয়ে বলতেন এই বিষয়ে যে, যদি দেশমাতার মাটি খুবলে নিয়ে সমস্ত খনিজ বার করে নিয়ে তা অন্যত্র গচ্ছিত করা বা বিক্রয় করা দেশমাতাকে প্রেম করা হয়, তবে হয় তাঁরা নিজের জন্মদাত্রীর মাংস কেটে বিক্রি করুন, নয় তাঁরা বলুন যে তাঁরাতাঁদের জন্মদাত্রী মাতাকে প্রেম করেন না, তাই তাঁর মাংস খোবলান না, দেশমাতাকে প্রেম করেন, তাই তাঁর মাংস খোবলান। যদি নিজের জন্মদাত্রী মায়ের শ্বাসরোধ করে, ছাতি চিড়ে না দেন, কিন্তু দেশমাতার আকাশ চিড়ে রকেট ক্ষেপণ করাকে দেশপ্রেম বলেন, তাঁরা তাহলে বলে দিন তাঁরা তাঁদের জন্মদাত্রী মাকে স্নেহ করেন না । কেবল মাত্র দেশমাতাকেই স্নেহ করেন, তাই তাঁরই ছাতি চিড়ে দেন।

সামান্য হেসে মিসেস সান্যাল বললেন – এই ছিল উনার দেশপ্রেমের ভাষা। উনি বলতেন দেশপ্রেম সকলে করেন; তাঁরা তাঁরা করেন যারা নিজের জন্মদাত্রী আর দেশমাতার মধ্যে কনো ভেদ করেন না, তাঁরা সকলেই দেশপ্রেমী। আর যারা নিজেদের উপর দেশপ্রেমের ট্যাগ লাগিয়ে নিয়ে, যা যা নিজের জন্মদাত্রী মায়ের সাথে করেন না, তাই তাই দেশমাতার সাথে করে, দেশবাসির সেবা করার অঙ্গিকার করে, তাঁরা কি সত্যই দেশপ্রেমী!

মিসেস সান্যাল সকলের উদ্দেশ্যে হেসে – উত্তর আপনারা দেবেন। ড্যাম না করে, খাল কেটে, সেই খালে ক্যাথোড এনোড লাগিয়ে প্রকৃতির গতিকে কনো ভাবে ক্ষুণ্ণ না করে, যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে তোমরা, সেটাই দেশপ্রেম, কারণ সেই কাজে তোমরা যেমন দেশের মানুষকে বিদ্যুৎ দেবার সেবা করলে, তেমন দেশমাতার সাম্যতাকে ধরে রাখার সেবাও করলে।... বিপুল নদীমাত্রিক আমাদের এই দেশের জলধারাদের মধ্যে ক্যাথোড এনোড ব্যবহার করে বিপুল মেগাওয়াট ইলেকট্রিক উৎপাদন করে তাক লাগিয়ে দিয়ে, যখন সমস্ত যানবাহনকে এলেক্ট্রিকে চালিত করে দিয়ে, প্লেনের সংখ্যা কমিয়ে, ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে, জনসেবা করতে পারবে, সেটিই হবে প্রকৃত দেশপ্রেম।

মানুষের প্রয়োজন মেটানোটাই শুধু দেশপ্রেম নয়। এই দেশের মানুষ তো দীর্ঘকাল বিদ্যুৎ ছাড়াই দিন কাটিয়েছে, সুখে দিন কাটিয়েছে। ... আজ যে বিদ্যুতের প্রয়োজন তাঁদের পরছে, সেই প্রয়োজনের রচয়িতা কারা! ... মানুষের প্রয়োজনকে সীমিত রেখে, দেশের আকাশ, জল, আর মাটির সাম্যতা ধরে রাখার কাজ করবে সেটিই, সেটিই দেশপ্রেম। ... তাই তোমাদের সকলের আদর্শ, লেট ব্রিগেডিয়ার সুধীর সান্যালের কথা অনুসরণ করেই বলছি, প্রকৃত দেশপ্রেমী হয়ে ওঠো। ... শুধুই দেশপ্রেমীর ট্যাগ নিজের সাথে যুক্ত করার জন্য অন্ধের মত ছুটোনা; প্রকৃত দেশপ্রেমী হয়ে, দেশমাতার প্রিয় সন্তান হয়ে ওঠো। আর কিছু বলার নেই আমার। ... কারুর কনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করতে পারো।

জমা হওয়া সমস্ত ছেলেমেয়ে উন্মুক্ত উৎসাহের সাথে করতালি দিলেন ম্যাডাম সান্যালের উদ্দেশ্যে। বাবাও খুব আনন্দিত ও উৎসাহী দেখলাম। কিন্তু বাবার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, আর দেখলাম বাবার মুখের ভাব পালটে যাচ্ছে। ... তার পরমুহূর্তেই দেখলাম, বাবা স্টেজে ধড়ফড় করে উঠে পরলেন, আর খানিক পরে, মিসেস সান্যালের মাথা নামিয়ে নিয়ে, নিজের মাথাও নামিয়ে নিলেন। একটা ফায়ারের শব্দ। ... ডাইসের পিছন দিকে যেই সিল্কজাতিয় চাদর ছিল, তাতে একটা ছিদ্র, আর সেই ছিদ্র থেকে ধুয়া বার হতে থাকলো।

কেউ গুলি চালালেন মিসেস সান্যালকে হত্যা করার জন্য। ... লেজার লাইট পরেছিল উনার কপালে, বাবার থেকে পরে জেনেছিলাম। অর্থাৎ কেউ স্নিপার রাইফেল ব্যবহার করে, মিসেস সান্যালকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন? কে সেই আততায়ী! ... সমস্ত ঘরে হইচই লেগে গেল। সেদিনের মত সভা ভেঙে দেওয়া হলো। আর পরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দুইদিন সভা বন্ধ থাকবে।

ঘুরতে এসে, এমন রহস্য আমার সত্যিই ভালোলাগছিল না। ভেবেছিলাম, মাকে এই ব্যাপারে সঙ্গে পাবো, আর তা পেলে, বাবাকে এই রহস্যের থেকে দূরে রাখতে পারবো। কিন্তু মায়ের অন্যরূপ আজ । মা নিজে বাবাকে বললেন – তুমি এখানে থাকতে, মিসেস সান্যালের কিচ্ছু হতে পারে না। ... উনার মতন একজন মহিলা, যিনি একটা নতুন ধারার হিল্লোল তুলে দিলেন কিছু যুবাযুবতির মধ্যে, তাঁর কিচ্ছু হতে পারেনা, তুমি থাকতে। ... খুঁজে বার করো, কে উনাকে মারার চেষ্টা করেছিলেন। ... আমরা তো এখানেই ৫ তারিখ পর্যন্ত আছি। আজ তো সবে ২৯ তারিক। তুমি খুঁজে বার করো তাকে।

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন – হুম করবো, তবে চুপচাপ। কারুকে বলতে যাবেনা আমি তদন্ত করছি। ... জানবে এখানে সব এক্স-ব্রিগেডিয়ার। উনারা যদি জানতে পারি আমি তদন্ত করছি, আততায়ীকে ছেড়ে, ওরা হাতধুয়ে আমার পিছনেই লেগে যাবে। ... তাই কেউ জানবে না যে আমি তদন্ত করছি। ... পুরপুরি চেপে যাও ব্যাপারটা। আমি দেখছি।

মায়ের এই মূর্তি দেখে আমি একটু লজ্জাই পেয়ে গেলাম। সর্বক্ষণ আমি বাবাকে এসিস্ট করি। আমার মনে বিরক্তি এলো। আর মা তো বাবার সঙ্গই পান না। এই বেড়াতে এসে সঙ্গ পেয়েছিলেন। উনি নিজে এই কেসের তদন্ত করতে বলছেন। মিসেস সান্যালের মত একজন ব্যক্তিত্বের সুরক্ষাকে উনি নিজের ঘোরাবেরনোর থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারলেন, আর আমি পারলাম না এই সিদ্ধান্ত নিতে!

কারুকে সেই ব্যাপারে কিছু বলিনি। কোন মুখেই বা বলতাম! কিন্তু মনে মনে নিজের আচরণে নিজেই আঘাত পাচ্ছিলাম। বিদিপ্তাদি কাছে এসে বললেন – মা তোর দিদিভাই। ... বড় হয়েছিস কিন্তু মায়ের থেকেও বড় হয়ে গেছিস!

কথাটা শুনে প্রথমে একটা মেকি হাসি দিলাম। তারপর মন থেকে একটা হাসি দিলাম। আর তারপরে বাবার সাথে সাথে মায়ের জন্যও গর্ব বোধ করে, একটা আনন্দের হাসি দিলাম। দিদি বোধ হয় এই তিননম্বর হাসির অপেক্ষা করছিলেন। তাই সেই হাসি দেখে তবেই সেখান থেকে গেলেন।

মা আর আমি বাবার পরামর্শেই মিসেস সান্যালের কাছে গেলাম, উনাকে সান্ত্বনা আর ভরসা দিতে। অন্যদিকে বাবা আর দিদি চলে গেলেন সেনসোর ব্রিজের দিকে, একটু চা খেয়ে আসতে। মিসেস সান্যালকে মা সান্ত্বনা দিতে গেলে, মিসেস সান্যাল বললেন – আমার কি করে কনো শত্রু থাকতে পারে! আমি তো কনো এক্টিভিস্টও নই। সামান্য গৃহবধূই ছিলাম বরাবর। আমার স্বামীর দেহাবসানের পর থেকে, তাঁর সমস্ত কথা আমার স্মৃতিতে ঘোরাফেরা করতে করতে, তাঁর সমস্ত কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারছিলাম মাত্র। ... আমার শত্রু!

মা বললেন – আপনার ছেলে মনে হয় এখানে নেই, তাই না!

মিসেস সান্যাল – না ও তো ওর ব্যবসা সেটআপের জন্য জব্বলপুর গেছে। ওকে কিছু জানাতে চাইছিনা। জানলে বড্ড টেনশন করবে। ... আচ্ছা মিসেস সিন, বিজয় এখানে রয়েছে, আমার ছেলে এখানে ৪ তারিখের মধ্যে ফিরে আসবে। আজ ২৯ তারিখ, সময় আছে। ছেলে আসার আগে বিজয় যদি ঘটনার তদন্ত করে ফেলে, খুব ভালো হয়।

মা – আসলে আমিও উনাকে বলেছিলাম কথাটা। উনি বললেন, আর্মির লোকরা সাধারণ তদন্তকারি এমনকি পুলিশ ইত্যাদিকেও গুরুত্ব দেয়না। তাই আমাকে ব্রিগেডিয়ার রা তদন্ত আগিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না!

মিসেস সান্যাল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন — আমি যদি বিজয়কে এপয়েন্ট করি, তাহলে তো কারুর কিছু বলার থাকতে পারেনা। হ্যাঁ, কো-অপারেট করবে না, আমিও জানি; কিন্তু আমি এপয়েন্ট করলে, ওকে আটকাতেও পারবে না। ... আর আমি বিজয়ের সম্বন্ধে যেটুকু জানি, ও তার মধ্যেই নিজের তদন্ত করে নিতে পারবে। ... ওর উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

মাও সেই কথা জানেন। কিন্তু যেন এই এপয়েন্ট করার কথাটা মা মিসেস সান্যালকে দিয়ে বলাতে চাইছিলেন। আমার মায়ের বুদ্ধিও কম নয় কনো অংশে। সূক্ষ্মবুদ্ধিতে উনিও অসাধারণ। এই কথাটা বাবা বলেছিলেন আমাকে। উনি বলেছিলেন, যদি কখনো পরিস্থিতি সহায়ক হয়, তবেই তোর মায়ের সাহস আর বুদ্ধির পরিচয় পাবি; গৃহবধূরা নিজেদের এইসকল গুণ লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করেন। সাহস তো এখনো দেখতে পাই নি, তবে হ্যাঁ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে গেলাম।

আমি আর মা, আমাদের করনিয় যা কিছু ছিল, তা করে নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। বাবা আর দিদি বেড়িয়েছেন, তা প্রায় দুই ঘণ্টা হয়ে গেছে। এখনো ফেরেননি উনারা। আমি সেই চিন্তায় পায়চারি করতে থাকলাম আমাদের বড় ঘরটাতে। মা অনেকক্ষণ আমাকে পায়চারি করতে দেখলেন, তারপর বললেন — কি হচ্ছে কি মিলি! একজায়াগায় চুপ করে বোস।

আমি – চা খেতে এতক্ষণ সময় লাগে কারুর!

মা – এত কেসে বাবার সাথে ঘুরছিস, এখনো তোর বাবাকে চিনলি না, কি হবে বলতো তোর!

আমি ভ্রু কুঁচকে মায়ের দিকে সন্দিহান নেত্রে তাকালে, মা বললেন – কলেজে পরিস তো!

আমি – হ্যাঁ, হঠাৎ!

মা – যখন আচমকা কনো টিচার ক্লাসের ছুটি দিয়ে দেন, কি করে ছাত্ররা?

আমি – ক্যান্টিনে ভিড় করে। চা কফি খায়।

মা – আর কিছু কি বলতে হবে?

আমি – বুঝতে পারলাম না! ... আচ্ছা, তুমি বলছো, এই আচমকা ছুটি পেয়ে সকলে চা খেতে চলে এসেছে; আর বাবা সেই কারণেই চা খাবার জন্য বেড়িয়ে গেলেন যাতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়! ...

মা – যাক বুঝলি তাহলে!

আমি – কিন্তু এইসবের কি দরকার ছিল! ব্রিগেডিয়ারের ঘরে গেলেই তো, সকলকে একসঙ্গে পাওয়া হয়ে যেত!

মা – পরাধীন মানুষের বক্তব্য, আর স্বাধীন মানুষের বক্তব্যে পার্থক্য থাকে তো, না কি! ... ব্রিগেডিয়ারের বাড়িতে, ব্রিগেডিয়ারদের নিয়মে বাঁধা ওরা। আর বাইরে চা খেতে আসলে, সম্পূর্ণ স্বাধীন। ... তুই একটা কাজ কর মিলি, এবার থেকে বাবার সাথে কেসে আর যাসনা।... না, বুঝতে পারছি, তোর বাবার মাথা খাস তুই। কিচ্ছু বুঝতে পারিস না, আর বাবাকে প্রশ্ন করে করে, উনাকে বিরক্ত করিস।

আমি মায়ের কাছে বসে বললাম – না, আমি প্রশ্ন করি না। ... মানে প্রশ্ন করে কনো লাভ হয়না । বাবা কিচ্ছু উত্তর দেন না। ... কিন্তু আমি সত্যি কিচ্ছু বুঝিনা।

মা – বোঝার জিনিস হলে তবে তো বুঝবি। ... বুঝতে কি হয় মিলি! ... একটা বইয়ের একটি লাইন, একটি প্যারাগ্রাফ কি বলছে, সেটা বোঝার জিনিস। কিন্তু পুরো বই কি বলছে, সেটা তো বোঝার জিনিসই নয়। সম্পূর্ণ বইয়ের মর্মার্থ উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়। ... মিলি বাবু, বুঝতে হয় মাথা দিয়ে, যা ব্যবহার করে লোকে ইঞ্জিনিয়ার হন, হিস্টরিয়ান হন, আইএএস হন, আইপিএস হন, এমনকি প্রচুর পয়সাপিশাচ ডাক্তারও হন। কিন্তু অনুভব করতে হয় হৃদয় আর আত্মা দিয়ে। ... যারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন তাঁরা বিশ্ববরেণ্য ডাক্তার হন, শত শত বছর মানুষের কাছে আদর্শ হয়ে থাকা বৈজ্ঞানিক হন, দার্শনিক হন, লেখক বা কবি হন। ... আর যারা আত্মা দিয়ে অনুভব করার সামর্থ্য ধরেন, তাঁরা হন ঋষি। ... বাবু, বুদ্ধি কম খাটা, আর অনুভব বেশি করার চেষ্টা কর। বুদ্ধি খাটিয়ে কেবল ধন উপার্জন করা যায়, এর থেকে বেশি কিছু করা যায়না। বাবাকে দেখে শেখ। যা সকলের দৃষ্টির অগোচরে, আততায়ীর বুদ্ধি আর মনের অন্তরের কথাকে উনি টেনে বার করে আনেন। কি করে? বুদ্ধির জোরে! বুদ্ধির এত ক্ষমতা আছে? দুর্বল গতি সম্পন্ন বুদ্ধির ক্ষমতা কতখানি! ... অনুভব শক্তির মাধ্যমে বাবা করেন এইসব। শেখ মিলি শেখ। এখনো যদি না শিখিস আর কবে শিখবি!

আমি – কিন্তু সারা পৃথিবীতো বুদ্ধির জয়গান গেয়ে যাচ্ছে!

মা – সেটাই তো স্বাভাবিক। ... মিলি, যার প্রভাবে এসে আমরা অবান্তর স্বপ্ন দেখতে পারি, তাকেই তো আমরা সাধারণতো হিরো মনে করি তাই না! ... বুদ্ধিই যে অবান্তর স্বপ্ন দেখে। দ্যাখ বুদ্ধি কি স্বপ্ন দেখে চলেছে! ... মঙ্গলে গিয়ে বসবাস করবে, স্পেসে হাঁটবে। যারা এই ছলনাকে ছলনা বলে জেনে, সেই

ছলের সাথে হাত মিলিয়েছে, তারা সুরক্ষিত। কিন্তু যখনই কেউ বুদ্ধির এই নোংরামো কে নোংরামো বলে না বুঝে, স্বপ্নকেই সত্যি মেনে নিয়েছে, কি হয়েছে! কল্পনা চাওলার মত স্পেসে পা রাখা মাত্রই ধ্বংস হয়ে গেছে। ... কি যায়নি!

আমি কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু মা একটা ফ্লোতে ছিলেন। তাই চেপে গেলাম। মা বলতে থাকলেন – আসলে কি বলতো, আমরা ভারতীয়রা কমবেশি সকলে মিথ্যে কথা বলি। ... শীতকালে স্নান করিনি। সামান্য গায়ে জল ছিটিয়ে, বাথরুম জলে পরিপূর্ণ করে, বাইরে এসে মাকে বলি, স্নান হয়ে গেছে। ... এই সামান্য মিথ্যেকে আমরা ভারতীয়রা মিথ্যে মনেই করিনা। ... কিন্তু আমরা না বড় মিথ্যে বলতে পারিনা। ... ভাবতেও পারিনা এমন মিথ্যে বলার কথা, বা এমন মিথ্যে কেউ বলতে পারে, সেটা মেনে নেবার কথা। (ঈষৎ হেসে) কল্পনা চাওলাও বুঝতে পারেন নি, স্পেস মিশনের আড়ালে থাকা ভয়ানক মিথ্যাচারকে। ধরে নিয়েছিলেন, সত্যিই মানুষ স্পেসওয়াক করছেন। ... আর সেই মিথ্যেকে মিথ্যে বলে মানতে না পারার ফল কি হলো? অঘোরে প্রাণ দিতে হলো।... বর্তমান বিজ্ঞান যা বুঝিয়েছে, সে তাই বুঝেছে, কিন্তু এই সহজ কথা ওর মাথায় ঢুকল না যে, যেই মাটি দিয়ে এই শরীর তৈরি, সেই শরীর ততক্ষণই টিকে থাকতে পারে, যতক্ষণ এটা মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে।

নিজের মনেই সামান্য হেসে মা আবার বললেন – বর্তমান বিজ্ঞান যে তাঁকে পঞ্চভূতের বিদ্যা দিতেই পারেনি। তাই সে বুঝতেও পারলো না যে, যেই প্রাণবায়ুর কারণে আমরা দেহে অবস্থান করতে পারছি নিশ্চিন্তে, সেই প্রাণবায়ুর উৎস কেবল অক্সিজেন নয়, তার উৎস এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। তাই যেই মুহূর্তে এই বায়ুমণ্ডলের সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হবে, সেই মুহূর্তে, তাঁর দেহধারণ অসম্ভব হয়ে যাবে। ... আর কেন বোঝেনি জানিস! ... কারণ সে জীবনকে বুঝতে গেছিল। তোদের আজকের বিজ্ঞান তো এই বোঝার কথাই বলে, অনুভবের কথা তো বলেই না। আর বলবেই বা কি করে, সে নিজে অনুভব করবে, তবেই না অনুভব করার কথা বলতে পারবে! ... আর সেই অনুভব না থাকার জন্য কল্পনা চাওলাকে মরতে হলো। ... মিলি, বাবার সাথে সর্বক্ষণ থেকেও তুই একটি জিনিস বুঝলি না যে, তোর বাবা বুদ্ধির জোরে একটিও কেস শলভ করেন না। উনার প্রখর অনুভবশক্তির কারনেই উনি আজ মিস্টার সিন।

আমি মায়ের দিকে অবাক দৃষ্টিতে দেখছিলাম। বাবা দিনরাত আমাকে বলেন, তোর মা একজন মহীয়সী। আমি শুনতাম, কিন্তু মনে মনে বলতাম, নিজের স্ত্রী, তাই এমন বলেন বাবা। কিন্তু আজ যেন ভুত দেখার মত মাকে দেখলাম। আমার মা যে এমন বিদুষী, আমি জানতামও না। ... মা আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন – আচ্ছা আমাকে একটা কথা বল মিলি। তোর বিদিপ্তাদিদি তো সামাজিক ভাবে একজন খুনি। ঠিক তো?

আমি – হ্যাঁ।

মা – তারপরেও তোর বাবা, তাঁকে আইনের হাতে তুলে দিলেননা, আর তাঁকে নিজের কাছে রেখে, নিজের আরাধ্যার সমান স্নেহ করেন। কেন বলতে পারিস? এমনটা উনি কেন করেন?

আমি – উনি খুবই ভালো। আসলে পরিস্থিতির কারণে ... না বুঝতে পারছিনা মা। ... মানে আমি আসল কারণটা ধারনা করতে পারছিনা। যা বলছি, সেগুলো উনার খুন করার বাধ্যতা সম্বন্ধে বলছি।

মা – ঠিক বলেছিস, আসল কারণটা তুই এখনও উপলব্ধি করতেও পারিস নি। ... আর আসল কারণ এই যে, তোর বাবা মন দিয়ে অনুভব করেন, আর কিছু কিছু সময়ে আত্মা দিয়েও অনুভব করেন, বিশেষ করে যখন ভারতমাতা বা বঙ্গমাতার কথা স্মরণ করেন। ... কিন্তু তোর বিদিপ্তাদি, আমার দিদিভাই, না তো মন দিয়ে, আর না আত্মা দিয়ে কিছু অনুভব করেন। উনি অনুভব করেন চেতনা দিয়ে, যা সত্যি করে বলতে গেলে ঋষিদেরও পক্ষে করা অসম্ভব। ... তাহলে দিদিভাই কেন করতে পারেন? কারণ তিনি ও তাঁর গুরুভগিনীরা এক পূর্ণঅবতারের ধারায় শিক্ষিত। ... ঋষিরা চেতনার দ্বারা অনুভব করতে অপারগ। সেটা করার সামর্থ্য একমাত্র অবতারের থাকে। আর দিদিভাই-এর গুরু হলেন সেই অবতারের কন্যা, যিনি সেই অবতারের ধারাকেই ধারণ করে শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই দিদিভাই তোর বাবার কাছে আরাধ্যার সমান, কারণ তিনি চেতনার মাধ্যমে উপলব্ধি করেন।

আমি – তুমি তো মা বেশি প্রশ্ন করো না। বাবাও এত বিস্তারে কনো কিছু বলেন না। তবে তুমি এইসব জানলে কি করে?

মা – নীরব দর্শক হয়ে। হ্যাঁ তোর বাবাই আমাকে শিখিয়েছেন। উনিই শিখিয়েছেন, বুদ্ধির ব্যবহার হলো সামনে যা হচ্ছে, তার সমানে বিশ্লেষণ করতে থাকায়। আর অনুভব করতে হলে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিদিয়ে সমস্ত কিছু দেখে যাও। ঠিক সময়ে যা কিছু দেখেছো, তার সার তোমার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। ... মিলি, বিশ্লেষণ আমরা কি দিয়ে করি! আমরা যেটুকুকে সত্য বলে মানি, তাই দিয়েই করি। তাই সামান্য কিছুই গ্রহণ করি একটা সম্পূর্ণ ঘটনা থেকে। আর বিশ্লেষণ না করলে, যখন উচিত সময়ে নিজে নিজে এই বিচার হতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ সত্য তোর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যায়।

আমি – তারমানে বিশ্লেষণ করবো না! ... হ্যাঁ বাবাকেও দেখেছি। আমি অনেক গোয়েন্দা গল্প পরেছি। সেখানে গোয়েন্দাকে দেখেছি বিশ্লেষণ করতে, চুলছেরা বিশ্লেষণ করতে; কিন্তু বাবা কনো বিশ্লেষণ করেন

না। একের পর এক জিনিস উলটেপালটে দেখতে থাকেন, আর আচমকা সঠিক ঘটনা, যা সকলের চোখের আড়ালে ঘটেছে, তা বাবার দৃষ্টির সামনে এসে যায় যেন!

মা – হ্যাঁ, তোর বাবা বিশ্লেষণ করেন না, বিচার করেন। আর সেই কারনেই এই সকলের অসাধ্য কেসগুলো অতি সহজেই শলভ করে দেন।

আমি – কিন্তু এই বিচার কি করে করেন উনি!

মা – বিচার করা যায়না মিলি; বিচার হয়ে যায়। আর সেই বিচার যাতে হতে পারে, তারজন্য প্রয়োজন প্রচুর প্রচুর তথ্য আর বিদ্যা। ... যখন তোর মনের মধ্যে অজস্র তথ্য আর সেই তথ্যদের মধ্যে সম্বন্ধ অর্থাৎ বিদ্যা একত্রিত হয়ে যায়, তখন আপনা আপনিই বিচার হয়ে যায়।... দেখনা, একটা চাল আর একটা ডাল, একসঙ্গে কড়ায় চাপিয়ে সেই সমস্ত কিছু কর, যা খিচুরি করার ক্ষেত্রে করিস। কি দেখবি, চাল আর ডাল আলাদা আলাদাই হয়ে আছে। ... যখন একবাটি চাল আর একবাটি ডাল নিবি, তখন কি দেখবি, খিচুরি হয়ে গেছে। ... তাই মিলি নীরব দর্শক হয়ে, সমস্ত তথ্য, সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ করতে থাক। যখন স্টিম ঠিকঠিক অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন ঠিকই খিচুরি হয়ে যাবে। তোর বাবা, ঠিক এটাই করেন।

আমি এবার মায়ের গলাটাকে পিছন থেকে জরিয়ে ধরে বললাম – বাবা ঠিকই বলেন, তুই তোর মাকে চিনিসই না। তিনি সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম মহয়সি নারী। ... আজ পরিচয় পেলাম তার। ... তুমি এত খুলে কথাই বলো না কখনো।

মা হেসে বললেন – ধুত পাগল মেয়ে। আমি যা কিছু, তার কারিগর তো তোর বাবাই। ... তিনিই তো আমাকে এইভাবে তৈরি করেছেন। ... জানিস, তুই যখনও হস নি, তখন তোর বাবা দিনরাত আমাকে বিভিন্ন জিনিস শেখাতেন, আর কি বলতেন জানিস! ... বলতেন, সন্তানের প্রথম গুরু হলেন মা। ... তাই মাকে সেই অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, যার ফলে সন্তান হবে কল্পনামুক্ত, কামনামুক্ত, আর সমস্ত বিকারমুক্ত। ...

কথাটা বলে মা একটু হাসলেন নিজের খেয়ালে। আমি মায়ের গলা জরিয়েই বললাম – আচ্ছা মা, দিদিকে বাবা নিয়ে গেলেন, আর আমাকে নিয়ে গেলেন না। এদিকে আমাকে তোমার সাথে মিসেস সান্যালের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর পিছনে রহস্যটা কি বলোতো!

মা – দিদিভাই চেতনার প্রকাশদ্বারা অনুভব করেন। আর চেতনার কাছে না, শোকতাপ, ভয় চিন্তা, এসব কিচ্ছুই কিচ্ছু নয়। সম্পূর্ণ ভাবে বিকারমুক্ত, সম্পূর্ণ ভাবে সমস্ত ভ্রমের থেকে মুক্ত পরমেশ্বর হলেন

চেতনা। সম্পূর্ণ বৈরাগী হলেন চেতনা। তাই কারুকে সান্ত্বনা দেওয়া একজন চেতনাজাগ্রত মানুষের কাছে নিছকই একটা অভিনয়; বাস্তবে তিনি কনো সান্ত্বনা কারুকে দেনই না, কারণ সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজনই মনে করেননা উনি। উনি তো জানেন, যা নিয়তিতে লিখিত, তাই হবে। আমরা কেবলই নিজেদের নিয়তিকে নিজেরা জানিনা বলে, নিজেদের কর্তা জ্ঞান করি, বা সাফারার মনে করি, যেটা সম্পূর্ণ ভাবেই একটা ভ্রম। ... তাই উনি দিদিভাইকে এই সান্ত্বনার কাজে পাঠালেন না।

মা একটু থেমে আবার বললেন – কিন্তু অন্যদিকে, যাদের জেরা করছেন এখন তোর বাবা, তারা সকলেই তথ্য আর সত্য গোপন করবে। এমনও কিছু সত্য গোপন করবে তারা, যা তোর বাবাও অনুভব করতে পারবেন না। কিন্তু চেতনার দ্বারা চালিত, দিদিভাইয়ের চোখ এড়িয়ে জাওয়া যে অসম্ভব। তাই দিদিভাইকে উনি সেখানে নিয়ে গেলেন।

আমি – মাথা না চালিয়েই এরকম করা যায়!

মা – মাথা না চালালেই এরকম করা যায়। মাথা চালালে কেবলই ভয়, শঙ্কা, ধূর্তামি, ধোঁকাবাজি, সুবিধাবাদী মনোভাব সামনে আসে; তাছাড়া কিছুই আসেনা। মনে আছে, ফেলুদাকে যখন জটায়ু প্রশ্ন করতো, এর পর আপনার প্ল্যান কি মহাই! তখন ফেলুদা কি বলতো! ... ফেলুদা বলতো, আমি কনো প্ল্যান করিনা। পরিস্থিতি যেমন যেমন হতে থাকে, আমি তেমন তেমন করতে থাকি। ... মাথা না চালানোই আসলে বুদ্ধিমানি, বুঝলি বোকা মেয়ে!

আমি এবার একটু বাইরের দিকে ঘুরতে গেলাম। আর মা একটু ব্যাগ গোছাতে থাকলেন। বাইরে বেড়িয়ে বাবার অপেক্ষা করতে থাকলাম। ... আর মনে মনে ভাবলাম, আমাকে এমন হতে হবে যাতে আমি আমার মাবাবার যোগ্য সন্তান হই। ... এমন অদ্ভুত দুই ব্যক্তিত্বের সন্তান তো বায়োলজিকালি আমি হয়ে গেছি। কিন্তু নিজেকে এই দুই অসামান্য ব্যক্তিত্বের অংশ বলতে, মন থেকে সায় পাচ্ছিনা। ... মাবাবা নয়, আমি তো দেবীদেবতার সন্তান হয়েছি। কিন্তু দেবদেবীর সন্তান হয়েও, আমি এখনও দেবসন্তান হয়ে উঠতে পারিনি। অনেকটা ইন্দ্র আর শচিমাতার পুত্র জয়ন্তের মত। ... দেবরাজ আর স্বয়ং শচিমাতার সন্তান হয়েও কাক সেজে সীতামাকে ঠোকরাতে চলে গেল! ... আমিও সেইরকমই একটা হয়ে রয়েছি। ... আমাকে দেবসন্তান হয়ে উঠতে হবে; আমার মাবাবার যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে উঠতে হবে আমাকে।

হাতের কফির মগের কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কারণ কফি খাবার কথা ভুলে গিয়ে, এই সমস্ত ভাবনা ভাবছিলাম। একটু উপরের দিকে তাকাতে দেখি, দিদি আর বাবা আসছেন। ... স্বর্গের জয়ন্ত থেকে মর্তের

মিলি হয়ে গেলাম আবার। বাবাকে দেখে যেন ধরে প্রাণও ফিরে এলো; কেন এমন হলো জানিনা। তবে হলো। মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে বললাম – মা বাবা আসছে।

মা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম – কি হলো আবার!

মা – তুই যখন ৬-৭ বছরের মেয়ে ছিলিস, তখন এমনই বারন্দায় হা করে বসে থাকতিস, বাবা কাজ থেকে ফিরবে, সেই রাহা দেখতিস। ... একনজর দেখতে পেলেই, এমনই ভাবে ছুটে এসে বলতিস – মা বাবা আসছে। ... কিচ্ছু পালটাস নি। ... সেই ছোট্ট মিলিক্ষেপীই আছিস এখনও।

টার্গেট টু

কেন জানিনা, মনে একটা দারুণ আনন্দ হলো, আর একটু লজ্জাও লাগলো, মায়ের এই কথাটা শুনে। আবার একটু বারন্দায় গিয়ে দেখলাম, বাবা আর দিদি কাছে এসে গেছেন। ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আসলে কি হলো ওখানে জানার প্রচণ্ড আগ্রহ আমার।

বাবা ঘরে এসে একটু লম্বা সোফাতে গা এলিয়ে দিলেন। আমি বললাম – কারুর সাথে কথা হলো?

বাবা বললেন – হুম, সকলের সাথেই।

আমি – কিছু দিশা পেলে!

বাবা – হুম, পেলাম। ২০ জন ছেলের মধ্যে, দুইজন ছেলে কাশ্মীরের। একটু খবর নিতে হবে; ছেলেগুলোর চোখের ভাষা ভালো নয়। যেন হিংসাভাবকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। দুইজনেরই পরীক্ষা করতে পারিনি। তবে এঁদের একজনের নিশানা খুবই ভালো। খেলাধুলা করেনা, এমনই বলল। তাহলে নিশানা কেন ভালো? একটু খবর নিতে হবে। দেখি, অতনু যদি কিছু সাহায্য করতে পারে।

আমি – বাকিরা?

বাবা – না, তেমন কিছু আর কারুর মধ্যেই দেখতে পেলাম না।

বাবা এবার অতনু আঙ্কেলকে ফোন লাগালেন। অতনু আঙ্কেলকে এই দুই ছেলের ব্যাপারে খবর নিতে বলা হলো। ফোন রেখে, বাবা বললেন – আততায়ী নিজের কাজে সফল হয়নি। তাই সে কি করবে এবার?

আমি – কিছু করবে না। ব্রিগেডিয়ারদের জায়গা। একবার বেঁচে গেছে, বারবার তো আর বাঁচবেনা।

বাবা – হুম, ঠিক কথা, কিন্তু ...

আমি – আবার কিন্তু কি এখানে?

বাবা – ব্রিগেডিয়ার দুইজনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে যেন তৎপরতা বলে কিছু দেখতে পেলাম না। যদিও দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু আর্মির লোক ... উম, আর্মির লোক কি আর চা খেতে খেতে পরামর্শ করবে! ... আর্মির লোক ভাবে কম, সরাসরি এক্সান করাই অদের চারিত্রিক গুণাবলি।

আমি – মানে, উনারা চা খাচ্ছিলেন!

বাবা – হুম, উনাদের তিন তোলার ছাদে বসে, দুইজনে চা খাচ্ছিলেন।... হতে পারে যে দুইজনে কি করা যায়, সেই বিষয়ে চা খেতে খেতে, জল্পনাও করছিলেন। কিন্তু এই জল্পনা ব্যাপারটা আর্মির মানুষের কাছে আশাপ্রদ নয়। ...

আমি – সেরকম হলে তো আততায়ী আবার একবার সুযোগ নেবে।

বাবা – হুম, তেমনই মনে হচ্ছে আমার। দেখা যাক কি হয়।

দুপুরে লাঞ্চ করে আসার পর, একটু গাটা বিছনায় রেখে, জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছিলাম, অতনু আঙ্কেলের ফোন এলো। বাবা ফোন ধরে কেবলই শুনলেন। বাবার মুখের ভাষা ফোনের কথা শুনতে শুনতে পাল্টে যাচ্ছিল, বেশ অনুভব করলাম। প্রায় ১০-১২ মিনিট ফোনে কথা শোনার পর, বাবা বললেন – পরবর্তীতে কি করা উচিত, আমি তোমায় জানাচ্ছি। ... অতনু একটা কাজ করো, এর মধ্যে। তুমি একটা টিম আর এই মিশনে টিমের একশনের ওয়ার্যা□ন্ট তৈরি করে নাও। ... সময় হলে, তোমাকে লাগবে, ডাকবো তোমাকে।

বাবা ফোন রেখে দিলেন, আর ঘরে খানিক পায়চারি করলেন। আমি বললাম – কি বললেন কাকু?

বাবা – কাশ্মীরি মোর্চার দুই সদস্যের ছেলে, এই দুই ছোকরা। মজার কথা এই যে, এই মোর্চারই মাথাকে ধরতে গিয়ে, ব্রিগেডিয়ার সান্যাল আর সেই মোর্চার প্রধান নিহত হন।

আমি – উড়ি বাবা ... এতো একটা অঙ্ক সামনে এসে গেল। তাই না!

বাবা – হুম। ... সেরকমই একটা। ব্রিগেডিয়ার সান্যালকে যদি ধরে নেওয়া যায় যে সেই মোর্চা সংগঠনকে নষ্ট করে দেওয়ার কাণ্ডারি, তবে উনাকে হত্যা করে মোর্চা সংগঠন শান্তি পায়নি। আর তাই উনার স্ত্রী ... তারমানে তো... মিলি মিসেস সান্যাল ঘরেই আছেন না! ... চল তো আমার সাথে।

আমি – কিন্তু হঠাৎ হলোটা কি, সেটা বলবে তো! ...

বাবা – তুইও তো যাচ্ছিস, আমার সাথে। সাখ্যাতেই সমস্ত শুনতে পাবি। এখন চল।

আমি আর বাবা তড়িঘড়ি মিসেস সান্যালের ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় নক করতে, ভিতর থেকে আওয়াজ এলো – কে?

বাবা – আমি বিজয় সিংহ আর আমার মেয়ে মিলি।

এক মিনিট মত অপেক্ষা করতে হল; মিসেস সান্যাল দরজা খুললেন । আমরা ভিতরে যেতে, উনিই বললেন – আসলে ব্রিগেডিয়ার সিং আর গতি আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, কে দরজার অপারে, না জেনে দরজা না খুলতে। তাই একটু ...

বাবা – খুবই ঠিক করেছেন আপনি। ... আসলে এই ভরদুপুরে আপনাকে বিরক্ত করতে হলো। ... কিছু জরুরি কথা বলার আছে মিসেস সান্যাল। ... আচ্ছা, আপনার ছেলে এখন কোথায়, এখানে নিশ্চয়ই নেই। কারণ এখানে থাকলে তো আমার সাথে আলাপ হতো।

মিসেস সান্যাল – হ্যাঁ, ও ব্যবসার কাজে জব্বলপুর গেছে। আমার এই অনুষ্ঠানের শেষের আগে ফিরে আসবে বলেছে ও।

বাবা – ইমিডিয়েটলি ওর সাথে যোগাযোগ করুন, আর ওকে বলুন যেন, এখনি এখানে না ফেরে। আততায়ী আপনার উপর আক্রমণ করেছে, এমনও হতে পারে যে ওর উপরেও আক্রমণ করবে। ... আমার ধারনা, আততায়ীর টার্গেট, আপনার পরিবার। আর যেহেতু আততায়ী এই মুহূর্তে এখানে রয়েছে, তাই এখান থেকে দূরে থেকেই আপনার ছেলে সেফ আছে। ওকে এখানে এই অনুষ্ঠান চলাকালীন আসতে বারণ করে দিন।

মিসেস সান্যাল একটু নার্ভাস হয়ে গেলেন, কথাটা শুনে। তাই বাবা বললেন, নার্ভাস হবার কিচ্ছু নেই, মিসেস সান্যাল। আপনার ছেলে এখান থেকে দূরে থাকার জন্য সেফ। আসলে, আততায়ীর কাছে খবর ছিলনা যে সে বাইরে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি করেই ঠিক হয়েছে না, এই বাইরে যাবার প্ল্যান!

মিসেস সান্যাল – হ্যাঁ, যাবার দুইদিন আগেই ঠিক হয়েছে।

বাবা – হুম, ওই জন্যই আততায়ীর কাছে খবর নেই। ... চিন্তা একদম করবেন না। আপনার ছেলে সেফ আছে। আর ফোনে ওকে দূরে থাকতে বলে দিন, ও সেফই থাকবে। আর অনুষ্ঠান চলা পর্যন্ত আমরা যদি আততায়ীকে ধরে নিতে পারি, তবে তো সকলেই সেফ হয়ে যাবে। ... নিশ্চিন্তে থাকুন আপনি। আর শুধু একবার, ছেলেকে ফোন করে বলে দিন যে ... না, দাঁড়ান। আপনার ফোন থেকে ফোন করবেন না। আততায়ী কেমন জাল বিছিয়েছে, আমরা কেউ জানিনা। হতেও পারে যে ওরা আপনার ফোনকে ট্র্যাপ করে রেখে দিয়েছে, আপনার ছেলের সন্ধান পাওয়ার জন্য। ... আপনি আমার ফোন থেকে ফোন করুন।

মিসেস সান্যাল বাবার ফোন নিয়ে, নিজের ফোন থেকে দেখে দেখে নম্বর টিপে, ছেলেকে ফোন করলেন। আর বললেন – বাবু, তুই দিন পাঁচেক পরে আয়। একটা বিশেষ ব্যাপার আছে। তুই আসলে বলবো। ... এখানে আমরা সকলে ভালো আছি। কিন্তু তুই এখনই এখানে এসে গেলে, সমস্যা হতে পারে। তাই দিন পাঁচেক পরে আয়।

ছেলে অদিক থেকে কিছু প্রশ্ন করছিল হয়তো। তার উত্তরে মিসেস সান্যাল বললেন – তুই আসলে, সবটাই বলবো। এখন অতো প্রশ্ন করিস না। শুধু যেটা বললাম, সেটা কর।

ফোন রেখে দিলে, বাবা আর আমি উনাকে বিদায় জানিয়ে, ঘরে ফিরলাম। ... রোদটা একটু পরতে, বাবা উইন্ডচিটারতা চাপিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে যেতে গেলে, আমি বললাম – কোথায় যাচ্ছ!

বাবা – দেখি একটু চা খেয়ে আসি; আর একটু আবহাওয়াটাও বুঝে আসি।

আমি – আমিও যাবো।

বাবা – যা গায়ে চাপাবার, চাপিয়ে নে তাড়াতাড়ি।

আমি গায়ে ফারের জ্যাকেটতা চাপিয়ে, চলে গেলাম। ফিরতে দেরি হলে চিন্তা নেই; এই জ্যাকেটটার হুডি আছে; ওতেই দুটো ঢেকে নেওয়া যাবে। দুইজনে দুটো চা নিয়ে খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, বাবার কপালে লাল একটা আলো ফিক্স হবার চেষ্টা করছে। প্রথমে মাথায় আসেনি। তারপর মাথায় আস্তেই, বুক ধড়পড় করে উঠলো। এতো স্নিপার রাইফেলের নিশানা লাগানো হচ্ছে বাবার উপর! বাবার মুখের সামনে নিজের মুখ নিয়ে গিয়ে বাবাকে আসতে করে বললাম – তোমার কপালে স্নিপার রাইফেল দিয়ে নিশানা করা হচ্ছে।

বাবা কি অদ্ভুত ভাবে কুল। উনি সেই মুহূর্তেই আমাকে বললেন, চায়ের দাম দেওয়া আছে।... এখান থেকে সরে পর, আর চল একবার ব্রিগেডিয়ারদের তিন তোলার দিকটা দেখে আসি।

আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম। যেদিক থেকে আলোটা আসছিল, সেদিকটায় আমি রইলাম। আর বাবাকে দেখলাম অদ্ভুত একটা বিক্ষিপ্ত গতিতে চলছেন। এই খুব জোরে, তারপরেই একটু আসতে। আবার একটু জোরে, তারপর খুব আসতে।

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম – কি করছ বলোতো তুমি?

বাবা – যারা স্নিপার চালায়, তারা আমার চলার গতি ধরে, ১০ সেকেন্ড পরে, আমি কোন জায়গায় থাকবো, সেটা ধরে নিয়ে, ফায়ার করার সামর্থ্য রাখে, অনেকটা শিকারি পাখিদের মত। তাই এই বিক্ষিপ্ত গতিতে চলছি, যাতে ও নিশানা লাগাতে না পারে। ... গায়ে হাতে, কোথাও কি আর লেজার আলোটা পরছে?

আমি একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম – না, আর নেই। বুঝে গেছে বোধহয় যে আমরা বুঝে গেছি।

বাবা – হুম, হতে পারে।

আমি আর বাবা প্রায় তিন তোলার গেটের কাছে এসে গেছিলাম, সেই সময়ে বাবা দাঁড়িয়ে পরে একটি লালটুকটুকে ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন – এদিকে, কি ব্যাপার!

ছেলেটি যেন বাবার কণ্ঠস্বরে চমকে গেল। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বলল – আখরোট এর গাছের চারা চেয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার সাহেব। সেটাই দিতে এসেছিলাম। ...

ছেলেটার পিঠে একটা বর ব্যাগ। আর যেন সেই ব্যাগে কি রয়েছে, বেশ বড়সর কিছু। বাবা সেটার দিকে তাকিয়ে বললেন – ব্যাডমিন্টন খেলো?

ছেলেটি নিচের দিকে নেমে যেতে যেতে বলল – খেলতে দিলেন না, ব্রিগেডিয়ার সাহেব।

উত্তরে বাবা একটু মৃদু হাসলেন। আমি উপরের দিকে উঠছিলাম, বাবা আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে, বাবা বললেন – মনে হয়, আমাদের এইদিকের যাবার উদ্দেশ্য পূড়ন হয়ে গেছে।

আমি – আমরা ওকে সার্চ করলেই তো! ব্যাগে আশা করি ব্যাডমিন্টন র্যাএকেট ছিলনা, কি বলো?

বাবা – উমহুম, শত্রুকে জানতেও দিতে নেই যে সে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। চল ফিরে যাই।

আমরা ফিরে এলাম। বাবা বলে দিয়েছেন, এই নিশানার কথা যেন মাকে না বলি। অহেতুক চিন্তা করবেন উনি। কিন্তু সত্যিই কি অহেতুক চিন্তা! ... স্নিপার রাইফেল। একটা গুলিই যথেষ্ট প্রাণ নিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু বাবার আদেশ। তাই চুপ থাকলাম। বাগান দিয়ে হেটে যাচ্ছি, বাবা থমকে দাঁড়িয়ে পরলেন। বললেন, তুই ভিতরে যা। আমার একটা কাজ আছে, সেরে আসছি।

আমি – না, তোমায় একা একা কি করে ...

বাবা – আমি দেখে ফেলেছি, সতর্ক হয়ে গেছি। আর আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। তুই যা। আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

বাবা ফিরলেন প্রায় ৮টা। এতক্ষণ কি করছিলেন কে জানে! যতক্ষণ না ফিরছিলেন, ততক্ষণ আমি খালি ঘরবার করে যাচ্ছিলাম। মা বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করলেন, বাবা কোথায় গেছে! ... বললাম, কি একটা জরুরি কাজে গেছে। বলতেও পারছিনা যে বাবার প্রাণের সঙ্কট আছে, তাই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সে এক অদ্ভুত বিপাকে পরে গেছিলাম আমি। মাঝে অবশ্য আমার ত্রিকালদর্শী দিদি এসে আমাকে বলে গেছিলেন – তোর বাবার কেস শলভ করা হয়ে গেছে। ফাঁদ পাততে ব্যস্ত।

কি করে জানে এইসব জানিনা। তবে উনি ঠিক ছিলেন, আর তা জানতে পারলাম দুইদিন পর। বাবা ফিরে এসে ডিনারের টেবিলে বসে বললেন – মিসেস সান্যাল, আমাকে কাল একটা কাজে গ্যাংটক যেতে হবে। আপনাদের অনুষ্ঠান তো আবার ৩ তারিখ থেকে শুরু হবে। আমি তার মধ্যে ফিরে আসবো। কারুকে তেমন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যদি প্রশ্ন করে কেউ, বলবেন আমি একটা কাজে গ্যাংটক গেছি। তাহলেই হবে।

রাত্রের খাবার খেয়ে ঘরে এসেও আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সত্যি বলতে, আমি বাদে বাবাকে যেন সবাই চেনে। মাও আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন – কি হয়েছে তোর! এতো অশান্তি কিসের? বাবা ফাঁদ পাতছে আততায়ীকে ধরার জন্য। এখনো বুঝতে পারছিস না!

না সত্যি আমি বুঝতে পারিনি। বাবা পরেরদিন সকালে জিপ ধরে গ্যাংটক চলে গেলেন। আমি চুপচাপ হয়ে গেছি। মাথা কিচ্ছু কাজ করছে না। একটাই কথা চলছে খালি মাথায়; বাবা একা একা চলে গেলেন, যদি উনার কনো বিপদ হয়! ... বাবা যে সত্যিই ফাঁদ পাতা শুরু করে দিয়েছেন, দিদি আর মা যে সঠিকই বলেছিলেন, তা বুঝলাম ১ তারিখ বেলায়। সেইদিন প্রায় জনা ১২জন যুবক এলেন এখানে। মিসেস সান্যালের কাছে এসে প্রথমে দেখা করলেন, তারপর মিসেস সান্যালের সাথেই ব্রিগেডিয়ারদের কাছে গেলেন। ইনারা মিসেস সান্যালের এই প্রোগ্রামের কথা সিক্কিমের খবরের চ্যানেলে দেখে এখানে এসেছেন।

উনারা বাকি অনুষ্ঠানে উনার ভাষণ শুনতে চান। ব্রিগেডিয়াররা বলে দিলেন, এখন আর উনাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবেনা। উত্তরে উনারা বললেন যে, উনারা পেলিং-এর কনো একটা হোটেলে থেকে যাবেন। আর নিজেদের খরচেই থাকা খাওয়া করে নেবেন। সেই কথাতে সকলে সম্মত হয়ে গেলেন। না এই সমস্ত কথা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন না যে, আমি কি করে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু ব্যাপারটা এই যে, এই ১২ জনের ট্রুপের তিনজনকে আমি চিনি, আর এঁদের মধ্যে একজন হলেন অতনু আঙ্কেল। সেটা দেখেই বুঝে যাই যে, বাবার ফাঁদের একটা অংশ এটা।

৩ তারিখ

আজ তিন তারিখ। অনুষ্ঠান আবার শুরু হবে আজকে। বাবা নেই শহরে। একা একা লাগছিল । শুধু আমারই নয়, মায়েরও। আমি মাকে বেশ কয়েকবার বললাম – বাবা একবারও ফোন করেও তো খবর দেবে একটা।... মাঝে মাঝে যেন দায়িত্ববোধ উনার হারিয়ে যায় কোথায় একটা!

মা হেসে বললেন – দেখগে যা, হয়তো গ্যাংটক থেকে উনি ফিরেই এসেছেন। অতনুদাদের সাথে আছেন। চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন!

মা এই সবগুলো বোঝেন কি করে? টেলিপ্যাথি না কি! কই আমি তো বুঝতে পারিনা! সত্যি সত্যি বাবা কাল রাত্রেই ফিরে এসেছিলেন। ছদ্মবেশে ঢুকে, অতনুকাকুদের সাথে ছিলেন। যদিও আমি এটা জানতে পারি শেষ দিন। কিন্তু মা! ... উনি কি করে বুঝে যান এইসব!

দিদিকে পরে বলতে, দিদি বলেছিলেন – ভালোবাসার অনেক ধরন হয়। তার একটি ধরন হলো, যাকে ভালোবাসি তাকে জানা। এই পদ্ধতিতে সামনের মানুষটার প্রতি অসামান্য বিশ্বাস জন্ম নেয়। ... আর তাই এই ভালোবাসাই হলো শ্রেষ্ঠ। কখনো কখনো এই ভালোবাসা, যেখানে যাকে ভালোবাসি, তাকে চেনাতেই মন থাকে, তার উৎকৃষ্ট ভাবের কারণে, এই ভালোবাসাকে ভক্তি বলা হয়। ... হেসে দিদি বলেছিলেন, তোর মা, তোর বাবাকে শুধুই ভালোবাসেন না, উনি তোর বাবাকে ভক্তি করেন। যেমন ভক্ত তাঁর ভগবানকে কখনো কখনো তো ভগবানের থেকেও বেশি জানেন, তেমনই তোর মা কখনো কখনো তোর বাবাকে, তোর বাবার থেকেও বেশি জানেন।

যাই হোক, এই সমস্ত কিছু পরের কথা। আগে এইসমস্ত জানলে তো আমার টেনশনই চলে যেত। তবে না, যেত না। কারণ টেনশন কিছু বুঝতে দেয় কোথায় আমাদেরকে? ঘটনার শেষে না হয়ে, যদি আগে এইসব জানতাম, তবে আমার টেনশন এই সমস্ত কথাকে মনভোলানো কথা বলে উড়িয়ে দিতো। ... যাই হোক, নিজের দুর্বলতা আর কি বলবো আপনাদেরকে। মেয়েদের স্বভাব, বাবার প্রতি তারা দুর্বল হয়। আমিও ব্যতিক্রম নই। মাকে ভীষণই ভালোবাসি, কিন্তু বাবার কথা ভাবলেই, মনে একটা কিরকম ভাব জন্মায় যেন... যেন মনে প্রচুর ভয়, শঙ্কা আরো কতকিছু জন্ম নিয়ে নেয়। ... সব সময়ে হারিয়ে ফেলার ভয়, যেন সবসময়ে চোখের সামনে দেখতে পাবার এক অদম্য ইচ্ছা। ... কেন এমন হয় বলতে পারবো না। তবে হয়, আর শুধু আমার নয়, আমার বিশ্বাস প্রায় ৭০ শতাংশ মেয়েদেরই বাবার প্রতি এমনই ভাব থাকে।

একবার আমি মায়ের উপর রেগে গিয়ে একটু নিজের এক্তিয়ার ছাড়িয়েই বলেছিলাম, তোমার তো বাবা নেই; তুমি বুঝবে না! ... উত্তরে মা আমাকে যা বলেছিল, সেটা হলো কথার মাধ্যমে গালে সপাটে একটা থাপ্পড়। মা বলেছিলেন, আমার বাবা নেই, তাই! ... একবার তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস তো, উনার কয় মেয়ে! ... উত্তরটা আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি, উনি বলবেন উনার দুই মেয়ে, আর তুই উনার ছোট মেয়ে। বড় মেয়েটা আমি। ... তোর এমন মনে হয়না, কারণ তুই তোর বাবাকে কনোদিন জানার চেষ্টা করিস নি। তাই তোর থাকে উনাকে নিয়ে ভয় আর শঙ্কা। আর উনিই আমার সমস্ত কিছু, তাই উনাকে জানাই আমার একমাত্র জীবনের ব্রত মনে হবার জন্য, আমি উনাকে জানি। আর তাই উনাকে নিয়ে আমার ভয় বা শঙ্কা থাকে না, থাকে শুধুই অকাট্য বিশ্বাস।

যেটাই হোক, ৩ তারিখের কথাতে আসি। আমরা সেই বড় হলঘরে বসে সমস্ত ভাষণ বক্তৃতা শুনছি। এমন সময়ে, আমি দেখি আবার মিসেস সান্যালের কপালে সেই লেজার রশ্মি পড়ছে। ... বাবাও নেই,

অতনুকাকু নিজেকে অতনুকাকু বলে পরিচয় দেন নি। কি যে করি আমি, কিছু বুঝতে পারছিনা! ... মিসেস সান্যালকে কি তবে বাঁচানো যাবেনা!

এমনই ভাবছি, একটা ফায়ারিং-এর শব্দ, আর তারপরেই আরো একটা ফায়ারিং-এর শব্দ, আর সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে একটা আর্তনাদ। ... যেদিক থেকে আর্তনাদটা আসছিল, আমরা সকলে সেদিকে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, একটা দাড়ি দেওয়া লোক, বিচ্ছিরি ভাবে মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছে। ছেলেটার সামনেই সেট করা স্নিপার রাইফেল। বুঝলাম যে এই লোকই বারবার স্নিপার দিয়ে নিশানা লাগাচ্ছিল। ব্রিগেডিয়ার সিং চেঁচিয়ে উঠলেন – হু ঈশ ফায়ারিং হেয়ার!

অতনুআঙ্কেল সামনে এগিয়ে এসে বললেন – মাইসেলফ স্যার। আমি অতনু, সিবিয়াই ইস্ট করিডরের চিফ। (পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে, ব্রিগেডিয়ারের হাতে দিয়ে) আমি এখানে গভার্নমেন্টের স্পেশাল অর্ডারে এসেছি, এখানে যেই মার্ডার এটেম্পট চলছে, তার প্রতিকার করার জন্য, আর যিনি মার্ডার এটেম্পট করছেন, তিনি আপনাদের সামনে এখন, তার দুটো পায়ে গুলি লাগার জন্য, মাটিতে কাতরাচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার গতি এবার চেঁচিয়ে উঠে বললেন – হু ইজ হি! ... আউটসাইডার! ... এরেস্ট হিম!

বাবা এবার সামনে এগিয়ে এলেন। সামনে এগিয়ে আসার সময়ে, মুখের দাড়িটা সরাতে থাকলে, আমরা বুঝলাম যে, যেই ১২ জন সিবিয়াইএর লোক এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন বাবা। ... সামনে এসে উনি বললেন – সত্যিই কি ইনি আউটসাইডার! ... অতনু, একবার ছেলেটির নকল দাড়িটা খুলে দাও দেখি!

অতনু আঙ্কেল লোকটির দাড়ি টেনে খুলে দিলে, মিসেস সান্যালা চেঁচিয়ে উঠলেন – বাবু!

বাবা – হ্যাঁ, মিসেস সান্যাল, বাবু! অর্থাৎ আপনার ছেলে সুবীর। ... না সে জব্বলপুর যায়নি। সে এখানেই ছিল। আপনার মুখ থেকে প্রথম দিনের ভাষণ শুনে, উনি আপনাকে হত্যা করবেন এমন মনস্থির করে, আপনাকে সুট করার চেষ্টা করেন। ... আপনাকে আমি বাঁচিয়ে নিই, তাই আমি থাকতে আপনাকে হত্যা করতে পারবে না বলে, আমাকেও ও টার্গেট করে। আর আমি বেশ বুঝে যাই যে আমি এখানে আছি জানলে, ও আপনার উপর আবার এটাক করবে না, তাই আমি গা ঢাকা দিই। তবে হ্যাঁ, গ্যাংটক আমি গেছিলাম। তবে গেছিলাম এই কেসের ব্যাপারেই। তবে আমি সেখান থেকে একদিনের মধ্যেই ফিরে

এসে, সিবিয়াই টিমের সাথেই থেকে যাই, যেই সিবিয়াই টিম আপনার ভাষণ শুনবেন বলে সিক্কিমের খবর দেখে এসেছেন বলে দাবি করেন।

মিসেস সান্যাল বিধ্বস্ত হয়ে বসে পরলেন। মা উনার কাঁধ হরে রইলেন। মিসেস সান্যাল চোখের জলে বলে উঠলেন – কিন্তু কেন? মা তোর কি করেছে বাবু!

সুবীর আগ্রাসী হয়ে বলে উঠলো – মা! ... আমার বাবার মাথায় ওই সব আজেবাজে কথা তুমিই ঢুকিয়েছিলে। আর সেই কারণেই বাবাকে মরতে হয়, ওই মোর্চাদের হাতে। আমি মানছিলাম না, কিন্তু যখন সেই একই কথা তোমার মুখে প্রথমদিন শুনলাম, সেদিনই বুঝে যাই যে তুমিই আসলে দেশের শত্রু, আর তাই তোমার কারণেই আমার বাবার এমন অবন্নতি হয়, আর মোর্চা, যারা আতঙ্কবাদী, তাদেরকে বোঝাতে যায়, আর তাদের হাতে উনার মৃত্যু হয়। ... আমি ছাড়ব না তোমাকে!

মিসেস সান্যাল কেঁদে উঠেই বললেন – আমি যা বলেছি, আমি তা তোর বাবার থেকে শিখেছি। আমার এতো জ্ঞানগুণ নেই যে তোর বাবার মত এমন একজন মহৎ ব্যক্তিকে কিছু শেখাই! ... এই সব কি আবোলতাবোল বলছিস তুই বাবু!

সুবীর আবার আগ্রাসী হয়ে – মিথ্যে কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যে। ... তোমার কারণেই মোর্চার হাতে, আমার বাবার মৃত্যু হয়।

আমার বাবা এবার বললেন – মিস্টার সুবীর সান্যাল, আপনি একদম ঠিক বলেছেন যে, আপনার বাবার এমন মানসিকতার জন্যই উনাকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা যে, আপনার বাবাকে মোর্চারা মেরেছে। ... এটা একদমই মিথ্যে কথা যে আপনার বাবা মোর্চাদের বোঝাতে গেছিলেন। মোর্চাদের উনি কেন বোঝাতে যাবেন? উনি যে নিজেই মোর্চাদের সমর্থন করতেন!

ব্রিগেডিয়ার সিং এবার চেঁচিয়ে উঠলেন – এই মিস্টার, রাস্ক্যাল টিকটিকি একটা। মুখ বন্ধ রাখ।

বাবা এবার চেঁচিয়ে উঠলেন – আজকাল তাহলে, খুনির কথা শুনে আমাকে চলতে হবে নাকি! ...

সুবীর বলে উঠলেন – হাউ ডেয়ার ইউ! ... উনারা কারা আপনি জানেন! ...

বাবা একটা ব্যাকা হাসি দিয়ে – জানি, খুনি উনারা দুইজন। ... একজন ব্রিগেডিয়ারকে খুন করেছেন, অসংখ্য দেশের মানুষের বিশ্বাসকে খুন করেছেন, আর কত কত কুকীর্তি করেছেন, তার তো ইয়ত্তাও নেই।

সুবীর – কি সব আবোলতাবোল বলছেন! ... কার সম্বন্ধে কি বলছেন! ... উনারা ব্রিগেডিয়ার, দেশের জন্য প্রাণ দেন উনারা! ... দেশপ্রেম উনাদের থেকে শুরু হয়।

বাবা আবার বিকৃত ঠোঁট দেখিয়ে বললেন – দেশপ্রেমের ভ্রান্ত ধারনা নিয়ে মূর্খদের বোঝানো যায় যে আপনি দেশপ্রেমী, আমাদের নয়। ... যাই হোক, আমার মুখের কথা শোনার আগে, একটা জিনিস আপনাদের সকলকে দেখাতে চাই। ... এই অতনু... ব্যবস্থা করেছ!

অতনু আঙ্কেল – হ্যাঁ, ... এই আনো।

তিনজন একটা রোলিং টেবিলের উপর একটা এলসিডি স্ক্রিন আনলে, বাবা একটা ভিডিও চালালেন। ভিডিও দেখে সকলে স্তম্ভিত। ... ভিডিওতে দেখা গেল যে, একজন পাঠানড্রেস পরা লোক, একজন ব্রিগেডিয়ারের কাছে ছুটে গেলেন। ... তারপর একদল আর্মির লোক, সেই দিকে গেলে, যেই ব্রিগেডিয়ারের কাছে ওই পাঠানড্রেস পরা ব্যক্তি ছুটে গেছিলেন, তিনি সামনে এসে দাঁড়িয়ে, সেই পাঠানড্রেসের মানুষকে সুরক্ষা দেবার চেষ্টা করতে কিছু বলছিলেন।

তারপর, সেই আর্মিগ্রুপের সামনে থাকা ব্রিগেডিয়ার সিং ও ব্রিগেডিয়ার গতি, সুরক্ষা প্রদানকারি ব্রিগেডিয়ারের পায়ের ফাঁক দিয়ে সেই পাঠানড্রেস পরা ব্যক্তিটিকে গুলি করেন । তারপর সমস্ত জোয়ান প্রচুর গুলি মেরে, সেই পাঠানপোশাক পরা ব্যক্তির শরীর ঝাঁঝরা করে দেন। ... এরপর ব্রিগেডিয়ার সিং সামনে এগিয়ে গিয়ে সেই পাঠানপোশাক পরা ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বন্দুক উদ্ধার করে ব্রিগেডিয়ার গতিকে দেন, আর ব্রিগেডিয়ার গতি, সেই সামনে দাঁড়িয়ে সুরক্ষাদেওয়া ব্রিগেডিয়ারকে, পাঠানপোশাক পরা ব্যক্তির বন্দুক থেকে গুলি করে হত্যা করে দেন।

ভিডিও থেমে গেল। ব্রিগেডিয়ার গতি চেঁচিয়ে উঠলেন – ইটস এডিটেড। ... ইটস ফেক।

বাবা ব্যাকা মুখে একটা হাসি দিয়ে বললেন – না মিস্টার গতি, সিবিয়াই আগেই টেস্ট করে দেখে নিয়েছে, এই ভিডিও এডিটেড কিনা। ... এই ভিডিও এডিটেড নয়, আর এই ভিডিও যিনি করেছিলেন,

তিনি হলেন একজন কাশ্মীরি রিপোর্টার, মিসেস নুশরত ফাতিমা ফারদিন। ... উনি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গেই আছেন। ... আসুন ফাতিমা!

একটি সুন্দরি ফুটফুটে মহিলা সামনে আসলে বাবা বললেন – ইনিই সেই ফাতিমা, যিনি সম্পূর্ণ খবরের কভারেজ করছিলেন, লুকিয়ে লুকিয়ে। ... একটু বিস্তারে বলুন, পুরো ব্যাপারটা কি হয়েছিল!

ফাতিমা হিন্দিতেই বলল। আমি বাংলায় বলছি সেই কথা। উনি বললেন – জানাব, সমস্ত কিছুর শুরু হয়েছিল, যখন তিনটে কলোনির ১৮টি মহিলাকে রেপ করা হয়। রেপ আর মার্ডার করেছিল, ইন্ডিয়ান আর্মি। আর সেই ঘটনার পর থেকেই, ব্রিগেডিয়ার সান্যাল বিক্ষিপ্ত হয়ে যান। ... উনি আর্মির সেই চারজনকে গ্রেফতার করেন, এবং কার অর্ডারে এমন করে তারা, সেটার তদন্ত করতে শুরু করেন। ... সম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরি হলে, তবেই আর্মি কোর্টে ডকুমেন্ট দেওয়া হবে, এবং দোষীদের দণ্ড দেবার ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু এরই মধ্যে, সেই তিনটে কলোনি থেকে, প্রায় ২৫জন পুরুষ একত্রিত হয়ে, মোর্চা গঠন করে।

কাশ্মীরে আগ্নেয়অস্ত্র পাওয়াটা বড় ব্যাপার নয়। তাই, কিছুদিনের মধ্যেই মোর্চার কাছে অস্ত্রও এসে যায়। ... আর শুরু হয়ে যায়, তাদের শুটিং ট্রেনিং। ... কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সান্যাল তাঁদের সাথে আলাদা করে দেখা করেন, এবং তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, উনি দোষীদের শাস্তি দেবেন। ... তাই মোর্চা ট্রেনিং নেবার পরেও শান্ত হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, ব্রিগেডিয়ার গতি আর ব্রিগেডিয়ার সিং সমস্ত কথা হায়ার অথারিটি, অর্থাৎ ইন্ডিয়া গভমেন্ট-এর নেতামন্ত্রীদের জানালে, সেখান থেকে অর্ডার আসে যে, মোর্চার প্রধানকে টেররিস্ট ঘোষণা করে, হত্যা করতে হবে। ... আর তারপরেই, তারা মোর্চার মাথাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে দেয়। ... মোর্চার মাথা, প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে পালাতে, ব্রিগেডিয়ার সান্যালের কাছে যায়। আর সেখানে পৌঁছে যায় ব্রিগেডিয়ার সিং ও গতি এবং তাঁদের ট্রুপ। ...

সেখানে দীর্ঘক্ষণ বচসা হয়, ব্রিগেডিয়ার গতি, সিং এবং ব্রিগেডিয়ার সান্যালের, যেখানে ব্রিগেডিয়ার সান্যাল বোঝাতে চান যে আর্মির করা ক্রাইমের জন্য মোর্চা গঠন হয়েছে। কিন্তু তারা কিচ্ছু করবে না, কারণ আর্মির সেই ক্রিমিনালরা, যারা কাশ্মীরবাসিকে অতিষ্ঠ করে রেখে দিয়েছে, আর যাদের কারণে সাধারণ কাশ্মীরঅধিবাসী ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যেতে চায়, তাদেরকে আমরা শাস্তি দেব।

উত্তরে ব্রিগেডিয়ার সিং বলেন, আর্মি কনো দোষ করেনি। ... আর্মিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল যে, ওই তিন অঞ্চলের কাশ্মীরিদের মধ্যে আর্মির আতঙ্ক যেন এমন ভাবে ছড়ায় যাতে, আর্মির নাম শুনলেই তারা ভয় পায়। ... আর সেই কারণেই এইসমস্ত করা হয়েছে। গভমেন্টের অর্ডারে যা করা হয়েছে, তা কখনোই ক্রাইম হতে পারেনা।

এই কথা নিয়ে তিন ব্রিগেডিয়ারের তুমুল বচসা হয়, কারণ ব্রিগেডিয়ার সান্যাল কিছুতেই মানতে রাজি ছিলেন না যে, আর্মির ভয় দেখিয়ে কাশ্মীরিদের ভারতে আটকে রাখার চেষ্টা একটি নিজেই ক্রাইম, সেই ক্রাইম আর্মি করুক আর গভমেন্ট, মানুষের উপরে কেউই নয়। ... কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সিং ও গতির কাছে দেশ ভক্তি ছিল, গভমেন্টের অর্ডার। সেটাই ওদের দেশপ্রেম, আর তার অন্যথা হলেই, তারা তাদেরকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করতো। ... কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সান্যাল উনাদের বিশিষ্ট বন্ধু, এবং উনার বিচিত্র দেশপ্রেমকে নিয়ে তাঁরা সবসময়েই চিন্তিত থাকতো। ...

তাই, প্রথম ব্রিগেডিয়ার সান্যালের পায়ের ফাঁক দিয়ে মোর্চার মাথাকে গুলি করে ভূমিশায়ী করা হয়, তারপর আর্মির সকল জোয়ানকে অর্ডার দিয়ে, মোর্চার মাথাকে গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। ... ব্রিগেডিয়ার সান্যাল এই দৃশ্য দেখে, প্রতিবাদ করতে গেলে, ব্রিগেডিয়ার সিং মোর্চার প্রধানের বন্দুক নিয়ে ব্রিগেডিয়ার গতিকে দেন। তারপর ব্রিগেডিয়ার গতি বলেন – তুমি দেশপ্রেমী, সেই নিয়ে কনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে গভমেন্টের অর্ডার মানবে না, সে দেশের শত্রু। তাই তোমাকে মরতে হবে, কিন্তু তোমার দেশপ্রেম যাতে বৃথা না যায়, তাই মোর্চার গুলিতে মর তুমি। তাহলে এই এঙ্কাউন্টারে তুমি শহীদ হয়েছ, এই বলা হবে। এরপর উনাকে ফায়ার করে দেওয়া হয়, যেমন ভিডিওতে দেখতে পেলেন।

বাবা – কি সুবীর, বুঝতে পারলে তো! ... তোমার বাবার সেই অসামান্য দেশপ্রেমের আদর্শ-এর কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু মোর্চা তোমার বাবাকে মারেন নি। ... মেরেছেন, এই করাপ্টেড গভমেন্টের চামচা, নরকের কীটগুলোর হাতে। ... আর হ্যাঁ, তোমার বাবার আদর্শে তোমার মা শিক্ষিত, তোমার মায়ের আদর্শে তোমার বাবা নন। ... আর এই মিথ্যা কথা তোমাকে এই দুই চামচা শিখিয়েছিলেন, যাতে তোমার মাকে তুমি নিজে হাতে হত্যা করো।

গ্যাংটকে তোমার বন্দুকের দোকানের কি হলো সুবীর!... সেই লাইসেন্স উনারা তোমাকে কেন করিয়ে দিয়েছিলেন! ... এই স্নিপার রাইফেল দেবার জন্য! ... যদি তাই না হয়, তবে সেই লাইসেন্স তো ৩ বছর হয়ে গেছে তুমি পেয়েছ, তাও গান স্টোর হলো না কেন! ... ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, এখনো আর্মির ট্রেনিং দেন। ইনাদেরকে গান ফ্যাক্টরির সাথে যোগাযোগ এমন নেই যে ৩ বছরের মধ্যে তোমার দোকান সেটআপ করে দিতে পারেন! ... না সুবীর, ইনারা তো তোমার দোকানের জন্য চিন্তিতই নন। ইনারা

তোমার মা যেদিন থেকে তোমার বাবার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন, সেদিন থেকে তোমার মায়ের হত্যা করার জন্য উঠে পরে লাগলেন, কারণ ইনাদের ভয় হতে শুরু করে যে, এই ভাবে চলতে থাকলে, মিসেস সান্যাল কনোদিন সত্য না জেনে যান। ... রাতারাতি তিন বছর আগে, পেলিংএ বাড়ি কিনে নিলেন। তোমাকে পেলিংএ রেখে ট্রেনিং দেওয়ালেন। আরো কত কি করলেন।

ভেবো না তোমাকে ফাঁসিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন উনারা। ... না না, একদমই করেন নি। দেখগে যাও, এখনও যা করছিলেন, তাও গভমেন্টের নির্দেশেই করছিলেন। গভমেন্টকে ইনফর্ম করেছেন যে, ব্রিগেডিয়ার সান্যালের আদর্শ আবার জেগে উঠছে, তাই গভমেন্ট হয়তো অর্ডার দিয়েছেন এদেরকে, সেই আদর্শকে আগাগোড়া উচ্ছেদ করে দিতে। ... তাই তোমাকে মাধ্যম করে, তোমার মাকে হত্যা করার জন্য, তোমাকে তৈরি করে। ... তুমি তৈরি হচ্ছিলেনা, তাই তো এই অনুষ্ঠান করেন উনারা। তুমি নিজের কানে মায়ের ভাষণ শুনবে, আর তারপর কনভিন্স হয়ে যাবে মাকে হত্যা করার। ... আসলে এদের কাছে চামচাগিরিটাই আসলে দেশপ্রেম কিনা!

তবে ওই যে বললাম, তোমাকে ফাঁসিয়ে দিতো না। ... তুমি যাতে না ফেঁসে যাও, তাই জন্য সেই কাশ্মীরি মোর্চারই ভগ্নাবশেষ থেকে এই দুই কাশ্মীরি ছেলেকে তুলে এনেছিলেন। সেই মোর্চা দলেরই দুই ব্যক্তির ছেলে এঁরা। এদেরকে ধরে নিয়ে আসে যাতে, মিসেস সান্যালের খুনের সমস্ত দোষ, এঁদের ঘাড়ে যায়। ... আসলে পাবলিককে এই নিউজই তো দিয়েছেন না উনারা যে, মোর্চাকে আক্রমণ করতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার সান্যাল শহীদ হন। উনার কারণেই মোর্চা ভেঙ্গে গেছে, তাই তার প্রতিশোধ নিতেই ওরা এসেছে, এই বলে ওদেরকে ফাঁসিয়ে, তোমাকে বাঁচিয়ে নিত, তবে তোমার মাকে তোমার হাতেই মেরে ফেলত এই চামচাগুলো।

ব্রিগেডিয়ার গতি চেঁচিয়ে উঠলেন – হু হেভ গিভেন ইউ দা অথরিটি টু ইন্টারফেয়ার ইন দা মেটার অফ আর্মি!

বাবা – অথরিটি! ... ইয়েস আই হ্যাভ ডা অথরিটি, আর সেই অথরিটি আমাকে ভারতমাতা দিয়েছেন। ... তোদের মত কুসন্তানকে নষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন উনি আমাকে। ... এনিঅয়েজ, মিস ফতিমা, আপনি এই খবরটা পাবলিশ করেন নি কেন?

ফতিমা – স্যার, কাশ্মীরের পেপার এই খবর ছাপতে ভয় পেয়েছিল। তাই ছাপতে পারি নি। তবে আমি চুপ করে বসে থাকতেও পারিনি। একটা রিপোর্টারের দায়িত্ব সত্যখবর ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। যখন খবরের কাগজে ছাপতে পারলাম না, তখন মোর্চাদের কাছে গিয়ে এই খবর দিই, আর এই ভিডিও

দেখাই। আজও ওরা ব্রিগেডিয়ার সান্যালের মৃত্যুদিবস পালন করে, কারণ তিনি সত্যি কারের দেশপ্রেমী ছিলেন। ... স্যার, আপনি এই দুই মোর্চা ছেলেদের মাধ্যমে যাদের সাথে যোগাযোগ করে, এই ভিডিওটা পেয়েছিলেন আর আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, তাঁদের কাছেই আমি গেছিলাম এই সমস্ত খবর দিতে।

বাবা বললেন এবার – ব্রিগেডিয়ার গতি আর সিং, আপনারা কি জানেন, আপনারা এই দুই মোর্চাদের ছেলেকে এখানে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য নিয়ে এসে খাল কেটে কুমীর এনেছেন! ... জানেন না তো! ... এঁরা এখানে আপনাদের আবাহনে আসতে রাজিই হয়েছিল, শেষদিনে আপনাদেরকে মেরে যাবে বলে। ... ফরদিন আর আলি, তোমাদের বন্দুকগুলো দিয়ে দাও। একটা ব্যাডমিন্টন কোর্টের পিছনে লুকয়ে রেখেছিলে, উদ্ধার করে নিয়ে এসেছ; আরেকটা নিচে বাস্কেটবল কোর্টের পিছনে লুকানো ছিল, সেটা আমরা উদ্ধার করে নিয়েছি। অগুলোর লাইসেন্স নেই, তাই অগুলো সঙ্গে রাখার মানে, নিজেদেরকে আততায়ী প্রমাণ করা। তাই অগুলো আমরা আমাদের হেফাজতে নিয়ে নিয়েছি। ... ও ভালো কথা, ফরদিন, সেদিন তুমি তোমার বন্দুকটা উদ্ধার করতেই তো এসেছিলেনা, এই ব্যাডমিন্টন কোর্টে! ... আর আলি, সেদিন যখন তোমার পিছনে পিছনে গেলাম, তুমি তো তোমার বন্দুকটাই বাস্কেটবল কোর্ট থেকে উদ্ধার করতে গেছিলে না!

দুই কাশ্মীরি ছোকরা মাথা নামিয়ে নিলে, বাবা বললেন – ফরদিনকে ব্রিগেডিয়াররা ব্যাডমিন্টন খেলতে না দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছেন, অথচ তার হাতের অনেকটাই মাটি লাগা। সেটা দেখেই বুঝে যাই যে তুমি এখানে মাটি কোপাতে এসেছিলে, আর তা যে সম্ভবত নিজেদের গোপন আগ্নেয়অস্ত্র উদ্ধার করতে, সেটা ধারনা করে নিই। আর সেই ধারনা পাকাপাকি হয়ে যায় যখন আলি বাস্কেটবলের কোর্টের দিকে যাচ্ছিল, আর আমি তার পিছু নিই। ... আসলে আমি তখন মিসেস সান্যালের বাড়িতে আমার মেয়ের সাথে ঢুকছিলাম, সামনের কাঁচের পার্টিশনে দেখি তুমি হন্তদন্ত হয়ে নিচের দিকে যাচ্ছ; তাই মেয়েকে ফিরে যেতে বলে তোমার পিছু নিই। খানিকক্ষণ তুমি কি করো সামান্য দূর থেকে দেখেই, বুঝে গেছিলাম, আগ্নেয়অস্ত্র উদ্ধার করছো; জায়গাটা ভালো করে দেখা হয়ে গেলে, তোমাকে তোমার কাজ থেকে বিরত করতে আওয়াজ দিই।

বাবা আবার বললেন – হুম, তোমরা মোর্চার ছেলে জেনে, আমার প্রথম সন্দেহ তোমাদের উপরেই যায়। কিন্তু ফারদিনের হাতের মাটি আর আলির বন্দুক উদ্ধারের চেষ্টা আমার কাছে পরিষ্কার করে দেয় যে স্নিপার রাইফেল তোমরা চালাচ্ছিলে না। ... তোমরা অন্য কারুকে খুন করার জন্য এসে ছ। তারপর তোমাদের সাথে কথা বলে মোর্চার সাথে কথা, ভিডিও পাওয়া, আর শেষে গ্যাংটকে আসতে বলে, ফাতিমাকে এখানে

নিয়ে এসে সমস্তই ক্লিয়ার হয়ে যায় যে তোমরা ব্রিগেডিয়ার গতি আর সিংকে হত্যা করতেই উনাদের ডাকে সারা দিয়ে, এখানে এসেছিলে।

বাবা এবার হেসে ব্রিগেডিয়ারদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন – সরি ব্রিগেডিয়ার স্যার, আপনাদের আরো একটা জিনিস জানা নেই। ... আর সেটা হলো, আপনাদের সেই আর্মি ট্রুপ, যারা মোর্চা প্রধানকে হত্যা করেছিল, এবং আপনাদের ব্রিগেডিয়ার সান্যালকে হত্যা করতে দেখেছিলেন, তাদের একজন এখানেই আছেন এবং এখানেই থাকেন। ... তিনি হলেন মিসেস সান্যালের ড্রাইভার। ...

মিসেস সান্যাল – প্রভাস!

বাবা – হ্যাঁ ম্যাডাম, সেই কাশ্মীর অভিযানের পর, প্রভাসের কাশ্মীর থেকে মন উঠে যায়। উনি ব্রিগেডিয়ার সান্যালকে প্রচণ্ড স্নেহ করতেন। উনার সাথে করা দ্বিচারিতাকে উনি মেনে নিতে পারেন নি। আর তার সাথে ওর এমনও মনে হয় যে, এর পরের টার্গেট নিশ্চিত ভাবে আপনি মিসেস সান্যাল। তাই উনি আপনার ড্রাইভার হয়ে আসেন। ... তবে এরই মাঝে একটি ঘটনা হয়ে যায়, সেটির একটা দিক জানলেও, অন্যদিকটা ব্রিগেডিয়ার সিং আর গতি জানেন না। ... (ঈষৎ হেসে) মনে পরে মিস্টার সিং, আর্মি জেনারাল প্রভাস সিংহ আপনার এই সমস্ত কীর্তির প্রতিবাদ করেন, আর আপনি বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে, ওর মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিলেন! ... প্রভাস তারপর কাশ্মীর নয় কেবল, আর্মিই ছেরে দেয়। নিজের মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করায়, যেটা আপনি ভেঙে দিয়েছিলেন মেরে। আর তারপর মিসেস সান্যালের সেবা করে, নিজের পাপবোধ থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন।

বাবা আবার হেসে বললেন – মিসেস সান্যালের উপর যখন এটাক হয় প্রথমবার, প্রভাসের মধ্যে যেই নার্ভাসনেস কাজ করছিলো, আর সেই নার্ভাসনেসে ও যেই ভাবে সব জায়গা দেখছিল, সেই দেখার ধরন দেখেই আমি বুঝি যে ওর সাথে আর্মির ট্রেনিং রয়েছে। ... তাই ওকে গোপনে প্রশ্ন করি। ও প্রথমে আমার কথা এড়িয়ে যায়। তারপর যখন মোর্চার ভিডিও পাই। তখন একজনের চেহারা দেখে, আমি প্রভাসের সাথে মিল পাই। ... তাই ভিডিওটা দেখিয়ে, ওকে চেপে ধরতে, ও নিজেই আমাকে সমস্তটা বলে দেয়। ... আর এই ভিডিওতে দেখানো সমস্ত কথা যে সত্য, তাও বলে দেয়... তার আগে কি হয়, সেটাও বলে, যা ফাতিমা আমাদের বলল, আর তারপরে যা হয়, অর্থাৎ ওর মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়, ও আর্মি ছেরে দেয়, আর এখানে ড্রাইভার হয়ে আসে, সেই সমস্ত কথা বলে দেয়। ... তাই ব্রিগেডিয়ার স্যার, এবার কি বলবেন!

ব্রিগেডিয়ার গতি চেঁচিয়ে উঠে বললেন – আমরা যা কিছু করেছি, সমস্তই গভমেন্টের অর্ডারে করেছি। তাই আমরা সম্পূর্ণ ভাবে নির্দোষ।

বাবা – হুম, গভমেন্ট আপনাদের কাশ্মীরের ওই তিন অঞ্চলের উপর চাপ আর ভয় বাড়াতে বলে, তাই আপনারা রেপ করে মার্ডার করে দিলেন। যদিও রেপ করাটা গভমেন্টের অর্ডার কখনোই ছিল না, তবুও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, সেটা গভমেন্টের অর্ডার। মোর্চার মাথাকে হত্যা করার অর্ডার পেলেন আপনারা, তাই হত্যা করলেন। ... এটাও ধরে নিলাম ঠিক আছে। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সান্যালের হত্যা করার অর্ডার তো আপনারা পাননি। সেই খুনের দায় কে নেবে, মিস্টার গতি আর মিস্টার সিং! ... সেই খুনের দায় গভমেন্টও আপনাদের থেকে নিতে রাজি হয়নি। আর তাই আপনাদের সেই গভমেন্ট, যার চামচাগিরি করে, কাশ্মীরে নোংরামো করে এসেছেন, সে-ই আপনাদের বলে যে, এই সান্যালের ফাইল যেন আর কনোদিনও না খোলে। কিন্তু মিসেস সান্যালের স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করা দেখে আপনারা ঘাবড়ে গেলেন আর তাঁর নিজের ছেলের হাতেই তাঁকে খুন করিয়ে, সেই মোর্চাদের উপরেই সেই দোষ চাপাতে গেলেন । এই অর্ডারও তো আপনাদের দেওয়া হয়নি মিস্টার গতি আর সিং। তাই, আপনাদেরকে ব্রিগেডিয়ার সান্যালের মত শহীদ দেশপ্রেমীর খুন করার অভিযোগে, এবং তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করার চেষ্টা করার অভিযোগে, অর্থাৎ দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে দেশদ্রোহিতার দায় স্বীকার করে, আর নিজেদের দেশপ্রেমের ট্যাগ ত্যাগ করে, জীবনের অবসান করতেই হবে যে।

বাবা একটু বিকৃত হাসি হেসে – ফাতিমা, তুমি আমার সাথে বেঙ্গলে চলো। সেখানে আমার চেনা প্রচুর খবরের কাগজের ওনার আছে। ... তোমার সেই খবর, আর এখানে যা হচ্ছে, সেই খবর সম্পূর্ণ ভাবে তাঁরা ছাপবেন। বাংলা, না মুঘলকে ভয় পেয়েছে, না ব্রিটিশ পর্তুগিজকে, না আমেরিকা কে, আর না এই গভমেন্টকে। . .. আজও আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে, বাঘাজতিন, ক্ষুদিরাম, সুভাসচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, বিনয়বাদলদিনেশ আর অরবিন্দ ঘোষের রক্ত বইছে। ... চলো সেখানে চলো, আর তোমার খবর পাবলিশ করো। ... সারা ভারতবর্ষের মানুষের জানার সময় হয়ে গেছে, কি কারণে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যেতে যায়। সকলের জানার সময় হয়েছে, কেন কাশ্মীরের সমস্যা কোনদিনও মিটছে না। ... জানা উচিত সারা ভারতের সমস্ত মানুষের যে কাশ্মীরের মানুষ কিসের বিদ্রোহ করে, কি কারণে বিদ্রোহ করে। ... এবার সকলের জানার সময় হয়ে গেছে। ...চলো।

এবার অতনু আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে – দেখছো কি! এরেস্ট করো এই দুই দেশদ্রোহীকে। ... ব্রিগেডিয়ারকে মোর্চাদের গুলি দিয়ে মেরে, উনাকে শহীদ প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু উনারা যে সেই শহীদ হওয়া দেশপ্রেমীর খুনি, অর্থাৎ দেশদ্রোহীর ট্যাগ নিয়েই বাকি জীবনটা বাঁচবেন। ... এরেস্ট করো। ...

মিস্টার গতি, আর মিস্টার সিং, এবার বাবার পায়ের সামনে বসে পরে বললেন – মিস্টার সিন, আপনার কথা আমরা অনেক পড়েছি আর শুনেছিলাম। তাই ভয়ও পেয়েছিলাম, আর তাই সুবীরকে বিলেছিলাম যাতে ও আপনাকে শেষ করে ফেলে। ... স্যার, আমাদের অনুমানের থেকেও অনেক বেশি ভয়ানক আপনি। ... প্লিজ আমাদের ছেড়ে দিন। ... এই দেশদ্রোহী ট্যাগ নিয়ে আমরা বাঁচতে পারবো না। ... প্লিজ, আমাদের ছেড়ে দিন। ... হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পেরেছি, প্রকৃত দেশপ্রেম কি। ... ব্রিগেডিয়ার সান্যাল যে একজন অসামান্য দেশপ্রেমী, সেই ব্যাপারে আমাদের কনো সন্দেহ ছিলনা স্যার। ... হ্যাঁ, আমরা উনার মত দেশপ্রেমী হতে পারিনি। এতটা সাহস দেখাতে পারিনি। গভমেন্টের চেলাই থেকে গেছি। গভমেন্টের আগে দেশমাতাকে কনোদিনও বসাতে পারিনি। ... কিন্তু স্যার, আমরা এই দেশদ্রোহী ট্যাগ নিয়ে বাঁচতে পারবো না। ... প্লিজ স্যার, আমাদের হয় ছেড়ে দিন, নয় মেরে দিন।

বাবা – বেশ, যান, এই বাড়িঘর সমস্ত কিছু ফেলে, এমনকি নিজেদের আইডিকার্ডও ফেলে, সমস্ত আইডেন্টিটি ছেড়ে, পালিয়ে যান, এখনই। এই মুহূর্তে। ... যান, কনো চার্জ হবে না। কনো খবর পাবলিশ হবেনা, কিচ্ছু হবেনা, যদি আপনারা পালিয়ে যেতে পারেন সব ছেরেছুরে। ... যান চলে যান।

বাবার কথা শুনে, মিস্টার সিং এবং গতি, একবস্ত্রে সেখান থেকে চলে যেতে থাকলেন। উনারা এই ৪-৫ মিটার যাবার পরে, সুবীর উগ্র হয়ে উঠে বললেন – না আমার বাবাকে মেরেছে, আমার মাকে আমার হাতে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। এতোগুলো রেপকে, গভমেন্টের অর্ডার বলে মেনে নিয়েছে। ... না স্যার, আমাকে ওদেরই শেখানো স্নিপার রাইফেল দিয়ে ওদের খুন করতে দিন। আমি তারপর জেলে যাবো খুনের দায়, তাও ভালো। কিন্তু স্যার মারতে দিন আমাকে।

বাবা হেসে বললেন – ভেরিগুড সুবীর। ... আমি তো এটা তোমার মুখ থেকে শুনবো বলেই, ওদের যেতে দিলাম। ... তবে ভাই, তোমার স্নিপার দিয়ে মারলে তো হবেনা। ... ওরা তোমার বাবাকে মোর্চার গুলি দিয়ে মেরেছিল, শহীদ প্রমাণ করতে। ... এবার তুমি সিবিয়াই-এর গুলিদিয়ে ওদের মারবে, ওদের দেশদ্রোহী প্রমাণ করতে। ... অতনু, ওকে তোমার বন্দুক দাও। ..

অতনু আঙ্কেল নিজের লোডেড বন্দুক সুবীরকে দিলে, কনো সময় নষ্ট না করে, তিনটি বুলেট সরাসরি মিস্টার গতির পায়ে, পিঠে আর মাথায় মারলেন। ... সিং পিছন ঘুরে দেখতে গেলে, সুবীর উনার পায়ে, বুকে আর মাথায় গুলি মারলেন। ... অতনু আঙ্কেল এরপর ব্রিগেডিয়ার গতির বন্দুক হাতে নিয়ে, নিজের হাতে একটা ফায়ার করলেন। না গুলি ঢোকালেন না, তবে বেশ গভীর ক্ষত করলেন। ...

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে উনার ট্রিটমেন্ট করলে, বাবা ফাতিমার দিকে তাকিয়ে বললেন – উনাদের মৃত্যু কি করে হয় ফাতিমা!

ফাতিমা – স্যার, ফেঁসে গেছেন জেনে পালিয়ে যেতে গেলে, পায়ে গুলি করা হয়। তারপর পাল্টা গুলি চালালে, গুলিবিদ্ধ করে দুই দেশদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। ...

বাবা – থ্যাঙ্ক ইউ। ... চলো বেঙ্গলে গিয়ে, এই খবর ছাপা হবে।

বিতর্কিত উষ্কা

সেরেনা ফ্লেমিং

বাবা বেশ কিছুদিন ধরেই একটু বিষাদগ্রস্ত। কারণটা উনার প্রিয় একজন গবেষকের মৃত্যু, তাও আত্মহত্যা। খবরের কাগজে খবরটা পড়েছেন তা দিন সাতেক আগে। কিন্তু এখনো বাবার বিষাদগ্রস্ত ভাবের সমাপ্তি হয়নি। যিনি আত্মহত্যা করেছেন, তিনি হলেন ডক্টর সত্যব্রত ভুঁইয়া । তিনি নাকি মস্তবড় গবেষক এবং ভূতাত্ত্বিক ছিলেন। বিবিধ নতুন নতুন ভৌগলিক তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন উনি। বাবা উনার সাথে বেশ কিছুবার সাখ্যাতও করেছেন, আমাকেও একবার সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন। ভদ্রলোকের ভূগোল জ্ঞান সত্যিই অনবদ্য। আর আমার বাবারও ভূগোল এক আকর্ষণ ও অধ্যাবসায়ের স্থান। তাই হয়তো! ...

বিমর্ষ অবস্থায় দেখতে না পেরে, একদিন চায়ের টেবিলে বাবাকে প্রশ্ন করলাম – এতো ভেঙে পরলে কেন তুমি বাবা, ডক্টর ভুঁইয়ার মৃত্যুতে?

বাবা – একজন মানুষ, যিনি সর্বক্ষণ নতুন কিছু খোঁজার জন্য ব্যস্ত, তাঁর জীবনে কি প্রকার অবসাদ আসতে পারে মিলি! ... তোর মনে আছে কিনা জানিনা, তুই আমার সাথে উনার কাছে দুবার গেছিলিস। একবার বছর চারেক আগে, যখন উনাকে দেখেছিলিস অত্যন্ত প্রাণবন্ত, আর একবার এই দুইমাস আগে। তখনও উনাকে অবসাদগ্রস্ত দেখেছিলাম। ... কিন্তু সেই অবসাদের কারণটা কি? এমন ভাবে সেই অবসাদ ঘনিয়ে এলো যে এমন একজন ব্রাইট ব্যক্তিত্ব সরাসরি আত্মহত্যা করে নিলেন! ... কেরকম একটা মনে খচখচ করছে। স্বস্তিতে থাকতে পারছিনা।

বাবা কথাটা বলে বিদিপ্তাদির দিকে তাকালে, বিদিপ্তাদি নিজের স্বভাববশত মুচকি হেসে বললেন – বিজয়, অনেকসময়ে হতাশাই প্রাপ্য হয় একটি মানুষের, আর সেই হতাশা যতক্ষণ না তাঁর জীবনে আসছে, ততক্ষণ থাকে জীবনের প্রতি উৎসাহ। ... যেমন ধর একজন ক্লাসে ফার্স্ট হবার জন্য খুব উৎসাহী। একের পর এক পড়া শেষ করছে, আর তার উৎসাহ বাড়তে থাকছে। শেষে যখন পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হয়, তখন সে ফার্স্ট হয়না। আর কি আসে তার? হতাশা। ... তাই...

দিদি হয়তো আরো কিছু বলতে চাইছিলেন, এমন সময়ে কলিং বেল বেজে উঠতে, আমি আইহোলে তাকিয়ে দেখলাম একজন বিদেশিনী। ... বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম – বিদেশিনী!

বাবা ঘাড় উঁচিয়ে দরজা খুলতে বললে, আমি দরজা খুললাম। ইংরাজিতেই উনি সমস্ত কথা বললেন, সেদিনও আর পরেও, কারণ উনি বাংলা বা কনো ভারতীয় ভাষা বোঝেনই না। বাবাও উনার সাথে ইংরাজিতেই কথা বলতেন। আপনাদের জন্য, আমি উনার আর বাবার এই কেসে সমস্ত কথা বাংলাতেই বললাম।

উনার নাম উনি বলেছিলেন সেরেনা ফ্লেমিং। নিবাস অস্ট্রেলিয়ায়। সেরেনা বললেন – গত দুইমাস ধরে আমি ভারতে রয়েছি। আমার বাবার মৃত্যুর তদন্ত করছিল এফবিয়াই। আমার বাবার মৃত্যু ভারতেই হয়েছে।

বাবা – দাঁড়ান দাঁড়ান, বাবা ইন্ডিয়াতে মারা গেছেন। ডক্টর স্যামুয়েল ফ্লেমিং এঁর কথা বলছেন কি?

সেরেনার বয়স আমার থেকে সামান্য বড় হবে। এই ২৪ কি ২৫, তার বেশি নয়। দেখতে অপরূপ সুন্দরী নয়, তবে গায়ের ধবধবে লালচে রঙ, টানটান স্কিন, আর মুখে বা সারা শরীরে একটা পিম্পিলের দাগও না থাকার জন্য, এই ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির ভদ্রমহিলাকে অদ্ভুত সুন্দরী দেখতে লাগছিল। উনি মিষ্টি হেসে এবার বললেন – হ্যাঁ, আমি ডক্টর স্যামুয়েল ফ্লেমিং এঁরই একমাত্র কন্যা। নিজের কন্যা নই আমি, এডপ্টেড চাইল্ড। উনি বিয়ে করেন নি।

বাবা – হুম, এফবিয়াই-এর রিপোর্ট অনুসারে, উনি তো জাকার্তা অঞ্চলের কনো এক জঙ্গলের মাকড়সার বিষের শিকার, তাই না!

সেরেনা – হ্যাঁ, এফবিয়াই রিপোর্ট তো তাই বলেছে। জাকার্তা অঞ্চলের সেই বিরল আর অজানা মাকড়সার নাম বাবা দিয়েছিলেন সেলডিভ; সেই মাকড়সার রস যদি কনো ভাবে আমাদের সেলাইভার সাথে মিশে যায়, তাহলে নিস্তব্ধে সমস্ত সেল এমনই গতিতে বিভাজন হতে থাকে যে, একমাসের মধ্যে আমাদের সমস্ত শরীরের সমস্ত কোষ বিভাজিত হয়ে, আমাদের সমস্ত শরীরকে নষ্ট করে দেয়। ... আর এই ভাবেই বাবার মৃত্যু হয়েছে বলে এফবিয়াই জানিয়েছে।

বাবা – উনার মৃত্যু তো প্রায় ১৫ দিন মত হয়ে গেল। তা উনি কি তার একমাস আগে, জাকার্তা গেছিলেন নাকি?

সেরেনা – হ্যাঁ, আমি জানতাম না। আসলে বাবা তো বাইরে বাইরেই থাকতেন। তা, এফবিয়াই তো সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এমনই বলেছে।

বাবা – আর আপনি কি করেন?

সেরেনা – জিওলজি নিয়ে কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে, অস্ট্রেলিয়ান জিও সার্ভেতে কর্মরত আমি। এখন অবশ্য সেই কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আরো দুই মাস পরে, ন্যাট জিও তে আমার জয়েনিং । লাভা স্পেশালিষ্ট হয়ে চাকরি পেয়েছি।

বাবা – আগের চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন? মানে পরের চাকরিতে জয়েন করার এতো আগে!

সেরেনা – চাকরি তো আমার অর্থনৈতিক প্রয়োজন নয়। প্রকৃতির সাথে থাকা আমার প্যাসান। আমি প্রকৃতির থেকে সামান্যও দূরে থাকতে পারিনা। ... আর লাভা স্পেশালিষ্ট হবার কাজ আমি পেয়ে গেছি, তাই লাভা সংক্রান্ত বিস্তারিত পড়াশোনার একটু প্রয়োজন পরেছিল।

বাবা – তো, ইন্ডিয়াতে আপনি কি বাবার মৃত্যুর পরপরই আসেন?

সেরেনা – না, ইন্ডিয়াতে আমার সব থেকে প্রিয় টিচার থাকেন। উনি আমার কলেজের জিওলজির টিচারও ছিলেন। তাই উনার কাছ থেকে লাভা সংক্রান্ত অনেক কিছু জানার জন্য, আজ থেকে প্রায় ২ মাস আগে, আগের চাকরিটা ছেড়ে, এখানে নভোটেলে আমি রয়েছি। ... আমার বাবা তো আমারই হোটেলে এসে উঠেছিলেন।

বাবা – উনার এখানে আসার কারণ?

সেরেনা – তেমন বিশেষ কিছু কারণ ছিল কিনা বলতে পারবো না। তবে আমরা বাপবেটি এমনই করি। কেউ একজন যদি ছুটি পাই, তবে অন্যজন যেখানে থাকে, তাঁর কাছে গিয়ে আমরা থাকি; আর এই ভাবেই আমরা বছরের কিছুদিন অন্তত একসঙ্গে থাকতে পারি।

বাবা – আচ্ছা বেশ, এবার আমাকে বলুন, আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি, আর তারও আগে জানতে ইচ্ছা রাখি যে, আপনি আমার সন্ধান পেলেন কিভাবে?

সেরেনা – স্যার, আমার বিশ্বাস আমার বাবার মৃত্যুর পিছনে আরো কিছু ব্যাপার আছে, যা এফবিয়াই খুঁজে পায়নি। আমি সেটা জানতে চাই। আর হ্যাঁ, আমি এখানে থাকার সময়ে, বেশ কিছু ইংলিশ পেপারে, আপনার শলভ করা কিছু কেসের ব্যাপারে জানি। আর সেটা জেনেই আমার মনে হয়েছে, এই কেসের

যদি কেউ সমাধান করতে পারে, তা হলেন আপনি। ... তাই আমি আপনার স্মরনাপন্ন হয়েছি। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।

বাবা মাথা নিচু করে কিছু চিন্তা করছিলেন; সেই দেখে সেরেনা বললেন – স্যার, আমি আপনাকে যথাযথ পারিশ্রমিক দেব। এই নিন অগ্রিম ১০ হাজার ডলার।

বাবা কিছু বলতে না পেরে, মুখের দিকে তাকালেন সেরেনার। সেরেনা আবার বললেন – যদি তদন্তের জন্য আপনাকে কোথাও যেতে হয়, সেই সম্পূর্ণ খরচ আমার; আর কেসের শেষে আপনাকে আরো ১০ হাজার ডলার পেমেন্ট করবো।

বাবা – আমি আপনার দেওয়া টাকাটা নিলাম, কিন্তু খুললাম না। ... যদি দেখি যে এফবিয়াই যা বলেছে, তার বাইরে আমার আর কিছুই বলার নেই, তাহলে আপনার দেওয়া পেমেন্টটা আমি ফিরিয়ে দেব।

সেরেনা হেসে বললেন – একজন প্রকৃত প্রফেসানালের মত কথা। ... নভোটেল ৩য় ওয়ার্ড, ৩১২ নম্বর রুম। রিসেপ্সনে বলা থাকবে, আপনি আপনার নাম বললেই, আপনাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে। এখন আসি তাহলে!

দরজা পর্যন্ত উনাকে ছেড়ে দিয়ে এসে বাবা সোফাতে বসে, মাথাটা এলিয়ে দিয়ে, কিছু ভাবলেন। আমি বললাম – কি হলো বাবা!

বাবা – সেরেনার ইংরাজি কথা বলার ধরনটা দেখলি!

আমি – হ্যাঁ, একদম সাবলীল ইংরাজি, যেমন বিদেশিদের হয়।

বাবা – হুম, তাই না!

আমি – আরে খুলে বলবে তো! আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনা।

বাবা – ঠিক আছে, কাল নভোটলে যাবো তো, তখন নয় আরেকবার ভালো করে শুনে বলিস, কিছু বিশেষত্ব পেলি কিনা।

কথা বাড়ালাম না, বুঝতে পারলাম, বাবা বলতে চাইছেন না, আমার থেকে শুনে ক্রশ চেক করতে চাইছেন। তাই চেপে গেলাম। আমাদের বাড়ি থেকে নভোটল খুব দূরে নয়। বাইপাস ধরে, চিংরিহাটা

দিয়ে বেরিয়ে, একটা ফ্লাইওভার থেকে নেমেই সেক্টর ফাইভ, তারপর নিউটাউনে ঢুকে একটু এগোলেই নভোটেল। পরের দিন সকাল এই ৯-১০ নাগাদ আমি আর বাবা চলে গেলাম সেখানে। ৩ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে বলতে, আমাদের বলা হলো সেরেনা ঘরে নেই, সে আসলে আমরা তাঁর সাথে যেতে পারি। এর মধ্যে হয় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, নয় ঘুরে আসতে হবে। আমরা অপেক্ষাই করলাম।

বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। এই মিনিট দশেকের মধ্যেই সেরেনা সেখানে উপস্থিত হলো। রিসেপ্সানে গিয়ে চাবি নিতে, তাকে রিসেপ্সানের মহিলা বললেন আমাদের কথা। পিছন ঘুরে দেখতে, বাবা হাত নাড়লো। আমাদের কাছে এসে আমাদের দিকে মিষ্টি হেসে গুড মর্নিং বলে, আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ৩১২ নম্বর রুমে। নভোটেল খুবই লাকজারি হোটেল, সেটা জানতাম, কিন্তু ভিতরে এই প্রথমবার। সত্যিই ভিতরটা ঝাঁচকচকে।

ঘরে ঢুকে আমাদের বসতে দিলে, আমরা দেখলাম আমরা যেমন নর্মাল হোটেলে উঠি, এটা সেরকম নয়। এতে দুটো আলাদা আলাদা ঘর আছে, আর সঙ্গে আছে একটা বড়ধরণের বাথট্যাব দেওয়া আর স্টিমবাথের এরেঞ্জমেন্ট দেওয়া বাথরুম আর একটা খাবার জায়গা। মনে হচ্ছিল কারুর কনো ফ্ল্যাটের এপার্টমেন্ট-এ চলে এসেছি, হোটেল নয়। দুটি ঘরের মধ্যে একটি হলো বসার ঘর, গেস্টদের জন্য। আমরা সেখানেই বসলাম।

সেরেনা বসতে বসতে বলল – চা কফি কিছু!

বাবা – না ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। আপনি কি আপনার টিচারের কাছ থেকে আসছেন!

সেরেনা – হ্যাঁ, আমি ইন্ডিয়াতে আর কারুকে চিনি না।

বাবা – আচ্ছা, তা আপনার টিচারের নামটা কি?

সেরেনা – ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়া।

বাবা – ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়া! ... কনো ভাবে কি উনি ডক্টর সত্যব্রত ভুঁইয়ার সাথে যুক্ত!

সেরেনা – হ্যাঁ, উনার প্রয়াত স্বামীর নাম ডক্টর সত্যব্রত ভুঁইয়া।

বাবা – হুম, উনার মৃত্যু তো কিছুদিন আগেই হয়েছে, তাই না!

সেরেনা – মিস, মানে আমার টিচার যখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেন, তখন উনার কাছেই আমি মোঘলাই খাবার খেতে শিখি। আর তখন থেকেই আমি বিরিয়ানির খুব ভক্ত। তা সেইদিন মিস বিরিয়ানি বানাচ্ছিলেন। যখন আমরা সকলে, মানে মিস, উনার কাজের মেয়ে, আমি খাবার টেবিলে, তখনও ডক্টর ভুঁইয়া, মানে মিসের হাজব্যান্ড সেখানে আসেন নি। তাই মিস উনাকে ডাকতে গেলেন। উনার ঘরের দরজা ধাক্কাচ্ছিলেন, উনি কিছুতেই খুলছিলেন না, আর কনো সারাশব্দও দিচ্ছিলেন না। তারপর যখন অনেকক্ষণ সেই ভাবে মিস দরজা ধাক্কানোর পরেও দরজা খোলা হলো না, তখন উনার ড্রাইভার দরজা ভাঙলেন, কিন্তু ততক্ষণে গলায় দড়ি দিয়ে উনার হৃদ স্পন্দন থেমে গেছিল।

বাবা – উনার একটি ছেলেও ছিল না!

সেরেনা – হ্যাঁ, ছেলে এই একমাসও হয়নি, ইউএসএতে চলে গেছে। ওখানে নাকি ওর গার্ল ফ্রেন্ড থাকে। তার সাথে বিয়ে করে ওখানেই এখন আছে সে। ওর নাম প্রিয়ম ভুঁইয়া।

বাবা – শুধু প্রিয়ম ভুঁইয়া নাকি, ডক্টর প্রিয়ম ভুঁইয়া!

সেরেনা হেসে বলল – না বাবা মা, দুইজনেই উচ্চশিক্ষিত হলেও, ছেলের মন পড়াশুনায় ছিলনা। ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিল দুইতিনবার। সব বারেই লস খেয়েছে। কিন্তু শেষ বারের ব্যবসা করার সময়ে ওই ইউএসএর মহিলার সাথে সম্পর্ক হয়। বেশ কয়েকবার ইউএসএতে ট্রাভেলিং ভিসা নিয়ে ঘুরে এসেছে, কিন্তু ওখানে থাকার পারমিশন পাচ্ছিল না। যতই ওর গার্লফ্রেন্ড ওকে বিয়ে করতে রাজি হোক, ওদের দেশ বাইরের দেশের মানুষ, বিশেষ করে ভারতের লোকদের তো কিছুতেই সিটিজেনসিপ দিতে চায়না, যদি না একটা বিপুল সম্পত্তি দেখাতে পারে, আর সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারে। ... মানে ততক্ষণ সেই ভারতীয়কে এমিগ্রেন্ট বলেই ধারনা করা হয়। তাই প্রিয়ম যেতে পাচ্ছিল না। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা করে, এই কিছুদিন আগে সেখানে গেছে।

বাবা – বাবার মৃত্যুতে এসেছিল!

সেরেনা – না। মায়ের সাথে ফোনে কথা বলেছিল খালি।

বাবা এবার একটু উঠে ঘরে টাঙ্গানো একটা ছবির দিকে উঠে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দিকে পিছন করে, ছবির দিকে তাকিয়েই বললেন – ইনিই লেট ডক্টর স্যামুয়েল ফ্লেমিং!

সেরেনা – হ্যাঁ।

বাবা – আপনার কত বছর বয়সে উনি আপনাকে দত্তক নিয়েছেন, ঠিক জানেন?

সেরেনা – আমি যতদূর জানি, উনি আমাকে কনো অনাথ আশ্রম থেকে দত্তক নেন নি, মানে যেটাকে অফিসিয়ালি দত্তক নেওয়া বলে। উনার পরিচিত কনো এক মহিলা ছিলেন। সেই মহিলা তখন অবিবাহিত। কিন্তু তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। একজন মানুষ উনাকে বিয়ে করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু উনার বাচ্চাকে দত্তক নিতে রাজি ছিলেন না। বাবা, উনার সন্তানকে দত্তক নেন, আর আমি সেই সন্তান।

বাবা আবার উঠে এসে কাউচে বসলেন আমার পাশে, আর বললেন – ডক্টর ফ্লেমিংএর সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টগুলো এখন নিশ্চয়ই এফবিয়াই ছেড়ে দিয়েছে!

সেরেনা – হ্যাঁ, আমি একাউন্ট ডিলিটের জন্য আবেদন করেছি, তবে এখনো একাউন্ট ডিলিট হয়নি। ৩০ দিন পর্যন্ত সময় আছে রিভোক করার। ... মানে যদি ৩০ দিনের মধ্যে আবার একাউন্টটা ইউজ করা হয়, তবে অটোমেটিক্যালি রিভোক হয়ে যাবে।

বাবা – আপনার কাছে আইডি পাশওয়ার্ড আছে?

সেরেনা – শুধু ফেসবুকেরটা আছে। এফবিয়াই ওটাকে ইউজ করে, আমাকে নতুন আইডি আর পাশওয়ার্ডটা দিয়েছিল। দাঁড়ান আমি আনছি, আমার ডায়রিতে নোট করা আছে।

সেরেনা উঠে চলে গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ডায়রি নিয়ে এলো, আর ডায়রি থেকে একটা পাতার খানিকটা ছিঁড়ে বাবার হাতে দিয়ে দিল।

বাবা – আপনার লাগবে না, এটা!

সেরেনা – আমার এতে কি কাজ!

বাবা – আচ্ছা, একটা কথা বলুন আমায়। আপনার বাবা তো অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন ছিলেন। তবে এফবিয়াই আপনার বাবার মৃত্যুর তদন্ত কেন করলো?

সেরেনা – বাবা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমেরিকান একটি ভূতাত্ত্বিক সংস্থার হয়ে কাজ করছিলেন। তাই সেই কোম্পানির হয়ে এফবিয়াই তদন্ত করেছিল।

বাবা – আচ্ছা, ঠিক আছে। ... আজ আসি। যদি আবার প্রয়োজন হয়, আসবো, নয়তো ফোনে কথা বলে নেব।

সেরেনা লিফট পর্যন্ত আমাদের ছেড়ে দিল। আমরা বাইরে এসে নিজেদের স্করপিওতে উঠতে, আমি আবদার করলাম গাড়ি চালাবো। তাই চালকের আসনে আমি, আর আমার পাশে বাবা। ... পথে যেতে যেতে বাবা বললেন – আজকে কি লক্ষ্য করেছিস কিছু! মানে সেরেনার ইংরাজিটা!

আমি – হ্যাঁ, ওর ইংরাজিটার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান টান থাকলেও, বেশ কিছু শব্দ উচ্চারণ ওর অস্ট্রেলিয়ান নয়।

বাবা – বিশেষ করে, ভারতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে। ইংরাজি যাদের মাতৃভাষা, সত্যব্রত উচ্চারণ করতে গেলে তাদের দাঁত ভেঙে যাবার কথা। কিন্তু সেরেনার উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট আর তাও বাঙালিদের মতই।

আমি – হয়তো ওর মিস, মানে ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়ার সংস্পর্শের কারণে হতে পারে।

বাবা – হতে পারে... একটা কাজ কর তো। ... যখন এখানে নিউটাউনে এসেইছি, একবার ডক্টর ভুঁইয়ার বাড়ি ঘুরে যাই। ... বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার মাথায় ঘুরছে। দেখি কনো দিশা পায় কিনা ভাবনা গুলো!

আমি গাড়ি নিয়ে গেলাম ডক্টর ভুঁইয়াদের বাড়ির দিকে। রাস্তা চেনালেন বাবাই। ... বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে, বেল বাজাতে হলো না। উনাদের ড্রাইভার স্যান্ডো গেঞ্জি আর বারমুডা পরে গাড়ি ধুচ্ছিলেন। উনিই আমাদের প্রশ্ন করলেন – আপনাদের পরিচয়?

বাবা – মিসেস ভুঁইয়ার কাছে এসেছিলাম। আমি উনার হাজব্যান্ডের একজন গুণমুগ্ধ অনুগামী ছিলাম। সেই সূত্রে, উনার মৃত্যুর পর, উনার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে এসেছি। আর ... এই আমার মেয়ে।

ড্রাইভার ভিতরে চলে গেলেন, আর মিনিট দুইয়েক পরে বাইরে এসে আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসার জায়গায় বসালেন।

মিসেস ভুঁইয়া এলেন। একজন ২২ বছর ছেলের মা উনি, দেখে বোঝার উপায় নেই। ... চুলের পাক হয়তো কলপ করা বলে বোঝা যাচ্ছেনা, কিন্তু স্কিন টানটান। ... দেখতেও বেশ সুন্দরী। বেশ বলা ভুল হবে, খুবই সুন্দরী। ... গায়ের রঙ হলদেটে ফরসা, লম্বা প্রায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। স্বাস্থ্যও খুব সুন্দর।

বসার ঘরে ঢুকতে, বাবা উঠে দাঁড়ালেন। তাই আমিও দাঁড়ালাম। বাবা বললেন – নমস্কার, আমি ডক্টর সত্যব্রত ভুঁইয়ার একজন অনুগামী ছিলাম। আমি উনাকে তিনবার ইন্টার্ভিউও করেছি। একবার আমি একাকী, আর একবার আমার এই কন্যাকে নিয়ে উনার কাছে, এই বাড়িতেও এসেছিলাম। তবে আপনার সাথে কনোবারই সাক্ষাত হয়নি, তাই হয়তো আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন – নমস্কার। ... আপনার নামটা!

বাবা – বিজয় সিংহ।

ভদ্রমহিলা – আচ্ছা, বিজয় ... মানে আপনিই কি মিস্টার সিন! ... যিনি অনেক অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করেছেন! ...

বাবা – হ্যাঁ, আমি সেই ব্যক্তিই।

ভদ্রমহিলা – সো নাইস টু মিট ইউ। ... জানেন, আমি আপনার একজন ফ্যান হয়ে গেছি বলতে পারেন। ... বয়সে আপনি আমার থেকে অনেকটাই ছোটো। জানেন আমি আপনার সাথে একবার দেখা করতে চাই, এমনও আমার স্বামীকে বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন, উনি আপনাকে চেনেন, মানে পারসোনালি চেনেন। উনি নিয়ে যাবেন আমাকে। ... কিন্তু তারপর তো...

আবার থেমে মিসেস ভুঁইয়া বললেন – আমার এক অস্ট্রেলিয়ান ছাত্রী আছে। সেও আপনার বেশ কিছু কেস পেপারে পড়ে বলে, আপনি নাকি জীবন্ত সার্লক হোমস। ...

বাবা – আজ্ঞে, মার্জনা করবেন, আপনার সেই অস্ট্রেলিয়ান ছাত্রী আমার সাথে দ্যাখা করে, আমাকে উনার বাবার মৃত্যুর তদন্ত করতে বলেন। আমার এখানে আসার একটা কারণ সেটাও বলতে পারেন।

মিসেস ভুঁইয়া উৎসাহী হয়ে বললেন – আচ্ছা, এর মধ্যে ও আপনার সাথে যোগাযোগও করে নিয়েছে! ... আচ্ছা আমি কার কথা বলছি, আপনি জানেন?

বাবা – হ্যাঁ, আপনার ছাত্রীর নাম বোধ হয়, সেরেনা ফ্লেমিং, তাই না!

মিসেস ভুঁইয়া

মিসেস ভুঁইয়া হেসে বললেন – ও নিশ্চয়ই নিজের কার্ড আপনাকে দেয়নি। ... কার্ড দিলে অবশ্যই আপনি জানতেন, ও এখন আর খালি মিস সেরেনা ফ্লেমিং নেই। এখন ও ডক্টর সেরেনা ফ্লেমিং হয়ে গেছে, ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডক্টর সেরেনা ফ্লেমিং।

বাবা হেসে বললেন – নিজের মুখে ছাত্রীর প্রশংসা করতে পারার সৌভাগ্যই আলাদা না ম্যাডাম!

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ, তা তো বটেই। ছাত্রছাত্রী একজন শিক্ষিকার সবসময়েই গর্ব হয়।

বাবা – তা আপনি উনার বাবা, ডক্টর স্যামুয়েলকেও চিনতেন নাকি?

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ চিনি, খুব ভালো করেই চিনি। ... আমি প্রথম জীবনে একজন বেসরকারি রাশিয়ান সংস্থার হয়ে ভূতত্ত্ববিদের কাজ করছিলাম। বহুদেশে গিয়ে কাজ করেছি। প্রকৃতিই আমার এড্রেস থাকতো। বাড়ি ফিরতামই না। বাড়ি, মানে বদ্ধ ঘরে থাকতেই পারতাম না, কেমন যেন একটা খাঁচায় বন্দি হয়ে গেছি, বন্দি হয়ে গেছি ভাব আসতো। ... সেই সব কাজ করতে গিয়েই, একবার ডক্টর স্যামুয়েলের সাথে আমার আলাপ।

বাবা – যদি আপত্তি না থাকে, একটু বিস্তারে বলবেন প্লিজ।

মিসেস ভুঁইয়া হাসিমুখে বললেন – জাভার একটি দ্বীপ থেকে আমরা মানুষ আর গবাদি পশু ইভাকুয়েট করছিলাম। আমার গবেষণা বলেছিল, সেখানে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আগ্নেয়গিরির উদ্গিরন হবে, সেই কারণে। আর সেই সময়ে স্যামুয়েল ওর সমস্ত ছাত্রছাত্রী নিয়ে সেই দ্বীপে এসে উঠছিল। তাই তাদেরকে নিয়েও আমরা অন্য একটা দ্বীপে চলে যাই। সেখানেই প্রথম আলাপ।

তারপর, একের পর এক, বিভিন্ন জায়গায় ওর সাথে দেখা হতো। ... (একটু হেসে) খানিকটা ও ম্যানিপুলেট করেই সেই সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হতো, যেখানে আমাদের কোম্পানিও ঘাঁটি পাততো। তাই আলাপ আরো একটু গভীর হতে থাকে।

বাবা – আপনার এখনের রূপ দেখেই বোঝা যায় যে সেই সময়ে আপনি বেশ আকর্ষণীয় রকমের সুন্দরী ছিলেন। সেই কারণেই কি!

মিসেস ভুঁইয়া একটু মুচকি হেসে বললেন – ভগবান সুন্দরীদের একটু যদি বুদ্ধিও দিতেন কৃপা করে, তাহলে আমরা নিজেদের বাঁচাতেও শিখে যাই, জানেন তো। ... কিন্তু সৌন্দর্য আর বুদ্ধির যেন কনো মিলই হয়না; হলে কি আর ভগবান তা মেলাতেন না!

বাবা – এমন কেন বলছেন আপনি! ... আপনি কি নির্বুদ্ধিতার কাজ কিছু করেছেন নাকি!

মিসেস ভুঁইয়া – একবার করলেও না বুঝতাম; আমি আসলে ন্যাড়া নইতো, তাই বেলতলায় একবার না, দুইদুইবার গেছি।

বাবা – ডক্টর ফ্লেমিংই কি আপনাকে অস্ট্রেলিয়ার কলেজে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন!

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ। আসলে আমার কাজই ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে আগে থেকে ধারনা করা । কিন্তু প্রকৃতি তিনি। সন্তান কি আর মাকে সম্পূর্ণ ভাবে কখনো চিনতে পারে! ... কিন্তু বিদেশিরা বড্ড বেশি মেকানিকাল। আমার একটা ভুল প্রেডিকশন; আর সরাসরি আমার চাকরি খেয়ে নিলো ওরা। ... যখন এই ঘটনাটা ঘটে, তখন স্যামুয়েল সেই দ্বীপেই ছিল। জাপানের একটা দ্বীপ, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি সুনামির পূর্বাভাস করেছিলাম। ... সুনামি হয়েওছিল, কিন্তু আমি যেইদিন প্রেডিক্ট করেছিলাম, তার তিনদিন পরে।... আসলে প্রকৃতির হয়তো এমনই ইচ্ছা ছিল, তাই আমার সাথে এমনই করলেন তিনি। ...

বাবা – আর সেই সময়ে চাকরিহারা ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়া, যার প্রতি উনার প্রেমপীরিতও কম ছিলনা, তাঁকে নিজেরই কলেজে একটা চাকরি দিয়ে, একটু বেশি দেখাসাখ্যাতের ব্যবস্থা করলেন, এই তো!

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ একদমই ঠিক, তবে আমি তখন ভুঁইয়া ছিলাম না; আমি ছিলাম চক্রবর্তী।

বাবা – হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাই মিস্টেক। ... তারপর কি হলো?

মিসেস ভুঁইয়া – ক্রমশ আমি স্টুডেন্টদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম। আর তাই আমাকেই সমস্ত এক্সপিডিশনের কাজে, মানে যেখানে গিয়ে সমস্ত জিওলজির স্টুডেন্টরা ওদের এসাইনমেন্ট করবে, সেই এক্সপিডিশনগুলোতে নিয়ে যেতে থাকলাম; মানে যেই কাজটা আগে স্যামুয়েল করতো, সেই কাজটা।

সেখানেই ডক্টর ভুঁইয়ার সাথে আমার আলাপ। একজন মানুষ যিনি জিএসআইতে কাজ করতেন, আর যিনি পাগলের মত কিছু যেন খুঁজে চলতেন। রূপের জন্য কিনা জানিনা; তবে আমার ধারনা ছিল, প্রকৃতির সাথে আমার আশ্চর্যরকমের সম্পর্কের কারণেই এই স্যামুয়েল আর ডক্টর ভুঁইয়া আমাকে পছন্দ করেন। তবে বিজয়, ইউ আর মোর কারেক্ট; তবে সেটা আমি তখন বুঝিনি। ...

বাবা – মানে? আপনি কি কনো অন্যায়ের স্বীকার হয়েছিলেন না কি?

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ হয়েছিলাম, তবে অন্যায়টা আমিই আমার সাথে করেছিলাম। ... আমার ছাত্রী, সেরেনা একটা কথা বলে জানো বিজয়। আমি প্রকৃতিকে চিনতে পারি, তবে মানুষ আমি একদম চিনিনা। ... একদমই ঠিক বলে ও। ... স্যামুয়েল আমার রূপযৌবনকে ভালোবাসলো, আর ডক্টর ভুঁইয়া আমার প্রকৃতিজ্ঞানকে নিজের আশ্চর্যরকম আবিষ্কারের অস্ত্র করে নেবার জন্য ব্যবহার করলেন। ... আর আমি মূর্খের মত দুজনের কাছে ... (একটা দীর্ঘ নিশ্বাস)

বাবা – হুম, ডক্টর ভুঁইয়া একবার আমাকে আনঅফিসিয়ালি বলেছিলেন যে, উনার সমস্ত আবিষ্কারের পিছনে একজন আছেন, যার কথা কেউ জানেনা। ... আপনিই কি সেই ব্যক্তি!

মিসেস ভুঁইয়া – হতে পারি আমিই সেই; আমাকে তো উনি এমন কথা কনোদিন বলেন নি। ... আর দ্বিতীয় কথা এই যে, উনি আমাকে যখন বিয়ে করলেন, তখন আমাকে সর্তই এই দিয়েছিলেন যে আমি আর চাকরি করতে পারবো না। ... এক অদ্ভুত জীবনের চক্রে আমি ফেঁসেগেছিলাম জানো বিজয়। ... বাইরে বাইরে কাজ করি, আমার বাবার কিছুতেই তা পছন্দ ছিল না। ... তাই আমার বাড়িতে ঢোকাই বন্ধ করে দিলেন, আর পরিবারের সকলকে নির্দেশ দিলেন যে আমার সাথে যে কেউ সম্পর্ক রাখবে, উনি তাঁকে সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত করবেন। আমার বাবা, বিখ্যাত ডক্টর সুরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্পত্তি প্রায় ৫০ থেকে ৭০ কোটি টাকা তো হবেই। কেউ সেই সম্পত্তির লোভ ছাড়তে পারলেন না, তাই আমার সাথে সকলে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, আমার মাও।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে আবার বললেন – এমন অবস্থাতে, আমি না... একটা পরিবারের খুব কামনা করছিলাম। মাঝে মাঝে নিজেকে বড্ড একা লাগতো। হয়তো বিদেশিনী হলে লাগতো না; কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা; শুধু মেয়েরাই কেন বলবো, সব মানুষই একা থাকাকে একটা সময়ের পর যন্ত্রণাই মনে করে; আমিও তাদের মধ্যে একজন অন্যতম। ... তাই আমি চাকরি সমস্ত ছেড়ে দিই। ...

বাবা – ভারতে চলে আসেন?

মিসেস ভুঁইয়া – না ভারতে আমরা এসেছি, এই কিছু বছর হলো। ... তখন জিএসআই-এরই অস্ট্রেলিয়ান রিজে একটা বিশাল গবেষণা চলছিল। তাই উনি ওখানেই থাকতেন। ... আর আমার কোলে বাবু এসে গেছিল। তাই বাবুকে নিয়েই, আর কিছু ছাত্রী আমার সাথে তখনও যোগাযোগ রাখতো, তাদেরকে নিয়েই সময় কাটাতে থাকি। ... বাবু বড় হয়ে যেতে, আমি কলেজের সাথে একরকম একতা চুক্তি করেই, লুকিয়ে লুকিয়ে টিচারি করতাম। চুক্তি এই ছিল যে, আমাকে বাইরে এক্সপিডিশনে পাঠানো যাবেনা।

বাবা – তাহলে আবার যাচ্ছেন কবে প্রকৃতির কোলে?

মিসেস ভুঁইয়া – এই বয়সে আমি তো আর নিজের জন্য চাকরি পাবো না। ... সেরেনা বলেছে, ও আমাকে ওর এসিস্ট্যান্ট করে নেবে। ন্যাট জিওতে ও তো লাভা এক্সপিডিশনে চাকরি পেয়েছে; সেখানে একজন নিজস্ব এসিস্ট্যান্ট নেওয়া এলাউড। ও বলেছে আমাকে নেবে। ... যদি নেয়, ... আমি ... আমি ... কি বলবো বিজয়, আমি আবার প্রকৃতির কোলে যেতে পারবো। ... আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, এই বদ্ধ খাঁচায় থাকতে থাকতে। ...

ভদ্রমহিলার চোখে জল দেখে, আমি ভাবলাম, একজন প্রকৃতিকে এতোটা ভালোবাসতে পারেন?

বাবা একটু হেসে বললেন – কিন্তু আমার প্রশ্নের আপনি উত্তর দিলেন না! ডক্টর ভুঁইয়া কি, আপনার কথার ভিত্তিতেই সমস্ত আবিষ্কার করতেন বা আবিষ্কারের নাম কিনতেন, এমন কিছু?

মিসেস ভুঁইয়া – না, কিছু না করে নাম কেনার মতন ফাঁকিবাজ ব্যক্তিত্ব উনি কখনোই ছিলেন না। ... হ্যাঁ, আমার থেকেই থিওরি নিতেন। তারপর উনি সেই থিওরি অনুসারে অভিযান করতেন, আর সেই অভিযানের থেকে আপনারা যাকে আবিষ্কার বলেন, সেই সব। ... তাই এমন বলবেন না যে, উনি কিচ্ছু না করে নাম কিনতেন। ... পরিশ্রম উনি সর্বদা করতেন।

বাবা – তাহলে তো আজকে আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন আপনার থেকে আমি এই প্রকৃতির একটা আপনার চোখে দেখা মানচিত্র দেখতে চাই ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়া । অবশ্যই আপনি যদি আমাকে শোনাতে চান তবেই। মানে আমি জোর করবো না আপনাকে।

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ বলবো, আর যা বলবো, তা তুমি বলেই বলবো। ... তোমার এক্সপিডিশনগুলো আমি পড়েছি, আর তার থেকে এটুকু জেনেছি যে তুমি যেমন এই দেশকে ভালোবাসো, তেমন এই প্রকৃতিকে। ... আমি তোমাকে বলবো, আর তা বলবো কারণ তুমি প্রকৃতিকে ভালোবাসো বলেই।

বাবা – বেশ মিসেস ভুঁইয়া, কিন্তু সেই গভীর কথায় যাবার আগে, দুটো চারটে প্রশ্ন আছে, মানে আপনার ছাত্রী যেই কেসটা আমাকে দিয়েছেন, সেই কেসের ব্যাপারে। যদি কোয়াপরেট করেন তবে কি ...

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ, করুন না। ... বলুন।

বাবা – আচ্ছা, আপনি কি জানতেন, ডক্টর স্যামুয়েল ইদানীং কলকাতাতেই থাকছিলেন?

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ সেরেনার হোটেলেই তো উনি উঠেছিলেন।

বাবা – আপনার সাথে উনি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি কনো?

মিসেস ভুঁইয়া – না, আমার বিয়ের পর থেকে ও আমার সাথে আর একবারও কথাবার্তা বলেনি, না সামনাসামনি না ফোনে, আর না কনো অন্য মিডিয়ামের মাধ্যমে।

বাবা – আপনি কি উনার মৃত্যুর আগেই জানতেন, উনি এখানে এসেছেন?

মিসেস ভুঁইয়া – উনি এখানে আসার আগে থেকেই জানতাম, সেরেনা আমাকে বলেছিল। ... ও নিত্য আমার সাথে যোগাযোগ করে।

বাবা – ডক্টর ভুঁইয়ার সাথে উনার যোগাযোগ ছিল!

মিসেস ভুঁইয়া – না এমনিতে তো ছিল না। তবে ইদানীংকালে, মানে উনি যখন থেকে জাকার্তার এক্সপিডিসিশন করে ফিরেছেন, তারপরে উনাকে আমি দুইতিনবার স্যামুয়েলের সাথে ফেসবুকে কথা বলতে দেখেছি। কি কথা, কি বিষয়ে কথা, সেটা বলতে পারবো না।

বাবা – শেষ প্রশ্ন, আপনার ছেলে যে বাইরে চলে গেল, ওখানে সেটেল হতে, এতে আপনাদের কারুর আপত্তি ছিলনা? ...

মিসেস ভুঁইয়া – ওর বাবার আপত্তি ছিল। আর সেই কারণে বাবা টাকাও দিচ্ছিল না, যেই পরিমাণ টাকা ওর দরকার ছিল। ... আমার কাছে যা সেভিংস ছিল, তাতে ওর প্রয়োজনের ২০ শতাংশও হচ্ছিল না; তাই নেয় নি। ...

বাবা – শেষে তো বাবা বেঁচে থাকতেই, চলে গেল। তখন ডক্টর ভুঁইয়া বাঁধা দেন নি!

মিসেস ভুঁইয়া – ও তো নিজে থেকেই টাকা যোগার করেছিল। তাই বাবার আর কথা বলার জোর থাকলো কোথায়?

বাবা – সে তো প্রচুর টাকা!

মিসেস ভুঁইয়া – ২ই লক্ষ্য আমেরিকান ডলার।

বাবা – মানে প্রায় দেড় কোটি টাকা... এতো টাকা কি করে...

মিসেস ভুঁইয়া – তা বলতে পারবো না।

বাবা – আচ্ছা বেশ, ওসব কথা রাখুন, এবার আসল কথায় আসুন। আমি আপনার মুখ থেকে, আপনার নির্মিত একটা পৃথিবীর মানচিত্র শুনতে চাই।

মিসেস ভুঁইয়া – একটা কথা বলো বিজয়। এমন অদ্ভুত আবদার করলে কেন? মানে পৃথিবীর মানচিত্র!

বাবা – আসলে ডক্টর ভুঁইয়া প্রায়শই একটা এমন মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাঁর মানচিত্রটি অসম্পূর্ণই থাকতো, আর সেটা শুনে আমার প্রায়শই একটা অসংলগ্নতা নজরে আসতো। ... আর যখন আপনার কথা শুনে এমন মনে হলো যে, আপনার থিওরিকে বেস করেই উনি সমস্ত গবেষণা করেছিলেন, তাই মনে হলো হয়তো সেই মানচিত্রটি উনি আপনার কথার ভিত্তিতে আঁকতেন, কিন্তু আঁকতে পারতেন না। ... আসলে বুঝতেই পারছেন, তদন্ত করতে করতে, একটা বাজে জিনিস যেটা হয়ে গেছে আমার মধ্যে, সেটা হলো সন্দেহজনক মন। যেখানে সন্দেহ করার কিচ্ছু নেই, সেখানেও সন্দেহ করে ফেলি।

মিসেস ভুঁইয়া হেসে বললেন – না না, একদমই ভুল জায়গায় সন্দেহ করোনি তুমি। না, আমি একজ্যাক্টলি জানিনা যে উনি কি ধরণের মানচিত্র তোমাদের সামনে আঁকতেন, তবে হ্যাঁ, এই মানচিত্র আমার মনে সদাসর্বদাই থাকতো। ... আসলে ব্যাপারটা এই যে, তোমাদের ডক্টর ভুঁইয়া একজন ভূতত্ত্ববিদ অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন না। ... আর তা আমি বুঝেছিলাম যখন উনি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে আনন্দের সাথে স্বীকার করতেন না, সেটা দেখে। ... আমি পুরপুরি ঠিক কিনা জানিনা, তবে হ্যাঁ, উনি একটা কিছুর সন্ধান করতেন। আর সেই সন্ধান উনি প্রকৃতিতেই করতেন। আর সেই সন্ধানকে

সক্রিয় রাখার জন্যই, উনি ভূতত্ত্ববিদ হয়ে ওঠেন। ... কিন্তু আমার ব্যাপারটা অন্যরকম। প্রকৃতি আমার কাছে আমার নিজের মা। ... এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আমার কাছে আমার মায়ের দেহ। ... বলে বোঝাতে হয়তো পারবো না, আমি ভূতত্ত্ববিদ প্রকৃতির টানে, অন্য কিছুর টানে নয়; এমনকি কেরিয়ারের টানেও নই।

সামান্য হেসে মিসেস ভুঁইয়া বলতে শুরু করলেন – আমার চোখে এই সম্পূর্ণ পৃথিবীটা একটি নারী, আর সেই নারী আমার মা; এই দেহের মা; আগের সমস্ত দেহের মা; আর পরবর্তী যা যা দেহ নেব, তারও মা। একটু ভালো করে যদি পৃথিবীতা দেখো বিজয়, তাহলেই উনার গঠনটা বুঝতে পারবে। আকৃতিটা অনেকটা কেমন বলোতো! বাস্তুদেবতা দেখেছো?

বাবা – হ্যাঁ, হাঁটু গেঁড়ে শুয়ে থাকে।

মিসেস ভুঁইয়া – কিন্তু উনি দেব, আর ইনি দেবী; মা বলা হয় ইনাকে। ... সঙ্গমের অবস্থা স্মরণ করো বিজয়; নারীর মুখ ঊর্ধ্বে, আর পুরুষের মুখ নিম্নে। বাস্তুদেবতার মুখ নিম্নে, আর ধরিত্রী মাতার মুখ ঊর্ধ্বে। এবার দেখো, উনার মুখ কোথায়? উনার কপাল আর কপালের আজ্ঞাঅবস্থা, অর্থাৎ যেখানে সমস্ত সময় এসে থেমে যায়, বা যেখান থেকে সময়ের চক্রবাত শুরু হয়, সেটি কোথায়? সেটিকে আমরা বলি গ্রিনউইচ মেরিডিয়ান, অর্থাৎ লন্ডন। তাঁর দুই দিক দিয়ে কেশ; বাঁ দিকের কেশ কাঁধের উপর দিয়ে গেছে, রাশিয়া; আর ডান দিকের কেশ পিঠের পিছন দিয়ে গেছে; যতটুকু কাঁধের পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে, সেটা এন্টার্কটিকা।

কপালের নিচেই কি? চোখ, তাই তো? স্পেন, জার্মানি। একটু ভেবে দেখো বিজয়, ইউরোপের সমস্ত কালচার এই দুই দেশের থেকেই আসে। আর তাতে সহযোগ দেয় ধরিত্রীর নাসিকা, ফ্রান্স, যা সারা জগতে নিজেদের সুগন্ধি পারফিউমের জন্য প্রখ্যাত।এবার গাল বা কপোল দেখো। একদিকে ছোটছোট দেশ, যাদেরকাছেই একমাত্র ইউরোপে যেটুকু খনিজ আছে, তা পাওয়া যায়, অর্থাৎ অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারি, রোমানিয়া, এই দেশগুলো। আর অন্যদিকে রয়েছে টলটলে গাল, ভুমদ্রসাগর।

কথা বলেন আর আহার করেন ইতালি দিয়ে, তাই সেখানের আহারের বাহার এতো। আর কণ্ঠস্বর কি দিয়ে? গ্রিক অপেরা দিয়ে। কণ্ঠের নিচে কি?

বাবা – গণ্ডদেশ বা গলা, যা একটি নারীর রূপের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়।

মিসেস ভুঁইয়া – ভেরি গুড, আর পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরী নারী কোথায় পাওয়া যায়!

বাবা – তুরস্ক, অর্থাৎ গলা।

মিসেস ভুঁইয়া – এবার আসি ডান কাঁধে। ওটা তো চুলে ঢাকা নেই, তাই দেখা যাবার কথা। কে সেটা? আফ্রিকা। যেমন কেশের থেকে মুক্ত যেই কাঁধের অঞ্চল থাকে, তাতে হার, মালা সব দেখা যায়, তেমনই দেখো বিজয়, আফ্রিকাতে ধনরত্ন ভর্তি। ঠিক তার নিচে দুটি ফুসফুস; পৃথিবীর দুটি প্রাণকেন্দ্র; একটি জেরুজালেম মানে পেলিস্টিন; দ্বিতীয়টি মক্কা মানে আরব। ঠিক তার নিচ থেকে দেখো, কঠিন পাঁজর, হিমালয় আর কারাকোরাম পর্বতমালা। আর সেই পাঁজরের মধ্যে সুরক্ষিত রয়েছে, তাঁর হৃদয়, ভারত। যেমন হৃদয়ে সমস্ত শরীরের রক্ত এসে নিজেকে পরিষ্কার করে চলে যায়, তেমনই দেখো ভারতে সমস্ত দেশের, সমস্ত সভ্যতার, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আসে, নিজেদের পরিষ্কার করতে। আর যেমন আমাদের হৃদয়ে সমস্ত দেহের সমস্ত কিছুর অনুভব থাকে, তেমনই প্রায় সমস্ত প্রমিনেন্ট ভৌগলিক গঠন সব ভারতে আছে, সব রকমের পাহাড়, মরু, মালভূমি, নদ, নদী, দ্বীপ, বদ্বীপ, সাগর, উপসাগর, মহাসাগর, সমস্ত কিছু এখানে উপস্থিত।

আরো অন্তর্দৃষ্টি দাও বিজয়। দেখো যেমন হৃদয়ে সমস্ত ধাতু থাকে, তেমন ভারতের ভূমিতেও আছে; আর দেখো, যেমন হৃদয়ে কনো প্রকার তেল থাকেনা, তেমনই ভারতের আশেপাশে তেল রয়েছে, কিন্তু মুল ভূমিতে নেই। তেল সব থেকে বেশি কোথায় থাকে? পেট আর নাভিতে, আর কিছু জমা হয়, ফুসফুসে; দেখো আমেরিকাতে তেল আছে, যা ওরা তোলে না বলে ওদের দেশের মানুষের এতো ওবেসিটি মানে মোটাপার সমস্যা; আর দেখ ফুসফুসে রয়েছে, তাই আরব, ইরাক, ইরান, সুদানে তেল।

স্তনদেশ তাঁর ভূমিনিচে, কিছু ভারতে, কিছু ইন্দোনেশিয়ার। তাই সেখানের ভূমি এতো উর্বর, আর এতো খনিজ। হিমালয় শেষ মানে, রিবকেজ বা পাঁজরের সমাপ্তি; পাশদিয়ে চিনরূপী কেশ মানে চুল তো রয়েইছে। আর সেটা শেষ হচ্ছে কোথায় গিয়ে? চায়না সাগরে গিয়ে। এবার হৃদয় শেষ হলে, কি থাকে? গলব্লাডার, প্যাক্রিয়া থাকে; আর অন্যদিকে থাকে লিভার। ঠিক ভারতের নিচে রয়েছে প্যেসিফিক রিং অফ ফায়ার, অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির মালা, যেখান থেকে সমস্ত হরমোন, এনজাইম সর্বক্ষণ নিঃসৃত হয়ে চলেছে। আর ঠিক তার কোনাকুনি রয়েছে ইন্দোনেশিয়া জাভা সুমাত্রা, যেখানে রয়েছে লিভার, তাই সেখান থেকেও বিভিন্ন এনজাইম নিঃসৃত হয়ে চলেছে।

আর তার নিচে দেখো কি রয়েছে? রয়েছে নাভিদেশ; মানে যেখানে কিডনি আর ইন্টেস্টাইন থাকে, অর্থাৎ মলমুত্র জমতে থাকে; আর সঙ্গে থাকে ইউটেরাস, অর্থাৎ যৌনতার স্থান। খেয়াল করে দেখো বিজয়। তোমার তো বিস্তর পড়াশুনা! আমেরিকাকে কি বলা হতো?

বাবা – হোর, অর্থাৎ বেশ্যাদের দেশ।... আজও ওদের জিডিপির একটা বড় অংশ পর্নোগ্রাফি থেকে আসে। আর স্ট্যাচু অফ লিবার্টি তো রয়েছেই, হোরেদের মুক্তির দেবী।

মিসেস ভুঁইয়া হেসে বললেন – এই কারণেই তো তোমাদের মত মানুষদের সাথে কথা বলে এতো সুখ। ... তোমরা তালের সাথে তাল মিলিয়ে সঙ্গত করো। ... ধরিত্রী মাতার অবস্থান যে কোনাকুনি, সেটা তো বুঝতেই পারছো। এবার বলো, এই সমস্ত কিছুর নিচে কি থাকবে?

বাবা – যোনি।

মিসেস ভুঁইয়া - একদম ঠিক। এবার বলতে পারো, ধরিত্রীমাতার যোনিকে আমরা কি নামে চিনি!

বাবা – বারমুডা ট্রায়েঙ্গেল কি!

মিসেস ভুঁইয়া – এক্সিলেন্ট।

বাবা – এরপর ... আঃ ... পা মুরে বসলেন তিনি; তাই পায়ের দাবনা আর ডিমে হলো ব্রাজিল আর্জেন্টিনা, তাই ওদের পায়ে ফুটবলের জাদু থাকে। আর... একদম নিচে পায়ের গোড়ালি, যা সম্পূর্ণ ভাবে রুক্ষ হয়, কারণ সারা শরীরের সব থেকে কঠিন জায়গা সেটি। আর সেটি হলো অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড! ... অদ্ভুত দিদি! ... অদ্ভুত। ... সত্যি বলছি, আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু ক্ষমা করবেন দিদি; আপনাকে না ঠিক ভূতত্ত্ববিদ মানতে পারছিনা। মন বলছে, আপনি একজন সাধিকা। প্রকৃতির সাধনায় উন্মত্ত এক সাধিকা আপনি। নিজের মায়ের প্রেমে দিশাহারা এক মাতৃভক্ত সন্তান আপনি। ... ঠিক আছে আজ তাহলে উঠি দিদি।

বাবা কথাটা বলে, একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন একদিকে। তারপর সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন – এই শিশিগুলোতে কিছু কিছু পোকামাকড় রয়েছে। এগুলো কি?

মিসেস ভুঁইয়া – এগুলো আমার কালেক্ট করা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিষধর কিছু পোকা । ... অদ্ভুত এদের বিষ জানো বিজয়। মানে এদের বিষে যদি কারুর মৃত্যু হয়, তবে না, এটাও বলা যাবেনা যে বিষের জন্য মৃত্যু হয়েছে।

বাবা – বাহ, অসাধারণ। ... আচ্ছা দিদি, এতে কি এমন কনো কীট আছে, যার বিষের কারণে, আমাদের শরীরের সমস্ত কোষ বিভাজিত হয়ে যায়, আর সেই ভাবে মৃত্যু হয়!

মিসেস ভুঁইয়া একটি শিশির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন – এই তো সেই মাকড়শা। জাকার্তার একটি জঙ্গলের মাকড়শা এটি। ... জানো বিজয়, এই দ্বীপে ডক্টর ভুঁইয়া আগে কনোদিন যাননি। আমার থেকে সেই দ্বীপের কথা শোনার পর উনার যেই মূর্তি হলো, উনাকে এতটা উৎসাহিত আমি জীবনে দেখিনি। কিন্তু ওই দ্বীপ থেকে ফেরার পরপরই, উনার মূর্তি ভয়াবহ হয়ে উঠলো। উনি একদম যেন ডিপ্রেশনে চলে গেলেন। ... আর সেই ডিপ্রেশন শেষ হলো উনার মৃত্যুতে।

বাবা – আচ্ছা কনো ভাবে উনার এই মৃত্যুর কারণ এই মাকড়শার বিষ নয়তো?

মিসেস ভুঁইয়া – না না, ইম্পজিবিল। এই বিষের ফলে দেহের শিরাতে এমনই ঘা হতে শুরু করে যে, তা শরীরকে সম্পূর্ণ ভাবে ফুলিয়ে জঘন্য দেখতে করে দেয়। ... আর তা ছাড়া, জাকার্তার ওই দ্বীপে একটা পদ্মফুল হয়, কমলারঙের পদ্ম। সেই পদ্মের নালের রস সামান্য পান করলেই এই বিষ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আমি উনাকে এই একটি পদ্ম আনতে বলেছিলাম ফেরার সময়ে। উনি আগেভাগেই সেই পদ্ম তুলে নিয়েছিলেন। শেষের জন্য রাখলে হয়তো ভুলেই যেতেন, কারণ যেই লেভেলের ডিপ্রেশনে তিনি আটকে গেছিলেন। ... বুঝতেই পারছো, এমন ডিপ্রেশন যে মৃত্যু উনাকে ঘিরে নিলো।

বাবা – তা সেই পদ্ম উনি এনেছিলেন?

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ, আমি উনাকে সেই নালের রস খাইয়ে দিয়েছিলাম। যদি সেই মাকড়সার রস উনার গায়ে লেগেও থাকে, তবে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছিল।

বাবা – আচ্ছা, স্যামুয়েলও কি সেই জঙ্গলে গেছিল?

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ, ... ডক্টর ভুঁইয়া সেখান থেকে ফিরে আসার পরে পরেই গেছিল । আমি সেরেনাকেও বলে দিয়েছিলাম এই পদ্মের কথা। আশা করি, সেও নিশ্চয়ই তার বাবাকে সেই কথা বলেছিল। কিন্তু পরে তো শুনলাম, সেই মাকড়শার রসেই ওর মৃত্যু হয়।

বাবা – হুম, আচ্ছা এক মাস মত সময় লাগে না, ... মানে এই বিষের জন্য একটা মানুষের মৃত্যু হতে একমাস লাগে না!

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ যদি একটা মাকড়সার কামড় লাগে তবে। ... যদি একাধিক মাকড়শা, মানে এই ধরো ১০টা মত মাকড়শার রস একবারে লাগে, তবে ২ দিনের মধ্যে সেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। ... তবে সেই সম্ভাবনা কম।

বাবা – কেন?

মিসেস ভুঁইয়া – কারণ এই মাকড়সাগুলি একা একা থাকে; ওরা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা পছন্দ করেনা। ... আর প্রচণ্ড স্বার্থপর ওরা। মানে ওদেরকে কেউ যদি আক্রমণও করে, ওরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাল্টা আক্রমণ করেনা। ওটা ওদের স্বভাব বিরুদ্ধ।

বাবা – হুম বুঝলাম, আপনার কাছে তো একটিই এমন মাকড়শা আছে। তাই না!

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ, আমি ওদের আয়ু দেখতে চাই আসলে। শুনেছি, জাকার্তার দ্বীপপুঞ্জের সামান্য কীটও মানুষের চেয়েও বেশি বাঁচে। সেটা দেখার জন্যই একটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। ...

বাবা – এখন ওর এই শিশিতে যা বিষ রয়েছে, সেটা কি পুরোপুরি ভাবে কেউ পান করে, তবুও একমাস সময় লাগবে কারুর মরতে!

মিসেস ভুঁইয়া – না, একদমই নয়। প্রতিদিন তিন ড্রপ করে বিষ দেয় ও। একটি বিষের ড্রপ ৭দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। তারপর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় আপনাআপনিই। ... এখন যেই বিষ রয়েছে ওর শিশিতে, তা প্রায় ৭দিন পুরনো। মানে উনার মৃত্যুর আগের দিন বোধহয়, আমি পরিষ্কার করেছিলাম। আমি প্রায়ই বিষ খালি করে দিই। ... আর যাতে সেই বিষে অন্য জীবের ক্ষতি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটা ব্লিচিং, বেকিং সোডা আর চুন দিয়ে পেস্ট তৈরি করে, তাতে এলোভেরার জেল দিয়ে পাতলা করে, বিষের উপর প্রয়োগ করি। তাতে বিষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়না ঠিকই, তবে সেটা আর তখন বিষ থাকেনা, মানে সেই বিষের ফলে একটি পিঁপড়েও আঘাতপ্রাপ্ত হয়না। ...

বাবা – এই যে ১০ দিনের বিষ, এটা যদি কারুকে দেওয়া হয়, কেমন এফেক্ট হবে?

মিসেস ভুঁইয়া – আজ রাতে দিলে, কাল সকালের মধ্যে মারা যাবেন উনি।

বাবা – হুম, কি নাম এই বিষের?

মিসেস ভুঁইয়া – সেল ডিভিশন হয়, তাই নাম দিয়েছি সেলডিভ।

বাবা – নামটা কি আপনিই দিয়েছেন?

মিসেস ভুঁইয়া – না, নামটা স্যামুয়েল দিয়েছিল। মানে আমিই যখন এই মাকড়শাটা কালেক্ট করেছিলাম, তখনও স্যামুয়েলের সাথে আমার সাখ্যাত হয়নি। ... তার প্রায় এক বছর পর আমার স্যামুয়েলের সাথে আলাপ হয়। এই যত নাম দেখছো সমস্ত পোকার, সমস্ত নাম, স্যামুয়েলই দিয়েছিল, ওদের গুনাগুণ অনুসারে।

বাবা – ঠিক আছে, আজকে আসি তাহলে। ... প্রয়োজনে কেবল নয়, অপ্রয়োজনেও মাঝে মাঝে চলে আসবো আপনার কাছে। আপনি শুনেছি অসাধারণ মোঘলাই রান্না পারেন!

মিসেস ভুঁইয়া হেসে উঠে – নিশ্চয়ই সেরেনা বলেছে। ... ওই আর কি। ... তবে হ্যাঁ, খেতে বেশ ভালো হয়; আমার একটা বাংলাদেশী জুনিয়ারের দিদির থেকে এই সব রান্না শিখেছি। ... একদিন সস্ত্রীক আসুন, সঙ্গে আপনার বিদিপ্তাদিকেও আনুন না; সবাই মিলে মোঘলাই খাবো; সেরেনাকেও ডেকে নেব। মেয়েটা মোঘলাই খেতে একটু বেশিই ভালোবাসে।

আমরা সেদিন চলে এলাম সেখান থেকে। আর এসে পর্যন্ত বাবাকে দেখলাম ফেসবুক পেজ নিয়ে বসে রয়েছেন। ... নিজের ফেসবুকও এতক্ষণ করেননি, যতখানি ওই ডক্টর ফ্লেমিংএর ফেসবুক ঘাঁটলেন। একটু যে কিছু প্রশ্ন করবো, সেই উপায়ও নেই। মুখই তোলেন না ফোনের থেকে। সর্বক্ষণ চার্জে বসিয়ে ফেসবুক দেখে যাচ্ছেন।

গোপন ডায়রি

আজকে বাবা তিনদিন পর, এই প্রথম ফেসবুক থেকে মুখ তুললেন। কাছে বসে প্রশ্ন করলাম – কি বুঝলে বাবা? কিছু কি রহস্য আছে কেসটায়?

বাবা – হুম আছে। ... একটা ডায়রি আছে, ডক্টর ভুঁইয়ার। সেই ডায়রির মধ্যে কি আছে, তা তো জানিনা; তবে হ্যাঁ সেই ডায়রির উপর স্যামুয়েলের নজর ছিল, আরো অনেকেরই নজর ছিল; কিন্তু স্যামুয়েল যেন ডেস্পারেট ছিল ওই ডায়রিটা নেবার ব্যাপারে। প্রায় ৫টা বড় বড় বার্তালাপ রয়েছে স্যামুয়েলের সাথে ডক্টর ভুঁইয়ার, আর সমস্ত কনভারসেশনের বিষয়বস্তু হলো সেই ডায়রি। ... শুধু তাই নয়, যখন স্যামুয়েল

দেখলো ডক্টর ভুঁইয়া সেই ডায়রি কিছুতেই দিতে রাজি নন, তখন উনার ছেলে মানে প্রিয়মের সাথেও যোগাযোগ করেন। আর কনভারসেশন পড়ে আমার যা মনে হলো, সেটা যদি সত্যি হয়, তবে স্যামুয়েল ইন্ডিয়াতে এসেইছিলো প্রিয়মের সাথে দেখা করতে, আর সেটা যদি সত্য হয়, তবে আমার অনুমান যে প্রিয়ম ওই ডায়রিটা হাতিয়ে স্যামুয়েলকে দেয়, আর হতে পারে যে সেই যে আমেরিকা যাবার টাকা যোগার হয় প্রিয়মের, সেই টাকা স্যামুয়েলই ওকে দেয়, ডায়রি পাচারের পারিশ্রমিক হিসাবে।

আমি – তাহলে আমাদের এবার করনিয় কি?

বাবা – মিসেস ভুঁইয়ার কাছে আরেকবার যেতে হবে, সেই ডায়রির সন্ধানে। মাইট বি, ডায়রিটা উনি খুঁজবেন কিন্তু পাবেন না। যদি না পান, তবে আমাদের তদন্তের দিশাটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে; আর যদি পেয়েও যান, তবে তো তদন্ত অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

আমি – আর সেলডিভ?

বাবা – হুম, সেটা যে জঙ্গল থেকে আসেনি, এমনটাই মনে হচ্ছে। ... এখান থেকে সেটা দেওয়া হলে, একটাই জায়গা পরে রয়েছে, আর তা হলো মিসেস ভুঁইয়ার কালেকশন। কিন্তু সেটা ব্যবহার করলো কে? মিসেস ভুঁইয়া নিজেই? ... হতে পারে। স্যামুয়েল যে উনাকে কনো না কনো ভাবে ব্যবহার করেছে, সেটা স্পষ্ট উনার কথা থেকে। আর ভারতে তিনি এসেছেন, সেটাও উনি জানতেন। আর নিজের কাছেই সেই বিষ রয়েছে। উনি জানেন স্যামুয়েল সেই জঙ্গলে গেছিলেন কিছুদিন আগেই, আর তাই সেই মারণঅস্ত্র স্যামুয়েলের উপর প্রয়োগ করে, তাঁর হত্যা করে, প্রতিশোধ নিলেন। ... হুম, এটা হবার সম্ভাবনা তো খুবই প্রবল। আর যদি এটা না হয়, তবে ব্যাপারটা আরো অনেক জটিল হয়ে যায়। কে হাতালো তবে বিষটা, এই প্রশ্ন এসে যায়। ... উনার ছেলে, প্রিয়ম! ... টাকা হাতিয়ে নেবার জন্য এই বিষপ্রয়োগ, আর বিষপ্রয়োগ করে বিষের এফেক্টে মৃত্যু হবার আগেই, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া! ... নাকি ডক্টর ভুঁইয়া, স্যামুয়েল উনার স্ত্রীকে ব্যবহার করেছিলেন; সেটা উনি হয়তো জানতেন। আর একবার হাতের নাগালে পেয়ে, তিনি এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। ...

আমি – তাহলে উনার মৃত্যু!

বাবা – অনুশোচনায় আত্মঘাতী! নাকি খুন! ... সেরেনা বলল, ডক্টর ভুঁইয়ার মৃত্যুর দিন, উনার বাড়িতে বিরিয়ানি হয়েছিল। ... সকলে সেখানেই ছিল, উনি মারা গেলেন। ডাকতে গিয়ে জানা গেল ... উমম, তারমানে নিশ্চয়ই বিরিয়ানিটা খাওয়া হয়নি, ফেলে দেওয়া হয়েছে! ... ওই এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে আবর্জনা তো কালেক্ট করাই হয়। ... একবার ওদের সাথে কথা বলতে হবে। ... চল একটু বেরোই;

প্রথমে হিডকো অফিসে যাবো, দেখি বিরিয়ানি কপালে জোটে কিনা। ... তারপর সেখান থেকে মিসেস ভুঁইয়ার কাছে যাবো।

আমরা গেলাম হিডকো অফিস, নিউটাউন। সময় বিস্তর লাগলো। আমাদের ধারনাও তেমনই ছিল । তাই একটু ভাতেপুতভাত খেয়ে বেরিয়েছিলাম। প্রথম তো সেই লোকগুলোকে খুঁজে বার করা, যারা ডক্টর ভুঁইয়ার এলাকায় নোংরা তোলেন, তারপর তাদের খুঁজে বার করা, যারা সেইদিন আর তারপরের দিন ওখান থেকে নোংরা তুলেছিল; আর অবশেষে তাদের মনে করার অপেক্ষা। যাই হোক, তাদের মনে পরলো অবশেষে। তাদের একজন বলে উঠলো, হ্যাঁ, উনাদের বাড়ি, যেখানে মৃতদেহ ছিল, আর পুলিশ ছিল, সেই বাড়ির ডাস্টবিনে প্রচুর বিরিয়ানি ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

অর্থাৎ, সেরেনা সত্যিকথা বলেছিল। জানিনা আমার মাথায় কি খেললো সেই সময়ে, আমি বাবাকে বললাম। আচ্ছা বাবা, একবার নভোটেলে গিয়ে, ডক্টর স্যামুয়েল ফ্লেমিং যেই কয়দিন ওখানে ছিল, উনার সাথে কে কে দেখা করতে এসেছিল, তাদের তালিকা বার করলে কেমন হয়!

বাবা – উমম, মন্দ হয়না। চল তাহলে একবার ওখান হয়ে, এক্সিস মল থেকে কিছু খেয়ে, তারপর না হয় মিসেস ভুঁইয়ার কাছে যাওয়া যাক।

আমরা এবার গেলাম নভোটেল। তালিকাও পেলাম। তালিকায় তিনবার এসেছিলেন প্রিয়ম ভুঁইয়া; আর একবার একবার করে এসেছিলেন ডক্টর পবিত্র গোমস, আর ডক্টর মনিন্দ্র ঝাঁ। বাবা একটু খবর লাগালেন জিএসআইতে। উনার অনুমানই ঠিক। এঁরা দুইজনেই জিএসাইএর লোক। আর এঁদের একজনের ফ্ল্যাট, নিউটাউনেই; অন্যজন থাকেন টালিগঞ্জ। বাবা দুইজনের নম্বর যোগার করলেন ট্রুকলার থেকে, আর ফোন লাগালেন দুইজনকেই। দুজনেরই এক কথা । ডক্টর স্যামুয়েল উনাদের বলেছিলেন, উনি ইন্ডিয়াতে এসে একটা এক্সপিডিশনের প্ল্যান বানাবেন, আর সেটার খবরাখবর নিতেই, উনারা ডক্টর স্যাম্যেল ফ্লেমিংএর সাথে দেখা করেন, কিন্তু প্ল্যান ডিলে হয়। শেষ উনাদের সাথে ফোনে কথা হয়, আর স্যামুয়েল বলে যে দুইদিনের মধ্যে উনি রুটম্যাপ তৈরি করে, উনাদের ডাকবেন। কিন্তু তার কাগেই উনার মৃত্যু হয়ে যায়।

বাবা প্রশ্ন করলেন – ডক্টর স্যামুয়েলের সাথে উনারা যখন দেখা করেছিলেন, তখন উনাকে কি অসুস্থ দেখাচ্ছিল!

উনাদের উত্তর – না, একদমই নয়। বরাবরের মতই ফিট, ফাইন আর এনারজেটিক।

বাবা উনাদের অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলেন। এবার আমরা গেলাম মিসেস ভুঁইয়ার কাছে। ঘরের বেল বাজাতে, ড্রাইভার বেরিয়ে এলেন। আমাদেরকে উনি চেনেন; গতকালই আমাদেরকে দেখেছেন। তাই কথা না বারিয়ে মিসেস ভুঁইয়াকে ডেকেদিলেন।

মিসেস ভুঁইয়া আগের দিন চশমা পরে ছিলেননা। আজকে চশমা পরে এলেন। বাবা বললেন — অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম, তাই না! ... কিছু পড়াশুনা করছিলেন নিশ্চয়ই!

মিসেস ভুঁইয়া – ও কিছু না। আমার পুরনো এক্সপিডিশনের ডায়রিগুলো ঘাঁটছিলাম। সময় কাটেনা এখন একদমই। তাই ভাবছিলাম, অগুলোর উপর একটা করে এডভেঞ্চার স্টোরি লিখবো। নিজের নাম না করে, নিজেকে নিয়েই না হয় লেখা যাবে। প্রচুর অভিজ্ঞতা। প্রকৃতিকে চেনার অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার; যদি কনো প্রকৃতিপ্রেমীর কাজে লাগে এইসব, সেই জন্য আর কি। ... তা বলো বিজয়, আমার থেকে কি কনো সাহায্য লাগবে!

বাবা – হ্যাঁ, সাহায্য লাগবে। আসলে আমার একটা ডক্টর ভুঁইয়ার ডায়রি লাগতো। ... মানে একটা পার্টিকুলার ট্রিপের ডায়রি। ... কিন্তু কথা হচ্ছে যে, কোন পার্টিকুলার ট্রিপের ডায়রি, সেটা আমার জানা নেই।

মিসেস ভুঁইয়া – উনি ডায়রি লিখতেন না। একটাই ট্রিপের ডায়রি লিখেছিলেন। ... সেটাই হবে নিশ্চয়।

বাবা – আচ্ছা, উনি লিখতেন না ডায়রি! ... ওই একটাই!

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ, ওই একটাই। ... ডায়রিটা জাকার্তার ফরেস্ট অভিযান নিয়ে। কি আছে ভিতরে আমি জানিনা; তবে হ্যাঁ, মৃত্যুর আগের দিন থেকে উনি ওটা নিয়ে বারবার উল্টেপাল্টে দেখতে থাকছিলেন। আর সব থেকে বড় কথা, উনার দেহ যখন সিলিং থেকে ঝুলন্ত পাই আমরা, তখন ওই ডায়রির বিভিন্ন পাতাকে দেখি ঘরের মধ্যে এলোপাথাড়ি ভাবে ছিঁড়ে ছড়ানো হয়েছে। ... আমি পুলিশকেও সেই কথা বলেছিলাম। পুলিশ খুব একটা গা করেনি ব্যাপারটায়।

বাবা – আচ্ছা ওই ডায়রিটাকি আমাকে একটু দেওয়া যাবে!

মিসেস ভুঁইয়া – হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেওয়া যাবে, তবে বিজয় তোমাকে ডায়রির পাতাগুলো নিজেকে এরেঞ্জ করে নিতে হবে। সব পাতাই আশা করি ওতে আছে, যদি উনি কনোপাতাকে ড্যামেজ না করে ফেলেন তো,

কিন্তু এদিক সেদিক ছিঁড়ে ছড়িয়ে রাখার জন্য, আমি সমস্ত পাতাকে একসঙ্গে তো রেখেছি, কিন্তু সেটা পাতা অনুযায়ী সাজানোর কথা আমার আর মনে ছিলনা।

বাবা – ঠিক আছে, সে আমি করে নেব। আপনি আমাকে ডায়রিটা একটু দিন।

আমাদের বসিয়ে রেখে মিসেস ভুঁইয়া ভিতরে গেলেন; আর মিনিট দুইয়ের মধ্যেই চলে এলেন। এসে বাবার হাতে একটা ডায়রির কভার, আর ভিতরে প্রচুর পাতা যা ডায়রির থেকে ছেরা হয়েছে, সেটা দিলেন। বেশ কিছু পাতার মাঝখান থেকেও ছেঁড়া হয়েছে, আবার এলোমেলো ভাবেও। আর পাতাগুলোর অবস্থা যেরকম দেখলাম, তার থেকে এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, ডায়রির উপর বেশ বল প্রয়োগ করেই ছেঁড়াছেরিটা হয়েছে, মানে শান্ত মনে ছেঁড়া নয়, বিরক্তি বা হিংস্রতার সাথে ছেঁড়া হয়েছে পাতাগুলো।

বাবা কথা বাড়ালেন না। মিসেস ভুঁইয়া বললেন – আজ অন্তত একটু চা খেয়ে যাও বিজয়।

বাবা হেসে বললেন – আজ নয়, তবে শীঘ্রই কেসের সমাধান করে নিয়ে, খাবো। আজ আসি!

আমরা আমাদের গাড়ি করে এবার বাড়ির পথে রওনা দিলাম। বাড়িতে এসে, আমাদের প্রথম কাজ হলো ডায়রির পাতাগুলোকে ঠিক ভাবে এরেঞ্জ করা। প্রায় একটা গোটা দিন লেগে গেল, সেই কাজে। পরের দিন বেলা ১১টায় গিয়ে সমস্ত গোছান শেষ হলো। আমি এরই মধ্যে বাবাকে বললাম – কেউ এই ডায়রির উপর প্রচণ্ড আক্রোশ খাটিয়েছে, দেখে বুঝতে পারছো!

বাবা – হুম, আর শুধু, তাই নয়; সম্প্রতি এই ডায়রির জেরক্সও করা হয়েছে।

আমি – সেটা কি করে বুঝলে?

বাবা – ডায়রির বেশ কিছু পাতা ভাঁজ করা ছিল; সেটা ভাঁজ করাও হতে পারে, আবার ভাঁজ পরেও যেতে পারে। কিন্তু মোট কথা, ভাঁজ ছিল, আর অনেকদিন ধরে ছিল। ... এই দ্যাখ (আমাকে একটি পাতা দেখালেন) ... আর দ্যাখ, সেই পাতাগুলোর ভাঁজ খোলা হয়েছে, যাতে যেই লেখাগুলো ভাঁজের জন্য চেপে যাচ্ছিল, সেটা দেখা যায়। ... আর সেই ভাঁজ খোলার পর, সেই ভাঁজের জায়গায় কিছুদিয়ে চাপও দেওয়া হয়েছে। যেটা জেরক্স মেশিনের গ্লাস ক্লোজারটা ছাড়া অন্য কিছু নয় । ... অর্থাৎ সম্প্রতি, এই ডায়রির জেরক্স করা হয়েছে।

আমি – কিন্তু কে?

বাবা – প্রিয়ম বা সাবিত্রীদেবী হতে পারে; আবার যদি এই ডায়রিটা একদিনের জন্য স্যামুয়েলকে দেওয়া হয়, সেও এর একটা কপি করে রাখার জন্য, এমনটা করতে পারে।

আমি – সাবিত্রীদেবী!

বাবা – হুম, যদি ডক্টর ভুঁইয়া সাবিত্রীদেবীর কথাকে কপি করেন, তবে এটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে; কিন্তু যদি মিসেস ভুঁইয়া এই মিথ্যে কথাটা বলেন, ডক্টর ভুঁইয়া অনুপস্থিত বলে, তবে তো হতেই পারে! ...

আমি – হুম, অর্থাৎ ডায়রিটা পড়তে হবে, নাহলে বোঝা যাবেনা।

বাবা – একজ্যাক্টলি। তা শুরু করি এবার পড়া!

বাবার পড়া শুরু মানে, আমাকে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমি চলে গেলাম। বাবা একটা রাত্রি নিলেন ডায়রি পড়া শেষ করতে। পরের দিন সকালে বাবার মুখের ভাবে শুধুই স্তব্ধতা। আমি কাছে গিয়ে বললাম – সিরিয়াস কিছু বাবা!

মা হাঁক দিলেন – উমম, বিরক্ত করছিস কেন? উনি কেসটা মাথায় সাজাচ্ছেন তো!

আমি এটা কিছুতেই বুঝিনা। বুঝিনা বললেও ভুল হবে, মানতে পারিনা যে, বাবা কিছু না বললেও, মা সমস্ত কিছু বুঝে যান। কি করে? আমাকে তো বাবা মুখে বললেও বুঝিনা, মা ... বিদিপ্তাদি আগে আমাকে পেলিংএ যেই কথা গুলো বলেছিলেন, সেটা মনে পরে গেল। তাই চুপ করে গেলাম।

বাবা প্রায় আধাঘণ্টা জিন্দা লাশের মত পরে রইলেন। তারপর একবার মিসেস ভুঁইয়াকে বাবা ফোন দিলেন – হ্যালো, সাবিত্রীদি! ... হ্যাঁ, একটা ইনফরমেশন লাগতো। ... হ্যাঁ বলছি, যেদিন ডক্টর ভুঁইয়া আত্মহত্যা করলেন, তার আগের দিন কি আপনি কোথাও বেরিয়েছিলেন?

উত্তর বোধহয় হ্যাঁ এসেছিল, তাই বাবা বললেন – আচ্ছা আপনি বাড়ি ফিরে কি দেখেন যে সেরেনো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে! ...

এবারো মনে হয় উত্তর হ্যাঁ-ই আসে। তাই বাবা উত্তরে বললেন – লাস্ট। ... আচ্ছা আপনি ফিরে আসার পর থেকে আপনার স্বামীর সাথে বসে কথা বলেছেন?

উত্তর কি আসে এবার জানতে পারিনা। বাবা বললেন – ঠিক আছে, একবার সেরেনাকে আপনি এখনই আপনার বাড়িতে ডেকে নিন প্লিজ। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছি। ধরে নিন, এই এক ঘণ্টার মধ্যে। ... সেরেনা কি তারমধ্যে আসতে পারবে? ... ওকে থ্যাংকস। আমরা যাচ্ছি।

বাবা ফোন রেখে দিলেন। আমি বললাম – সেরেনা চলে আসছে?

বাবা – হ্যাঁ, সাবিত্রীদি বললেন, উনি ডাকলে ১৫ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। হাতে কনো কাজ থাকলে, সেটা ফেলে আসবে। ... চল রেডি হয়ে নে। ... বেরবো।

বাবার এবারের কীর্তি আরো অবাক করলো আমাকে। বিদিপ্তাদির কাছে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে বাবা বললেন – দিদি, পাপীকে শাস্তি দিলে, যে শাস্তি দিলো, সে কি দোষী হয়!

বিদিপ্তাদি – যদি পাপী আমার সাথে পাপাচার করে, তবে তাকে যদি আমিই শাস্তি দিই, তা দোষ ও অপরাধও। কিন্তু যদি সেই পাপী এমন কারুর সাথে পাপাচার করে, যিনি সাখ্যাতে শাস্তি দেবেন না, বা সমাজ তাঁর কর্মকে পাপাচার মানবে না, তখন তাকে শাস্তি দেওয়া আমাদের পরমকর্তব্য ও ধর্মও।

বাবা হেসে বললেন – আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। আসছি দিদি। মধু আসছি।

মায়ের কাছে আমি গিয়ে বললাম – কিছু বুঝলে?

মা হেসে বললেন – একজন যিনি সমাজের চোখে অপরাধী, তাঁকে বাঁচাতে যাচ্ছেন তোর বাবা। যা, উনার সঙ্গে যা।

নিউটাউনে

বাবা আর আমি এসে পৌঁছলাম মিসেস ভুঁইয়ার বাড়িতে। গাড়ি পার্ক করে, ডক্টর ভুঁইয়ার ডায়রি নিয়ে আমরা ঢুকলাম বাড়িতে। বাড়ির ড্রাইভার এবার বোধহয় জানতোই যে আমরা আসবো। তাই অপেক্ষাতেই ছিলেন। আমরা যেতেই দরজা খুলে দিলেন। বাবা সরাসরি বসার ঘরে চলে গিয়ে বললেন – সাবিত্রীদি, সেরেনা; ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড; আমি আপনাদের এখানে কিছু সিক্রেট কথা বলবো বলে ডেকেছি। যদি আপনারা আমাদের সাথে আমাদের গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসেন। ... মানে দেওয়ালেরও কান আছে তো, তাই দেওয়ালকেও এইক্ষেত্রে আমি ভরসা করতে পারছিনা।

মিসেস ভুঁইয়া আর সেরেনা আমাদের পিছনে পিছনে আমাদের গাড়িতে উঠলেন। বাবা গাড়ির সমস্ত কাঁচ বন্ধ করে দিয়ে, গাড়ির এসিটা চালিয়ে দিলেন। এতক্ষণ লক্ষ করিনি; সেরেনার দৃষ্টি যেন প্রখর ভাবে বাবার হাতে। খেয়াল করলাম যখন বাবাই বললেন – কি হলো সেরেনা, এই ডায়রিটা দেখে, এতো রাগ জন্মাচ্ছে কেন?

বাবা কথাটা বাংলায় বললেন। আর অবাক করা উত্তরটাও বাংলাতেই এলো । সেরেনা বলল – না তেমন কিছু নয়।

বাবা – তাহলে বাংলা তুমি বেশ ভালোই জানো, তাই না সেরেনা! ... আর জানবে নাই বা কেন? তোমার বাঙালি মায়ের কাছেই তো তুমি বেশি সময়টা কাটিয়েছে। কি ভুল বললাম!

মিসেস ভুঁইয়া এই কথায় মাথা নামিয়ে নিলেন। বাবা তাই উনার দিকে তাকিয়ে বললেন – লজ্জা পাবার মত আপনি এমন কনো কাজ করেন নি, সাবিত্রীদি। ... আপনি অবিবাহিত থেকেও যেই সন্তানকে গর্ভে এনেছিলেন, তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে থেকেও নষ্ট তো করেনই নি, উপরন্তু, সর্বক্ষণ তাঁর দেখভাল করেছেন। তাঁকে স্নেহ দিয়েছেন, আর তাঁকে উপযুক্তও করে তুলেছেন। ...

সেরেনা একটু অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল; তাই বাবা ওকে বললেন – মুখের মিল সেরেনা। ... হ্যাঁ তুমি একটা কথাও মিথ্যে বলো নি। ... তোমার বাবা তোমাকে অফিসিয়ালি দত্তক নেন নি। একজন অসহায় স্ত্রীর সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন। আর সেই অসহায় স্ত্রীটি হলেন তোমার মা, অর্থাৎ মিসেস সাবিত্রী ভুঁইয়া। ... কি তাই তো?

সেরেনা কিছু বলতে গেলে, বাবা ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন – তুমি কিছু বলার আগে, আরো কিছু বলার আছে সেরেনা। তুমি যেমন তোমার মায়ের পরিচয় মায়ের থেকেই জেনেছিলে, তেমন তোমার বাবার পরিচয়ও তোমার মায়ের থেকেই জেনেছিলে। তাই তো? আর তোমার বায়োলজিক্যাল ফাদারের নামও তোমার দত্তক পিতাই, অর্থাৎ স্যামুয়েল ফ্লেমিং। ... ঠিক বললাম?

সেরেনা – বাট, আপনি কি করে?

বাবা – ওই যে বললাম মুখের মিল, তোমার ঘরে তোমার বাবার মুখের ছবি দেখে, আর সাবিত্রীদেবীকে দেখে, একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় আমার কাছে; সেরেনা তোমার মুখের গঠনটি মায়ের মত, আর চোখমুখ বাবার মত। ... তা বাবার পরিচয় তো অনেকদিনই পেয়েছিলে। এখন উনার খুন করলে কেন?

মিসেস সাবিত্রী – কি বলছো বিজয়, সেরেনা খুন করতে পারেনা!

বাবা – ঠিকই বলছেন,পারেনা, কিন্তু পেরেছে। বাবা আসছে, আর কি কারণে আসছে জেনেই, আপনার সেলডিভ-এর শিশি থেকে ও বিষ চুরি করেছিল। সাতদিন – দশদিন পরপর আোপনি বিষ খালি করেন, তাই না! ... তা দিদি, আপনি শেষ যখন বিষ খালি করতে গেছিলেন, কিছু পেয়েছিলেন? না। কিছু পান নি!

মিসেস ভুঁইয়া – আসলে!

বাবা – কিচ্ছু পাননি আপনি। আর তাই আমাকে বলার সময়ে, আপনার মনে পরছিল না যে কতদিন আগে তা ডিস্পোস করেছিলেন। ... সত্ত্বর তো করেন নি, কিন্তু বিষ পাননি। ... তাই আপনি ভেবেও নিয়েছিলেন যে মাকড়শাটা বোধহয় মরে গেছে। ফেলে দেবেন ভেবেওছিলেন, কিন্তু আপনার স্বামী তার মধ্যে মারা যান। আর আমার সাথে সেদিন কথা বলতে গিয়ে আপনার মনে পরে যে মাকড়সাটাকে তো ফেলা হয়নি! ... কিন্তু শিশির দিকে তাকিয়ে, আপনি চমকে গেছিলেন, কারণ বিষ জমা হচ্ছিল, অর্থাৎ মাকড়সা তখনও মরেনি। ... আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আমি সেদিন পরেছিলাম সাবিত্রীদি। ... কিন্তু ব্যাপারটা এই যে, আপনি সত্যিই বড্ড সরল। কিন্তু আপনার মেয়ে আপনার মত হলেও, বাপের থেকে জটিলতাও খানিকটা পেয়েছে; তাই ও শত্রু চিনতে পারে, যেটা আপনি পারেন না বলে, একবার নয়, দুদুবার আপনি প্রতারণার স্বীকার হয়েছেন। প্রথমবার, অবিবাহিত অবস্থায়, ডক্টর স্যামুয়েল ফ্লেমিংএর সন্তান গর্ভে লাভ করেছিলেন, যিনিই আপনার এই সুকন্যা সেরেনা ফ্লেমিং। আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, আপনি আরো বড় বিপাকে পরেন।

বাবা বলতে থাকলেন – অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেন আপনি তখন; সেখানে সিঙ্গিল মাদার হওয়া যায়, তাতে আইনগত ভাবে কনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি আপনি যে ভুলতে পারেন নি; তাই আপনি ডেস্পারেটলি আপনার সন্তানের মাতাও যেমন হতে চেয়েছিলেন, তেমনই সে তার পিতাকে পাক, সেটাও চেয়েছিলেন। কিন্তু এমন অবস্থায় ডক্টর ফ্লেমিং আপনার দায়িত্ব নিতে রাজি হন না, কারণটাও খুবই স্পষ্ট। আপনি সুন্দরী, এবং অত্যন্ত বিশেষ ভাবে প্রকৃতিপ্রেমী; কিন্তু আপনি একজন মনপ্রাণ থেকে ভারতীয়; আর সত্য বলতে ভারতীয় মানসিকতাকে, বিশেষ করে বাঙালি মানসিকতাকে সারা পৃথিবীর মানুষ ব্যবহার করতে তো পছন্দ করে, কিন্তু গ্রহণ করতে নয়। অন্যদিকে, ডক্টর ভুঁইয়াও একই সাথে আপনার সৌন্দর্যের উপভোগকামী হয়ে ওঠেন, আর সাথে সাথে, উনার যে স্বপ্ন ছিল, তাতে আপনার প্রকৃতিপ্রেম ও জ্ঞান যে ভয়ানক ভাবে সহায়ক হবে, তাও তিনি আন্দাজ করে নেন।

তাই, উনি আপনাকে বিবাহ করতে চাইলেন, কিন্তু আপনার গর্ভে যেই ফ্লেমিং-সন্তান ছিল, তাঁকে তিনি গ্রহণ করতে রাজি হননা। এমন অবস্থায়, এক দায়িত্ববান মায়ের যা ভূমিকা, আপনি সেটাই পালন করলেন। ডক্টর ফ্লেমিং আপনার দায় নিতে না চাইলেও, আপনার গর্ভে যে উনারই সন্তান ছিল, তাঁর দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হন। আর তাই, আপনি সেরেনার জন্ম দিয়ে, ডক্টর ফ্লেমিংকেই সেই সন্তানের দত্তকপিতা করে সরকারি ভাবে হ্যান্ডওভার করলেন। আর আপনার সাথে সন্তান না থাকার কারণে, ডক্টর ভুঁইয়াও আপনাকে বিবাহ করলেন।

একটু হেসে বাবা আবার বললেন — আপনি অত্যন্ত সরল, তাই ভেবে নিয়েছিলেন যে ডক্টর ভুঁইয়া আপনাকে ভালোবাসেন, তাই আপনাকে বিবাহ করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর, যখন আপনি আবার গর্ভবতী হন, অর্থাৎ আপনার গর্ভে যখন আপনার পুত্রসন্তান প্রিয়ম ছিল, তখন থেকেই আপনি ডক্টর ভুঁইয়ার আপনাকে বিবাহ করার আসল উদ্দেশ্য জানতে পারেন। আপনি জানতে পারেন যে, ডক্টর ভুঁইয়া একজন ভূতাত্ত্বিক হলেও, তিনি প্রকৃতিকে প্রেম করেন বলে সেই পেশায় যাননি, উপরন্তু উনি একটি গুপ্তধনের সন্ধানে এই পেশা গ্রহণ করেন, কারণ একমাত্র ভূতাত্ত্বিকের পক্ষেই কনো গুপ্তধন উদ্ধার সম্ভব।

আপনার থেকে প্রকৃতির বিজ্ঞানকে ডক্টর ভুঁইয়া অসম্ভব ভাবে রপ্ত করতে থাকেন, আর ইতিমধ্যেই আপনার থেকে জাকার্তার কাছে একটি অজানা দ্বীপে যে গুপ্তধন আছে, সেই খবরও উনি লাভ করেন। তখন ডক্টর ভুঁইয়া আর আপনি, আপনাদের পুত্রসন্তানকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতেই বসবাস করতেন। আর সেরেনা আপনার অত্যন্ত প্রিয়, একই সাথে আপনিই সেরেনার একমাত্র প্রিয় ব্যক্তিত্ব। সেরেনা যে আপনারই কন্যা, সেটা আপনি জানতেন, আর সেরেনার বাবাও জানতেন। সেরেনা আপনার কাছে থাকতে, আপনার সাথে বাংলায় কথা বলতে, এবং বয়স বারার সাথে সাথে, আপনার থেকে প্রকৃতিজ্ঞান অর্জন করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন। কিন্তু সে আপনার কাছে আসুক, সেটা ডক্টর ফ্লেমিংএর পছন্দ ছিলনা।

কারণটা খুবই স্পষ্ট। আপনি একজন প্রকৃতিপ্রেমী; আর ডক্টর ফ্লেমিং একজন ব্যক্তিত্ব যিনি প্রকৃতির জ্ঞানকে নিয়ে বাণিজ্য করাকেই পছন্দ করেন। উনি চাইতেন উনার কন্যা উনারই মত হোক, কিন্তু আপনার কন্যা সেরেনাকে উনি দেখেন, ক্রমশ সে আপনারই মত হতে থাকে। কিন্তু নিয়তি যে সবার থেকে, সব থেকে শক্তিশালী। তাই ডক্টর ফ্লেমিং উনার মেয়েকে আটকাতে পারলেন না। সেরেনা এবার কলেজে পড়তে গেলে, আপনি ওর টিচার হন; আর সেরেনা আপনি ওর মা জেনেও, ওর বাবার কাছে আপনাকে টিচার বলেই স্থাপিত করে; তাই ওর বাবার কনো উপায় ছিলনা মেয়েকে আটকানোর।

অন্যদিকে, ডক্টর ভুঁইয়া খুব ভালো করে উনার একসময়ের সহকর্মী, ডক্টর ফ্লেমিং-এর মানসিকতা জানতেন। উনি জানতেন যে, জাকার্তার সেই দ্বীপে যদি গুপ্তধন আছে, এমন উনি জেনে যান, তবে

উনাকে টক্কর দিয়ে, ডক্টর ফ্লেমিং সেই দ্বীপে গিয়ে সম্পত্তি হাতিয়ে নেবেন। তাই এবার তিনি দেশে ফিরে আসার চিন্তা করেন। আর উনার পরিবার অর্থাৎ আপনাকে ও প্রিয়মকে নিয়ে উনি ভারতে চলে আসেন; এবং জাকার্তার সেই দ্বীপে যাবার পরিকল্পনা করেন।

একটা নিশ্বাস নিয়ে বাবা আবার বললেন – আপনি প্রকৃতিকে নিজের মায়ের সমান প্রেম করেন। আর সেটা ডক্টর ভুঁইয়া খুব ভালো করেই জানতেন। তাই আপনি যে সেই প্রকৃতির সম্পত্তি লুণ্ঠনের সঙ্গ দেবেন না, সেটাও জানতেন। তাই উনি অন্য ভাবে জাকার্তার সেই দ্বীপের একটি অভিযান নিশ্চিত করেন, আর দেখান যেন তাঁকে এই এক্সপিডিশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; আর উনি স্বেচ্ছায় সেখানে যাচ্ছেন না। ... আপনি তাই কনো বাঁধা দিলেন না, আর উনি যাতে সেলডিভ-এর খপ্পরে না পরেন, তার উপায় বলে দিলেন।

সেখানে গিয়ে, উনি আপনার থেকে শোনা ম্যাপ ফলো করে, সেই বিপুল গুপ্তধনের কাছে পৌঁছে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে উনি দেখেন যে প্রচুর সংখ্যক পাইথনের থেকেও বড় সাপ, সেই গুপ্তধনের পাহারাদার। ডক্টর ভুঁইয়া নিজের সমস্ত এক্সপিডিশনে একাধিকবার বন্যপশুদের কারণে বড় বড় বিপদ থেকে বেঁচেছেন। তাই প্রাণীহত্যা তিনি করতে মন থেকে সায় পাননা। আর তাই উনি নিজের সেই এক্সপিডিশন সেখানেই সমাপ্ত করেন। কিন্তু তা করলেও, ছোট থেকে উনি যেই স্বপ্ন দেখে এসেছেন, সেই স্বপ্নকে নিজের চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখে, উনি অনন্ত অবসাদের মধ্যে পরে যান। আর সেই অবসাদের ফলে, উনি উনার পেশাও ছেড়ে দেন; কারণ সেই পেশার উদ্দেশ্যই যে সেই গুপ্তধন লাভ ছিল, আর তা তাঁর কাছে অসম্ভবপ্রাপ্য হয়ে গেল।

পুরানো সঙ্গী, ডক্টর ভুঁইয়ার স্বপ্ন সম্বন্ধে ভালো করেই জানতেন তাঁর একসময়ের সঙ্গী, ডক্টর ফ্লেমিং। আর তাই, আকস্মিক পেশা থেকে রিটায়ার করা, আর অনন্ত ডিপ্রেশনে চলে যাওয়া যে গুপ্তধনের সাথে সংযুক্ত, সেটা ধারনা করে নিতে, ডক্টর ফ্লেমিং-এর খুব একটা অসুবিধা হয়না। আর তাই তিনি নতুন করে ফেসবুকে যোগাযোগ করলেন ডক্টর ভুঁইয়ার সাথে। ... যোগাযোগ আর কথাবার্তা থেকে উনি যা জানলেন, সেই অনুসারে এটাও জেনেগেলেন যে সেই জাকার্তা দ্বীপের সমস্ত মানচিত্র তথা গুপ্তকথাকে, ডক্টর ভুঁইয়া একটি ডায়রিতে লিখে রেখেছেন, কারণ সেটি ডক্টর ভুঁইয়ার কাছে সারা জীবনের স্বপ্নপুড়নের যাত্রা ছিল।

আর তাই সেই ডায়রিটি বারবার পাবার চিন্তা করছিলেন ডক্টর ফ্লেমিং। অন্যদিকে, ডক্টর ভুঁইয়া বুঝে যান যে ফ্লেমিং যদি সেখানে যায়, তবে সেই সাপেদের হত্যা করতে সে একবারও ভাববেনা। তাই কিছুতেই সেই ডায়রি দিতে চান না ডক্টর ভুঁইয়া। ... অন্যদিকে ডক্টর ফ্লেমিং হয়ে ওঠেন নাছোড়বান্দা। উনি কনো কিছু ছাড়াই একবার জাকার্তার সেই দ্বীপে যাত্রা করলেন। মেয়ে সেরেনাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেরেনা সেই সময়ে নিজের পিএইচডি কমপ্লিট করা, আর ন্যাট জিওতে স্বপ্নের কাজ পেয়ে, নিজের

মাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। তাঁর কাছে তাঁর মা, তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিপ্রেমী হওয়া সত্ত্বেও, জীবনের চক্রবাতে বন্দি হয়ে, প্রকৃতি থেকে আজ দূরে। তাই তাঁর স্বপ্নই হয়, তাঁর মাকে আবার প্রকৃতির বুকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাঁর জীবনের সবথেকে প্রিয় মানুষ, তাঁর মা ও তাঁর টিচার ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়ার সর্বক্ষণ সঙ্গলাভ করা।

মেয়েকে সঙ্গে না পেলেও, মেয়েকে জাকার্তা দ্বীপে যাত্রা করার কথা বলার কারণে, মেয়ে আপনার সাথে সেই বিষয়ে কথা বলেন সাবিত্রীদি, আর আপনি সেলডিভের কথা বলেন ওঁকে। ডক্টর ভুঁইয়ার ডায়রি বলছে, সেই জঙ্গলে তেমন কনো বন্যপশু নেই; কিন্তু এই সেলডিভই যেন সেই জঙ্গলের রক্ষক। দিকে দিকে সেই দ্বিপে একটি করে এমন মাকড়সা সমস্ত দ্বিপকে সুরক্ষিত করে রাখে। কিন্তু সেই কথা ডক্টর স্লেমিং জানতেন না। উনি সেই দ্বীপে গেলেন, এবং সেই মাকড়শার কবলেও পরলেন। কিন্তু আপনার থেকে জেনে, উনার মেয়ে সেরেনা উনাকে প্রতিকার বলে দেবার কারণে উনি কনোভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন, আর সিদ্ধান্ত নেন যে কনো না কনো ভাবে ডক্টর ভুঁইয়ার ডায়রি হাতিয়ে নিতে হবে; নিশ্চয়ই সেই ডায়রিতে এমন কনো দিক দিয়ে দ্বীপে ঢোকার কথা বলা আছে, যা তিনি জানেন না।

চৌর্যবৃত্তি আপনার রক্তে নেই, সেটা ডক্টর ফ্লেমিং খুব ভালো করেই জানতেন। তাই আপনার সাথে এমনিও উনি যোগাযোগ রাখতেন না, কারণ উনি চাইতেন না যে উনার কন্যা নিজের আসল মাতৃপরিচয় পান, আর উনি জানতেন না যে সেরেনা সেই পরিচয় অনেক ছোটবেলাতেই পেয়ে গেছে, এবং তাঁর কাছে তাঁর মা-ই তাঁর সমস্ত জগত। যাইহোক, আপনার সাথে উনি যোগাযোগ করতেও চাইছলেন না, আর আপনার সাথে যোগাযোগ করে সেই ডায়রিও পাওয়া যাবেনা, তাই অন্য মাধ্যম খুঁজলেন উনি।

আর সেই মাধ্যম হলেন আপনার ছেলে প্রিয়ম। ফেসবুকে অনেক কথা বলে প্রিয়মের ব্যাপারে সমস্ত জেনে ফেলেন ডক্টর ফ্লেমিং। আর তাই ডক্টর ফ্লেমিং উনাকে আমেরিকা গিয়ে সেটেল হবার সমস্ত পয়সা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন, সর্ত এই যে তাঁকে ওই ডায়রি দিতে হবে। ... সমস্ত প্ল্যান রেডি হলে, ডায়রি নিতে ডক্টর ফ্লেমিং ভারতে এলেন, আর পিছনে পিছনে দুই ভারতীয়কে নিয়ে সেই জাকার্তা দ্বীপের অভিযানও সাজাতে থাকলেন। ... এখানে এসে মেয়ের হোটেলেই উঠলেন। আর প্রিয়ম সেখানে তিনতিনবার যান।

প্রথমবার পরামর্শ করতে, দ্বিতীয়বার অর্ধেক পয়সা নিতে, আর তৃতীয়বার বাকি অর্ধেক পয়সা নিতে এবং ডায়রির জেরক্স কপি দিতে। সেরেনা সেই ডায়রির জেরক্স চুরি করে পড়ে, এবং পরে সেই ডায়রি কারুর হাতে পরলে, প্রকৃতির বিনাশলীলা চলতে পারে, তাই সেই জেরক্সকপি পরে পুরিয়েও দেয়। এই ডায়রি পড়ার পর, তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সাবিত্রীদি, আপনার মত আপনার কন্যাও একজন অনন্য

প্রকৃতিপ্রেমী, কিছুটা আপনার ডিএনএ-র গুণে, আর বাকিটা আপনার তালিমের গুণে। আর সেই ডায়রির জেরক্স পড়ার পর, আমি নিশ্চিত, ওঁর মাথা ঘুরে যায়।

আমিও সেই ডায়রিট পড়েছি, আর তাই জানি যেকোনো প্রকৃত প্রকৃতিপ্রেমীরই সেই ডায়রি পরে মাথা ঘুরে যাবে। সেই ডায়রিতেই হয়তো প্রথমবার আপনার নামের অফুরন্ত সুখ্যাত করা আছে সাবিত্রীদি। আমার বিশ্বাস, সামনাসামনি ডক্টর ভুঁইয়া আপনার কনোদিনই প্রশংসা করেন নি, যদিও আপনার তাতে কনো মাথাব্যাথাই নেই, কারণ আপনি প্রশংসা পাবার জন্য প্রকৃতিকে প্রেম করেন না। কিন্তু সেই ডায়রির প্রথমে আপনার কথাই খালি বলা আছে। আপনার অসম্ভব প্রকৃতির প্রতি প্রেম; আপনার প্রকৃতির সম্বন্ধে অমানুষিক জ্ঞান, এবং প্রকৃতির সংলগ্ন থাকা অবস্থায়, আপনার অদ্ভুত রূপ, যা দেখে মনে হয় যেন আপনি এই প্রকৃতির নিজের সন্তান, সেই সমস্ত কথাই ওই ডায়রির প্রথম দিকে লেখা।

এরপরে যা লেখা তা হলো, উনার ছোটবেলা থেকেই গুপ্তধন লাভের লোভ আর সেই লোভের পূর্তির জন্যই ভূতাত্ত্বিক হয়ে ওঠার কথা। আপনার থেকে জাকার্তা দ্বীপের সম্বন্ধে যা জেনেছেন, তা হলো সেই ডায়রির তৃতীয় অধ্যায়। আর সেই অধ্যায়ের থেকেই একটি ম্যাপ তৈরি করেছেন উনি, যেই ম্যাপ অনুসরণ করে, উনি একটিও সেলডিভ-এর সম্মুখীন না হয়ে, কি ভাবে দ্বীপের ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছে গুপ্তধনের দেখা পেলেন, তা লেখা। আর শেষে সেই গুপ্তধন কারা আগলে রেখেছে, আর তা দেখে উনার নিজের হতাশা আর জীবন বাঁচার ইচ্ছার সমাপ্তির কথা লিখেছেন।

সেরেনা সেই লেখা পরে স্পষ্ট বুঝে যায় যে, ওর বাবা, মানে ডক্টর ফ্লেমিং এবার সেই দ্বীপে গিয়ে, অভিযান চালিয়ে, সেই দ্বীপকে সম্পূর্ণ ভাবে লুণ্ঠন করে, তার উপর আধিপত্য স্থাপন করবে, এবং প্রকৃতির ধ্বংস করবে। তাই সে কনো কথা না বারিয়ে, নিশ্চিত করে নেয় যে এবার ডক্টর ফ্লেমিংকে মরতে হবে। সাবিত্রীদি, আপনার কাছে তো সেরেনা রোজই আসতো। সেদিনকে আপনি যেই সময়টা বাড়ির মধ্যে থাকেন না, এবং একটু বাগানের পরিচর্যা করেন, সেই সময়ে এসে, আপনার সেলডিভের পাত্রে যতটা বিষ ছিল, সেই সমস্তটা কালেক্ট করে নিয়ে চলে যায়, এবং ডক্টর স্যামুয়েলের উপর তা প্রয়োগ করে তাঁর হত্যা করে।

কনো ভাবেই, এটিকে খুন বলা যায়না, বিশেষ করে তখন যখন উনি কিছু দিন আগেই জাকার্তার সেই দ্বীপ থেকে ঘুরে এসেছেন, যেখানে সেলডিভ-এর আখরা, আর সেই সেলডিভের বিষের কারণেই উনার মৃত্যু। তাই সেরেনা কনোভাবেই সন্দেহের তালিকায় আসে না, আর যখন এফবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন সেরেনা আপনার নামকে সম্পূর্ণ ভাবে গোপন করে যায়, আর তাতে অসুবিধাও হয়না, কারণ ডক্টর ফ্লেমিং

আপনার সাথে যোগাযোগ রাখতেন না। সেরেনা জানতো যে কনোভাবে যদি ডক্টর ভুঁইয়ার সাথে এফবিআই যোগাযোগ স্থাপন করে নেয়, তবে আপনার বাড়িতে এসে এই সেলডিভ দেখা মাত্রই, সমস্ত সন্দেহ আপনার উপর চলে যাবে, আর সেরেনা নিজের প্রাণপ্রিয় মাকে কিছুতেই এই ভাবে আক্রান্ত হতে দেবেনা। তাই অতি কৌশলে এফবিয়াই-এর সামনে নিজেকে বাপসোহাগি মেয়ে বলে স্থাপন করে বেঁচে যান।

ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ হয়না সাবিত্রীদি। এর পরপর, সেরেনা কনো না কনো ভাবে ডক্টর ভুঁইয়ার সাথে কথা বলতে চাইছিল। সুযোগ পেতে একটু দেরী হয়। আর সেই সুযোগ ও এমনি এমনি পায়নি। সে আপনাকে বিরিয়ানি খাবার কথা বলে, কারণ ও জানে যে বিরিয়ানির বাজার আপনি নিজে হাতে করেন। তাই যেদিন বিরিয়ানি করবেন বলেন, ঠিক তার আগেরদিন বিকালে, যখন আপনি বাজারে যাবেন বিরিয়ানির যোগার করতে, তখন আপনার বাড়িতে আসেন। ... ড্রাইভার আপনাকে নিয়ে বেরিয়েছেন, তাই বাড়িতে একাকী ডক্টর ভুঁইয়া ছিলেন। ...

সেরেনা এবার উনাকে শাসাতে থাকলেন, এবং সেই কথাকাটাকাটি বেশ গুরুতর হয়ে ওঠে। সম্ভবত সেই কথার থিম ছিলেন আপনি সাবিত্রীদি। আপনি আপনাকে যেই দুই পুরুষ ব্যবহার করে গেছেন, তাঁদেরকে নিজের নির্বুদ্ধিতার দোহাই দিয়ে ক্ষমা করে দিলেও, আপনার কন্যা করেননি। আপনার কন্যা সেদিন আপনার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলেন, আর এই অভিযোগ করেন যে, আপনার ন্যায় এক বিদুষী, যাকে মাথায় করে রাখা উচিত ছিল, তাঁকে ব্যবহার করে, নিজেদের লোভচরিতার্থ করতে তাঁদের লজ্জা করেনা, ইত্যাদি ধরণের কথা।

ডক্টর ভুঁইয়া গোপনে আপনার গুণকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করলেও, প্রত্যক্ষ তা করতে পারতেন না, নিজের ইগো আর নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য; উনি কিচ্ছু নন, আর সমস্ত কিছু আপনারই কারণে, এই কথাকে উনি নিতে পারতেন না; আর তাই সেই কথাকে সকলের থেকে গোপন করে আসতেন। সেইদিন প্রথম একজনকে উনি সামনে দেখেন যার থেকে সেই কথাকে উনি গোপন করতে পারলেন না। কিন্তু সেটিই উনার আত্মঘাতী হবার কারণ নয় শুধু। উনার আত্মঘাতী হবার পিছনে প্রথম চিন্তা ছিল এই যে, উনি আপনাকে সম্মান না করে ব্যবহার করে আসার জন্য যেই পরিমাণ লজ্জা পেয়েছিলেন, তার কারণে নিজের কাছেই উনি ছোট হয়ে যান; দ্বিতীয়ত, সেরেনা উনাকে প্রকৃতির অপরাধী বলে আখ্যা দেয়, আশা করি, আর সেটা উনাকে নিজের চোখেই অপরাধী করে দেয়; আর বাকি সমস্ত হলো এই যে তিনি নিজেকে নিজেই ক্ষমা করতে পারছিলেন না।

তাই তিনি ডায়রির সেই অংশ যেখানে উনি আপনার সম্বন্ধে কথা বলেছেন, সেটাকে অক্ষত রাখার চেষ্টা করে, বাকি অংশকে ছিঁড়ে ফেলতে চান। কিন্তু এই সমস্ত কিছুতেও উনি শান্ত হতে না পেরে, আত্মঘাতী হন। ... এই হলো যা কিছু ঘটেছিল, তার সমস্ত বিস্তারিত বিবৃতি। এবার সেরেনা আমাকে বলবে, আমি কতটা ভুল, এই ব্যাপারে।

আমি বললাম – কিন্তু সেরেনা নিজে অপরাধী, আর সেই অপরাধ ও এফবিআই-এর থেকে গোপন করে বেঁচেও গেছে, তারপরেও ও তোমার কাছে খুঁচিয়ে ঘা করলো কেন?

বাবা হেসে বললেন – ও রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হয়ে, সর্বক্ষণ মায়ের কাছে থাকতে চায়। বাবা স্যামুয়েল বেঁচে থাকতে তা হতে পারতো না; ডক্টর ভুঁইয়া বেঁচে থাকতে এমন করা হলে, সাবিত্রীদির চরিত্রে দাগ লেগে, উনার সম্মান হানি হতো, এমনকি প্রিয়ম আমেরিকাতে সেটেল হয়ে যাবার ফলেও এবার আর কনো বাঁধা নেই। তথ্যপ্রমাণ ওর কাছে সব আছে, কিন্তু সেটা নিয়ে এগোনোর রাস্তা ওর জানা নেই । তাই আমার দ্বারস্থ হয়েছে।

সেরেনা একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বাংলায় বলে উঠলো – আমি কিন্তু মায়ের কাছে থাকবো বলে বাবাকে খুন করিনি। বাবা যা করতে যাচ্ছিলেন, তা প্রকৃতির ধ্বংস অভিযান। উনাকে বুঝিয়ে লাভ নেই, কারণ উনি অত্যধিক লোভী, আর উনি যখন লোভের অভিযানে চলেন, তখন উনি একজন রাক্ষস। তাই ... উনাকে মেরে ফেলা ছাড়া, আর কনো উপায়ই আমার কাছে ছিলনা । ... সমস্ত কিছুর শেষে, আমার মনে হয় যে আমার আর মায়ের কাছে থাকা কনো ভাবেই বাঁধা হতে পারেনা। ... আমি মাকে ছাড়া থাকতে পারিনা। মা আমার কাছে সবকিছু। তাই ...

বাবা – জানি, বুঝিও। আর আমার চোখে সেরেনা তুমি কনো অপরাধ করো নি। ... কিন্তু শুধু আমার দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই হবেনা এখানে, ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়ার দৃষ্টিকোনও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই উনার মত আমি জানতে চাইবো।

মিসেস ভুঁইয়া – আমি কি আর বলবো এখানে! ... সেরেনা আমার প্রাণ। ... অস্ট্রেলিয়া থেকে চলে আসার পর থেকে আমি খুব বিষণ্ণ থাকতাম, কারণ ওকে দেখতে পেতাম না আর। ... না আমি কনো ভাবেই প্রতিশোধ স্পৃহাগ্রস্ত নই। আমি তো ওদের দুইজনকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, আর তাও যে করতে পেরেছিলাম, তা একমাত্র সেরেনার কারণে। ওর থেকে যেই ভালোবাসা পেয়েছি, তারপর আর কারুর প্রতি আমার কনো ক্ষোভ ছিলনা। ... তবে সত্যি করে বলতে গেলে, প্রকৃতিকে হনন করার আরো

এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে এসেছিলেন, আর তাঁর নাম ডক্টর মারগারেট এলিনা ডসন, একজন আমেরিকান। ... আজ নিজে মুখে স্বীকার করছি আমি, আমি উনাকে খুন করেছিলাম, উত্তর প্যাসিফিকের এক জঙ্গলে। বনের পশুরা মানুষ খায়না, কারণ মানুষের দেহের কীটাণু ওরা সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু হাঙর মানুষ খায়। ... আমি একটা ট্র্যাপ ফেলে, হাঙরের খাদ্য করে দিয়েছিলাম মারগারেটকে। তাই, যেই কালে আমি নিজেই এমন কাজ করেছি, সেই ক্ষেত্রে আমি আমার মেয়েকে কি আর বলবো। ... তবে কিছু মনে করো না বিজয়, একজন তদন্তকারির সামনে এমন কথা বলা কখনোই উচিত নয়, তা জেনেও বলছি, আবার যদি এমন কনো প্রকৃতিবিদ্বেষী সামনে আসে, আবারও তাকে এমন ভাবে হত্যা করতে, আমি পিছুপা হবোনা। ... আমার মাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, আমি অসুর কেন রাক্ষস হতেও প্রস্তুত।

বাবা হেসে বললেন – সাবিত্রীদি, একটা কথা বলবো? ... আমার চোখে একজন রিয়েল লাইফ হিরো হলেন আমার বিদিপ্তাদি, যিনি মানবজাতির সত্যের পথে যাত্রাকে অনবরুদ্ধ রাখার জন্য কারুকে হত্যা করতে দুইবার ভাবেন না। আর আপনি ও আপনার কন্যা হলেন দ্বিতীয় হিরো আমার চোখে, যারা প্রকৃতির রক্ষা করার জন্য, কারুকে হত্যা করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ভাবেন না। ... আপনারা কার কাছে কি জানিনা, আমার চোখে রাক্ষসও নন, আর অসুরও নন। আপনারা তিনজনেই আমার চোখে অসুরদলনী মাদুর্গা। নিজের সুবিধার জন্য যারা হত্যা করেন, বা যিনি নির্দোষ তাঁকে যিনি হত্যা করেন, আমার চোখে তিনিই হত্যাকারী। যারা আমাদের জন্মজন্মের মাবাপ, সেই ঈশ্বর আর এই ধরণী আর এই ভারতমাতার কল্যাণের জন্য হত্যা করেন, তাঁরা সত্যকারের হিরো।

আবার একটু নিজের মনে হেসে – ধরা পরিলে, সাজা পাইবো আমি, কিন্তু তবুও করিব রক্ষা এই ধরণী। সেরেনা, আমি তোমার রেসিডেন্সিয়ালের জন্য সব কিছু করবো। তবে একটু আইনি ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে তোমাকে।

মিসেস ভুঁইয়া – আমার কিন্তু চূড়ান্ত বিস্ময় জেগেছে বিজয়। তুমি একজায়গায় দাঁড়িয়ে, শুধুমাত্র একটা ডায়রি পরে, আমার আর সেরেনার সমস্ত জীবনকথা জানলে কি করে?

উত্তর দিলো সেরেনা – আমার মুখ বাবার সাথে আর তোমার সাথে মেলে মা, সেটাই উনার কাছে প্রথম সূত্র। তারপর আমার আর তোমার কথাগুলোকে সাজিয়ে সাজিয়ে, আর নিজের অসামান্য অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে করে; সঙ্গে ডক্টর ভুঁইয়ার ডায়রি থেকে বাবার, উনার, তোমার আর আমার মানসিকতাকে ধরেন উনি। আর এরপর, কি কি কারণে সেই মানসিকতা জন্ম নিতে পারে, সেই অনুসারে সমস্ত সূত্রগুলোকে সাজিয়ে আমাদের জীবন এঁকে দেন উনি। ... মা, উনার সম্বন্ধে দুইতিনটি কেস আমি পরেছিলাম ইন্ডিয়ার পেপারে, আর সেখান থেকেই বুঝেছিলাম, সম্পূর্ণ সত্য যদি কেউ উদ্ধার করতে

পারেন, তা একমাত্র উনি। আর তার সাথে সাথে উনি একজন প্রকৃতিপ্রেমীও। তাই হয়তো আমাদের কীর্তিকে অন্যচোখে দেখতেও পারেন। তাই ... একতা বড়সর রিস্ক নিয়ে ফেলি আর কি!

আমরা সেদিন চলে এলাম বাড়ি। বাবা দিন ১৫ খুব ছোটাছুটি করে, সেরেনাকে ভারতীয় অধিবাসী করে দিলেন, যদিও মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য এখানে খুবই লেগেছিল। ... এখন সেরেনা আর সেরেনা ফ্লেমিং নয়, সে এখন ডক্টর সেরেনা ভুঁইয়া। এফিডএফিড করে নিয়ে, ন্যাট জিওতেও এখন সে ডক্টর সেরেনা ভুঁইয়া, আর তাঁর এসিস্ট্যান্ট ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়া। ... বাবা আর বাকি টাকাটা নেন নি। ... আমরা সকলে মিলে একদিন মিসেস ভুঁইয়ার হাতে বিরিয়ানি খেলাম। সত্যিই অসামান্য বিরিয়ানি করেন উনি। ...

তবে বলতেই হয়, ডক্টর সাবিত্রী ভুঁইয়া একজন সত্যিই সাধিকা। প্রকৃতির সাধিকা উনি। ... এখন আমার বাবাও বেঁচে নেই, আর ডক্টর সাবিত্রীও নেই। তবে আমি আর সেরেনা খুবই কাছের বন্ধু। ... ওর সাথে আমি বেশ কয়েকবার আগ্নেয়গিরির মুখেও গেছি। সেরেনাও কিন্তু কম প্রকৃতিপ্রেমী নন। তবে এঁদের কথা বলতে গেলে, আরেকজন প্রকৃতিপ্রেমীকে বাদ দেবেন না কিন্তু; তিনি আমার বাবা। যিনি প্রকৃতিপ্রেমী বলেই প্রকৃত-প্রকৃতিপ্রেমীদের সনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

অপরাধী

আইনের চোখে অপরাধী চিহ্নিত হলেই কি তিনি অপরাধী? অপরাধী নিয়ে এক অনবদ্য রহস্যময় বাংলা গল্প রইল আজকের প্রতিবেদনে।

বাংলা গল্প সমূহের সব থেকে জনপ্রিয় বিষয় হলো রহস্যের তদন্ত। রহস্য শাখার বাংলা গল্প রচয়িতারা শুধুই যে পাঠককে অনুমোদন দেওয়ার সামগ্রী রাখেন, তা কখনোই নয়। যেমন পাঠকদের এই বাংলা গল্পগুলি আকর্ষণীয় ক্লাইম্যাক্স উপহার দেয়, তেমনই এরা দেয় এক বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় । সেই বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি কখনো হয় সমাজের একটা শ্রেণির মানুষের মানসিকতার বীজ, তো কখনো হয়, একটা শ্রেণির মানুষের জন্য বুদ্ধির রসদ। কিন্তু আরো একটা জিনিস এই বাংলা গল্পগুলিতে থাকে আর তা হলো, একটি বিশেষ ধরনের সমাজ দর্শন। দেখুন তবে, আজকের বাংলা গল্পতে, কি ধরনের রসদ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

উকিলবাবু

অপরাধী কে, তা খুঁজে বার করাই একজন তদন্তকারীর প্রধান কাজ। সেই অপরাধী বেশির ভাগ সময়েই প্রত্যক্ষ থাকেন না, সেই জন্যই তদন্ত। কিন্তু কখনো কখনো একজন অপরাধী সম্পূর্ণ ভাবে সুপ্ত থাকেন। এই অপরাধীকে খুঁজে বার করা খুব কঠিন হয়।

আমাকে আপনারা চেনেন। আমি মিলি, বিজয় সিংহের একমাত্র কন্যা। একটা কেসের স্মৃতি এলো, তাই সেই কথা বলছি আপনাদেরকে। কেসটা একটা উকিলের, না না আদালতের কাঠগড়ার কেস নয়, মানে আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি, তবে একজনকে নিয়ে এই কেস, যাকে কাঠগড়াতে দাঁড়াতেও হয়েছে, আর জেলের সাজাও ভোগ করতে হয়েছে। কেসের শুরু হয় এক বিচিত্র ভাবে। আমাদের বাড়িতে সেদিন বিদিপ্তাদি আর মা পুজোর বাজার করতে গেছিল, তাই আমি আর বাবাই বাড়িতে ছিলাম।

কলিংবেলটা বেজে উঠতে, দরজা খুললাম, দেখলাম একজন এই ২৫-২৬ বছরের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভিতরে আসতে বললে, তিনি এলেন। বাবা আর আমি তখন বসে চা খাচ্ছিলাম; বাবাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, "আপনিই কি মিস্টার বিজয় সিংহ?"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, আপনার পরিচয়টা?"

ভদ্রলোক বললেন, "সোহম পণ্ডিত। ... আমি এখানে একটা কেসের ব্যাপারে এসেছি, আমার বাবার ব্যাপারে। বাবা হলেন প্রাক্তন উকিল, সৌরভ পণ্ডিত"।

বাবা – আপনি কি করেন?

সোহম – আজ্ঞে, সেন্ট্রাল গভারন্মেন্টে একটা কন্ট্র্যাকচুয়াল কাজ করি।

বাবা – আচ্ছা, তা বলুন, কেসটা কি?

সোহম – আসলে বাবা বেশ কিছু মাস ধরে অসুস্থ। অনেক ডাক্তারবদ্যি করেছি, কিন্তু কিছু লাভ হয়নি। শেষে ডাক্তার এন এস লাহাকে দেখাতে, উনি বললেন, বাবাকে একটি মনস্তত্ত্ববিদ দেখাতে। শর্মিষ্ঠা গুহঠাকুরদা নামক এক মনস্তত্ত্ববিদকে দেখাতে উনি বললেন, আমার বাবা কনো একটা ব্যাপারে অত্যন্ত গিল্টি ফিল করছেন, আর সেই গিল্টিফিলিং এতটাই প্রবল যে, উনি স্বেচ্ছায় মৌন না নিয়েও মৌন হয়ে গেছেন। উনি সমস্ত পরীক্ষা করে বললেন, যদি সেই গিল্টি ফিলিং যার প্রতি, তাঁকে সামনে দাঁড় করানো যায়, তবে হতে পারে যে, তিনি ঠিক হতে পারেন।

বাবা একটু হেসে বললেন – কিন্তু এসব তো ডাক্তারবদ্যির ব্যাপার। আমি এখানে কিই বা সাহায্য করতে পারি!

সোহম – আসলে বাবা সম্পূর্ণ ভাবে মৌন। কেবলই ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে থাকেন আমার দিকে। কনো কথা বলেন না, খালি চোখের জল ফেলেন মাঝে মধ্যে। এমন অবস্থায় আমি কি করে বাবা কি জন্য গিল্টি, সেটা বুঝি বলুন তো! ... আপনি যদি সাহায্য করতেন আমাকে এই ব্যাপারে, তবে...

বাবা – আপনার বাবার বয়স কতো?

সোহম – ৫৬

বাবা – মাত্র ৫৬ বছর বয়সে রিটায়ার হয়ে গেছেন, উকিলের পেশা থেকে? ... কোথায় প্র্যাকটিস করতেন?

সোহম – আজ্ঞে হাইকোর্টে। প্রচুর বড় বড় কেস করেছেন উনি । বিপুল টাকাও কামিয়েছেন। ... কিন্তু আচমকাই সমস্ত কেস নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তারপর বার কাউন্সিল থেকে নাম কাটিয়ে, বাড়িতে বসে গেলেন। আমি সবে সবে চাকরি পেয়েছি, মা নেই আমার। আর এরপর থেকে বাবা, ক্রমশ মৌন হয়ে গেলেন, আর এখন তো একটি কথাও বলেন না!

বাবা – হুম, বুঝেছি। ... তা আপনার বাবা জীবনের শেষ কেসটা কি লড়েছিল, সেই বিষয়ে আমাকে জানাতে পারবেন?

সোহম – আজ্ঞে, বাবার একজন এসিস্ট্যান্ট ছিল, মুকুল দত্ত। বাবা যখন বার কাউন্সিল থেকে নিজের নাম কাটালেন, তখন এই মুকুলকে একজন অন্য উকিলের নিচে এপয়েন্ট করে যান। এই ব্যাপারে সে-ই বলতে পারবে। আমি তার বাড়ি চিনি। আপনি যেতে চাইলে, আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

বাবা – আপনি এক কাজ করুন, কাল আসুন, ঠিক এই সময়ে। আর পারলে, মুকুলের সাথে আগেভাগে একবার কথা বলে রেখে, একবার জানিয়ে রাখলে ভালো হবে।

সোহম বললেন – তাহলে স্যার, আপনি কেসটা নিচ্ছেন তো? ... আপনার পারিশ্রমিক কি হবে?

বাবা – পারিশ্রমিক যদি নি, তবে আপনার বাবার হাত থেকেই নেব। ... আপনি কাল আসুন।

শেষ কেস

পরের দিন সোহম আসতে, আমিই দরজা খুললাম। আমি আর বাবা রেডি হয়েই ছিলাম। সোহম আসতে, তাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের স্করপিও চেপে রওনা হলাম মুকুলের উদ্দেশ্যে। মুকুলের বাড়ি লেকটাউনে। মুকুলের সাথে আগে কথা বলে রেখেছিলেন সোহম। তাই আমাদের সুবিধাই হলো।

মুকুলের থেকে জানা গেল যে, শেষ কেস হলো অনিক ভদ্রের খুনের মামলা। তাতে তনুশ্রী ভদ্র, যিনি অনিক ভদ্রের বোন, তাঁর সাজা হয়। এবং এখন তিনি জেলে আছেন।

বাবা বললেন – নিজের ভাইকে খুন করেছেন?

মুকুল – নিজেরই, তবে নিজের নয়। মানে, উনাকে উদ্ধার করে আনেন, মলয় ভদ্র, যখন তনুশ্রীর বয়স ১২। মা হারা হয়েছিল সেই সময়ে মেয়েটা, আর বেশ কিছু যুবক, সুন্দরী মেয়ে দেখে বিরক্ত করছিলেন,

তাই নিয়ে এসে, নতুন নাম পদবি দিয়ে, নিজের বোন করেই রাখেন। ... অনিক, মলয় আর তনুশ্রীর পরের ভাই।

বাবা – আচ্ছা কি ভাবে খুনটা হয়েছিল?

মুকুল – কানের পাশে সেফটিপিন ফুটিয়ে। মার্ডার অয়েপনও জায়গা থেকেই পাওয়া গেছে, যাতে প্রায় আধ ইঞ্চি মত রক্ত লেগেছিল। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করে, তনুশ্রীর হাতের ছাপ পাওয়া যায়, আর তাই ওকেই দোষী সাব্যস্ত করেন আমার স্যার, আর বিচারপতি সুনিরমল ভট্টাচার্য উনাকে ৩ বছরের জেল হেফাজত দেন।

বাবা – খুনের মামলায়, মাত্র তিন বছরের জেল কেন?

মুকুল – বিরোধীপক্ষের উকিল দাবি করে যে, অনিক তনুশ্রীর প্রতি সেক্সুয়াল হেরাস্মেন্ট করার কালে, তনুশ্রী এমন করে। তাই জজসাহেব বলেন, এটি আত্মরক্ষার জন্য করা খুন, তাই তিন বছরের জেল হেফাজতই দেন।

বাবা – আচ্ছা, আপনারা, মানে ব্যারিস্টার সৌরভ পণ্ডিত কার হয়ে কেসটা লড়েছিলেন?

মুকুল – আজ্ঞে, পুলিশের পক্ষ থেকে বাবা কেসটা লড়েন, পুলিশই এপয়েন্ট করেছিল উনাকে। সরকারি উকিল ছিলেন স্যার সৌরভ পণ্ডিত।

বাবা – আচ্ছা, এখনও কি জেলেই রয়েছেন এই তনুশ্রী ভদ্র! কত বছর হয়েছে জেল খাটছেন উনি?

মুকুল – কেসটি প্রায় আড়াই বছর, না তারও বেশি হয়ে গেছে। আর হয়তো কিছু মাস জেল খাটা বাকি আছে মেয়েটার। ... স্যার, এই কেসের পর প্রায় দুই বছর কনো কেস নেন নি। যাই কেস আসতো, উনি ফিরিয়ে দিতেন। আর শেষে আমাকে ব্যারিস্টার অজিতেশ গোস্বামীর কাছে এপয়েন্ট করে, উনি অবসর নেন। ... তারপরের কথা আমি কালই সোহমের কাছ থেকে জানি, মানে আমি জানতাম না স্যার এমন মৌন হয়ে গেছেন।

বাবা – হুম, আচ্ছা মুকুলবাবু, আপনি কি মলয় ভদ্রের এড্রেসটা দিতে পারবেন?

মুকুল – হ্যাঁ, ... দাঁড়ান, আমার আগের ডায়রিতে লেখা আছে। ... একটু খুঁজতে হবে।

ড্রয়ার খুলে, একটু ঘাটাঘাটি করে, আমাদের সামনে মুকুলবাবু একটা ডায়রির পাতা খুলে দিলেন। ডায়রির পাতায় মলয় ভদ্রের নাম, এড্রেস, ফোন নম্বর সবই লেখা ছিল, বাবা আমার দিকে তাকাতে, আমি মোবাইলে একটা ছবি তুলে, বাবাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলাম।

বাবা বললেন – আচ্ছা, এই মলয় ভদ্রের ব্যাপারে কিছু নিশ্চয় জেনেছিলেন আপনারা!

মুকুল – মলয়ের ব্যাপারেও জেনেছিলাম, আর ওঁর দুশ্চরিত্র ভাইয়ের ব্যাপারেও। ... ওঁর ভাই একজন মহিলার প্রেমে একসময়ে হাবুডুবু খেত। তখন তিনি দাদা, মানে মলয় ভদ্রের সাথে আমেরিকাতে থাকতেন। সেই মহিলাও নাকি ওখানকারই ছিল, মানে মলয় ভদ্রের বয়ান থেকে আমরা এমনই পেয়েছি। ... সেই মেয়েটি অনিককে ধোঁকা দেয়, আর তারপর থেকে অনিক বহুস্ত্রীর দেহসম্ভোগে সদা মত্ত থাকতো। আর এমনই মত্ততার শিকার হতে চলেছিল তনুশ্রীও।

বাবা – আচ্ছা, মানে মলয় আমেরিকাতে থাকতো?

মুকুল – খুব বড় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সে। ... দেশে ফিরেও কগ্নিজেন্ট বছরে ৬০ লাখের প্যাকেজ দিয়েছিল। কিন্তু সে সেই প্যাকেজ না নিয়ে, এক সফটওয়্যার বিক্রেতার সাথে যুক্ত হন, যিনি সেই কগ্নিজেন্টেই সফটওয়্যার বিক্রি করতেন। ... সেখানে মাইনে পেতো না, কিন্তু প্রতি সফটওয়্যারের জন্য প্রায় কটি খানেক পেত।

বাবা – হুম, ... আচ্ছা, তনুশ্রী এখন কোন জেলে রয়েছে?

মুকুল – আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। দাঁড়ান ... এক মিনিট।

আবার খানিকক্ষণ ডায়রি ঘেঁটে, মুকুলবাবু বললেন – ব্লক এফ, কয়েদি নম্বর ১১৮।

বাবা – আচ্ছা, এই রেকর্ডও রাখতেন?

মুকুল – আসলে স্যারের মানে সৌরভবাবুর একটা স্বভাব ছিল যে, যেই কেস নিতেন, তাতে যার সাজা হতো, তার কাছে জেলে গিয়ে, তাকে জিজ্ঞেস করতেন, যা কোর্টে প্রমাণিত হয়েছে, তাই সত্যি, নাকি আরো অন্য কিছু ব্যাপার ছিল, যা মিস করা হয়েছে। বা এমনও তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, তিনি আসলেই দোষী না দোষী নন।

বাবা – হুম। ... এনি অয়েজ, মেনি মেনি থ্যাংকস, আপনার অমূল্য সময় দেবার জন্য, আর এতভাবে সাহায্য করার জন্য। ... আচ্ছা একটা শেষ জিনিস, ... অনিক বাবু তো খুন হয়েছিলেন, উনার পোস্ট মরটেম নিশ্চয়ই হয়েছিল। সেই রিপোর্টের কপি তো মিস্টার সৌরভ ভদ্রের কাছে থাকা উচিত, তাই না! মানে সরকারি উকিল, তো পুলিশেরই সেই কপি দেওয়ার কথা। তাই না!

মুকুল – যদি স্যার সরিয়ে না দেন, তবে, উনার ঘরের পূর্ব দিকের শেষ জানলার পাশে একটা আলমারি আছে, তারমধ্যেই উনি এই সব কেসহিস্ট্রি, তারপর পোস্ট মরটেম রিপোর্ট, সমস্ত রাখতেন। যতদূর আমার মনে আছে, একদম উপুড়ের থাকের বাঁদিকের কপিটা হবে। ... মানে যদি স্যার এরপর সরিয়ে নেন, তাহলে বলতে পারবোনা।

বাবা হাতজোড় করে বললেন – অনেক অনেক ধন্যবাদ মুকুলবাবু।

আমরা সেখান থেকে উঠে এলাম। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম – মলয় বাবুর কাছে যাবার এপয়েন্টমেন্ট নেব?

বাবা – উমহুম, ... আগে পোস্টমরটেম কপিটা একটু দেখতে হবে। ... চলুন সোহমবাবু, আপনাদের বাড়ি চলুন। আপনার বাবার সাথে দেখাও করে আসি, আর পোস্টমরটেম রিপোর্টটা পাওয়া যায় কিনা দেখি।

পোস্টমর্টেম

বাড়ি না ফিরে আমরা তিনজনে সরাসরি চলে গেলাম সৌরভ বাবুর বাড়ি। মুকুল যেমন বলেছিল, ঠিক সেই খানেই ছিল পোস্ট মরটেম রিপোর্ট। সোহম সেই খান থেকে রিপোর্ট বার করে বাবার হাতে দিলে, বাবা সেটি উলটেপালটে দেখে নিয়ে, বললেন, “এটি কি আমি নিয়ে যেতে পারি!”

সোহম বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি এর কিই বা বুঝবো! আপনি নিয়ে যান”।

বাবা এবার রিপোর্ট নিয়ে সরাসরি সৌরভবাবুর সামনে গিয়ে, তিনি যেই চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁর হাঁটুর কাছে বাবা বসে বললেন, “তনুশ্রী কি নির্দোষ কাকাবাবু! ... আমি বিজয়। বিজয় সিংহ। উকিল ছিলেন, তাই নিশ্চয়ই আমার নাম শুনেছেন আপনি। ... যদি তনুশ্রী নির্দোষ হয়, তবে আমি তার নির্দোষ হবার প্রমাণ জড়ো করবোই আর তা আপনার সামনে রেখে দেব। কথা দিলাম কাকাবাবু”।

আমরা সেখান থেকে চলে এলাম এবার। বাড়ি এসে, বাবা রিপোর্টটি পড়লেন ভালো করে। তারপর বেশ জমিয়ে একটা সিগারেট টানলেন। সিগারেট টেনে, সোফায় মাথাটা হেলিয়ে দিলেন বাবা। বুঝলাম, রিপোর্টের এনালিসিস করছেন মনের মধ্যে। আমি একবার কাছে গিয়ে বললাম, "রিপোর্টটা আমি একবার দেখতে পারি কি?"

বাবা চোখ বন্ধ করেই, হাত বাড়িয়ে রিপোর্টটা তুলে আমার মুখে সামনে ধরলেন। আমি এবার রিপোর্টটা নিয়ে চোখ বলাতে থাকলাম। আমার দেখা প্রথম পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট। দেখে কিছু তেমন বুঝতেও পারলাম না; শুধু এটুকুই বুঝলাম ভিক্টিমের পেটে প্যারাকুয়াট পাওয়া গেছে, আর ভিক্টিমের কানের পাশে একটা শিরা ছিরে গেছিল।

বাবাকে প্রশ্ন করলাম – এবার কি করনীয়? আর বাবা এই প্যারাকুয়াট জিনিসটা কি?

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন – আমেরিকায় পাওয়া যায় একরকম কীটনাশক, যা অত্যন্ত বিষাক্ত। মুখে চলে গেলে, ৫ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত।

আমি বললাম – কিন্তু তনুশ্রী তো আমেরিকা যায়নি!

বাবা – হুম সেই ব্যাপারে তো সিওর নই, কিন্তু অনিক আর মলয় তো গেছিল। ... এমনও তো হতে পারে যে অনিক নিজে এই বিষটা খেয়েছিল!

আমি – তারমানে এটা একটা সুইসাইডের কেস!

বাবা ঠোঁট উলতে বললেন – মার্ডারও হতেই পারে। অনিক চরিত্রহীন ছিল, আর তনুশ্রীর সাথে নোংরামি করার চেষ্টা করেছিল, সেই জন্য মলয় ওকে বিষ দিয়ে দেয়, এও তো হতে পারে!

আমি – এরমানে মৃত্যু ওই বিষের জন্যই হয়েছিল, আর কানের পিছনে সেফটিপিন ফোটানোর জন্য নয়, তাই তো?

বাবা – কানের পিছনে পিন ফুটিয়ে একটি টিসুকে ডেমেজ করে দেওয়া হয়েছে। আর যেই সেফটিপিনের মাধ্যমে সেটা করা হয়েছে, সেটাতে তনুশ্রীর ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে, এটা তো সঠিক, কিন্তু এই পিন ফোটানোর জন্য খুব বেশি হলে, ভয়ানক ব্যাথা হতে পারে, মৃত্যু নয়।

আমি – আর মিস্টার সৌরভ পণ্ডিত, সেই বিষের ব্যাপারে জানতেন না বলে, পুরো দোষটা তনুশ্রীর উপর চাপিয়ে দেন। আর পরে সেটার ব্যাপারে জানতে পেরে, তনুশ্রীর জন্য খারাপ লাগতে শুরু করে!

বাবা – হতে পারে, এমনই সমস্ত কিছু হয়েছে। আসলে আমাদের দেশের আইন অদ্ভুত। সত্য গোপন করার জন্য বা সত্য বিকৃত করার অপরাধে এখানে সাজা হয়, কিন্তু একজন উকিল যখন সেই একই সত্য গোপন বা বিকৃত করেন, তখন তাঁর কনো সাজা হয়না। ... যাই হোক, এখনই কনো কনক্লুসানে আসা উচিত নয়। ... হ্যাঁ, যদি সৌরভ পণ্ডিত হনেস্ট উকিল হন, তবে এই বিষের ব্যাপারে না জানার জন্য, সেই দিকে তাকানো বন্ধ করে দেন এমন হতেই পারে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের উকিলের কি ভূমিকা?

একটু থেমে থেকে বাবা বললেন, একবার মুকুলকে ফোন লাগা তো, বিরোধীপক্ষের উকিলের ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা চেয়ে নে। আমি বাবার আদেশ পালন করলাম। বিরোধী পক্ষের উকিলের নাম আর ফোন নম্বর লিখে নিয়েছি। বাবা সেটার দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন – ইনার সাথে যোগাযোগ করার আগে, একবার আলিপুর জেল থেকে ঘুরে আসাটা বেশি দরকার। একবার তনুশ্রীর বয়ানটাও তো শোনা প্রয়োজন।

আবার বললেন – না, একবার ওই উকিলের সাথে কথা বলেনি। বারবার জেলে যাওয়া যাবেনা। ... একবারে গিয়ে, অনেক কিছু কথা বার করে আনতে হবে। ... কি নাম সেই উকিলের?

আমি – জয়ন্ত ভৌমিক।

বাবার নির্দেশে ফোন লাগালাম। রিং হতে বাবার হাতে ফোনটে ধরিয়ে দিলাম। দুই পক্ষেরই কথা লিখছি এবার, যদিও ওই দিকে কি বলা হয়েছে, বাবার থেকে আমি ফোন রাখার পরে জানি।

বাবা – হ্যালো ব্যারিস্টার ভৌমিক!

ভৌমিক – হ্যাঁ, আপনি!

বাবা – আমি একজন রিপোর্টার, বিজয় সিংহ।

ভৌমিক – রিপোর্টার না সরকারের বিশ্বস্ত গোয়েন্দা! ... আমি কি ঠিক আন্দাজ করছি!

বাবা – হ্যাঁ, একদমই ঠিক ধারনা করেছেন।

ভৌমিক – হ্যাঁ বলুন। নিশ্চয় কনো কেসের জন্য!

বাবা – হ্যাঁ, আপনার মনে নাও থাকতে পারে, বছর তিনেক আগের কেস; আপনার মক্কেলের ৩ বছরের জেল হয়; নাম তনুশ্রী ভদ্র।

ভৌমিক – তনুশ্রী ... তনুশ্রী... কেসের সামারিটা একবার বলতে পারবেন প্লিজ!

বাবা – সে কি, উকিলরা তাঁদের মক্কেলদের কখনো ভোলেন না শুনেছি। ... একটি ছেলে অনিক ভদ্রের কানের পাসে পিন ফুটিয়ে হত্যা করে আপনার মক্কেল।

ভৌমিক – ও আচ্ছা, আচ্ছা মনে পরেছে। ... না না, আপনি ঠিকই বলেছেন, উকিলরা নিজের মক্কেলদের কখনো ভোলেনা। আসলে তনুশ্রী ভদ্রের মকদ্দমা আমি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার মক্কেল ছিলেন, সুনয়না দত্ত। আসলে তনুশ্রীর কাছে কেস লড়ার পয়সা কোথায় ছিল; তাই কেসের পয়সা দিয়েছিল, আর আমাকে এপোয়েন্ট করেছিলেন মিস সুনয়না।

বাবা – আচ্ছা, উনি এই কেসের সাথে কনো ভাবে কি যুক্ত!

ভৌমিক – না কনো ভাবেই নয়; আসলে উনি তখন ছিলেন মলয় ভদ্রের হবুস্ত্রী, আর এখন তিনি উনার স্ত্রী। ... মলয়ের বোনের কেস বলে, সুনয়না আমাকে এপোয়েন্ট করে দেয় এই কেসে। আসলে মলয় তখন সবে সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছিল। তাই ওঁর কনো উকিল চেনা ছিলনা। তাই ওঁর ফিয়ন্সে সেই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যই আমাকে এপয়েন্ট করেন।

বাবা – ও আই শি। ... আচ্ছা ভৌমিকবাবু, আপনি অনিক ভদ্রের পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা নিশ্চয়ই দেখেছিলেন, তাই না!

ভৌমিক – হ্যাঁ তা তো দেখেছিলাম নিশ্চয়ই। আসলে অনেকদিন হয়ে গেছে তো, এখন সেসব আর মনে নেই তেমন।

বাবা – আচ্ছা আচ্ছা। ... আচ্ছা একটা কথা বলতে পারবেন আমাকে। আপনারা তো অনেক কেসই লড়েন, বিষ হিসাবে প্যারাকুয়েট ব্যবহার করা হয়েছে, এমন কনো দিন শুনেছেন!

ভৌমিক – কি কুয়েট! ... এরকম নামের বিষ আবার আমাদের দেশে হয়, সেটাই তো জানতাম না।

বাবা হেসে বললেন – আছা আচ্ছা ঠিক আছে। ... আচ্ছা, তনুশ্রী কি সত্যিই তার ভাইয়ের সাথে শারীরিক সম্বন্ধে জরিয়েছিল, নাকি ওঁর সাজা কম করার জন্য, সেটা বানানো!

ভৌমিক – বানানো। ... যখন কনো ভাবেই জাঁদরেল উকিল, সৌরভ পণ্ডিতকে হারাতে পারছিলাম না, তখন সুনয়নাই আমাকে বুদ্ধি দেয় এটার। ... আসলে অনিক যে দুশ্চরিত্র এবং বহু স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, যতদূর মনে পরছে, সেটা প্রমাণিত হয়ে যায়। ... তাই তনুশ্রীর সাজা কম করার জন্য সুনয়না সেইরকম কিছুকেই সামনে রাখতে বলেন। আমি দেখি, হ্যাঁ আমার মক্কেল তো এর জন্য বেঁচে যাবে, মানে সাজা কম হয়ে যাবে। ... তাই চালিয়ে দিই আর দেখুন, যেখানে ১০-১২ বছরের জেল হতে পারতো, সেখানে মাত্র তিন বছরের জেল হয়।

বাবা – অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। যদি সম্ভব হয়, একবার নয় ফোন করে, আপনার সাথে পরে দেখাও করে নেব।

বাবা ফোন রেখে দিলেন, আর পরের দিন তনুশ্রীর সাথে দেখা করার প্রস্তুতি নিলেন।

তনুশ্রী ভদ্র

পরের দিন সকালে, রথিনকাকার থেকে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আমরা গেলাম আলিপুর জেলে। সেখানে গিয়ে তনুশ্রীর সাথে সাখ্যাত করলাম। কি বিচিত্র মেয়েরে বাবা, জেল খাটছে, কিন্তু বিষদাঁত ভাঙে নি। বাবা গিয়ে প্রশ্ন করলেন – আপনি কি সত্যিই খুনটা করেছিলেন মিস তনুশ্রী!

মেয়েটি উত্তরে বললেন – আর একমাস জেল খাটা বাকি বলে এসেছেন, আরো তিন বছর জেল খাটানোর জন্য!

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে এবার প্রশ্ন করলেন – সত্যিই কি আপনি খুনটা করেছিলেন? নাকি আপনাকে ফাঁসানো হয়েছে!

তনুশ্রী আবারও কড়া ভাবে জবাব দিল – আপনি একটা জেলে এসে, একটা জেল খাটা মানুষের সাথে দেখা করছেন, তা কি এমনি এমনি সেই মানুষটা জেলে বসে বসে পচছে!

বাবা – আপনি যদি একটু সহযোগ করতেন, তাতে আপনারই ভালো হতো।

তনুশ্রী – সহযোগ! (একটা বিশ্রী হাসি) করলে কি হবে, এই যে তিন বছর আমার জেলে কাটলো, সেই সময়টা ফিরিয়ে দেবেন আপনি?

বাবা – আপনি জেলে এসেছেন তখন আপনার বয়স ২০, এজ পার পুলিশ রেকর্ড, অর্থাৎ আপনার বয়স এখন ২৩। আপনার সামনে কিন্তু প্রচুর জীবন পরে রয়েছে। আপনি সহযোগ করলে, আপনার বাকি জীবনটা ঠিক থাকতেও পারতো।

তনুশ্রী – আর না করলে? ... আপনি কে আমি জানিনা? সিয়াইডি চিফের সুপারিশ নিয়ে এসেছেন শুনলাম। তা মিস্টার, যেই হন না কেন আপনি, একটা জিনিস কান খুলে শুনে রাখুন। একজন জেল ফেরদ আসামীর বাকি জীবন কেমন কাটে, তা এই তিন বছর জেলে থেকে ভালো করেই জেনে গেছি আমি। তাই আর নতুন করে কনো গপ্প শোনাতে আসবেন না আমাকে!

বাবা – আগেও বুঝি এমন কনো গল্প শোনানো হয়েছিল আপনাকে?

তনুশ্রী – আপনি কি চাইছেন বলুন তো আমার থেকে?

বাবা – খুনটা কে করেছিল, সেটা তো আপনি জানেন। তাহলে মুখ বন্ধ করে, নিজের নামে সমস্ত এলিগেশন কেন মেনে নিলেন?

তনুশ্রী – এই যে মশাই শুনুন, আমি না কেসটা নিজে নিজে লড়াই করিনি; আমার একজন উকিল ছিল। তিনি আমাকে ডিফেন্ড করতে পারেননি। ... তিনি বলার চেষ্টা করেছিলেন, এটা একটা এক্সিডেন্ট, যেখানে আমার ব্যবহার করা সেফটিপিন অনিকের কানের নিচে ফুটে গেছিল। সে এমনও বলেছিল যে আমি খুনটা করিনি, আর মার্ডার বা ডেথ সিনারিওতে ছিলামও না। ... অনিককে দুশ্চরিত্র প্রমাণ করে, বলার চেষ্টা করেছিল যে সঙ্গমের পর, যখন বিছনায় পরে যায়, তখন সেফটিপিনটা এক্সিডেন্টালি ঢুঁকে যায় কানের পিছনে।

বাবা – কিন্তু শেষ রক্ষে হয়নি। ... আর যখন দেখলেন উনি যে, আপনাকে বাঁচানো যাচ্ছেনা, তখন আপনার উপরই সেই সঙ্গমের হামলা হয়েছিল, আর সেটার থেকে আপনি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে এমন একটি বিপদের মধ্যে ফেঁসে গেছেন, এই কথা বলতে, আপনার সাজা মাত্র তিন বছর অবধি সীমিত হয়ে যায়। ... আচ্ছা একটা কথা বলুন, তিন বছরের জেল শুনে আপনি কি চমকে গেছিলেন?

তনুশ্রী – না, উল্টোদিকের উকিল মানে সরকারি উকিল খুবই জাঁদরেল ছিলেন, আমাদের উকিল উনার সামনে দাঁড়াতেও পারছিলেন না। ... আমি তখনই বুঝে গেছিলাম, আমার জেল হবেই। প্রথমে তো ভেবেছিলাম ফাঁসি হবে, কারণ আমি ভাবতাম খুন করলেই ফাঁসি হয়। পরে দেখলাম তিন বছরের জেল হলো।

বাবা – আর ফাঁসির জায়গায় মাত্র তিনবছর জেল শুনে আপনার কেমন লাগে? মানে হতাশ লাগে, নাকি কষ্ট হয়, নাকি অবাক হয়ে যান!

তনুশ্রী – আপনি কি রিপোর্টার! রিপোর্টারের মত প্রশ্ন করছেন। যখন আমার নামে এলিগেশন লাগলো, তখন রিপোর্টাররা ঠিক এই ভাবেই প্রশ্ন করেছিল আমাকে।

বাবা – হ্যাঁ রিপোর্টার, আমি যাদের কে অহেতুক বা অন্যায় ভাবে ক্রিমিনাল সাজানো হয়েছে, তাদের চিত্রকে সামনে আনি, যাতে তাঁদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়, আর তাঁদের বাকি জীবনটা নষ্ট না হয়ে যায়।

তনুশ্রী – প্রয়াস খুব ভালো। এরকম অনেকেই আছে এখানে।

বাবা – আর তার মধ্যে আপনিও একজন তাই তো?

তনুশ্রী – দেখুন আমি এখন যদি বলি আমি নির্দোষ, তাহলে কি হবে আমার! ... আপনি কি গতি করে দেবেন আপনার?

বাবা – হুম গতি করে দেব, তবে আমি না, অন্য একজন আপনার গতি করতে চান। ... তবে তার জন্য আপনাকে তো আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে হবে না! ... আমি ধারনা করার চেষ্টা করছি, তিন বছর কেউ ক্রাইম না করে জেল খাটলে, তার ভিতরে কতটা বিতৃষ্ণা এসে যায়, যদিও পুরোটা ধারনা করতে পারছিনা।

তনুশ্রী – এই মিস্টার যানতো আপনি, আপনার কথাতে আমি বড্ড কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি!

বাবা – ঠিক যেমন সেই সময়ে লাগছিল, যখন আপনি বুঝতে পারছিলেন যে আপনি মিথ্যে কেসে ফেঁসে যাচ্ছেন। কি তাই তো? ... আপনাকে বলা হয়েছিল, আপনাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু তা করা হলো না, সেই নিয়ে আপনার দুঃখ বা রাগ হয়নি!

তনুশ্রী – চেষ্টা উকিলসাহেব অনেক করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি।

বাবা – হুম প্যারাকুয়েট আপনি কি করে পেলেন?

তনুশ্রী – কি কুয়েট! ... প্যারাকুয়েট জিনিসটা আবার কি? আর আমার এই খুনের সাথে সম্পর্কই বা কি?

বাবা – আচ্ছা, ছাড়ুন অসব। আপনি নিজেকে না বেকসুর বলতে রাজি নন। ঠিকই আছে, তিন বছর জেল খাটা হয়েই যখন গেছে আর নির্দোষ থেকে লাভ কি! ... ওসব ছাড়ুন, আপনার নামে তো খুনের অভিযোগ উঠেছিল, মানলাম, কিন্তু আপনার ভাই, মানে অনিক ভদ্রের উপর যে দুশ্চরিত্র হবার আরোপ এসেছিল, সেটা কতখানি ঠিক বা বেঠিক, সেই কথা আমাকে একটু বলবেন?

তনুশ্রী – মিথ্যে কথা। ... ডাহা মিথ্যে কথা। প্রথম যখন কথাটা শুনেছিলাম, তখন পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল আমার। কিন্তু সেই কথার জেরেই আমার সাজাকে জজসাহেব ৮ বছর থেকে ৩ বছরে করে দেন।

বাবা – একটা অপ্রিয় প্রশ্ন করতে পারি কি! ... আসলে এটা জানাটা খুব দরকার আমার জন্য।

তনুশ্রী – সব প্রশ্ন তো অপ্রিয়ই করছেন। আরো একটা করুন।

বাবা – আপনার সাথে কি কনোদিনও অনিকের ...

তনুশ্রী চেঁচিয়ে উঠলো – না ... কনোদিনও না। আমার ভাই ছিল। এবং বড়দার থেকেও বেশি স্নেহ করতো অনিক। ... অনিক দুশ্চরিত্র ছিলনা, কনোদিনও ছিলনা; না আমেরিকায় থাকতে, আর না এখানে আসার পর।

বাবা – সরি, আমি জানতাম, এই প্রশ্নটা আপনার অত্যন্ত অপ্রিয় হবে। সত্যি বলতে উত্তরটাও আমি জানতাম। কিন্তু প্রশ্নটা করার কারণ এই যে, আপনার ভাইয়ের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুসারে, উনার মৃত্যুর কিছু মিনিট আগেই, উনার বীর্যপাত হয়, এবং উনার যৌনাঙ্গ থেকে কনো স্ত্রীর যৌনাঙ্গের অবশেষও পাওয়া গেছে। তাই প্রশ্ন করলাম। ... কিছু কি আলোকপাত করতে পারবেন এই ব্যাপারে!

তনুশ্রী এই প্রশ্নের কনো উত্তর দিলো না। ফ্যাল ফ্যাল করে বাবার দিকে আর আমার দিকে তাকালো খালি। ... অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে ছিল; শেষ মুহূর্তে যখন দেখা করার সময় শেষ হয়ে গেছে বলে,

মহিলা জেলার পুলিশ ওকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনও তনুশ্রীর ওই মুখটা দেখেছিলাম আমি। যেন বিস্ময়ে হতবম্ব হয়ে গেছিল ও।

আমি আর বাবা ফরে এলাম। বাবাকে গাড়ি চালানোর সময়েও বললাম – তনুশ্রী ওই কথাতে হতবাক হয়ে গেল কেন?

গার্লফ্রেন্ড

বাবা – সকিং ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। ... উমম... তথ্যটায় ও চমকে গেছে, এটা নিশ্চিত। ... মানে অনেক কিছু হতে পারে, তবে একটা জিনিস আমি তনুশ্রীর ওই এক্সপ্রেশন থেকে বুঝতে পারলাম যে, যার সাথে শেষ মুহূর্তে যৌনসঙ্গম হয়েছিল অনিকের, সে-ই অনিকের খুনি, মানে সে-ই অনিককে ওই প্যারাকুয়েট দিয়েছিল।

আমি – হুম, কিন্তু সেই মহিলাটি কে?

বাবা – অনিকের সেই আমেরিকার গার্লফ্রেন্ড। ...

আমি – হাউ ক্যান ইউ বি সো শিয়র?

বাবা – অনিক দুশ্চরিত্র ছিলনা; না আমেরিকাতে, না এখানে। ... এর অর্থ, অন্য কনো দ্বিতীয়স্ত্রীর সাথে অনিকের সম্পর্ক ছিল না। ... তারমানে, যৌনসঙ্গমও সেই মহিলার সাথেই হয়েছিল। আর সেই মহিলা অনিককে বিষ দেয়, তাও সেই বিষ, যা এই দেশের বড় বড় উকিলরা জানেও না, এবং ছুঁচ ফুটিয়ে দেয় কানের পিছনে! ... উম সেটাই কি? নাকি অনিকের কানে ছুঁচটা ফোটানো আগেই হয়েছিল?

একটু থেমে থেকে, বাবা বললেন – একবার রিপোর্টটা দেতো পোস্ট মর্টেমের।

আমি রিপোর্টটা দিতে, চোখ বুলিয়ে বললেন বাবা – মৃত্যুর ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা আগে। ... ঈশ, এটা যদি আগে দেখতাম, তাহলে তনুশ্রীকে আরেকটা প্রশ্ন করার ছিল, সে এই ছুঁচ ফোটার পর অনিকের চ্যাঁচানো শুনেছে কিনা। ... ঈশ খুব ভুল হয়ে গেল বুঝলি।

আমি – আর তো তনুশ্রীর সাথে দেখাও করা যাবেনা। এবার ...

আচমকা একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়, তাই একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম – আরেকটা উপায় আছে!

বাবা – কি?

আমি – মলয় ভদ্র।

বাবা – রাইট। চল, একবার উনার সাথে দেখা করে আসি।

আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নিয়েই চলে গেছিলাম। কিন্তু দেখা হলো না। উনি নাকি স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন বারবিল, উড়িষ্যায়। আজ রাতেই নাকি ফিরবেন। ...

দেখা হলো না, তবে কিছু কাজ হয়ে গেল। বাড়িতে একটা কাজের মহিলা ছিলেন। সবসময়ের কাজের লোক। প্রশ্ন করাতে তাঁর থেকে জানা গেল যে, মলয় ভদ্র, যেমন মুকুল বলেছিল, একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার। আর উনার স্ত্রীর কোম্পানিতেই উনি কাজ করেন, যেখানে উনার স্ত্রী সফটওয়্যার বিক্রি করেন, বড় বড় কোম্পানিগুলোতে। ... প্রশ্ন করা হলো, কতদিন ধরে দাদাবাবু চেনেন ম্যাডামকে?

তার উত্তরে এল এই কথা যে, তিনি এই দুই বছর কিছুমাস হয়েছে কাজ করছেন, আর মলয়ের বিয়ে তার আগে হয়ে গেছে। প্রশ্ন করাতে এও জানা গেল, উনার আগে কনো কাজের লোক উনি যতটা জানেন, ছিলনা।

বাবা সমস্ত কিছু তথ্য নিয়ে, সোফার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটা সিগারেটের টান মারতে মারতে বললেন – তনুশ্রী অনিকের গার্লফ্রেন্ডকে চেনে। আমেরিকাতেও তাকে দেখেছে, আর এখানেও । ... অনিক আর সেই গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গমকে মৃত্যুর আগে হতেও দেখেছে তনুশ্রী। কিন্তু তনুশ্রী যেটা ভাবতে পারছে না, সেটা হলো এই যে, সেই গার্লফ্রেন্ডই অনিককে খুন করেছে।

আমি বললাম – আর সেই জন্যই যৌনসঙ্গমের পরেই মৃত্যু হয়েছে, এই তথ্যটা শুনে চমকে যায় তনুশ্রী!

বাবা – হুম, আর শুধু তাই নয়, যখন তনুশ্রীর উকিল এই যৌননির্যাতনের কথা বলে তনুশ্রীর সাজার সময় কমান, তখন সৌরভ পণ্ডিত কিন্তু তার প্রতিবাদ করেন না, কারণ তিনি পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দেখেছেন আর পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে স্পষ্ট ভাবে এই কথাটা লেখাও দেখেছেন। আর শুধু সৌরভ পণ্ডিতই বা কেন, জজসাহেবও সেই একি জিনিস রিপোর্টে দেখেছেন, তাই একটি নারীর চরিত্র নিয়ে টানাটানি না করার

জন্য, সকলেই ধরে নেন, তনুশ্রীর উকিলের কথাকে ধরে যে পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে যেই স্ত্রীর যৌনাঙ্গের অবশেষ পাওয়া গেছে বলে রিপোর্ট দাবি করেছে, সেটা তনুশ্রীরই।

আমি বললাম – কিন্তু তনুশ্রী সেই রিপোর্ট দেখেনি, তাই ও ভেবে গেছে যে উকিল সাহেব শুধু ওকে বাঁচানোর জন্য ওঁর অপ্রিয় এই মিথ্যা বলে গেল। ... কিন্তু আসল কথাটা আজ তোমার মুখ থেকে শুনে, ও ঘাবড়ে গেল। অর্থাৎ ও খুনিকে চেনে, আর যাকে খুনি বলে চেনে, তাকে খুনি ভাবতেই কি ও...!

বাবা বললেন – হ্যাঁ, ঠিক তাই। তনুশ্রী নিজে খুনি নয় জানলেও, এমন ধরে নেয় যে, উকিল সাহেব চেষ্টা করেও ওকে বাঁচাতে পারেনি, যেটা সত্যিও। কিন্তু খুনিকে ও চেনে, আর সে যে খুন করেছে, সেটা ও ভাবতেও পারছে না। আর অনিক দুশ্চরিত্র নয়, এখানেও নয়, আমেরিকাতেও নয়, মানে অনিকের সাথে যৌনমিলন কেবলই তার গার্লফ্রেন্ডের হয়েছে। ... আর সেই গার্লফ্রেন্ডই নিজে অনিককে খুন করে, চুপ করে তনুশ্রীকে খুনি প্রমাণিত হতে দেখে, মজা নিয়েছে।

আমি – হ্যাঁ, কেস তো শলভ হয়েই গেল। কালকে সকালে মলয় বাবুর সাথে দেখা করলেই তো অনিকের গার্লফ্রেন্ডের হদিস পেয়ে যাবো। ... ব্যাস কেস শেষ।

পরেরদিন সকালের অপেক্ষা আমি আর বাবা দুইজনেই করছিলাম যেন। সকাল হতেই। ব্রেকফাস্ট করে, সরাসরি মলয়বাবুর বাড়ি চলে গেলাম।

ধুয়াশা

সেখানে যাওয়া একরকম কেন পুরপুরিই সার্থক। মলয় ভদ্র সরাসরি বলে দিলেন, তিনি শুধু জানতেন যে অনিকের আমেরিকাতে কনো প্রেমিকা হয়েছিল, যে ওকে ধোঁকা দিয়েছিল, কিন্তু সেই মেয়েকে কোনদিনও দেখেননি উনি।

সেই কথা শুনে আমরা অথৈজলে পরে গেছিলাম, কিন্তু উনার স্ত্রী সুনয়না ভদ্র বললেন, "উনি অনিকের থেকে জেনেছেন সেই মেয়ের ব্যাপারে। ... তবে তিন জনের মধ্যে কোন মেয়েটি সেই মেয়ে, সেই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন। ...

উনার কথা অনুসারে, তিনটি মেয়ের সাথে অনিক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, একজন মনিকা যে আমেরিকাতেই থাকে এখনো, একজন মহিমা এবং একজন রিম্পি। রিম্পি আর মহিমার এড্রেস তো উনি দিতে পারলেন না,

তবে উনি বললেন, একজন সাউথ সিটিতে থাকে, আর অন্যজন নিউটাউনে রোহরা হাইটসে থাকে। অন্যদিকে মলয় ভদ্র বললেন, এই দুইজনের মধ্যেই কেউ হবে, কারণ আমেরিকা থেকে ওঁর গার্লফ্রেন্ড, তাঁদের এখানে আসার প্রায় দেড় বছর আগেই ফিরে এসেছেন।

যথেষ্ট তথ্যই পেয়েছি বলে আমাদের দুইজনেরই মনে হলো। বাবা রথিনকাকার সাহায্য নিয়ে রিম্পি আর মহিমার পুরো ডিটেলস বার করে নিলেন আমরা বালি থেকে হাওড়া আসার আগেই। তাই হাওড়া এসেই, আমরা উনাদের কন্ট্যাক্ত করে, উনাদের বাড়িতে একে একে চলে গেলাম। কিন্তু আমাদের আশার বারাভাতে ছাই পরে গেল। কারণ এই দুইজনেই যা বলল, তা আমাদেরকে পুরো গুলিয়ে দিল।

প্রথম আমরা গেছিলাম মহিমার কাছে, সে থাকে সাউথ সিটির একটা লাকজুরিয়াস এপার্টমেন্টএ। মহিমা সিংহরায় তাঁর পুরো নাম। সে বলল, অনিক খুবই ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল, আর ওঁর ক্লাসমেট ছিল। আমেরিকাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিল, তারপরে কি যে এক মেয়ের খপ্পরে পরলো, সেই মেয়ের সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল যে, পড়াশুনা আর হোলই না ওঁর দ্বারা। আমরা বললাম, সেই গার্লফ্রেন্ডের নাম কি রিম্পি!

মহিমা উত্তরে বলল – না না রিম্পি তো ওঁর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বন্ধু। ... ও এখন নিউটাউনে থাকে। বিয়ে করেছে সে, একটা সন্তানও আছে। ... অনিক এতটাই ভালোছিল পড়াশুনাতে যে, রিম্পি ওঁর ব্যাচমেট হওয়া সত্ত্বেও, অনিকের কাছেই পড়তো।... আমিও ওঁর ব্যাচমেট ছিলাম, একাধিকবার কেন, বেশির ভাগ সময়ে আমরা একসঙ্গেই যেতাম অনিকের কাছে পড়তে; অনেক সময়ে আমরা কলেজের লনেও পড়েছি।

বাবা বললেন – আপনি ওঁর গার্লফ্রেন্ডকে কনোদিন দেখেন নি!

মহিমা – না, ওঁর দাদা নাইট জব করতো, আর সেই মহিলা ওঁর কাছে এই রাত্রিতেই আসতো, আর ওঁর সাথে ও শারীরিক ভাবে এতটাই ইন্টিমেট হয়ে গেছিল যে, সেটাই ওঁর কাছে নেশা হয়ে যায়, আর পড়াশুনা থেকে মন উঠে যায়। ... আমরা কেউই ওঁর গার্লফ্রেন্ডকে দেখিনি, তবে আমরা ওকে বোঝাতাম যাতে, ও সেই মহিলার থেকে সরে আসে, কারণ সেই মহিলা ওঁর কেরিয়ার শেষ করে দিচ্ছে।

বাবা – নাম জানেন না সেই মহিলার?

মহিমা – সুনা বলে ডাকতো অনিক।

বাবা – দেশে ফিরে এসেছেন কবে?

মহিমা – এই তিন বছর হলো। এসেই আমরা প্রথম অনিকের সাথে দেখা করেছিলাম। ওঁর দাদা আসলে প্রচুর টাকা কামায়, তাই ওঁর কেরিয়ার শেষ হতেও ও পথে বসে গেল না। আমার ক্ষেত্রে এমন হলে, আমি শেষ হয়ে যেতাম।

বাবা আর আমি সেখান থেকে এবার নিউটাউন যাই। নিউটাউনে গিয়েও যেমন মহিমা বলল, তেমনই একটা গল্প শুনলাম, তবে আরো কিছু যোগ হয়েছিল। রিম্পি বললেন, তিনি বড়লোক বাপের মেয়ে, তাই বিদেশে পড়তে চলে গেছিলেন। অনিক মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অসাধারণ। সে না থাকলে, মহিমা হয়তো পড়া শেষ করতে পারতো, কিন্তু তাঁর কনসেপ্টই বসিয়েছে অনিক।

বাবা বললেন – আপনারা দেশে ফিরেও ওঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?

রিম্পি – অনিকের সাথে দেখা করার জন্য ঠিক যাইনি। অনিকের বোন তনুশ্রী, অদ্ভুত গান গায় ও, আর তেমন সুন্দর ছবি আঁকে। আর শুধু তাই নয়, উচ্চদর্শনও মেয়েটার। ... আমাদের খুব কাছের একজন। অনিকের গার্লফ্রেন্ড ওকে ছেড়ে, আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবার পর, প্রায় এক বছর অনিকের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, ওঁর দাদা, ওকে আর ওঁর বোন তনুশ্রীকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে। ... তারপর আমরা প্রায় এক বছর ওখানে ছিলাম, আর ফিরে এসে অনিকের সাথেও দেখা করতে যাই, আর বিশেষ করে ওঁর বোনের সাথে।

বাবা – সুনা নামছিল না মেয়েটির?

রিম্পি – ওই নামে অনিক ডাকতো। আমরা কনোদিনই তেমন ইন্টারেস্ট দেখাইনি। ... ও নিজে থেকেই আমাদের যা বলতো, তা শুনতে হতো, কারণ আমরা ওঁর থেকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতাম। ... ওই মেয়ের সাথে অনিকের অতিরিক্ত শারীরিক সম্বন্ধ হতো, আর সেটাই বোধহয় নেশা হয়ে যায় অনিকের কাছে।

বাবা – আচ্ছা সেই মহিলাও কি স্টুডেন্ট ছিলেন?

রিম্পি – না না, অনিকের থেকে বড়। কনো একটা পেস্টিসাইড কোম্পানিতে চাকরি করতো। ... দাঁড়ান, ওঁর হাতের একটা ছবি আছে ... মানে অনিক আমাদেরকে দিয়েছিল ছবিটা, আর বলে চলেছিল, ত্বক দেখ

না। ... ত্বক দেখলেই প্রেমে পরে যাবি। ... দাঁড়ান একটু দাঁড়ান, একটু খুঁজতে দিন। অনেক দিন আগের ছবি তো। ... ফোন পালটাইনি, তাই থাকার তো কথা। ...

বেশ খানিকক্ষণ ফোন নিয়ে ঘাটাঘাটি করে, শেষে বলে উঠলেন – এইতো পেয়েছি... অনিকের মুখ আর সেই মেয়ের হাত। ... ব্যাস, এর থেকে বেশি কিছু জানিনা আমি। বাবা ছবিটা নিয়ে নিলেন। আমরা ফিরেই আসছিলাম, তখন বাবা আবার লিফটের কাছ থেকে ফিরে গিয়ে বললেন, "সুনয়না ভদ্র বলে কারুকে চেনেন বা চিনতেন?"

রিম্পি দুইচারবার মুখে করে আওরালো, সুনয়না! ... ভদ্র! ... না এমন কারুর নাম তো আমি জানিনা! ... কে বলুন তো, মানে আমার কি জানা উচিত ছিল ইনাকে?

বাবা – হুম তেমনই একটা, কারণ তিনি আপনাদের চেনেন। আপনাদের নাম আমি তাঁর থেকেই জানি, মলয় ভদ্রের স্ত্রী।

রিম্পি বললেন – না তো, আমরা অনিকের দাদার নামটাই খালি জানি। যতবার অনিকের বাড়ি গেছি, ততবার উনাকে খালি ঘুমোতেই শুনেছি। দেখিনি কনোদিন, পাসের রুমের দরজা বন্ধ করে উনি ঘুমাতেন, কারণ রাত্রে উনার জব ছিল।

বাবা – আর অনিকের গার্লফ্রেন্ডকে আপনারা কেউ কনোদিন দেখেন নি! কি কাজ করতেন উনি!

রিম্পি – কনো একটা গাছে দেওয়ার পেস্টিসাইড কোম্পানিতে কাজ করতেন উনি। রাত্রে, অনিকের দাদা চলে গেলচ উনি আসতেন। পরমা সুন্দরী নাকি, তনুশ্রীর মুখে শুনেছি, কারণ অনিক ছাড়া একমাত্র তনুশ্রীই তাঁকে দেখেছে। তনুশ্রীর সাথে আলাপও ছিল।

বাবা – কোম্পানিতে কি কাজ করতেন জানেন?

রিম্পি – না জানিনা (হেসে বললেন) অনিক নিজেও জানতো কিনা আমার সন্দেহ।

বাবাও একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন – অনিকের চরিত্র কেমন ছিল? আর ওঁর বোনের সাথে ওঁর সম্পর্ক কেমন ছিল?

রিম্পি – ওঁর গার্ল ফ্রেন্ড ছাড়া, সকলের সাথে অনিক খুব সুন্দর ভাবে মিশত, মানে অন্য কনো মেয়ের প্রতি খারাপ নজর ওঁর ছিল না। ... না, এমনকি এই যে কিছু বছর আগে, অনিকের সাথে দেখা হয়েছিল, তনুশ্রীর সাথে দেখা করতে যাবার সময়ে, তখনও অনিকের নজরের মধ্যে খারাপ ভাব ছিল না। ... না, মানে একটা মেয়ে এটা খুব ভালো বুঝতে পারে। রাস্তাঘাটে চলতে চলতে, একটা স্পষ্ট ধারনা হয়ে যায় এই ব্যাপারে আসলে।

বাবা – হুম, আচ্ছা তনুশ্রীর সাথে জেলে দেখা করতে গেছিলেন আপনারা?

রিম্পি – আমি গেছিলাম। মহিমা একটু মিডিল ক্লাসেই বড় হয়েছে, ওঁর একটু আইন, পুলিশ, জেল, এসব থেকে ভয় আছে। আর তাছাড়াও আমেরিকায় একবার ওকে অকারণেই, একজন বিদেশির অহেতুক অভিযোগে তুলে নিয়ে যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুয়ো জেনে, ওকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু সেই আধঘণ্টাতে যা হাল হয়েছিল ওঁর, তারপর থেকে ও পুলিশের নাম শুনলেই একটু দূরে থাকে। ... তবে আমি গেছিলাম।

বাবা – আপনার মনে হয়, তনুশ্রী দোষী, মানে অনিকের সাথে তনুশ্রীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

রিম্পি – তনুশ্রী আমাকে বলেছিল, মৃত্যুর আগের দিন রাত্রে, অনিকের কান পরিষ্কার করে দিচ্ছিল ইয়ারবাড দিয়ে। তারপর কিছু একটা নোংরা বার করতে না পারার জন্য অনিক সেফটিপিন আগিয়ে দেয়। সেই সেফটিপিন দিয়ে কান খুঁচিয়ে পরিষ্কার করার সময়ে, অনিকের পায়ে কিছু কামড়াচ্ছিল বলে, ছটফট করে ওঠে, আর তারপর সেফটিপিনের মুখটা খুলে অনিকের কানের পাশে গেঁথে। ... বরোলিন গরম করেও দিয়েছিল কানে। সামান্য ব্যাথাও ছিল, আর একটু ফুলে গেছিল, কিন্তু এর জন্য যে অনিকের প্রাণ চলে যাবে, সেটা না অনিক আর না তনুশ্রী, কেউই ভাবতে পারেনি।

বাবা – আর সম্পর্ক!

রিম্পি – সম্পর্ক ভাইবোনের যেমন হয়। একে অপরকে চোখে হারাতো।

বাবা – এমন কি কনো সম্ভাবনা থাকে যে তনুশ্রীর সাথে অনিকের শারীরিক সম্পর্ক ... না মানে ...

রিম্পি – না না... এ মা! ... কি বলছেন? দুজন দুজনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল ওরা, আর ... ছি ছি, না না... এটা আমাকে কেউ বিশ্বাস করতে বললেও, আমি বিশ্বাস করবো না। ...

বাবা – অনেক ধন্যবাদ, আপনার সময় দেবার জন্য।

আমরা বাড়ি চলে এলাম। আর বাবা সোফায় বসে চিন্তায় ডুবে গেলেন।

ট্যাটু

বেশ কিছুদিন আমরা একটু অন্য কাজেই ব্যস্ত ছিলাম, কারণ মায়ের জন্মদিন ছিল, আর সেই নিয়ে এবারে প্রথম একটা সেলিব্রেশন হলো। সেই সবের মধ্যে অনেকদিন সময় যাবার পরে, বাবা চিন্তিত হয়ে সোফায় বসেছিলেন। আমি বাবার কাছে চিন্তিত হয়ে বসলে, বাবা বললেন – কাল তনুশ্রীর ছাড়া পাওয়ার দিন, আর আজ এখনো আমরা কিচ্ছু খুঁজে পেলাম না! কি বুঝছিস!

আমি – সমস্ত কিছু সাজালে, এটা দাঁড়ায় যে কানে সেফটিপিন ফোঁটা একটা এক্সিডেন্ট, আর ওঁর জন্য অনিক মারাও যায়নি। ... অনিক মারা গেছে ওঁর গার্লফ্রেন্ডের জন্য, কারণ ওঁর গার্লফ্রেন্ড আমেরিকায় থাকতো, আর একটা পেস্টিসাইড কোম্পানিতে কাজ করতো, তাই প্যারাকুয়েট পাওয়াও অসম্ভব ছিল না!... আর সেই প্যারাকুয়েট দিয়েই অনিকের হত্যা করা হয়।

বাবা – হুম, আর?

আমি – যেইদিন খুন হয় অনিক, সেইদিনেও অনিকের কাছে সেই মেয়েটি আসে, আর অনিকের সাথে সঙ্গম করে, অনিককে প্যারাকুয়েট দিয়ে চলে যায়। তনুশ্রী মেয়েটিকে চিনতো, তাই সে এতে কনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। পরে দেখা যায় যে অনিক আর উঠছে না। ... তখন ডাকাডাকি, পুলিশ ইত্যাদির আগমন। ... আর সব শেষে, তনুশ্রী গ্রেফতার, আর তনুশ্রী নিজেও ভাবতে থাকলো যে তাঁর সেফটিপিনের জন্যই অনিক খুন হয়। ...

বাবা – বেশ, আর ?

আমি – তনুশ্রী জানতোও না, আর ভাবতেও পারেনি যে সেই মেয়েটি অনিকের খুন করেছে। ... আর তাই যখন আমাদের থেকে জানলো যে যার সাথে অনিকের সঙ্গম হয়েছে, তার কারণেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন যেন সে নিজের কানকেই নিজে বিশ্বাস করতে পারলো না।

বাবা – হুম! ... এর কারণ কি? ... মানে এই অবাক হওয়ার কারণ কি?

আমি – উমম, তনুশ্রীর কি সে খুব ঘনিষ্ঠ, আর তাই সে এমন কাজ করতে পারে, ভাবতেই পারছিল না তনুশ্রী! ... দাঁড়াও দাঁড়াও, তনুশ্রীর খুব ঘনিষ্ঠ তো মহিমা আর রিম্পি। আর রিম্পি সেই কথা আমাদের বললেও, মহিমা কিন্তু সেই ব্যাপারটা আমাদের থেকে দিব্যি চেপে গেল। তাই না!

বাবা – হুম, গুড এনাফ। ... তবে কিছু একটা এখনো মিস করছি আমরা। ... একটা জিনিস ভাব, যে মহিমাকে সুনা বলবে, সে মহিমাকে সব সময়েই তো সুনা বলে ফেলবে না! ... মানুষের স্বভাব। ... কিন্তু রিম্পির সামনে একবারও সুনা বলে ডাকলো না! ... এটা কি একটা অবাক করা কথা নয়! ... আর ভেবে দেখ, সোনা বলতো, হুম অনেক প্রেমিকই তাঁর প্রেমিকাকে এই নামে ডাকে বা উল্টোটাও হয়। ... কিন্তু সুনা!

আমি – ভারতীয় ছিল মেয়েটা! ...

বাবা – হুম, নাহলে এই দেশে এলো কেন? শুধুই অনিককে মারার জন্য পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে, লাখ টাকা খরচ করে এলো! অনিক এমনও বড় কনো সেলিব্রিটি নয়। ...

আমি – তাহলে?

বাবা – হুম সেটাই তো ভাবাচ্ছে! ... আচ্ছা আমাদের কাছে সুনা নামটা আছে, আর কি জানি ওঁর গার্লফ্রেন্ডের সম্বন্ধে! ...

আমি – হাতে ট্যাটু রয়েছে, মানে ওই ছবি থেকে দেখলাম না!

বাবা – হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি ভেরি গুড। ... আচ্ছা, তুই একটা কাজ করতো, একটু যা তো, মায়ের হাতে হাতে একটু রান্না কর। ... আর শোন, যাবার সময়ে ঘরের লাইটটা বন্ধ করে ডিম লাইটটা জ্বালিয়ে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস!

বাবা যেমনটা বললেন, তেমনটাই করলাম। বাবা এবার কিছু গভীর চিন্তা করবেন, কিন্তু এমন আকস্মিক কেন? ট্যাটুর কথা বলতে, বাবা এমন ভাবে রিয়েক্ট করেলেন কেন?

অবিচার

পরের দিন সকালে, আমি উঠলাম এই ৯টা হবে। ১০টার সময়ে আমরা বেরবো। আলিপুর জেল যাবো, তনুশ্রীকে আনতে। ... উঠে দেখলাম বাবা গাড়ির চাবিটা রাখলেন টেবিলের উপর। বাবার চোখে মুখে একটা নিশ্চিন্তার ছাপ প্রত্যক্ষ।

আমাকে নিয়ে বাবা চলে গেলেন আলিপুর জেলে । সেখান থেকে তনুশ্রী বেরোতেই বাবা উনার কাছে গেলেন, আর বললেন – আসুন তনুশ্রী দেবী, গাড়িতে উঠে পরুন।

তনুশ্রী বললেন – আমার এক জায়গায় যাবার আছে। আপনার এড্রেস দিন। আমার একটা জরুরি কাজ আছে, কাজটা সেরেই আপনার কাছে আমি আসছি।

বাবা – যেই কাজের কথা আপনি বলছেন, সেই কাজ সারা হয়ে গেছে। আপনি গাড়িতে বসুন, গন্তব্যস্থলে যেতে যেতে আমি সেই সমস্ত কথা বলছি।

তনুশ্রী ভ্রুকুঁচকে বললেন – আমি কি কাজের কথা বলছি বলুন তো?

বাবা – বললাম তো, যেই কাজের কথা আপনি বলছেন, সেই কাজ সারা হয়ে গেছে। আপনি গাড়িতে বসুন।

তনুশ্রীর মেজাজ আজ তুঙ্গে। গাড়িতে উঠতে, আমাকে গাড়ি চালাতে দিয়ে, বাবা তনুশ্রীর পাশে উঠে বসলেন, আর বললেন – খুন না করে আপনি সাজা খেটেছেন, এবার খুন করতে যাচ্ছিলেন, তাই তো? কাকে? অনিকের গার্লফ্রেন্ডকে? মানে সুনাকে?

তনুশ্রী – ওই আসলে আমার ভাইকে খুন করেছে।

বাবা – হ্যাঁ, সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে, অনিকের শেষ ইচ্ছাকে পুড়ন করে, প্যারাকুয়েট খাইয়ে।

তনুশ্রী – হ্যাঁ

বাবা – আপনি যে বললেন, প্যারাকুয়েট কি আপনি জানেন না!

তনুশ্রী – মনে পরে গেছে।

বাবা – কি মনে পরেছে? আমেরিকায় আপনাদের ফ্ল্যাটে যখন সুনা আসতো, আর আপনার সাথে তার আলাপ হয়, তখন ও যেই কোম্পানিতে কাজ করতো, সেই কোম্পানিই ওটা প্রডাকশন করতো, তাই তো, আর তার থেকেই আপনি জানেন যে প্যারাকুয়েট এমন একটি বিষ যা মানুষ মুখে দেবার ৫ মিনিটের মধ্যে মারা যায়। কি ঠিক বলছি!

তনুশ্রী – ঠিক ভুল করে আপনি কি করবেন! ... আপনি সুনা সুনা করে যাচ্ছেন খালি? জানেন কি সুনার পুরো নাম কি?

বাবা – সুনয়না।

বাবার এই কথাটা শুনে, আমি গাড়ির ব্রেক মেরে দিলাম। হ্যাঁচকা খেয়ে, বাবা বললেন – সামনে লর্ডসের মাঠ আছে, সেখানে গিয়ে গাড়ি পার্ক কর। সবটা বলছি।

এবার আমি তেমন করতে, বাবা বললেন – কি তনুশ্রীদেবী ঠিক বলছি তো?... যেদিন অনিকের মৃত্যু হয়, সেদিন সুনয়না আপনাদের বাড়িতে এসেছিল। আর যখন এসেছিল, তখন আপনাকে দেখেই সে চমকে যায়, কি তাই তো?

তনুশ্রী এবার আগ্রহের সাথে বলল – হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?

বাবা – কারণ সুনয়না তো আপনার সাথে বা অনিকের সাথে দেখা করতে আসেনই নি সেদিন আপনাদের বাড়ি। ..

তনুশ্রী – ধুত, আপনি কিচ্ছু জানেন না । ওই আমার ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড ছিল, আর ওঁর সাথে ভাইয়ের একাধিকবার সঙ্গম হয়েছে।

বাবা – কিন্তু সেদিন আপনার ভাইয়ের কাছে উনি আসেন নি । উনি এসেছিলেন, উনার ফিয়ন্সে, মলয় ভদ্রের সাথে দেখা করতে। আর সেখানে এসে, তাঁর অজ্ঞাত ভাবে সে দেখে যে মলয় ভদ্রের ভাই অনিক ভদ্র এবং বোন তনুশ্রী ভদ্র। ... আর সেটা দেখার পরই, সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে সে কি করতে চলেছে। ...

বাবা বলতে থাকলেন – অনিকের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, আর তাকে বুঝতেও দেয়না, আর আপনাকেও। কি উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছে, আপনারা জানতেও পারেন না। আর অনিকের শেষ ইচ্ছা পুড়ন করানোর পরে, প্যারাকুয়েট দিয়ে ওঁর হত্যা করে, কারণ ও খুব ভালো করে জানতো প্যারাকুয়েট যে একটি বিষ, সেটা আর যেই জানুক ভারতের উকিলরা তেমন জানেনা । আর এর কারণে উকিলরা এই প্যারাকুয়েটের কথা তোলেই না, যতই পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে সেটা লেখা থাকুক।

বাবা বলে চললেন – তনুশ্রী কানের পিছনে ছুঁচ ফুটলে ব্যাথা হয় ঠিকই, কিন্তু মানুষ মারা যায়না। ... আর রইল কথা আপনার উকিল! সুনয়নাই তাকে এপয়েন্ট করে, আর আপনাকে আর নিজের ফিয়ন্সে, যে তাঁর কোম্পানিকে কোটি কোটি টাকা প্রতি মাসে এনে দেয়, তার কাছে দেখায় যে আপনার পরিবারকে কত কেয়ার করে সে। ... শেষে যখন উকিল আপনাকে বাঁচাতে পারছিলেন না, তখন অনিককে দুশ্চরিত্র আখ্যা দিতেও কুণ্ঠা করেন না, আর আপনার সাজা কম করে দেন । ... আর আপনারা সকলে ওঁর চালে বোকা বনে যান, আপনারাও, ভাইবোনও আর দুই উকিলও।

তনুশ্রী – আর সুনয়না এমন করলো কেন?

বাবা – আপনার ভাইয়ের শয্যাসঙ্গিনী, এটা জানার পরেও কি আপনার বড়দা তাকে বিবাহ করতো? ... আর তা যদি না করতো, তবে সুনয়নার কোম্পানিও চলতো? ... তাই পথের কাঁটা, আপনার ভাই অনিক, আর তাকে সরিয়ে দিল সুনয়না। আপনারা কেউ জানতে পারলেন না, আর সুনয়না আরাম-সে আপনার বড়দার সহগামিনী হয়ে, কোটি টাকার ব্যবসা চালাতে থাকলেন। আর আপনার বড়দা তো আপনাকে গ্রহণ করতেও অনিচ্ছুক এখন, কারণ তিনি তো বিশ্বাস করেন যে আপনি ইচ্ছা করে অনিককে মৃত্যু দিয়েছেন।

তনুশ্রী রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন – আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিন। এবার আমি সত্যি করে খুন করে জেলে যাবো।

বাবা হেসে বললেন – মৃতকে কি করে মারবে তনুশ্রী! ... সুনয়না নিজের কাজের সাজা আজ সকালেই পেয়ে গেছে। ... আইনের চোখে তো ওকে দোষী সাব্যস্ত করা যেত না, কারণ একটি ক্রাইমে একজনেরই সাজা হয়, আর সেই ক্রাইমে আপনার সাজা হয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের সাজার থেকে কে বাঁচাতো উনাকে? তাই ঈশ্বর আপনার মুক্তির দিনই ওকে মৃত্যু দিয়ে দেন।

এবার তনুশ্রীর সাথে সাথে আমিও একটু হকচকিয়ে গেলে, বাবা বললেন – রিম্পিকে চেনেন?

তনুশ্রী – আমার ভাইয়ের খুব ভালো বন্ধু আর আমারও। উনার সাথে মহিমাও থাকতেন।

বাবা – রিম্পির থেকে আর মহিমার থেকে সুনা নামটা শুনি আর একটা ছবিও দেখি, যেখানে সুনার হাত দেখা যাচ্ছিল আর বাহুতে একটা ট্যাটু আঁকা ছিল। ... সেই ট্যাটুটা আজও সুনয়না দেবীর হাতে ছিল। ... সুনা নামটা নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল, কারণ সুনা আদরের নাম ঠিকই, তবে আলাদা নাম নয়, কনো নামের শর্টফর্ম। আর কাল আমার মেয়ে যখনই আমাকে ওই ট্যাটুর কথা বলল, তখনই সুনয়নার হাতে যেই ট্যাটুটা দেখেছিলাম, তার স্মৃতি ভেসে আসে। ... আর সুনয়না নামের সাথে, সুনা নাম একবারে মিলে যায়।

বাবা আবার বললেন – সন্দেহ করার আরো জিনিস ছিল, আগে নজর করিনি, তবে সুনয়না নাম সামনে আসতেই, সব মিলে যেতে থাকলো। ... সুনয়নার বিবাহ হয়েছে অনিকের মৃত্যুর পর, কিন্তু রিম্পা বা মহিমা নামগুলো সে জানলো কি করে? অনিকের মৃত্যুর পর তারা তো একবারও যায়নি সেখানে, খালি রিম্পা এসেছিল তনুশ্রীদেবী, আপনার সাথে দেখা করতে, আর তার খবরও সুনয়না জানেনা। ... তাহলে?

অর্থাৎ, আমার মাথার সমস্ত জট ছেড়ে যায়, আর আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, আপনার দাদার সন্ধান করতে গিয়ে, সুনয়না জানতে পারে যে, উনি যাকে বিবাহ করে, কোটিপতি হয়ে থাকতে চান, সেই পথের বাঁধা হলো আপনার ভাই আর আপনি। আর তাই আপনার ভাইকে সকলের সামনে, অথচ সকলের নজরের পিছনে প্যারাকুয়েট খাইয়ে মেরে ফেললেন, আর আপনাকে সেই খুনের খুনি করে, জেলে ঠেলে দিলেন।

তনুশ্রী – এবার তো আমাকে ছাড়ুন। আইনের চোখে সুনয়না কনোদিনও সাজা পাবেনা আর। কিন্তু তার নিকৃষ্ট কর্মের দণ্ড কি সে পাবে না!

বাবা রিল্যাক্স হয়ে বলতে থাকলেন – ওই যে বললাম, যাকে আইন দণ্ড দিতে পারেনা, তাকে ঈশ্বর দণ্ড দেন। ... আজ সকালে উনার কাছে গেছিলাম আমি। বোধহয় বাড়ির কাজের মেয়ে আজকে আসেনি। তাই উনিই দরজা খুললেন। আর উনাকে আমি হাসিমুখে, সুনা নামে আবাহন করতেই, উনি পরি কি মরি করে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন।... আমি কেবলই আপনাদের বাড়ির পিছনের দিকের দরজায় গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াই। উনাকে দেখলাম ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখতে গেলেন, আর একটি গাড়ি উনাকে সপা-টে ধাক্কা মারলো। ... আমি গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে পাস করার সময়ে, গাড়ির কাঁচ নামিয়ে শুনলাম, "এক্কেবারে স্পট ডেড"।

তনুশ্রী কান্নায় ভেঙে পরলো এবার। কাঁদতে কাঁদতে বললেন – আমাদের পরিবারটাকে শেষ করে দিলো পুরোপুরি, ওই ডাইনিটা।

বাবা – হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আপনার ছোটভাইকে মেরে ফেললেন, আপনাকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন, আর আপনার বড়ভাই যতদূর ... (পকেট থেকে ফোন বার করে, একটা কি করে আমাদের দেখিয়ে বললেন) স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পাবার পরে, সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন।

একটু থেমে বাবা আবার বললেন – এবার যাবেন কোথায়?

তনুশ্রী নিশ্বাস ছেড়ে – একটা জেল ফেরত কয়েদি আর কোথায় যাবে! জাহান্নমে।

বাবা – একজন অপেক্ষা করছেন পপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। যাবেন তাঁর কাছে?

তনুশ্রী – কে সুনয়না! ... মরে যেতে বলছেন?

বাবা হেসে – না, ব্যারিস্টার সৌরভ পণ্ডিত।

তনুশ্রী – আমার বিরোধী সরকারি উকিল ছিলেন। খুবই ভালো ভদ্রলোক। আমি জেলে থাকতেও একবার এসেছিলেন। আমার হাত ধরে কেঁদে বলেছিলেন, "আমাকে ক্ষমা করে দে মা!"

বাবা – হয়তো আপনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেনও উনাকে, কিন্তু উনার বিবেক উনাকে ক্ষমা করেননি। ... উনি মৌন হয়ে গেছেন, আত্মগ্লানিতে। হয়তো আপনার জেলের পর প্যারাকুয়েটের ব্যাপারে জেনেছিলেন। ... যাবেন উনার কাছে? ... একটি বার। হয়তো আপনি নিজে মুখে যদি বলেন, আপনি উনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, উনি হয়তো কথা বলবেন আবার।

তনুশ্রী – চলুন, যদি কারুর ভালো করতে পারি। ... এমনি এমনি তো আর জেল খাটিনি; এই জন্মে না করলেও, আগের কনো না কনো জন্মে তো সুনয়নার মতই কিছু করেছিলাম; সেই জন্য নিজের প্রাণের প্রিয় ভাইয়ের থেকে যৌনহেনস্থার কথাও শুনতে হলো, আর জেলও খাটতে হলো। ... যদি কিছু ভালো করতে পারি এবার। ... চলুন।

বাবা হাসি মুখে এবার পণ্ডিতবাড়িতে গাড়ি নিয়ে যেতে বললেন আমাকে। আমাদের সাথে তনুশ্রীও বাড়ির ভিতরে গেলেন, আর সৌরভ পণ্ডিতের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। সৌরভবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে

পরলো। ... উনি কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠলেন – ক্ষমা করে দে মা আমায়। ... আমি একজন নির্দোষের নামে কলঙ্ক জুরে দিলাম।

তনুশ্রী হেসে বললেন – না মেশমেশাই, এমন বলবেন না । ... যে সৎ, তাঁকে দিয়ে ঈশ্বর কনো অন্যায় করাতে পারেন না। ঈশ্বরের উপর থেকে আমার বিশ্বাস এখনো ওঠেনি মেশমেশাই। ... আমি জানি, আমি এমন কনো কাজ করেছিলাম কনো জন্মে, যা করেও আমি আইনের চোখে ধুলো দিয়েছিলাম; আর তাই এবারে আমি দোষ না করেও জেল খাটলাম। ... আপনি ঈশ্বরের দেওয়া সেই দণ্ডের মাধ্যম ছিলেন।

সৌরভ বাবু বললেন – আমাকে আমার কলঙ্ক মুছতে দিবি!

তনুশ্রী – আমি কিই বা করতে পারি মেশমশাই!

সৌরভবাবু – জেল খাটা কয়েদি যদি কাজের খোঁজ করে, শুধুই লাঞ্ছিত হবে। ... তাই সেসব ছেড়ে, আমার পুত্রবধূ হয়ে থাকবি! ... তোর যাবার তো কনো জায়গা নেই। সম্মানের সাথে আমার ছেলের বউ হয়ে থাকবি? ... তুই খুব পবিত্ররে মা। ... থাকবি আমার ছেলের বউ হয়ে?

তনুশ্রী – আপনার ছেলের উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে না!

সোহম – না তনুশ্রী, একদমই নয়। ... ছেলে হয়ে যদি বাবার কলঙ্ক মুছতে পারি, সেটার থেকে বড় পাওনা আর কিছুই হয়না। ... আমি রাজি।

বাবা এবার বললেন – আমি আসি এবার।

সোহম বাবার সামনে এসে বললেন – তা বললে কি করে চলবে মিস্টার বিজয় সিংহ!... আপনি তো এখনও কনো পারিশ্রমিকই নেন নি। ...

সৌরভবাবু বললেন – বলছিলাম না, সব শুনছিলাম কিন্তু। ... আমার হাত থেকে পারিশ্রমিক নেবার কথা বলেছিলে। ... বিজয়, তোমার কথা আমি অনেক পড়েছি পেপারে, চাক্ষুষ দেখলাম। ... তুমি একজন অদ্ভুত মানুষ। কাজটা তুমি খুব মন দিয়ে করো, তাই জন্যই তুমি বিশেষ। ... মানুষকে ভালোবেসে কাজটা করো, নির্দোষদের খুব ভালোবাস তুমি। ... আর তাদেরকে সুরক্ষিত রাখবে বলে, নিজের সমস্ত কিছু দিয়ে দাও।

বাবা হেসে বললেন – ওই যে কথায় আছে না, হাজার দোষী মুক্ত থাকুক, কিন্তু একজন নির্দোষ যেন সাজা না পায়। আমি সেই মতেই বিশ্বাসী উকিলবাবু। ... নির্দোষ সাজা পেলে, তাঁর আইনের উপর নয়, ভগবানের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যায়। ... কাজ আমরা মানুষ করবো, আর দোষের ভাগি ভগবান হবেন, না উকিলবাবু, আমি এর ঘোরবিরোধী। আমার ভগবানকে আমি খুব ভালোবাসি, তাঁর উপর যেন কনো কলঙ্ক না লাগে, সেই চেষ্টাই করতে থাকি আমি সর্বক্ষণ, এই আর কি?

সৌরভবাবু একটি এক লাখ টাকার চেক লিখে দিলেন বাবার নামে। বাবা হাতে চেকটা নিয়ে বললেন, "পরিমাণটার সাথে জাস্টিস করলেন না উকিলবাবু। এমন কিছুও করিনি, যার জন্য এত টাকা দেওয়া যায়"।

সৌরভবাবু হেসে বললেন – আমি তো উকিল, জজ নই, তাই জাস্টিস আমি করবো কি করে... যাইহোক, বাড়ির সকলকে নিয়ে বিয়েতে আসা চাই । ... সোহম আপনাদের বাড়ি গিয়ে আপনাদের নিমন্ত্রণ করে আসবে। ... বেশি লোক ডাকবো না, অধিক লোক হলেই, কানাকানি হয়ে যাবে, জেলের কয়েদি, মেয়েটার মান সম্মান সব চলে যাবে।

বাবা আর আমি প্রস্থান করলাম সেখান থেকে। কেসের হ্যাপি এন্ডিং।

রক্তমাখা রক্তমুখি

প্রাচীন কবিতা

সামান্য এক কবিতা যে কতটা ভয়ানক হতে পারে , এর আগে তা ধারণাও করতে পারিনি। ঘটনার সূত্রপাত, আমার আর বাবার সামনে যেদিন থেকে হলো, তার দিন দুই আগে থেকে, সমস্ত জলঘোলা হতে শুরু করেছিল। আমরা যখন থেকে কেসটার মধ্যে ঢুকলাম, তখনকার থেকেই ঘটনাবলি আপনাদের বলতে শুরু করি তবে।

আমরা বাড়ির চারসদস্য একসাথে বসে চা খাচ্ছিলাম , তখন বেল বেজে উঠতে , আমি গিয়ে আইহোলে চোখ রেখে, দরজা খুলে দিলাম। রথিনকাকা ছিলেন , তবে উনার সঙ্গে আরো একজন ছিলেন , উনাকে চিনিনা আমি।

দরজা খুলে দিতে, রথিনকাকা বললেন – কি মিলি, বাবা বাড়িতে আছে তো?

আমি হেসে উত্তরে বললাম – দরজা খোলাটা আমার কাজ কাকু; আমি এসিস্ট্যান্ট না!

আমরা দুইজনে হাসলে, রথিনকাকা আর উনার সাথে থাকা আরেকজন ভিতরে এলেন। রথিনকাকা মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন – মধু, একটা জমিয়ে চা কর্ তো। সময় হয়না এদিকে আসার , আর তোর হাতে চা আর খাওয়া হয়না। আজ যখন এসেছি, জমিয়ে একটা চা বানা তো।

মা হেসে বললেন – উনি যে কেস শলভ করেন, এতে ভালোই হয়েছে রথিনদা বলো। ... নাহলে তো ৬০ না পেরলে এদিকে আসতেই না!

আমরা সকলে হাসাহাসি করলে, মা উঠে চলে গেলেন চা করতে। রথিনকাকা বিদিপ্তাদির চরণ ধুলা নিলে , দিদিও চলে গেলেন রান্নাঘরে। পরে রইলাম, আমি বাবা, রথিন কাকা আর আগন্তুক।

কথা পারলেন রথিনকাকাই। উনি বললেন – একটি বিচিত্র কেস নিয়ে তোমার কাছে এসেছি বিজয়। আজকে সকালেই আমি রানাঘাটের একটা মামলার নিষ্পত্তি করে , ওখানের ইন চার্জকে কেস হ্যান্ডওভার করে ফিরবো বলে সেখানে যাই। সেই সময়েই এই ভদ্রলোক সেখানে একটি জিডি লেখাতে গেছিলেন। কেস সুবিধার মনে হলো না, তাই উনাকে, উনার সম্পত্তি সমেত এনে এখানে হাজির করেছি।

বাবা মুচকি হেসে বললেন – আচ্ছা লটের সাথে বহরও আছে! ... তা সমস্যা নিশ্চয়ই সেই বহর নিয়েই ? কি নাম আপনার? থাকেন কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন – আজ্ঞে আমার নাম বিশ্বনাথ শেঠ। নিবাস নদীয়ার মাঝদিয়াতে। ... আর আপনি ঠিকই ধরেছেন, সমস্যা সেই বহর নিয়েই। ... আসলে, আমার সাতপুরুষের সম্পত্তি। আমরা তিন সন্তান। আমার এক ছেলে, দিল্লিতে থাকে। আর আমার দাদার এক ছেলে ছিল ১০ বছর হয়েছে মারা গেছেন দাদা ও বউদিকে সঙ্গে নিয়ে। প্লেন এক্সিডেন্ট। পিসির এক মেয়ে। আর আমার ঠাকুরদারা তিন ভাই। এঁদের একজন নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হন , আর একজনের দুই ছেলে এক মেয়ে ছিল। এই দুই ছেলেই অবিবাহিত অবস্থায় সাপের কামরে প্রাণ হারায়, আর দিদি, মানে সেই মেয়ের একটি মাত্র সন্তান ছিল।

বাবা – ছিল মানে এখন আর নেই।

বিশ্বনাথ বাবু বললেন – আজ্ঞে, আগের বছর দেহত্যাগ করেছেন। দিদি বেঁচে নেই। ছেলের বিয়ে হবার আগেই, একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় আমেরিকাতে প্রাণ যায়। আমার কাছে চিঠি এসেছিল সেই দেশ থেকে। এখানের এমব্যাসি থেকে আমি চিঠি পাঠালে, ওরা ওর সৎকার করে দেয়।

বাবা – মানে ওই দিকের কেউই রইলেন না। কেবল আপনাদের দিকেই যা শরিক, তাই তো?

বিশ্বনাথ বাবু – আজ্ঞে শরিক কেবল আমি আর আমাদের দিদির এক মেয়ে। দিদি আর বেঁচে নেই। আমি ওদের থেকে অনেকটাই ছোটো। আমার দিদির মেয়ের বয়স এখন ৩২ , আর আমার বয়স ৪৫। দিদি বেঁচে থাকলে দিদির বয়স প্রায় ৫৫ হতো।

বাবা – আপনার দিদির মেয়েও নিশ্চয়ই সম্পত্তির ভাগ ছেড়ে দিয়েছে!

বিশ্বনাথ বাবু – হ্যাঁ, এই মাস সাতেক আগে সে লেখাপড়া করে দিয়েছে। কাজেই , আমি একাই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলাম। তাই একটা প্রোমটারের কাছে জমি দিয়ে ফ্ল্যাট করতে বলি। জায়গা অনেক , প্রায় দেড় বিঘা। পৈত্রিক বাড়ি ভেঙে মাটি খুরে ভীত দিচ্ছিল প্রোমটার। সেখান থেকে একটি জিনিস উদ্ধার হয়। একটি পাথর, আর একটি কাঠের উপর খোঁদাই করে লেখা কবিতা।

বাবা – বিচিত্র ব্যাপার! আছে আপনার কাছে পাথর আর কবিতাটি?

বিশ্বনাথ বাবু, নিজের ব্যাগ হাতড়ে, একটি গামছায় মোরা থলে বার করলেন, আর তার থেকে একটি এই একফুট বাই একফুটের কাঠের টুকরো, আর একটি লাল রঙের পাথর বার করে দিলেন।

বাবা পাথরটি হাতে করে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন – এতো রক্তমুখি... পিওর রুবি। ... প্রাচীন মনে হচ্ছে। ...

বাবা তখনও চোখ বোলাচ্ছিলেন কবিতার উপর। চোখ বোলাতে বোলাতেই বললেন – হুম, আর এই দুটি পাওয়া থেকেই যতরাজ্যের সমস্যা!

বিশ্বনাথ বাবু – আজ্ঞে না। সমস্যা শুরু হলো যখন আমি এই কাঠটিকে নিয়ে , আমাদের ওখানের একটি কবিকে দেখালাম, আর উনি বললেন কলকাতায় এসে, সাহিত্য পরিষদে কবিতাটির কথা বলে, মূল্য জেনে আসতে।

খালি হাতেই এসেছিলাম কবিতার কথা বলতে। কিন্তু সেই কবিতা দিলে , পরিষদ বলল দাম দেবে ১ লক্ষ টাকা মতন। অমনি পিছন থেকে একজন আমার সাথে আলাপ করলেন। নিজের নাম বললেন অজিত সরকার, ঐতিহাসিক। বললেন, উনার সাথে কনো এক সাধুবাবার কাছে যেতে। গেলাম আমি উনার কাছে। কলকাতাতেই টালিগঞ্জের দিকে উনার ডেরা। ঐতিহাসিক অজিতবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন আমাকে, আর সাধুবাবা প্রশ্ন করলেন আর কি কি পেয়েছি!

আমি বললাম একটি পাথর পেয়েছি। যেমনই বললাম , দেখলাম উনার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলে , ওখান থেকে চলে এলাম। আমার সাথে সাথে একজন বেরিয়ে এলেন , তিনি পাঞ্জাব ন্যাসানাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার , দ্বিজেন দত্ত। পথে তিনি আমাকে জোরে পা চালিয়ে ধরে ফেলে বললেন, আমি যেন শীঘ্রই পাথর আর কবিতাটা আমার প্রপার্টি করে দাবি করে রেজিস্ট্রেশন করে নিই। যদি না নিই, তবে জিনিস বেহাত হয়ে যেতে পারে।

অন্যদিকে সেই কথা শুনে আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েই শিয়ালদহ থেকে গেদে লোকাল ধরে বাড়ি ফিরে আসি। কিন্তু সারা রাস্তা কে যেন , আর মাঝদিয়াতে নামার পর নিস্তব্ধ রাস্তাতেও কেউ আমাকে যেন অনুসরণ করছিল। বাড়ির কাছা কাছি এসে গেছিলাম , তখন কেউ আমাকে পিছন থেকে একটি আঘাত করে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। হুঁশ আসে, বাড়ির বিছানায়। আশেপাশের চেনা লোকেরা আমাকে ধরে , আমার বাড়ি নিয়ে যায়।

আর তারপরের দিন সকাল হতেই , আমার দিদির জামাই আমাকে ফোন করেন। ফোন করে একরকম হুমকি দিয়েই বলেন, আমি যেন ওই পাথর বিক্রি করে আর কবিতা বিক্রি করে যা পাবো , তার ভাগ দিই তাকে, মানে আমার ভাগ্নিকে। এই সব কি হচ্ছে আমার সাথে, বুঝতে না পেরে প্রথম ফুলিয়া থানায় যাই। তারপর সেখান থেকে রানাঘাটে পাঠালে, সেখানে জিডি করতে গেলে, সিইডি বাবুর সাথে দেখা হয়, আর উনি সমস্ত কিছু নিয়ে আপনার কাছে নিয়ে আসেন।

বাবা, মন দিয়ে সমস্ত কথা শুনে বললেন – আপনার উপর যে আক্রমণ হয়েছিল, তা আপনার কিছু খোয়া গেছে?

বিশ্বনাথ বাবু বললেন – না, মানিব্যাগ, মানিব্যাগে টাকা, সব ঠিকই ছিল তো!

বাবা – আপনার ভাগ্নিজামাই কি করেন?

বিশ্বনাথ বাবু – শুনেছি মস্তবড় ব্যবসাদার। কিসের ব্যবসা জানিনা, তবে একবার বাড়ি গেছিলাম, মস্তবড় বাড়িঘর, এলাহি ব্যাপার।

বাবা – হুম, ... কবিতাটি কি আমি রাখতে পারি! ... আর যদি আপনি অনুমতি দেন , তবে এই পাথরটি আমার কাছে একটিদিন থাক। আপনি কাল মাঝদিয়া কখন ফিরছেন?

বিশ্বনাথ বাবু – বৈকালের ট্রেন ধরবো। রথিনবাবু আজকে রাতটা উনার কাছেই থাকতে বলেছেন।

বাবা – তাহলে আমি রথিনের কাছে এই দুপুরের দিকে যাবো। তখন আপনাকে পাথরটা দিয়ে আসবো। ... আর কাঠে লেখা কবিতাটা আমার কাছে কিছুদিন রাখতে চাইছি, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

বিশ্বনাথ বাবু বললেন – আপনার নাম আমি বহু আগেই শুনেছি , আমার স্ত্রী আপনার কাহিনী খুব পরেন , যেগুলো আপনার কন্যা লেখেন। তাই আপনাকে বিশ্বাস না করার কনো কারণই নেই। ...

রথিনকাকা – তাহলে ভাই, কাল মধু আর বিদিপ্তাদিকে নিয়েই এসো না , মিলির কথা আর আলাদা করে বললাম না, ও তো তোমার আর মধুর কমন পার্ট। ও তো থাকবেই। সুমনাও অনেক দিন ধরে বলছে। একসাথে তাহলে লাঞ্চটা করা যাবে।

বাবা ঈষৎ হেসে বললেন – কারুকে না প্রশ্ন করেই সহমত দিলাম। তোমার কাছে লাঞ্চ করবো , এতে কারুর তো আপত্তি করার জায়গাই থাকেনা।

রথিনকাকা আর বিশ্বনাথবাবুর এবার চায়ের পাঠ শেষ করে উঠলেন। আমিও চাইছিলাম তাড়াতাড়ি উনারা, মানে বিশ্বনাথবাবু যান আর আমি কবিতাটা দেখবো। তাই দরজা দিয়ে এসেই , সরাসরি বাবার কাছে বসলাম। মা আর দিদিও বসেছেন কাছে। সকলের নজর ওই কবিতার দিকে।

বাবা পাঠ করে শোনালেন –

পাইব্বে যে রক্তমুখি 'ক' বর্ণ যোইগে।
এই কাব্য তাঁরই হ'বে, কাব্যরস ভইরে।।
ভাইবো না যেসে কাব্য, একটিবাইরো ভুইল্লে।
এই কাব্য দিইবে তোমা, জগতের ধনে ভইরে।।

শিবের নিবাস যেই খাইনেতে চূর্ণ বেটি মাইখে।
সেই তইটের উইত্তরেতে জগত ধনে পাইবে।।
বসুর মা মাথায় চাইপি বসি সেইথা রইছে।
তাইরি মাথে পিইপলাদের মাতৃস্তন চাইছে ।।

স্তনের নিইচে বরাপত্নী শুইয়ে আইছে বয়টে ।
ঘুম ভাইংলে দেইখতে পাবে জগতের ধনের দ্বাইরে।।
ভাইবোনা দ্বাইর পাইলে পরেই, পাইবে সকল ধনে।
শত মন ভাইর রাখো নিবাসে যোনির দ্বাইরে।।

বসুর মায়ের গইর্ভে এবার লাইফে পয়রো লাতি।
চার দিইশাতে চাইরটে পিইপে, অনল লাগাও তাইতি।।
মইধ্যে আইছে শইব্দজব্দ, মেলাও তাইরে জলদি।
রামরাবণের মাতা ধইরাও, উত্তুরে হাওয়া চাইবি।।

হাওয়ার মইধ্যে ঢুইকে পয়রো, ভাইবনা কিসের এইতো!
পশ্চিমেতে পাইবে ছেঁইদা, নজর দিইয়া দেইখ্যো।।
পুবালির ভইরাট বুইকে, কৃষ্ণ রইতন পাইবে।
পশ্চিম ছেঁইদে তাইরে বয়সাও, দখিন বাতাস বইবে।।

উতুর ছাইরে দখিন পালাও, চাইরের অধিক নয়কো।

তিন মরদ আর একটি বেটি দ্বাইর বন্ধ হইবো।।
দ্বাইরের পারে দুই পিপেতে পাবক যেন জ্বইলে।
সাইমনে পাইবে এইকটি দ্বার, দ্যাইখো হরির মাইদে।।

শত্তুর চিইন্তা কেইনো করো, লোভী সে যে বড়।
উইত্তরের বাতাস মাইঝে হইবে সে যে জড়।।
জগের ধন পাইলে পরে ছাইরে যাবে তাইরে।
গইলে পয়চে মইরবে সে বসুর মায়ের কোইলে।।

শেষ পইরিক্ষা এবার এইলো তোমাদেরই সনে।
দেইখবো এইবার জাইনো তোমরা কৃষ্ণলিপি কেমনে।।
কৃষ্ণ সখা আর কৃষ্ণা ভাইপো স্মরণ করো দেইখি।
স্মরণ এইলেই ছাইরে গর্ভ উইঠা পইরবে জাইনকী।।

দখিন বাতাস ভেইদ কইরা টাইনে আইনবে ধনে।
সেইদিন হইতি জগের ধন হইবে তোমা নাইমে।।
ভুইলো না সঙ্গীদেরও, তাঁদেরও ভাগ দিইবে।
জগের ধন বহু, দশের এক খান তাইদেরও দিবে।।

- ভারতচন্দ্র রত্নলঙ্কার

আমি বললাম – এ কেমন বাংলা বাবা? এমন বাংলা তো শুনিনি কনোদিন!

বাবা – ৪০০-৫০০ বছর আগের বাংলা।

আমি – আর বিশ্বনাথবাবুকে আক্রমণটা কে করলো?

বাবা – ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, বা ঐতিহাসিক, বা সাধুবাবার ভারা করা গুন্ডা বা ভাগ্নিজামাই। যেকেউ হতে পারে।

আমি – কি স্বার্থ?

বাবা – ধরে নিতেই পারে সাধুবাবা বা সাধুবাবার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা, মানে ঐতিহাসিক অজিত সরকার, বা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দ্বিজেন দত্ত যে, বিশ্বনাথবাবু কবিতা আর পাথর সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।

তাই বাড়ি যাবার আগে , আঘাত করে একবার সার্চ করে দেখে নিয়েছে , যদি সঙ্গে থাকে, তবে হাতিয়ে নেবে সম্পত্তি। আর এমনও হতে পারে যে ভাগ্নিজামাইও সেই একই চেষ্টা করেছে।

আমি – কিন্তু ভাগ্নিজামাই জানলো কি করে? আর সাধুবাবা যদি আক্রমণ করে ভাড়াকরা গুন্ডা দিয়ে, তবে ব্যঙ্ক ম্যানেজার বা ঐতিহাসিককে আলাদা আলদা করে সন্দেহ করার অর্থ কি?

বাবা – ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার লোভ কার থাকেনা! হতেই তো পারে যে সাধুবাবা প্রচেষ্টা করার আগেই ওর চ্যালাচামুন্ডা সম্পত্তি হাতাবার চেষ্টা করেছেন। আবার এমনও হতে পারে যে সাধুবাবা নিজেই অন্য ভাবে প্রয়াস করেছেন। ... আর ভাগ্নিজামাইকে খবর দিয়েছেন পাড়ার কবি। গ্রামগঞ্জে এই সব খবরচালাচালি খুবই চলে।

আমি – আর যদি সাধুবাবা বা ওর চ্যালারা আঘাত করে , তবে এতো দূরে , মানে বাড়ির কাছে গিয়ে মারলো কেন?

বাবা – যদি সঙ্গে সম্পত্তি না থাকে, তবে এলাকাতে মারলে, এলাকার লোক ধরে বাড়ি নিয়ে যাবেই, আর তাই বাড়িও চেনা হয়ে যাবে, সেই কারণে এতদূর যাত্রা।

আমি – কিছু তো পায়নি। তারমানে কি আবার আক্রমণ হবে? এবার কি সোজাসুজি বাড়িতে?

বাবা – হুম, মনে তো তাই হয়। ... তাই তো কবিতাটা সরিয়ে রাখলাম।

আমি – আর পাথরটা! সেটাতো কাল দিয়ে দেবে!

বাবা – কবিতাটা ভালো করে পর ... ওটা সামান্য কবিতা নয় । ওটা একটা গুপ্তধনের ইঙ্গিত। এমন পাথর অজস্র পাওয়া যাবে ওই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেলে। ... হুম তবে পাথরটাও ইম্পরট্যান্ট , কারণ ওই পাথরটাই আইডেন্টিটি। ... দেখি কি করা যায়। কাল সকালে একবার বেরবো। কিছু করা গেলে , ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

আমি – বিশ্বনাথবাবু সেফ তো!

বাবা – হ্যাঁ, উনি সেফ। উনার কিছু হলে সব ফসকে যাবে। তাই উনি হান্ড্রেড পারসেন্ট সেফ।

আমি – তাহলে দেরী কেন? কালকেই বলে, গুপ্তধনের সন্ধান করতে অভিযানে নেমে পরা যাক!

বাবা – উমহুম, জল কোন দিকে যাচ্ছে , সেটা দেখাটা খুব দরকার। যদি অজিত অর্থাৎ ঐতিহাসিক সাধুবাবার উপর বাটপারি করার চেষ্টা করে , তবে একটা টক্কর হবে ওখানে , সাধু আর অজিতের মধ্যে। আর যদি সেই একই কাজ দ্বিজেনবাবু করেন, তবে সেখানেও একটা টক্কর হবে। আবার যদি দ্বিজেনবাবু, যেমন দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে উনি বিশ্বনাথবাবুকে সাহায্য করতে চাইছেন, সেটা হয়, তবে আরেকটা অন্যরকম টক্করও হতে পারে। ... আর এর মাঝে, যেটা দ্বিজেনবাবু বলেছেন, রেজিস্ট্রেশনটাও করে নিতে হবে। আর সাথে সাথে, কবিতার মানেও তো উদ্ধার করতে হবে। তাই না! ...

আমি – তাহলে কি করবে?

বাবা – আগে কাল রথিনের বাড়ি যাই। ... দেখি , যদি আরো একদিন থাকতে রাজি করতে পারি বিশ্বনাথবাবুকে তবে নিশ্চয়ই সমস্ত করেই উনাকে ছাড়বো। ... তারপর আর কি... কবিতাকে ডিকোড করতে হবে, আর অন্যদিকে যা টক্কর, সেটাকে হতে দিতে হবে। তারপর আরকিওলজিকাল টিমের সাহায্য নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান করা যাবে। ... দেখি, কি করা যায়। এখন থেকেই সব বলতে পারছিনা।

জোরা ক্রাইম

সেইদিন রাত্রি থেকে বাবা আবার যেন এক ভিন গ্রহের প্রাণী হয়ে গেলেন। আমাদের সবার সাথেই আছেন, কিন্তু দিনরাত্রি মোবাইলে চোখ। না মোবাইলে কিছু পরছিলেন না। কাঠের ফলক থেকে একটি মোবাইলে ছবি তুলে রেখেছিলেন, আর সেই ছবিই দিবারাত্রি দেখে যাচ্ছেন। আর কি সমস্ত কথা বিড়বিড় করে বলছেন, মাঝে মধ্যে বসে পরছেন, বসে থেকে থেকে শুয়ে পরছেন।

বাবা আসলে যখন এমন করেন, তখন আমার খুব অস্বস্তি লাগে। বুঝতে পারি যে বাবা অনেক কিছু উদ্ধার করছেন, কিন্তু সেই উদ্ধার করা রহস্যের কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু আমি জানতে পারছি না, এ যে কি অস্বস্তি, তা বলে বোঝাতে পারবো না। যাই হোক, সেই অস্বস্তি নিয়েই বিছনায় এপাশ ওপাশ করতে ঘুমিয়ে পরলাম। ঘুমানোর আগে দুবার উঠেছিলাম। বাথরুম যাবার নাম করেই উঠেছিলাম , কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল, বাবা ফোন রেখে দিয়েছে কিনা দেখা। একবার যদি ফোন রেখে থাকে, অমনি আমার হামলা হবে। কিন্তু আমি যতক্ষণ না শুয়েছি, ততক্ষণ বাবা তো শোননি।

সকালেও যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম , ততক্ষণে বাবা কনো একটা কাজে বেরিয়ে গেছেন। আমার বাবার একটা বাজে অভ্যাস আছে। ফেলুদা কি সুন্দর একটা নোটবই রাখতো , আর তাতে সব লিখে রাখতো। হ্যাঁ কোড ওয়ার্ডে হত। কিন্তু বাবা যদি এমন করতেন, তবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকার জন্য কোড ওয়ার্ডগুলো তো আমিও জেনে যেতাম! ... কিন্তু না , আমার বাবা সমস্ত কিছু স্মৃতিতে রেখে দেন , কনো নোটবইই নেই উনার।

ফিরলেন বাবা ঠিক বাড়ি থেকে আমরা সকলে বেরবো তখন। যখন বুঝতে পারি বাবা রহস্য সমাধানের দিকে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছেন, অথচ আমি তাঁর নাগালও পাচ্ছিনা, তখন আমার ভীষণ রাগ হয়। সেই রাগ দেখিয়েই মাকে বললাম, আমরা সকলে সেজেগুজে থাকলে কি হবে! ... বাবা না এলে তো আমরা বেরোতেই পারবো না! ... বাবাকে আগে এসে উঠতে দাও!

মায়ের এই বিশ্বাসটা আমার কাছে খুব লোভনীয়, আর আমার মনের কথা যেন উনি আমাকে পেটে ধরার দিন থেকেই স্পষ্ট করে জানেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, বাবা কি রহস্য সমাধান করছেন , তা জানতে পারছিস না বলে রাগ হচ্ছে! ... মিলি, বাবা ঠিক সময়ে চলে আসবেন। ... আমরা রেডি হয়ে থাকলে, উনি আসলেই আমরা বেরিয়ে পরতে পারবো।

রাগকে একটু প্রকাশ করছিলাম , সেখানেই কণ্ঠরোধ! ... বাবা এসে গেলেন , যেমন মা বললেন , যথাসময়ে। আমিই ড্রাইভ করলাম গাড়ি। বাবা একটিও কথা বললেন না। যেন তিনি আর আমাদের মধ্যে থেকেও নেই। রথিনকাকার বাড়ি যেতে, বাবা বিশ্বনাথবাবুকে প্রথম উনার পাথর ফিরিয়ে দিলেন, তারপর বিশ্বনাথবাবু আর রথিনকাকা, দুইজনের উদ্দেশ্যেই বললেন – একটা দিন আপনি যদি থেকে যেতেন , তাহলে দ্বিজেন দত্ত যেমন বলেছিলেন , সেই প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশনটা করিয়ে নিতাম। ... ওটা খুবই আবশ্যক।

কথা শুনে বুঝতে পারলাম , রথিনকাকার সাথে বাবার আগেভাগেই এই বিষয়ে কথা হয়ে গেছে। বিশ্বনাথবাবু রাজি হলে, বাবা বললেন – আজকের মধ্যেই সমস্ত কাজ সেরে ফেলবো। তাহলে আপনি কালকে সকাল সকালই বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন, বৌদিও ওখানে একা আছেন। এই অবস্থায় উনাকেও একা রেখে দেওয়াটা বেশিদিনের জন্য ঠিক নয়।

বিশ্বনাথবাবু এবার উনার স্ত্রীকে ফোন করলেন আর বললেন – শোনো, আমি কালকে সকালে বাড়ি ফিরছি। আজকের দিনটা সাবধানে থাকবে।

বাবা বললেন – বিশ্বনাথবাবু, যদি অভয় দেন, তবে বৌদিকে কিছু বলতে চাই আমি।

বিশ্বনাথবাবু ফোনটা দিতে, বাবা বললেন – বৌদি নমস্কার, আমি বিজয়। আপনার স্বামী আমাদের কাছেই আছেন, সুরক্ষিত আছেন তিনি ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তিও। তাই নিশ্চিন্তে থাকুন। কিছু কাজ আছে এই সম্পত্তি বিষয়কই, যাতে তারা সুরক্ষিতই থাকে বিশ্বনাথবাবুর কাছে। তাই একদিন সময় চেয়ে নিলাম আপনার থেকে। ...

আর আপনাকে যেটা বলার জন্য বিশেষ করে ফোনটা চাইলাম সেটা এই যে, যদি আজ রাত্রিতে বাড়িতে চোর ঢোকে, আপনি চেঁচাবেনও না, ভয়ও পাবেনা। চোর যদি আসে, তবে এই পাথরটি নিতেই আসবে, যা আপনাদের বাড়িতে নেই। তাই ভয়ের কনো কারণ নেই। আপনি শুধু বুঝতে দেবেন না চোরকে যে আপনি তাঁর উপস্থিতি জেনেছেন, আর তাতে আপনি ভয় পেয়েছেন। চোর যদি এটা জানে, তবে আপনার উপর আক্রমণ করে দেবে সে। তাই আপনি নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন দয়া করে।

ফোন রাখার পর, রথিনকাকা বললেন – তোমার থেকে অনেক কিছু শিখছি জানো বিজয়। আমরা যারা পুলিশে আছি, তারাও এমন অভয়বার্তা দিই, কিন্তু আমাদের অভয়বার্তাটা ইমপ্র্যাক্টিকাল হয় পুরপুরি। আমরা বলি, কিছু গরবর দেখলেই আমাদের ফোন করবেন, আমরা ব্যবস্থা নেব। এমন বলার সময়ে আমরা একবারও ভাবিনা যে সেই সময়ে মানুষটা আমাদের জানাবে কি করে! আর জানাতে না পেরে ভয় পেয়ে যাবে। ... হুম, অনেক বেশি প্র্যাক্টিকাল তুমি বিজয়। আসলে তুমি ট্রেনিংএর ভিত্তিতে বলো না, বলো অনুভব থেকে, আর এইখানেই পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়।

লাঞ্চের আসরে বসে অনেক কথাই হলো। বিশ্বনাথবাবু একজন মারবেল পাথরের ডিলার ছিলেন, আর উনি প্রথম জীবনে একজন জাদুকর ছিলেন, এমনও জানলাম। আর উনার থেকে অনেক জাদু দেখলাম, আর কিছু জাদু শিখলামও। বাবা পরে আমাকে বললেন, মা দিদিকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে আসতে। আমি আসলে, আমি উনি, রথিনকাকা আর বিশ্বনাথবাবু প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশন করতে যাবো।

আমি আবার নির্দেশ মানলাম, ফিরে আসতে গাড়ি করে ফরচুনা টাওয়ার, ডালহাউসি চলে গেলাম। সেখানে সমস্ত কাজ করছিলাম, এমন সময়ে বিশ্বনাথবাবুর নাম ধরে কেউ ডাকলেন। বিশ্বনাথবাবু পিছন ফিরে তাকাতেই, উনার মুখ কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সামনে সেই ভদ্রলোক এসে বললেন – করে নিলেন প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশন। খুব ভাল করেছেন।

বাবা বললেন – আপনি কি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, দ্বিজেন দত্ত?

দ্বিজেনবাবু বললেন – আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আমি এক্স ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। এখন আমি রিটায়ার করে গেছি, তাও প্রায় তিন বছর হয়েছে, রিটায়ার করেছি। এখন আমি একজন সাধু, সোমেশ্বর বাবার কাছে যাই। আসলে উনার অনেক চ্যালা চামুণ্ডা আছে , যারা উনার কাছে বিচিত্র সম্পত্তির অধিকারীদের নিয়ে আসেন , যেমন অজিত সরকার বিশ্বনাথবাবুকে নিয়ে গেছিলেন। আমি তাঁদের সম্পত্তি যাতে তাঁদেরই থাকে , তাই তাঁদেরকে তাঁদের প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে বলি।

বাবা – আপনার কমিশন!

দ্বিজেনবাবু লজ্জিত মুখ করে বললেন – এ মা, না না, কমিশন কিছু নেই। আর এটা তো সরকারি জায়গা, এখানে কমিশনের জায়গাই বা কোথায়। ... তবে হ্যাঁ, যাদের যাদেরকে এমন পরামর্শ দিয়েছি, তারা যখন যখন নিজেদের প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশন করানোর সুফল পেয়েছেন , তাঁরা আমাকে আলাদা করে যোগাযোগ করে কিছু দিয়েছেন। সব সময়ে কিছু দিতেও পারেন না , একদিন ডেকে মিষ্টিমুখ করান বা মাংসভাত খাওয়ান। কিন্তু আনন্দ হয় , কারুর ভালো করতে পাড়ার জন্য। এমনি তো আমি পেনশন পাই , তাই কমিশনের আশা করিও না।

বাবা – আচ্ছা, আর সোমেশ্বর বাবা আপনার এই কীর্তি সম্বন্ধে জানেন না নিশ্চয়ই!

দ্বিজেন বাবু – জানলে কি আর বেঁচে থাকতাম মশাই! ... একটা যা কালো দৈত্য আছে ওর কাছে। ওকে দেখলে যে আচ্ছা আচ্ছা পালোয়ানেরও আত্মারাম খাঁচা হয়ে যায়!

বাবা নিজের পরিচয় দিলেন এরপর , আর রথিনকাকা নিজের নম্বর না দিয়ে , নিজের ডিপার্টমেন্টের নম্বর দিয়ে বললেন – বাড়িতে কে আছে? যেই থাকুন, তাকে দিয়ে রাখবেন। প্রয়োজন পরলে ফোন করতে বলবেন।

দ্বিজেনবাবু কার্ডটা দেখে বলে উঠলেন – বাবা সিয়াইডি চিফ! ... ওকে স্যার , আমার বাড়িতে একটি পুরাতন চাকর আর রান্নার লোক আছে খালি। চাকর এখানেই থাকে , এই দুদিনের জন্য দেশের বাড়ি গেছে, আর রান্নার লোক দিনে দুবার এসে রান্না করে যায়। আমি ওদেরকে দিয়ে রাখবো , আর আমিও নম্বরটি শেভ করে রেখে দেব। প্রয়োজন পরলে নিশ্চয়ই জানাবো।

আমরা এরপর ফরচুনা টাওয়ারের সমস্ত কাজ সেরে ফিরে এলাম। পাথরের সমস্ত স্পেসিফিকেশন আর ছবি নিয়ে, আর ফলকের ছবি আর স্পেসিফিকেশন নিয়ে একটা প্রপার্টি ওনারসিপের কাগজ দেওয়া হলো স্ট্যাম্প ডিউটি লাগিয়ে।

বাবাকে দেখলাম একটু নিশ্চিন্ত হলেন। বাড়ি ফেরার সময়ে বললেন – যাক একটা বড় কাজ হলো, তবে মনে হচ্ছে কি জানিস , এই কেস সহজ হবে না। বেশ জলঘোলা কেস হতে চলেছে। দেখা যাক কোন দিকে জল গড়ায়।

ভোর বেলায় বাবার ফোন বেজে উঠলো। কার ফোন জানিনা । আমার তখনও ঠিক করে ঘুম ভাঙেনি। ঘুমের আবল্যতেই শুনলাম বাবাকে বলতে – আচ্ছা, ঠিক আছে। বাড়ি গেছে? ... অসুবিধা নেই। ... ওটা আমার কাছেই আছে, ওর কাছে নকলটাই আছে, খোয়া গেলে, নকলটাই যাবে।

ঘুম থেকে উঠে বাবাকে প্রশ্ন করলাম – কিছু কি হয়েছে?

বাবা – এজ এক্সপেক্টেড , মাঝদিয়াতে বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে কাল চুরি হয়েছে। একটা ফোন করি উনাকে। জাস্ট ফর্মালিটি।

বাবা ফোন করলেন বিশ্বনাথবাবুকে – হ্যাঁ বিশ্বনাথবাবু, বাড়ি পৌঁছেছেন? ... আচ্ছা, কিছু কি চুরি গেছে? ... আচ্ছা ঠিক আছে... বৌদি কি কারুকে দেখেছেন?... আচ্ছা দিন।

আবার বললেন বাবা – হ্যাঁ বৌদি, কারুকে কি দেখেছিলেন আপনি? ... আচ্ছা... আচ্ছা... চেহারা কেমন? খুব লম্বা বা দশাসই কি ? ... আচ্ছা ঠিক আছে। ... চিন্তা করবেন না। আর যদি আবারও এমন হয় , ভয় পাবেন না। চোর যা খুঁজতে চাইছে, তাকে খুঁজতে দিন, প্রয়োজনে তা নিয়ে যেতেও দিন। ... বাঁধা দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নেবেন না।

বাবা ফোন রেখে দিলেন। আমি চাতক পাখির মত তাকিয়ে ছিলাম দেখে , বাবা বললেন – চোর এসেছিলো বাড়িতে , সম্ভবত যিনি বিশ্বনাথবাবুকে আঘাত করেছিলেন , তিনিই হবেন। পাথর তো বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে ছিল না, তাই কিছু পায়নি, কেবলই লণ্ডভণ্ড করে চলে গেছে।

আমি – চোর দেখেছেন বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী?

বাবা – হ্যাঁ দেখেছেন। মুখ দেখতে পাননি, একটা বড় হুডি চাপানো ছিল। চেহারার গড়ন ছিপছিপে, আর উচ্চতা মাঝারি, মানে ওই ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি মত।

আমি – কি করে বুঝলে, যে পিছন থেকে আঘাত করেছিল সে-ই?

বাবা – অনুমান, বাড়ি চেনা হয়ে গেছে, তাই বাড়িতে আক্রমণ। অর্থাৎ এদিকে কি হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে খুব একটা ধারণা নেই। ... এর মানে এই দাঁড়ায় যে হয় সে সোমেশ্বর বাবার সাথে যুক্ত নন , নয় সোমেশ্বর বাবার উপর উপরচালাকি করার চেষ্টা করছে। ... যদি দ্বিতীয়টা হয় , তবে হতেও পারে যে এই ব্যক্তিটি ঐতিহাসিক অজিত সরকার, আর যদি এমনটাই হয়, তবে ...

আমি – তবে কি?

বাবা – উম ... যদি সোমেশ্বর বাবা গুপ্তধনের সন্ধান করতে মাঝদিয়ে চলে যান , তবে এই ব্যক্তির খুনও হতে পারে।

আমি – কেন পাথরের খোঁজ করতেও তো যেতে পারেন সোমেশ্বর, তাই না?

বাবা – একটা পাথরের জন্য এতটা রিস্ক নেবে! আমার তো তেমন মনে হয়না। গুপ্তধনের সন্ধান পেলে , তবেই যাবেন।

আমি – কিন্তু গুপ্তধনের সন্ধান কি করে পাবেন উনি? উনি তো আর কবিতাটা দেখেন নি!

বাবা – হুম, ঠিক কথা। ... গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভবই সেই ক্ষেত্রে। যদি তেমন না হয় , তবে অজিত বাবু আবারও প্রয়াস করবেন পাথর হাতাতে।

আমি – আচ্ছা, অজিতবাবুই তো সোমেশ্বরের লোক হতে পারে! পারেনা!

বাবা – হতেও পারে। আবার নাও হতে পারে। ... সামনের দিনে ঘটনা বলে দেবে, অজিত যা করছে, তা সোমেশ্বরের হয়েই করছে, না নিজের থেকে করছে।

আমি – তুমি নিশ্চিত যে অজিতই সেদিন বিশ্বনাথবাবুকে ফলো করে আঘাত করেছিল , আর অজিতই বাড়িতে ঢুকে চুরির চেষ্টা করেছে?

বাবা – অজিত ছাড়া, ভাগ্নিজামাই হতে পারে, তবে মনে হয়না এমন চিপ কাজ করবে ওর মত বড়লোক। আর একজন করতে পারেন, তা হলো কবি। কবিদের অর্থের টান লেগেই থাকে। তাই এমন সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া না করার চিন্তা করতেই পারে। ... তবে আমার অনুমান বলছে অজিত। তাকেই সব দিক থেকে এই কীর্তিকলাপের যোগ্য মনে হচ্ছে। ঐতিহাসিক তাই সাহস তো আছেই। ঐতিহাসিক তাই পাথরও চেনে, বা ভারতচন্দ্রের কবিতার সাথে পাথর , তাই সেই পাথরের ঐতিহাসিক কদরও বুঝে গেছেন। ... দেখা যাক, সামনের দিনে কি সামনে আসে।

বাবা আর আমি কথা বলছিলাম। মা আর দিদি কথা তো বলছিলেন না, তবে উনারা কান খারা করে সমস্ত কিছু শোনেন। কিন্তু একটা কথাও বলেন না। ...

আমি বললাম – আমরা কি তবে এবার মাঝদিয়া যাবো?

বাবা – এখনই নয়। ... আরো হয়তো কিছু বলতে গেছিলেন , কিন্তু এরই মধ্যে বাবার ফোন বেজে উঠলো। ... রথিনকাকার ফোন। বাবা ফোন ধরে বললেন – হ্যাঁ রথিন বলো। ... সেকি? ... হুম এতটাও এক্সপেক্ট করিনি। ... যাচ্ছি, আমি আর মিলি তোমার বাড়িতেই যাচ্ছি। তোমাকে নিয়ে চলে যাবো ওখানে।

বাবা ফোন রেখে বললেন – মিলি, চটপট রেডি হয়ে নে। বেরোতে হবে।

মা মাঝখান থেকে বলে উঠলেন – এখনো জলখাবার খায়নি মিলি। ... ড্রেস করে আয় মিলি , আমি জলখাবার করে রাখছি তোদের।

বাবা – এখন খাবার সময় নেই আর। রাস্তায় কিছু একটা খেয়ে নেবো।

মা – জানি সময় থাকবে না, তাই এগরোল করেছি। ... তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে যাবে। ... মিলি ড্রেস করে আয়।

আমি বললাম – কি হয়েছে বাবা?

মা চেঁচিয়ে উঠে বললেন – ড্রেস করে আয় , খেতে খেতে শুনে নিবি , নয়তো গাড়িতে শুনে নিবি। ... তোদের জন্য রথিনদা দাঁড়িয়ে আছে না!

মায়ের বকা খেয়ে আমি চলে গেলাম। তাড়াতাড়ি নিচের লেগিন্সটা চাপিয়ে, গায়ে একটা কুর্তি পরে, চুলটা হর্সটেল করে চলে এলাম। এগ্রোল খেতে থাকলাম , বাবা গাড়ির চাবি আর কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বললেন – দ্বিজেন দত্ত খুন হয়েছে কাল রাত্রে। ... স্পটে যেতে হবে?

আমি – সে কি? উনি কেন? এই কেসের জন্যই?

বাবা – জানিনা, গেলে আন্দাজ পাবো। চটপট খেয়ে নিয়ে চল।

ভল্লুকের লোম

দ্বিজেন বাবুর বাড়িতে গেলাম। দেখলাম মাটির উপর লাসটা পরে আছে। হাতপা খুব ছুড়েছে। স্ট্রাগেলের চিহ্ন প্রত্যক্ষ। গলা টিপে খুন করা হয়েছে। হাতের ছাপ স্পষ্ট , কিন্তু তা মানুষের নয়, কনো জন্তুর। দেখে তো মনে হলো গরিলার? কলকাতার রাস্তায় গরিলা! ... চিরিয়াখানা থেকে ছেড়ে দিয়ে গেছে নাকি?

বাবা আর রথিনকাকু ডেডবডি চেক করে , দ্বিজেন বাবুর হাতের মুঠো থেকে কিছু লোম পেলেন। বাবা দেখে বললেন ভল্লুকের লোম।

রথিনকাকা – ভাল্লুক আবার কবে থেকে গলা টিপে মারা শুরু করলো?

বাবা – হুম, পোশাকটা গরিলার মতন, কিন্তু পোশাকে ব্যবহৃত হয়েছে ভাল্লুকের লোম।

রথিনকাকা – মানে মেকওভার! ... চাকরও তো নেই , রান্নার লোক চাবি খুলে এসে খবর দিয়েছে। যখন পুলিশ এসেছিল, গেটে তালা চাবি দুইটিই ঝুলছিল, মানে রান্নার লোক এই দৃশ্য দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে ফোন করে। চাকরকে খবর দেওয়া হয়েছে, এসে যাবে। তিনদিন হয়েছে দেশের বাড়ি গেছে।

বাবা – কখন আসছে?

রথিনকাকা কর্মরত পুলিশ অফিসারের দিকে তাকাতে , পুলিস অফিসার বললেন – এসে যাবে স্যার। ... কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে। ... বাড়ি থেকে ভোরে বেরিয়েছে , রান্নার লোক প্রথম ওকেই ফোন করে। ওই নম্বর দিতে সিয়াইডি দপ্তরে ফোন করে খবর দেয় রান্নার লোক। পথ দুই ঘণ্টার। বারাসাত পেরিয়ে ব্যারাচাপাতে বাড়ি।

বাবা – হুম, এলো বলে।

রথিনকাকা – তুমি কি চাকরকে?

বাবা – চেহারা দেখে বুঝতে পারবো। ... যার কাজ , সে দশাসই। ... হয়তো দ্বিজেন বাবুর কালো দৈত্যটা!

রথিনকাকা – মানে সোমেশ্বরের কাজ?

বাবা – এখনই এরেস্ট করো না। ... প্রমাণ নেই। ... আগে প্রমাণ পেতে দাও।

রথিনকাকা – যদি আরো ক্রাইম করে?

বাবা – করলে তবেই রাস্তা দেখতে পাওয়া যাবে। ... তাই ঘাপটি মেরে থাকো।

চাকর এলেন, ছিপছিপে চেহারা। ... মালিককে এই ভাবে পরে থাকতে দেখে , থমথমে হয়ে গেলেন। শুধু বললেন, পাঁচবছর পরে বাড়ি গেলাম, আর তার মধ্যেই! ... শত্রু তো উনার ছিল না। ...

বাবা – কতদিন চেনেন?

চাকর – পাঁচ বছর। ... বাবার একটা গোপাল উদ্ধার হয়েছিল। সোমেশ্বর শয়তানটা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। তাই আমাকে নিজের কাছে রেখে দেন দ্বিজেনবাবু। ... মালিকানা করিয়ে দেন গোপালের , সোমেশ্বরের কাছেই বিক্রি করান, আর ৩ লক্ষ টাকা ব্যবস্থা করে দেন। ... অনেককে এমন ভাবে সাহায্য করেছেন উনি। তারফল এমন! ...

রথিনকাকা – পোস্টমর্টেম করতে হবে। নিকট আত্মীয় কারুকে চেনেন?

চাকর – কেউ নেই। ... আমার দুই ছেলে আসছে। আমরাই শেষ কাজ করবো।

আমরা সকলে চলে এলাম। বাবার মধ্যে দেখলাম এই ঘটনার খুব একটা রেখাপাত হয়নি। হ্যাঁ এক্সপেক্ট করেন নি হয়তো ঘটনাটির কিন্তু , যেন আমাদের কেসের সাথে যুক্ত নয় , তাই হয়তো মনোযোগ সরিয়ে নিলেন। ... বা হতে পারে , কি হচ্ছে বুঝে নিয়ে , সেদিকের পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষা করছেন। বাবাকে বোঝা খুবই দুষ্কর আসলে।

বাড়িতে মা ভালো করে পোলাও রান্না করেছিলেন। সেই খাওয়া নিয়েই দিনটা কেটে গেল। ভালো খাবার হলে, আমরা একটু আগে আগে খাই, যাতে হজমের সময় বেশি পাওয়া যায়। খাওয়াদাওয়া সেরে ফেলার পর, বাবা আর দিদির পরামর্শ মত উপনিষদ পড়ছিলাম। কঠোপনিষদ শেষ করে ঈসাউপনিষদ পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পরেছি , জানিনা। কিন্তু মনে হয় তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পরেছিলাম , তাই সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেছিল।

যদিও ঘুমটা এমনি এমনি ভাঙেনি , বাবার ফোনের বিকট শব্দ করা রিংটোনের জন্যইই ঘুমটা ভাংলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সকাল ছয়টা মাত্র। ভাবলাম আরেকটু ঘুমিয়ে নিই, বাবা এসে ডেকে দিয়ে বললেন – মাঝদিয়া যেতে হবে।

কিছু ঘটেছে, এমন উত্তেজনা নিয়ে উঠে বসে পরলাম আর বললাম – কি হয়েছে? বিশ্বনাথবাবু ঠিক আছেন?

বাবা – হুম, ঠিক আছেন, একটু ভয় পেয়ে আছেন। পাথরটা চুরি গেছে , কালকে রাত্রে গরিলা হানা দিয়েছিল বাড়িতে।

আমি – মানে? গরিলা পাথর চুরি করতে গেছিল বাড়িতে?

বাবা – হুম, তাহলেই ভাব, কেমন গরিলা সে! ... যাইহোক ফ্রেস হয়ে জলখাবার খেয়ে রেডি হয়ে নে। সোজাসুজি গাড়ি নিয়েই চলে যাবো। রথিন এলো বলে। তাড়াতাড়ি কর।

বাবার কথা মত ফ্রেস হয়ে নিয়ে , মা একটু চিড়ের পোলাও করেছিল জলখাবারে , আমি আর বাবা খাচ্ছি, সেই সময়ে রথিনকাকা এলেন। মা উনাকে বললেন – রথিনদা, সুমনা নিশ্চয়ই ঘুম থেকে ওঠেনি এখনও! ... জলখাবার হয়নি তো! ... চিড়ের পোলাও করেছি একটু। ... খেয়ে নাও। ... মাঝদিয়া যেতে প্রায় ২ই আড়াই ঘণ্টা লেগে যাবে।

মা খাবারের কথা বললে, মায়ের মুখের উপর কথা বলার সাহস কারুর নেই। আমারও নেই, বাবারও নেই, রথিনকাকা বা সুমনাপিসিরও নেই , অতনু আঙ্কেলকেও তেমনই দেখেছি , এমনকি দিদি , মানে বিদিপ্তাদিকেও মা বকে দেন খাবারের প্রসঙ্গে। ... তাই রথিনকাকা চুপচাপ টেবিলে বসে পরলেন। মা উনার জন্য পোলাও দিলেন, আর চিনি ছাড়া ব্ল্যাক টি দিলেন।

চুপচাপ খাওয়া সেরে নিয়ে , আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পরলাম। পথে বাবা বেশি কথা বলছিলেন না। যেন উনার মনের মধ্যে কনো একটা সিঁড়িভাঙা অঙ্ক চলছে। ... রথিনকাকাই বলতে শুরু করলেন – কিছু কি বুঝতে পারছো ভায়া! ... আচ্ছা কবিতার কি কনো মীমাংসা হলো?

বাবা – বোঝার মত তেমন কিছু নেই, তবে হ্যাঁ ভাবার মত অনেক কিছু আছে। ... কথাটা হচ্ছে ইয়ে যে সেই গরিলা বা ভল্লুক, যাই হোকনা কেন, সে যদি সামনে আসে, তাকে বাগে কি করে আনবে?

রথিনকাকা – আমার সার্ভিস পিস্তল আছে, আর নিজের পার্সোনাল হাইরেঞ্জ বোল্টও আছে। ... লোডেড... সেটাই সহায়।

বাবা – মাথা ঠাণ্ডা রেখো। ... যাইহোক, মাঝদিয়া যখন যাচ্ছি, ওখানের শিবনিবাস দেখে আসবো কিন্তু। বিশাল শিবলিঙ্গ আছে ওখানে, কৃষ্ণচন্দ্র রাজার দ্বিতীয় পত্নী স্বপ্নাদেশ পাবার কারণে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই মন্দির স্থাপন করেন। ... যাবে তো?

রথিনকাকা – তোমার মনের মধ্যে কি চলছে বলো তো বিজয়! ... আমার এখন প্রাইম সাস্পেক্ট কে জানো? তুমি। ... তোমার মতিগতি আমার মগজের উপর দিয়ে যাচ্ছে। বড় কিছুর মধ্যে রয়েছ তুমি , যা আমি ধরতেই পারছিনা।

বাবা – তেমন কিছুই নয়, কবিতাটা মনের মধ্যে চলছে। ... আর তাছাড়া আরো একটা জিনিস চলছে। কেন যেন মনে হচ্ছে বিশ্বনাথবাবুর এই কেসে দুটো চক্র একসঙ্গে কাজ করছে, একটা বাইরে থেকে, আর একটা ভিতর থেকে। ... দেখো , মাঝদিয়া যাবার প্রয়োজন তেমন ছিলনা। ... বুঝতেই পারছি যে , বিশ্বনাথবাবু একটা গরিলার কথা বলবেন , আর বাড়ি থেকে পাথরটা চুরি গেছে , আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভল্লুকের লোম পাওয়া যাবে। ব্যাস এর থেকে বেশি কিছু নয়।

রথিনকাকা – পাথরটা চুরি গেল, আর তুমি বলছো, সেটা কিছু নয়!

বাবা একটু হেসে বললেন – ওটা নকল পাথর। আসলটা মধুর আলমারির লকারে আছে। ... যেটা চুরি গেছে, ওটা একটা কাঁচের সোপিস।

রথিনকাকা – হুম, তুমি যখন পাথরটা একদিনের জন্য রাখতে চেয়েছিলে, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, তবে তোমার আর পুলিশের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। পুলিশ যা করার প্রয়োজন মনে করে , তা তুমি করে ফেল সরাসরি।

বাবা – এতে পুলিশের দোষ নেই, পুলিশকে প্রতিটি একটিভিটির জবাব দিতে হয়, আমাকে নয়।

রথিনকাকা – কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। তুমি ওই সোমেশ্বর বাবাকে কাস্টডিতে নিতে দিচ্ছ না কেন?

বাবা – ওকে কাস্টডিতে নিলে ওর কালো দৈত্য আমাকে তোমাকে, কারুকে আস্তো রাখবে না। ... আগে ওই দৈত্যের ব্যামো থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। আগে রোগ মারো, তারপর পুষ্টি নেবে।

রথিনকাকা – কিন্তু এর মধ্যে যদি আরো কিছু করে ফেলে সোমেশ্বর?

বাবা – যদি অজিত সরকার উপরচালাকি করতে যায় , তবে সে মরতে পারে, এছাড়া অন্য কনো ক্রাইম হবেনা, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

রথিনকাকা – তাহলে কি অজিত সরকারকে পুলিশ প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা করবো?

বাবা – না... আপদটা সোমেশ্বরের চোরাকারবারের সঙ্গী। যদি ও মরে সোমেশ্বরের হাতে , তবে একটা আবর্জনা মিটবে পৃথিবী থেকে। হতে দাও খুন।... তবে যদি আমার সন্দেহ ভুল হয় , তাহলে নাও মরতে পারে অজিত।

রথিনকাকা – ভুল সন্দেহ মানে? ... মানে বলছো, যদি অজিত সোমেশ্বরের হয়েই কাজ করে, তবে অক্ষত থাকবে, এমন বলছো?

বাবা – হ্যাঁ, ... তবে সম্ভাবনা কম। যদি তেমনই হতো, তবে গরিলাকে আনতে হতো না। ... অজিতকে দিয়েই কাজ হয়ে যেত।

আমি বললাম – এর মানে, অজিত প্রথম বিশ্বনাথবাবুকে ফলো করলেন , বাড়ির কাছাকাছি পৌছাতে, পিছন থেকে আঘাত করে সার্চ করলেন যে পাথর বা ফলক আছে কিনা। দেখলেন নেই , তাই গা ঢাকা দিয়ে দেখলেন যে পাড়ার লোকেরা ধরে নিয়ে কোন বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়ি আইডেন্টিফাই করে নিতে, পরেরদিন রাত্রে হামলা করলেন বাড়িতে , যখন বিশ্বনাথবাবু কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু পাথর বা ফলক কিছুই পেলেন না। ... আর তুমি বলছো যে, এই সমস্ত কিছু সোমেশ্বরকে লুকিয়ে করেছে অজিত সরকার।

বাবা – মনে তো হয় তাই, কিন্তু চিন্তার বিষয় অন্য।

রথিনকাকা – সোমেশ্বর তবে বিশ্বনাথের বাড়ি চিনলো কি করে, তাই তো?

বাবা – একজ্যাক্টলি। ... অজিত যদি আলাদা ভাবে কাজ করে, তবে বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি চেনার তো কথাই নয় সোমেশ্বরের। যদি নাই চেনেন সোমেশ্বর , তবে গরিলাকে সেখানে পাঠালেন কি করে! ... এটাই আমার কাছে এখন ধাঁধা।

গাড়িতে আমাদের মধ্যে যা যা কথা হয়েছিল , তার সার কথা এটুকুই। আমরা মাঝে একবার নৈহাটিতে নেমেছিলাম। ওখানে চা খেয়েছিলাম, আর নৈহাটি স্টেশনের কাছে গাড়ি নিয়ে যেতে বলে , বাবা আমাকে বাথরুম করে নিতে বললেন। আর দ্বিতীয়বার চাকদহে এনএইচ ১২র উপর দাঁড়িয়ে চা খেলাম । তারপর সরাসরি মাঝদিয়া স্টেশন। সেখান থেকে বিশ্বনাথবাবুকে গাড়িতে তুলে নিয়ে, উনার বাড়ি।

বাড়ি পৌছাতেই গেটে দেখলাম বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন – অনেক দূর থেকে আসছেন। আগে একটু খেয়ে নিন। সোজাসাপটা পাঁঠার ঝোল আর ভাত করেছি।

বাবা হেসে বললেন – বৌদি, আগে একটু বাড়িটা দেখেনি। তারপর একজনের সাথে দেখা করার আছে , সেটা সেরে এসে লাঞ্চ করে নেব। লাঞ্চ করে এখান থেকে শিবনাবাস বোধহয় কাছেই। ওখান থেকে ঘুরে আসবো। ... আপনিও যেতে পারেন, যদি আপত্তি না থাকে।

বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রীকে দেখে মনে হয় বয়স উনার অনেক কম , এই আমার মায়ের থেকে অনেকটাই কম হবে। ... অবশ্য বিশ্বনাথবাবুও আমার বাবার থেকে সামান্যই বড়। গ্রামাঞ্চলে স্বামীস্ত্রীর বয়সে একটু পার্থক্যটা বেশি থাকে , তাই বোধ হয়। ... দেহের গড়ন একটু মোটার দিকে , আর গায়ের রঙ মেটে মেটে। ... মুখশ্রী খারাপ নয়, গ্রাম্য মানুষ হিসাবে বেশ সুন্দর। ... নাম উনার অনিতা শেঠ। হেসে বললেন – বিয়ে হয়ে এসেছি এখানে, তা প্রায় বছর ২৫ হলো। বিয়ের পরের দিন , শিবনিবাস গিয়ে জোরে প্রণাম করে শ্বশুরবাড়ি ওই যে ঢুকলাম, আর বেরিয়েছি কোথায়? ...

বিশ্বনাথবাবু – চলো না আজ। ... উনাদের গাড়ি আছে। ওতে করেই আজ যাই।

বাবা – খুব ভালো হয়। আপনারা থাকলে, পথ ভুলও হবেনা।

রথিনকাকা – ওখানে যেতে গেলে চুর্ণি নদী পেরোতে হয়না?

বাবা – মাঝদিয়া থেকে যেতে হলে চুর্নি নদী পরে। আমরা এখন তারকনগরে। এদিক থেকে যেতে হলে চুর্ণি পাবে না।

বিশ্বনাথবাবু – আরেবাবা! আপনার তো দেখছি, পথঘাট ভালোই জানা!

রথিনকাকা – ও কি আমাদের মত বিশ্বনাথবাবু! কবে কোন কেস আসবে , তবে সেই জায়গা সম্বন্ধে জানবে!

যাইহোক, বাবা আর রথিনকাকু এবার একটু চিরুনি তল্লাসি চালালেন। আর তার থেকে বাবা যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই হলো। ভল্লুকের লোম পাওয়া গেল, বেশ কিছু জায়গায়।

অনিতাদেবী বললেন – কিন্তু দাদা, উনি ঘুমলেও, আমার ঘুম ভেঙে গেছিল। আমি স্পষ্ট দেখেছি একটা গরিলা। এই ৭ ফুটের মত উচ্চতা ... কি করে যেন আলমারি খুললো , তারপর লকারও একই ভাবে খুললো, আর তারপর কিছু নিয়ে চলে গেল। ... আপনি ভয় না পেয়ে শুধু দেখতে বলেছিলেন। তাই শুধু দেখেছি।

বিশ্বনাথবাবু একটু গর্জন করে উঠে বললেন – ওই পাথরটা নিয়ে গেল , আর তুমি দেখলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! ... আমাকে ডাকতে পারলে না!

অনিতাদেবীও অভিযোগের সুরে বললেন – কি করতে তুমি! ওই বিশাল দানবের সাথে যুদ্ধ করতে! ...

বাবা হেসে বললেন – চিন্তার কনো কারণ নেই বিশ্বনাথ বাবু। আসল পাথর আমার কাছে আছে, যেটা চুরি গেছে, সেটা অবিকল দেখতে একটা কাঁচের টুকরো। হ্যাঁ তাতে 'ক' অক্ষরও লেখা আছে। তাই চিন্তা করবেন না, আর আমি এখন যেটা বললাম , সেটা পাঁচকান করবেন না। ... এমনটা হতে পারে , সেটা ধারণা করেই, বৌদিকে আমি শুধুই দর্শক হয়ে থাকতে বলেছিলাম, আর আসল পাথর আমার কাছে রেখে, নকল পাথর আপনার কাছে দিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে চোর সেটা চুরি করে শান্ত হয়ে যায়, আর আপনারাও সুরক্ষিত হয়ে যান।

বিশ্বনাথবাবু এবার একটু ক্যাবলার মত তাকিয়ে, ক্যাবলার মতই হেসে বললেন – রথিনস্যার বলেছিলেন, যার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, যদি কেউ সমস্ত কিছুর সুরাহা করতে পারেন , তবে সেটা একমাত্র তিনিই। বিশ্বাস হয়নি তা নয়, তবে এখন পুরপুরি বিশ্বাস হয়ে গেল।

বাবা – তবে আর কি ? চলুন একটু কবির সাথে সাখ্যাত করে আসি। তারপর জমিয়ে মাংসভাত খেয়ে শিবনিবাস।

শিবনিবাসে কীর্তিকলাপ

আমরা চারজনে, মানে আমি, বাবা, রথিনকাকা আর বিশ্বনাথবাবু চলে গেলাম বিশ্বনাথবাবুর কবি , প্রদ্যুত লাহিড়ীর কাছে।

আলাপ সেরে, বাবার সরাসরি প্রশ্ন – বিশ্বনাথবাবুর ভাগ্নিজামাইকে আপনিই খবরটা দিয়েছিলেন , ফলক আর পাথরের ব্যাপারে?

প্রদ্যুতবাবু – না তো! ... ভাগ্নিজামাইএর সাথে আমার ঠিক করে আলাপও নেই। ভাগ্নির বিয়ের দিন যা একটু দেখেছিলাম। ভাগ্নি বা ভাগ্নিজামাইইয়ের ফোন নম্বরও নেই আমার কাছে, ঠিকানাও জানিনা।

বাবা – অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ উঠি, আবার কখনো সাখ্যাত হবে।

আমরা চলে এলাম। বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। সিঁড়িভাঙা অঙ্ক মিলছে না। বাবার মুখ থমথমে। মাংসভাতটা জমিয়ে খেলাম। দিয়ে শিবনিবাস।

মন্দির দেখলাম, পাশাপাশি রামসীতার মন্দিরও দেখলাম, আর দেখলাম বিশাল শিবলিঙ্গ। এক অমরনাথে দেখেছিলাম এমন বিশাল শিবলিঙ্গ, তারপর এখানে দেখলাম।

বাবা বললেন – চলুন একটু চুর্ণ বেটিকেও দেখে আসি। ...

কথার মানে বুঝলাম না, মানে কেন চুর্ণিকে চুর্ণ বেটি বললেন বাবা, তা বুঝলাম না। আমরা পায়ে হেটেই চুর্ণির সাঁকো দেখতে গেলাম। সেখানে গিয়ে বাবাকে দেখলাম আমাদের ছেড়ে একটু উত্তরের দিকে চলে যাচ্ছেন। আমি আর রথিনকাকা একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবার অনুসরণ করলাম। আর আমাদের অনুসরণ করলেন বিশ্বনাথবাবু আর অনিতাদেবী। ... কিছুদূর গিয়ে , বাবা দাঁড়িয়ে পরে বললেন – প্রদ্যুতবাবু না!

বিশ্বনাথবাবু হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললেন – এদিকে কি ব্যাপার কবিদা!

প্রদ্যুতবাবু আমাদের দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। তারপর বললেন — না তেমন কিছু নয়। এদিকে একটু ওষুধের গাছ থাকে। তাই এদিকটা এসেছিলাম।

বাবার দৃষ্টি দেখলাম তীক্ষ্ণ। মুখে একটিও কথা নেই, চোখের দৃষ্টি প্রখর, আর তা চারিপাশে ঘুরতে থাকছিল।

বাবা বললেন – আপনি ফিরবেন তো প্রদ্যুতবাবু?

প্রদ্যুতবাবু – হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেছে। এবার গিয়ে টোটো ধরবো।

বাবা – আমাদের গাড়িতে জায়গা হয়ে যাবে। ... চলুন একসাথেই ফিরে যাই। ... বিশ্বনাথবাবু, আপনি বৌদি আর আপনার কবিদাকে নিয়ে গাড়ির দিকে যান। ... আমরা আসছি।

উনারা চলে গেলে, রথিনকাকা বললেন – কি হলো হঠাৎ ওদেরকে সরিয়ে দিলে এখান থেকে?

বাবা – চুর্ণির ওইদিকের জঙ্গলটা দেখো একবার রথিন।

আমি আর রথিনকাকা সেইদিকে তাকাতেই দেখলাম — একটা মানুষ পরে রয়েছে। গায়ে একটা তুঁতে রঙের হুডি। ... পুলিশকে ফোন করে ডেকে, বডি উদ্ধার হলো। পার্স পাওয়া গেল, আর পার্স থেকে আধারকার্ডও। অজিত সরকার, এনথ্রোপোলজিস্ট। বাবা কেবলই একটা নিশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, গলার দিকে একটা বিশাল মানুষের হাতের ছাপের দিকে দেখালেন। এই খুনটা গরিলা বা ভল্লুক কেও করেনি, করেছে মানুষ, কনো দৈত্য সাইজের মানুষ।

পুলিশকে বডি হ্যান্ডওভার করে বাবা আমাদের নিয়ে চলে আসার সময়ে বললেন — সোমেশ্বরের সাথে বেইমানি করার সাজা পেলো অজিত। ... কিন্তু ভাগ্নিজামাইকেই বা খবর কে দিলো, আর সোমেশ্বরই বা বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি চিনলো কি করে?

গাড়ি করে বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি ফেরার পথে বাবা একটা কথাও বললেন না। বাড়ি এসে কেবলই বিশ্বনাথবাবুকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি ফলকটা নিয়ে আপনার কবিদার কাছে গেছিলেন?

বিশ্বনাথবাবু – হ্যাঁ, উনাকেই প্রথম দেখিয়েছিলাম ফলকটা।

বাবা – উনি কি ছবি তুলে রেখেছিলেন?

বিশ্বনাথবাবু – না, আমার সামনে তো তোলেন নি।

বাবা – কিছু খেতে দিয়েছিলেন আপনাকে?

বিশ্বনাথবাবু – হ্যাঁ, রসগোল্লা আর পান্তুয়া।

অদিতিদেবী – তোমার সুগার আছে না! তুমি মিস্তি কেন খেলে?

বাবা – সুগার পেসেন্টরা রক্তের চাহিদায় মিষ্টি দেখলে আর মিষ্টি খাওয়া থেকে আটকানো ব্যক্তি সামনে না থাকলে, লোভ সামলাতে পারেন না। তাই আপনাকে মিষ্টি দিলেন আপনার কবি। আপনি খেলেন আর আপনি হাতে করে খেয়ে চ্যাটচ্যাটে হাত ধুতে বাথরুম গেছিলেন?

বিশ্বনাথবাবু – হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

বাবা – কিছু না। ... আপনি একটা কাজ করুন প্লিজ। ... দুইতিন দিনের মধ্যে আমরা , মানে আমরা তিনজন এখানে আসবো। আপনাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে একজায়াগায় যাবো। ... আপনি নিজের জন্য একটা গামবুট আর একটা বড় টর্চ কিনে রাখবেন। ... দেরী করবেন না। হাতে বেশি সময় নেই।

বিশ্বনাথবাবু – কিন্তু কি ব্যাপার, সেটা তো বলবেন!

বাবা – এটুকু জেনে রাখুন যে , আপনার কাছে যেই কবিতাটা ছিল , সেটা একটা জায়গায় যাবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেখানে গিয়ে কি পাওয়া যাবে, বা কিছু পাওয়া যাবে কিনা, তা বলতে পারবো না। সেটা সেখানে পৌঁছেই জানতে পারবো। ... তবে আপনাকে সেই স্থানে আমাদের সাথে যেতে হবে। আমরা একা গেলে হবেনা। ... কারুকে জানাবেন না এই ব্যাপারে, কারুকে নয় মানে কারুকে নয়। শুধু আপনি আর বৌদিই জানলেন এই ব্যাপারে। আমরা দুইতিনদিনের মধ্যে আসছি । কিছু পারমিশন নিয়ে আসতে হবে। সেটা পেয়ে গেলেই চলে আসবো, আর যাত্রা করবো।... এখন আমাদের বেরোতে হবে। কাজ গোছাতে দেরী করলে চলবে না।

আমরা বেরিয়ে পরলাম মাঝদিয়ে থেকে। বাবা সম্পূর্ণ মৌন হয়ে গেছেন যেন। রথিনকাকা বললেন – কি হচ্ছে বলো তো? আমার তো কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না!

বাবা – মিলি রানাঘাট পেরিয়ে, একটা রানাঘাট কলেজের মোর পাবি। সেখানে গাড়িটা হাইওয়ে থেকে নামিয়ে পার্ক কর। গাড়ি থামালে বলছি।

বাবা যেমন বললেন, তেমনই করলাম আমি। গাড়ি থামতে, গাড়ির মধ্যে বসেই বাবা বললেন – রথিন কিছু একটা গড়বর হচ্ছে মাঝদিয়াতে। ... কবি, অর্থাৎ প্রদ্যুত লাহিড়ীও কবিতার মানে ডিকোড করছে। ... তোমাদের প্রশ্ন এই যে, আমি কি করে বুঝলাম। ... তাহলে বলি শোনো, আমি শিবনিবাস গেছিলামই এই কবিতার মানে উদ্ধার করতে আমি পেরেছি কিনা, সেটা দেখতে।

একটু খেয়াল করে দেখো। তোমাদের সকলের হোয়াটসঅ্যাপএ আমি কবিতার ছবি পাঠিয়েছি। সেটা খুলে দেখো কি বলছে। ... প্রথমেই বলছে যে রক্তমুখি, যাতে ক বর্ণ লেখা আছে, সেটা যে পাবে, চিঠিটা তার। তারপর বলছে, যে পাবে এই কবিতা, আর এই কবিতার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে, সে পাবে জগতের ধন। জগতের ধন মানে বোঝো ? জগত শেঠের ধন। ... বিশ্বনাথ শেঠ অন্য কেউই নন, জগত শেঠের বংশধর। আর এই শিবনিবাস করা হয়েছিল জগত শেঠের পয়সা দিয়ে। সেই জগত শেঠেরই একটি ক্ষেত্রে, মাটির নিচে এই কবিতা আর পাথর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, যেই কবিতাটা ভারতচন্দ্র রত্নালঙ্কারকে দিয়ে জগত শেঠ লিখিয়েছিলেন।

কি বলছে দেখো কবিতাতে। বলছে, শিবের নিবাস যেই খানেতে চুর্ণ বেটি মানে চুর্ণের স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ চুর্ণিতে মাখে। মানে হলো শিবনিবাসের পিছনে চুর্ণি নদীর তটে। সেই তটের উত্তরে জগতের ধন পাবে। (এবার বুঝলাম কেন বাবা চুর্ণ বেটি বলেছিলেন) ... মানে শিবনিবাসের পিছনে চুর্ণি নদীর তট ধরে উত্তরে গেলে, সেখানেই জগত শেঠের ধন লুকিয়ে রাখা আছে। কি বলছে দেখো। বলছে বসুর মা মাথায় চেপে বসে রয়েছে। বসুর মা মানে বসুন্ধরা, অর্থাৎ মাটির স্তূপ আছে, আর তারউপর পিপলাদের মাতৃস্তন চাইছে।

পিপলাদ যিনি পিপল গাছের পাতার রসকে মায়ের দুধ মনে করে পান করে পিপলাদ নাম পেয়েছিলেন। স্তন সেই কারণে, আর স্তন এই কারণেই কারণ তারা সংখ্যায় দুটো, অর্থাৎ জোরা পিপলগাছ আছে সেখানে। সেই জোরাপিপল গাছ দেখতেই আমি শিবনিবাস যাই। ... আর যেইখানেতে সেই দুটি গাছ ছিল, সেই খানেতেই কবি অর্থাৎ প্রদ্যুত লাহিড়ীও ছিলেন। অর্থাৎ উনিও কবিতার মানে উদ্ধার করছেন। ... আমাদের তাই শীঘ্রতা করতে হবে। ... শিগগির আরকিয়লজি ডিপার্টমেন্ট থেকে পারমিশন নিয়ে, আমাদের কাজে লেগে পরতে হবে। ... পরে ওদের টিম এসে যোগ দিক। একটা বা দুটো ওদের মাটি খোঁড়ার লোক নিয়ে এসে দুদিনের মধ্যে কাজে লেগে পরতে হবে আমাদেরকে।

রথিনকাকা – এইটাই কি সমস্ত ঝামেলা? নাকি আরো কিছু আছে?

বাবা – আছে। ... কবি যদি ভাগ্নিজামাইকে না বলে কিছু , তবে ভাগ্নিজামাই জানলেন কি করে এই পাথরের ব্যাপারে বা ফলকের ব্যাপারেও। ... দ্বিতীয় কথা , কবির বাড়ি থেকে পশুর গন্ধ পাচ্ছিলাম , কিন্তু বাড়িতে কনো গৃহপালিত পশু নেই। ... গন্ধটা অনেকটা ভল্লুকের লোম যেটা পাচ্ছি আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে, তারই সঙ্গে মেলে।

আমি বললাম – এর মানে কি, ওই ভল্লুক বা গরিলাটা ওই কবির বাড়িতেই আছে!

বাবা – ভেরি গুড। ...

রথিনকাকা – এর মানে কি এই যে, সেই গরিলাটা সোমেশ্বর পাঠাচ্ছেনা, এই কবিই পাঠাচ্ছে?

বাবা – হতেও পারে, বা অন্য কিছুও হতে পারে। এখনই সেই কথা বলা যাচ্ছে না। বেশ কিছু অঙ্ক এখনও মেলা বাকি আছে। ... তবে এটা কনফার্ম যে , আমরা তাড়াতাড়ি না করলে কবি ওখানে পৌঁছে যাবে আমাদের আগে। ... আর যদি সোমেশ্বর কেবলই পাথর পর্যন্ত সীমিত থাকে আর গরিলা ওরই পাঠানো জন্তু হয় , তবে ওরা এখন মাঝদিয়া থেকে চলে গেছে। ... কিন্তু এখানেও প্রশ্ন এই যে , যদি কার্যসিদ্ধি হয়েই গিয়ে থাকে তবে অজিতকে মারা হলো কেন?

আমি বললাম – এই অঙ্ক তো একভাবেই মিলছে। যদি কবি প্রদ্যুত লাহিড়ীই ওই গরিলার মালিক হয় , তবেই এই সমস্ত অঙ্ক মিলছে। ... যেই দ্বিজেন দত্ত এই পাথর আর কবিতার মালিকানা বিশ্বনাথবাবুকে প্রদান করতে চাইছিলেন, তাঁর হত্যা হলো, কারণ এই কবিতা যার তারই সম্পত্তি। পাথরও চুরি হলো , কারণ যার মাঠর, তারই সম্পত্তি হবে। আর কবিতার সত্যতা জেনে যাচ্ছিল বলে অজিত সেই সম্পত্তির ভাগ চাইছিল, তাই অজিতকেও মরতে হলো।

রথিনকাকা – হুম, একদম ঠিক। অঙ্ক তো আর কনো ভাবে মিলছে না! ... আরেকটা জিনিস হতে পারে , সোমেশ্বর আর প্রদ্যুত লাহিড়ী একই ব্যক্তি। ... তুমি যেটা বলছিলে বিজয় যে সোমেশ্বর বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি চিনলো কি করে? দেখো, এই ক্ষেত্রে সেই অঙ্কও মিলে যাচ্ছে। আবার কালো দৈত্য তো সোমেশ্বরের ছিল। সেই দৈত্য কবির হয়ে কাজ করার আর তো কনো উপায় দেখছি না।

বাবা – হুম, কিন্তু ভাগ্নিজামাইএর অঙ্কটা মিলছে না। ... দেখা যাক , সামনে কি হয়, সেখান থেকে বোঝা যাবে কি আসলে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এইমুহূর্তে মনোযোগ গুপ্তধপ্নের উপর দেওয়া উচিত। ওটাই সমস্ত কিছুর মূল বিষয়বস্তু। ... রথিন কলকাতা গিয়ে , প্রথম আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করে , দুটি

ওদের খননের লোক যোগার করে, বাকি টিমকে আসতে বলে, লোকেশন শেয়ার করে, আমরা চলে যাবো মাঝদিয়া, শিবনিবাসে। আর দেরী করা চলবে না।

বাবার কথামত আমরা বাড়ি ফেরার পরেরদিনই রথিনকাকা আরকিওলজির সাথে ব্যবস্থা করে নিলেন। বাবাও গেছিলেন রথিনকাকার সাথে। আর সেখানে বাবা আর রথিনকাকার এক বন্ধু ছিলেন , নাম বিমল সাহা। উনি সমস্ত ব্যবস্থাও করে দিলেন , আর সাথে সাথে উনি টিমের নেতৃত্বও করবেন , যেটি মাঝদিয়া যাবে। রথিনকাকার কাছে দুটি খনন কার্য করার মত লোকও চলে আসবে। এমন জেনে এসে , বাবা বাড়ি ফিরলে, আমার মাঝদিয়া যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

বাবার কথা মত নিজের আর বাবার গামবুটটা পরিষ্কার করে রাখলাম। পরনে থাকবে আমার একটা টিসার্ট আর জিনস। বাবার প্রিয় একটা নরম জামা , আর সঙ্গে বাবার প্রিয় টেরিকটের প্যান্ট। সঙ্গে নেওয়া হলো দুটো পাওয়ার ব্যাঙ্ক, ফোন চার্জ দেবার জন্য , আর দুটো বড় টর্চ, নতুন ব্যাটারি ভরা। জামাকাপর তেমন নেই। সবে শীত গেছে , তাই তেমন ঠাণ্ডাও নেই , আর গরমও নেই। তাই জামাকাপড় তেমন কিছু সঙ্গে নেওয়াই হলো না।

পরেরদিন সকালে রথিনকাকু নিজের ল্যান্ড রভার গাড়িতে দুইজন আরকিওলজিকাল ডিপার্টমেন্টের দেওয়া শ্রমিককে নিয়ে চলে এলেন বাড়িতে। মা আর দিদিকে বিদায় জানিয়ে, বাবা নিজের পিঠে একটি স্কাইব্যাগ আর আমার পিঠে একটা স্কাইব্যাগ নিয়ে , গামবুট চাপিয়ে উঠে পরলাম। আগের দিন রাতেই বিশ্বনাথবাবুকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। তাই দুইঘণ্টার মধ্যে মাঝদিয়াতে পৌঁছেগেলাম। সেদিনের বিরতি। পরের দিন অভিযান গুপ্তধন।

গুপ্তধনের ব্যাপারে এখনো কিচ্ছু জানেননা বিশ্বনাথবাবু। বাবা বলেছেন , কাল সকালে উনাকে নিয়ে যেতে হবে গুপ্তধনের উদ্ধারের জন্য। তখনই সমস্ত কথা বলা যাবে। তাই সেইদিনটা রেস্ট।

রথিনকাকু বললেন – ভায়া, আজ রাত্রে গেলেই তো হতো। এতো আগেভাগে যাবার কি কারণ?

বাবা – গরিলা। যদি ওই গরিলার মালিক এমন কেউ হন যে গুপ্তধনের সন্ধান করছেন , তবে গরিলা এখানেই আছে। ... আর এবার তার আক্রমণ হবে আমাদের উপর , কারণ যে গুপ্তধনের সন্ধান করছে, সে এও জেনে গেছে যে আমরাও গুপ্তধনের সন্ধান করছি। ... অর্থাৎ সে আমাদের টার্গেট করবেই গরিলাকে দিয়ে।

রথিনকাকু – এতো জেনেশুনে ফাঁসিকাঠে মাথা গলানো কেস!

বাবা – রথিন একবার মাটির নিচে ঢুকে গেলে , সেখানে যদি ওই গরিলার সামনা করতে হয় , তখন তো সে একাই আমাদের পিষে মেরে দেবে। ... তার চাইতে এটাই ভালো না যে আমরা তার সাথে মোকাবিলাটা আগেভাগে সেরে ফেলি।

গরিলা কেলেঙ্কারি

বাবার অনুমান, উফ অব্যার্থ জেনো। ... যেমন বললেন , তেমনই হলো। তবে যা হলো , তা সত্যই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। রাতের ডিনারটা খুব ভারি ছিল। গুগলির ঝাল , তিন রকম মাছ, সে এলাহি ব্যাপার। ... খাওয়া দাওয়া সেরে, আমরা একটু নিশিভ্রমণে বার হলাম। বিশ্বনাথবাবুও সঙ্গে ছিলেন আমাদের সাথে।

রাস্তাপথঘাট সম্পূর্ণ চুপচাপ। একটা মানুষও নেই। ... দুচারটে খালি কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাদিরা মদ্দাদের ওসকাচ্ছিল, আর মদ্দারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মাদির সাথে যৌনতায় জরাতে মত্ত। ... খানিকটা আরো এগিয়ে গেলে, সেটাও নেই। ...

রথিনকাকা বললেন – বাবা একটা চায়ের দোকানও খোলা নেই এখানে! ... দাঁড়াও। একটু বাথরুম করে আসি। ...

বিশ্বনাথবাবু বললেন – আমারও পেয়েছে। ... চলুন ওদিকের ঝোপটায়।

রথিনকাকু – সাপখোপ নেই তো!

বিশ্বনাথ বাবু – বর্ষাকাল হলে থাকতো। এখন নেই।

আমার পেটটা খুব আইঢাই করছিলো। তাই ফাঁকারাস্তায় একটু দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করলাম। দৌড়ে খানিকটা গেলাম। আর যখন ফিরে আসছি , তখন যা দেখলাম , আমার হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ... দেখলাম একটা গরিলা বাবার গলা ধরে, বাবাকে প্রায় মাটি থেকে দেড়ফুট উপরে তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রথিনকাকা আর বিশ্বনাথবাবু বেরিয়ে আসতে এই দৃশ্য দেখেই তটস্থ হয়ে উঠলেন। রথিনকাকা নিজের পকেট তন্যতন্য করে খুঁজে বিরক্তির সাথে বলে উঠলেন – শালা, আজই বন্দুকটা নিয়ে বেরোলাম না! ...

এবার কি করি। ... এই বলে একটা ইট তুলে নিলেন হাতে। ... বিশ্বনাথবাবু বললেন – দাঁড়ান মশাই। ... এর ওষুধ আমার কাছে আছে।

বিশ্বনাথবাবু এবার গরিলার সামনে চলে গেলেন। আর নিজের দুই হাতের দশ আঙ্গুল দিয়ে কি করলেন কে জানে, গরিলা বাবাকে ছেড়ে দিলেন, বাবা মাটিতে পরে গেলেন, আর বেশ খানিকক্ষণ কাশলেন। ... অন্যদিকে গরিলা যেন মাতাল হয়ে গেছে। মাটিতে বসে পরেছে সে।

বাবা কাশি থামিয়ে বললেন – রথিন ওই ভল্লুকের খোল ছাড়িয়ে দাও। ...

রথিন কাকু আর আমি খোল ছাড়াতেই একটা কালো নিগ্রো বেরিয়ে এলো। দ্বিজেন বাবুর কালো দৈত্য।

বাবা এবার উঠে ওর সামনে যেতে , ওই দৈত্যটা এদিকসেদিক দেখে বলল – হয়ের এম আই! ... দিস ঈশ নট মাই প্ল্যাস।

নাইজেরিয়ার লোকেদের মত কথা বলার ধরন। বাবা বললেন – হু আর ইউ। হয়ের আর ইউ ফ্রম।

উত্তর এলো বিমর্ষতার সাথে – কঙ্গো ... মাইসেলফ তাইসন।

বাবা – হোয়াট ঈশ দা লাস্ট থিং ইউ রিমেম্বার?

উত্তর এলো – এ হোয়াইট ম্যান অফ ইন্দিয়া ... শট মি ... প্রব্যাব্লি ট্র্যাঙ্কুইলাইজার।

বাবা একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন – নট ট্র্যাঙ্কুইলাইজার , আ হিপ্নটিজিম পয়েসন। ... ইউ ওয়ের হিপনোটাইজড, এন্ড ইউ হেভ বিন ইউজড টু কিল টু পারসেন।

টাইসন বলল – হোয়াট! আই এম এ স্টুডেন্ট অফ কঙ্গো।

বাবা – ইয়েস ইউ ওয়ের, বাট ইউ হ্যাভ বিন ব্রট হেয়ার বাই সামওয়ান ফর হি ওয়ান্টেড টু ডু ক্রাইম উইথ ইওর হেল্প। ...

বাবা আবার রথিনকাকার দিকে তাকিয়ে বললেন – রথিন, একে রাতারাতি এখানে থেকে নাইজেরিয়া পাঠিয়ে দিতে হবে। সম্ভব হবে কি?

রথিনকাকা – ভোর সারে চারটের প্লেনে মিশর ফিরিয়ে দেওয়া যায়। ... তার আগে, এমারজেন্সি পাসপোর্ট ভিসা সব হয়ে যাবে। একবার আমি আর তুমি চিফমিনিস্টারের সাথে কথা বললেই সব হয়ে যাবে। ... কিন্তু এ যে দুটি খুনের আসামি!

বাবা – আসামি এ নয়। একে বশ করা হয়েছে , আর এর গায়ে ভল্লুকের লোম থেকে তৈরি পোশাক পরিয়ে দিয়ে, একে বশ করে, ওকে দিয়ে খুন করানো হয়েছে। আর যে খুন করিয়েছে , ভেবো না সে বাঁচবে। ... তাকে জেলে নিতে হবে না। ... তার দণ্ডের বিধান ভারতচন্দ্র রত্নালঙ্কার দিয়ে গেছেন। ... তাই নিশ্চিন্তে একে এর বশ্যতা থেকে মুক্ত করে বিদায় দেবার চিন্তা করো।

আমাকে আর বিশ্বনাথবাবুকে বাবা বললেন – মিলি, বিশ্বনাথবাবুকে নিয়ে তুই এই পোশাকগুলো জ্বালিয়ে দে আর সঙ্গে প্যাকেটে করে রেখে দে। কাল চুর্ণির জ্বলে বিসর্জন দিয়ে দিবি।

আমি আর বিশ্বনাথবাবু তাই করলাম। বাবা আর রথিনকাকু ওই টাইসনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। ফিরে এলেন উনারা তখন ভোর ৬টা। সরাসরি এখানে এসে চা খেলেন। সারারাত দুজনেই ঘুমাননি। জমিয়ে চা খেয়ে, একটু ছাদে উঠলাম আমরা চারজন, মানে বাবা, রথিনকাকু, আমি আর বিশ্বনাথবাবু।

বাবা বিশ্বনাথবাবুকে বললেন – আপনি না থাকলে, কালকে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল বিশ্বনাথবাবু। আপনি ম্যাজিকটা বেশ ভালোই করতেন হ্যাঁ!

বিশ্বনাথবাবু একটু লাজুক হয়ে বললেন – বড় জাদুকর হবার ইচ্ছা ছিল। বাড়ির লোকেদের ঘোর আপত্তি, তাই ছেড়ে দিতে হলো। কিন্তু একটা কথা বলুন, ওই গরিলা আপনাকে মরারা চেষ্টা করলেন কেন?

বাবা – যে ওকে ব্যবহার করে আপনার ঘর থেকে রক্তমুখি চুরি করালেন , তিনি কি এতদিনে বোঝেন নি যে ওটা পাথর নয় কাঁচ! ... আর আমাকে আপনার সঙ্গে থাকতে দেখে , নিশ্চিতই বুঝে নিয়েছেন উনি যে এই আসল পাথর আমার হেফাজতে আছে। ... তাই হয়তো আমাকে এটাক।

অনিতাদেবী নীচ থেকে হাঁকপারলেন – এই শুনছো?

বিশ্বনাথবাবু আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচে চলে গেলে , আমি প্রশ্ন করলাম – কে চালাচ্ছিল ওই দৈত্যকে?

বাবা – তিনজন অবশিষ্ট আছেন। ভাগ্নিজামাই , সোমেশ্বর, আর কবি প্রদ্যুত লাহিড়ী। ... এঁদের মধ্যে যেকোনো একজনের কাজ হবে এটা। ...

বিশ্বনাথবাবু উঠে এসে বললেন – বলছি, আপনারা কি পান্তা খাবেন? একটু গরম গরম আলুর চপ দিয়ে?

বাবা – ওরেব্বাস।... এতো লোভনীয় খাবার। ... তবে ঘুমিয়ে ... না অসুবিধা নেই। ... এই লোভ সামলানো যায়না। ... করে নিন। ... আপনি খাবেন তো?

বিশ্বনাথবাবু – হ্যাঁ, আমাকেও তো আপনাদের সাথে যেতে বললেন!

বাবা – আচ্ছা বিশ্বনাথবাবু, এই কবি মানে প্রদ্যুত লাহিড়ী কি কনোদিনও বিদেশে গেছেন , আপনি জানেন?

বিশ্বনাথ বাবু – বিদেশ! বলেন কি? উনার তো যেইচুলেই যান, রাত্রে উনার নিজের বাড়ি ফিরতেই হবে। ... কে জানে কি সম্পত্তি বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন!

বাবা হেসে বললেন – আচ্ছা ঠিক আছে। ... যান বৌদিকে বলে আসুন , উনি সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। ... তারপর আমরাও বেরবো।

বিশ্বনাথবাবু চলে গেলে, বাবা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন – দল ভাঙিয়ে না নিলে, কবি এই তালিকা থেকে বাদ, মানে গরিলা ওর হয়ে কাজ করতো না। ... কিন্তু ...

রথিনকাকা – ওই পোশাকের গন্ধ প্রদ্যুতের বাড়িতে ছিল। তাই তো?

বাবা – হুম ... বুঝে গেছি, অঙ্ক মিলে গেছে। ... রথিন, এবারে কিন্তু বোল্টটা নিতে ভুলো না।

রথিনকাকা – আরে এরকম হবে জানলে, কালকেই সঙ্গে রাখতাম।

বাবা – যেটাই হয় ভালোর জন্যই হয়। গুলি চললে , চারিদিকে শব্দ হত। তাহলে আর ওই বেকসুরকে বাঁচানো যেতনা। ... বেচারার চেহারাকে কাজে লাগিয়ে, বশ করে ওর জীবনটা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছিল।

আমি – অতিমানবের থেকে মুক্তি পাওয়া গেল, কি বলো?

বাবা মুচকি হেসে বললেন – হ্যাঁ, সেটাই চাইছিলাম। সেটাই এখানে কালকের দিনটা থাকার উদ্দেশ্যে ছিল। বাকি বোঝাপড়া মাটির নিচে হবে। ... তোমার বোল্টও কাজে আসবে , আর বিশ্বনাথবাবুর হিপনোটিজমও।

জগতের গর্ভে

একটু পান্তাভাত খেয়ে আমরা চারজন , অর্থাৎ আমি, বাবা, রথিনকাকু আর বিশ্বনাথবাবু বেরিয়ে পরলাম শিবনিবাসের উদ্দেশ্যে। বিশ্বনাথবাবু তখনও কিচ্ছু জানতেন না গুপ্তধনের ব্যাপারে। তিনি ভাবছিলেন, ওই পাথর যেটা তিনি পেয়েছেন , সেটা উদ্ধারের জন্যই সমস্ত কিছু হচ্ছে। সেটা উদ্ধারের জন্যই গরিলার অ্যাটাক, সেটার জন্যই চুরি, ছিনতাই। সমস্ত কিছু। ...

গাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে , বাবা যতটুকু বলার তা বলে দিলেন আর যা জানার জেনেও নিলেন বিশ্বনাথবাবুর থেকে। আমরা জানলাম , উনার যে পত্রিক বাড়ি ছিল , তা হলো জগত শেঠের ভাইপোর বাড়ি। সেই ভাইপোই উনার জানা উনাদের বংশের প্রথমপুরুষ। ... বাবাও সেই সূত্রে বললেন , আপনাদের প্রপিতার কাকা , জগতশেঠ, আপনাদের জন্য একটা সম্পত্তি রেখে গেছেন। ... সম্পত্তিটা আপনি পাবেন না, তবে সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে অর্থ দেবে আরকিওলজিকাল ডিপার্টমেন্ট। সম্পত্তিটা ভারত সরকারের হবে।

বিশ্বনাথবাবুর সেই কথা শুনে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন – কত দেবে সরকার?

বাবা – অনুমান হিসাবে বলতে হয়। যদি সামান্য সম্পত্তি হয়, তবে এই ধরে নিন এক কোটি টাকা। আর যদি বেশি হয় তবে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত, তার বেশি নয়, আশা করি।

বিশ্বনাথবাবু – আপনি কি উদ্ধার করবেন সম্পত্তি? ...

বাবা – সেইরকমই তো ইচ্ছা আছে। ... আপনার প্রপিতার কাকা কৃষ্ণচন্দ্র রাজার রাজকাজে টাকা ধার দিতেন। উনার সম্পত্তির অনেকটাই ব্রিটিশরা খেয়ে নেন , যখন মিরকাশিমের চাটুকারিতার জন্য ব্রিটিশ জগতশেঠকে হত্যার চিন্তা করেন। ... কিন্তু জগত শেঠ ছিলেন ব্যবসাদার। হাওয়া বুঝে তিনি বিভিন্ন স্থানে ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রেখেছিলেন। তেমনই একটা উনার ভাইপোকে দেন, যেটার উত্তরাধিকার আপনি।

গাড়ি থেকে আমরা নামলাম তারকনগরের বাজারে। সেখানে একশো মনের চাল কিনতে হবে। আমি আর রথিনকাকু প্রশ্ন করাতে বাবা কবিতার রেফারেন্স দিয়ে আমাদের কবিতার দিকে নজর দিতে বললেন , আর বললেন – কবিতার তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ লাইনটা পরে দেখো।

আমরাও পড়লাম – শত মন ভাইর রাখো নিবাসে যোনির দ্বাইরে। ... আমি বললাম – এর মানে কি?

বাবা – নিবাস মানে শিবনিবাস। শিবনিবাসে শিবলিঙ্গের যোনিভাগের দ্বারে , মানে ঝুল্যমান অংশে ১০০ মন ওজন চাপাতে হবে। ... মন্দির কর্তৃপক্ষ মানবে না এই কাজে। তাই ১০০ মন চাল কিনলাম। এই চাল চাপালে, গুপ্তধনের দরজা খুলবে, আর তা খোলা থাকবে। তাই শর্ত এই রাখা হয়েছে যে , আমরা যতক্ষণ না মন্দিরে ফিরে আসছি, ততক্ষণ সেই চাল ওখানেই থাকবে। বিমল সাহা তার তদারকি করবে। আর আমরা ফিরে এলে, ওই চাল মন্দিরকে দান করা হবে।

রথিনকাকা – শর্ত রাখা হয়েছে মানে? কথা বলা কি হয়ে গেছে?

বাবা – হ্যাঁ, ফোন নম্বর নিয়ে এসেছিলাম। ফোনে কথা বলা হয়েছে , আর বিমল ওখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।

রথিনকাকা – সুপারব্ ... আমরা পুলিশরা এতো ফাস্ট কেন কাজ করতে পারিনা! ...

আমি রথিনকাকাকে বললাম – আচ্ছা কাকু, বাবার অনুমান এমন সবসময়ে সত্যি হয়ে যায় কি করে বলো তো? বাবা অনুমান লাগালো যে অজিত উপরচালাকি করছে , তাই খুন হতে হবে , সেটাই হলো। বাবা অনুমান করলো বিশ্বনাথবাবু জগত শেঠের বংশের সাথে জড়িত , তাও মিলে গেলো! ... এই ভাবে আমাদের অনুমান মেলে না কেন?

রথিনকাকা হেসে বললেন – তুই আমি অনুমান করি, আর তোর বাবা অনুমান করে না , হিসাব করে। ... আমাদেরটা অনুমান তাই মেলে না , উনারটা হিসাব, তাই মিলে যায়। ... চল তোর বাবার দৌলতে , এই জীবনে গুপ্তধনও উদ্ধার করার অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। দেখি কি থাকে এই সমস্ত গুপ্তধনের ভাণ্ডারে।

আমরা এবার শিবনিবাসে আসতে, বিমলবাবু এগিয়ে এলেন। উনার লোকেরা আর শিবনিবাসের সেবকেরা ১০০ মন চাল নিয়ে গেলেন আমাদের থেকে , আর বিমলবাবু একজনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন , যিনি এসে খবর দিলে, তবেই এই ১০০ মন চাল চাপানো হবে শিবলিঙ্গে। তার নাম তুহিন খান। ...

আমরা গেলাম এবার চুর্ণির ধারে উত্তরের দিকে, যেখানে মাটি উঁচু হয়ে থেকে, দুটি পিপল গাছ ধারণ করে রেখেছে। ... বাবার নির্দেশে , পিপলগাছগুলি কাটা হলো। মেশিন দিয়ে কাটা , তাই বেশি সময় লাগলো না। ... তারপর মাটি কোপানো চললো দুপুর পর্যন্ত। দুপুর প্রায় ১টা ১০, তখন কোদালে ঠং করে আওয়াজ হতে, বাবা বললেন, দরজা এসে গেছে। মিনিট ২০ ধরে মাটি সরাতে , এবার বেরিয়ে পরলো একটা লোহার দরজা। ... জং ধরে গেছে দরজায়। তা হবেনা! ... ৩০০ বছর প্রায় জল খেয়েছে।

বাবা বললেন – তুহিন, যাও বিমলবাবুকে গিয়ে বলো ওজন চাপিয়ে দেবার কথা। আর তোমার টিম এসে গেছে?

তুহিন – না স্যার, আসছে রানাঘাট পৌঁছেছে। আপনারা নেমে পরুন। আমরা তো আর নামবো না। ... আমরা মই, দড়ি নিয়ে তৈরি থাকছি, আপনাদের আর গুপ্তধন তোলার জন্য।

বাবা – ঠিক আছে, ... যাও বিমলদাকে বলে এসো।

তুহিন চলে গেল। ... আর ওর যাবার প্রায় মিনিট ১৫ পরে , লোহার দরজা আপনাআপনি খুলতে শুরু করলো। ... টর্চ জ্বেলে বাবা গভীরতা দেখে নিয়ে বললেন – বেশি গভীর নয়। হাল্কা লাফ।

আমি, বাবা, রথিনকাকা আর বিশ্বনাথবাবু নেমে পরলাম। নামতেই বাবা বললেন। ব্যাগে লাইটার আছে। এদিকে ওদিকে একটা একটা করে মশাল থাকার কথা, দ্যাখ লেখা আছে চারটি পিপে, অনল দাও তাতে। ... দুটি এদিকে , দুটি ওইদিকে। এই বলে বাবা টর্চটা ধরতে , দেখলাম দুটি লোহার মশাল। লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরতেই আগুন জ্বলে উঠলো।

আমরা এগিয়ে গেলাম, বাবা টর্চ জ্বালিয়ে অন্য দেওয়ালেও তাক করলেন দেখলাম সেখানেও দুটি মশাল। এগিয়ে গিয়ে লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। এই আলোগুলো জ্বলতেই, দেখলাম মাটির নিচের ঘরে একটি বিশাল আকৃতির যন্ত্র। ... বাবা বললেন – শব্দজব্দ। ... রামরাবনের মাতার নামকে মেলাতে হবে। কি নাম মিলি?

আমি বললাম – মেলাতে হলে কৈকেয়ী আর কেকশি মেলাতে হবে , কৈকেয়ীর কে'র সাথে কেকশির কে মিলবে।

বাবা হেসে বললেন – চটপট ওর উপর উঠে পরে মিলিয়ে দেয়ে।

আমি বাবার আদেশ পালন করলাম। লোহার সমস্ত কিছু, টেনেটুনে শব্দছক মেলাতে একটু সময় লাগলো। কিন্তু যাই হলো, অমনি প্রচণ্ড জোর হাওয়ার মত আওয়াজ হতে থাকলো, কিন্তু হাওয়া নেই।

বাবা মুচকি হেসে বললেন – আচ্ছা, একেই ওইজন্য উত্তুরে হাওয়া বলেছে। ... চলো রথিন, মিলি বিশ্বনাথবাবুকে নিয়ে আয়। এখানে কাজ আছে।

আমরা এগিয়ে যেতে দেখলাম একটা কারাগারের মত জায়গা, তবে খুব ছোটো, মানে লকআপের মত এরিয়া হবে। ঢুকতে বাবা বললেন, কবিতা এবার কি করতে বলছে ? ... পশ্চিমেতে পাইবে ছেঁদা, নজর দিয়া দেখো। ... রয়েছে পশ্চিমে ছেঁদা?

আমি দেখে বললাম, এই তো ছেঁদা।

বাবা – বেশ, এবার বলছে, পুবালির ভরাট বুকে, কৃষ্ণ রতন পাবে। ... পশ্চিমের উল্টো পুব। ... এদিকে আয় মিলি। ...

আমি ভালো করে নিরীক্ষণ করে কনো কৃষ্ণমূর্তি দেখতে না পেলে, বললাম – কই এখানে তো কনো কৃষ্ণমূর্তি নেই!

বাবা – হুম,... মিলি! ... কি বলছে দ্যাখ, পশ্চিম ছেঁদে তারে বসাও, দখিন বাতাস বইবে। ... ছেঁদা দেখ, ওতে কি কৃষ্ণমূর্তি বসবে ? ... কৃষ্ণ রতন মানে কৃষ্ণমূর্তি নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের রত্ন, মানে কৃষ্ণচন্দ্রের মুদ্রা। সেটাই ছেঁদার সাইজে হবে। ... দ্যাখ দেওয়ালে কনো মুদ্রার ছাপ পাচ্ছিস!

আমি আর রথিনকাকু ভালো করে দেখেও খুঁজে পেলাম না। বিশ্বনাথবাবু বললেন – এইটা কি? কার যেন ছবি ছাপা রয়েছে। ... আমি একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাপ দিতেই, মুদ্রাটা খুলে এলো। ... সেটা নিয়ে বাবার কাছে একটা উত্তেজনায় ছুটে গেলাম। বাবা ছিদ্রটা দেখিয়ে বললেন – এতে বসা। ...

সেখানে বসাতেই, আবার একটা হাওয়ার আওয়াজ। আর তারই সাথে কারুর যেন মাটিতে নামার আওয়াজ। ... বাবা বললেন – তুহিন আসার আগেই, এসে গেছে দুষ্কৃতিরা। ... তাড়াতাড়ি চল মিলি। ...রথিন বিশ্বনাথকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উলটোদিকে চলো। কবিতা বলছে, উত্তর ছেড়ে দক্ষিণ পালাও। চারজনের বেশি সেখানে ঢোকা যাবেনা। ... তিনজন পুরুষ মানে মরদ, আর একজন বেটি মানে মেয়ে,

মানে আমরা চারজন ঢুকলেই দক্ষিণের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাস , আর দুষ্কৃতিরা কিচ্ছু করতে পারবে না। ... তাড়াতাড়ি পা চালাও।

দক্ষিণের দ্বার খোলা পেতেই আমরা চারজন ঢুকে পরলাম , আর অমনি ঘরঘর আওয়াজ করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাবা বললেন – দ্বারের পারে দুই পিপেতে পাবক যেন জ্বলে। ... মিলি , দরজার দুই পারে দুটো মশাল লাইটার দিয়ে জ্বালা। বিশ্বনাথবাবু টর্চ ফেললেন , আর আমি আগুন লাগালাম। পুরো ঘরটা আলোয় আলো হয়ে গেল। কিন্তু ঘর তো পুরো ফাঁকা! কিচ্ছু নেই!

আমি বলে উঠলাম – আমাদের আগে কেউ নিয়ে গেছে!

একটা ঘরঘর আওয়াজ হতে আমাদের মন সেদিকে গেল। বাবা হেসে বললেন – শত্তুর চিন্তা কেন করো, লোভী সে যে বড়। ... কিছুই নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের পয়সা দেখে লোভ সামলাতে না পেরে, ওটা খুলে নিয়েছে। আর উত্তরের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। আর কনো চিন্তা নেই।

আমি বললাম – কিন্তু এই ঘরে যে কিচ্ছু নেই বাবা!

বাবা হেসে বললেন – সামনে পাইবে একটি দ্বার, দেখো হরির মাদে। ... হরির মাদি কে?

আমি ভেবে বললাম – লক্ষ্মী আর ... ধরিত্রী।

বাবা – নিচের দিকে দ্যাখ।

আমরা সকলে সেই দিকে তাকাতে দেখলাম একটি চকচকে লোহার দ্বার। আর আবার তারুপর কিছু শব্দজব্দ দেওয়া আছে। বাবা বললেন – কৃষ্ণ সখা আর কৃষ্ণা ভাইপো ... শব্দজব্দের উত্তর। ... কর মিলি।

আমি অনেক ভেবে বললাম – কৃষ্ণ সখা মানে ? ... সাত্যকি? ... আর কৃষ্ণা? মানে দ্রৌপদি! ভাইপো মানে, ধৃষ্টদম্ন্যুর ছেলে? কি করে ম্যাচ হবে বাবা?

বাবা হেসে বললেন – সাত্যকির অন্য নাম যুযুধন আর কৃষ্ণার ভাইপো মানে যুদ্ধমন্যু , অর্জুনের রথের বামচাকার রক্ষক।

আমি আর বিশ্বনাথবাবু এবার সেই লোহার দ্বারে বসে শব্দজব্দ মেলাতেই , আমাকে আর বিশ্বনাথবাবুকে সমেত সেই লোহার দ্বার উপর দিকে উঠে এলো। বাবা হেসে বললেন – স্মরণ এলেই ছাইরা গর্ভ, উইঠা

পরবে জানকী। ... মানে শব্দজব্দ মিলে গেলেই , মাটিছেড়ে উঠে পরবে লক্ষ্মী , জানকীর গর্ভধারিণী মা হলেন পৃথিবী, আর জানকী মানেই লক্ষ্মী।

এবার এই স্থান থেকে টেনে আনতে হবে , তাহলেই দরজা খুলে যাবে। কি বলছে দেখো কবিতা। দখিন বাতাস ভেদ করে টাইনে আনবে ধনে , সেদিন হতে জগের ধন হবে তোমার নামে। ... ভ্যাকিউম হ্যান্ডেলগুলো বার করো রথিন। লাগাও চারটে সামনের দিকে। ... তোরা নেমে আয় মিলি। ...

আমরা নেমে এসে, এবার সেই চারটি হাতল দিয়ে সামান্য টান দিতেই মাটি ছেড়ে নেমে এলো আর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের দ্বারও খুলে গেল। বাইরে টেনে এনে যা দেখলাম , তাতে আমাদের চোখ জুরিয়ে গেল। সোনার থালা, সোনার বাটি, সোনার সাজবাতি, সোনার তামাকসাজি, সোনা, হিরা, জহরত দেওয়া কয়েক দশক হার, চূড়া, বালা, আরো কত কিছু, সবই সোনার, হিরার, চুনির আর পান্নার। ...

বাবা সব দেখে বললেন – সম্পত্তি বিক্রি করলে, বর্তমান বাজারে প্রায় ১লক্ষ কোটি টাকা বিশ্বনাথবাবু। ... কিন্তু সম্পত্তি তো সরকারের। আপনি এই ২০ কোটি তো পাবেনই। দেখছি কতটা বেশি করা যায়।

ভাগীদার

উত্তরের কারাগারে বন্দি ছিলেন সোমেশ্বর বাবা আর কবি প্রদ্যুত লাহিড়ী। প্রদ্যুত লাহির বললেন , ভুলো না সঙ্গীদেরও, তাদেরও ভাগ দেবে। জগের ধন বহু, তাদেরও দশের একখান দেবে। শেষ লাইন কবিতার ... পড়ুন সিন... পড়ুন।

বাবা হেসে বললেন – এখান থেকে বাইরে যাবেন তবে তো ভাগ পাবেন! ... এতো লোভ কেন প্রদ্যুত বাবু! ... যাকে গিয়ে সমস্ত খবর দিলেন , তাঁর কালো দৈত্যটি কোথায় ? ... সোমেশ্বর বাবা! কোথায় টাইসন!

সোমেশ্বর বাবার মাথা দিয়ে ঘাম ঝড়তে শুরু হয়ে গেছে। ... বাবা হেসে বললেন – প্রদ্যুতবাবু, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে কারাবাস। ... এবার সারাজীবন এই কারাগারেই মাটি চাপা পরে বসে বসে পচুন। ...

প্রদ্যুত বাবু কান্না জুরে বললেন – দোহাই আপনার। ... বিশ্বাস করুন। সোমেশ্বর বাবা এমন আমি জানতাম না। উনি আমাকে বুঝিয়ে এসেছিলেন যে এই সম্পত্তি জনহিতে কাজে লাগবে। ... আশ্রম

খুলবেন এই দিয়ে। ... অনেক বড় আশ্রম। ... তাই আমি এই কবিতা ধরে ধরে ... বিশ্বাস করুন আমাকে। ... আমি মিথ্যা বলছিনা! ... আমি ঠক নই। আমাকে ভাগ ও দিতে হবেনা!

বাবা গভীর ভাবে হেসে বললেন – আপনার সোমেশ্বর বাবা কে জানেন ? ... একটু দাড়িগোঁফটা টেনে দেখে নিন। কে উনি!

সোমেশ্বর বাবা আস্ফালন করতে থাকলে , বাবা বললেন – কই রথিন একটু হ্যান্ডস আপ করাও। ... বিশ্বনাথবাবু আপনার জাদু একটু দেখিয়ে দিন তো। ... ঘণ্টাখানেক চুপ থাকবে তো? তাহলেই হবে।

রথিনকাকা বন্দুকটা তুলে বললেন – হ্যান্ডস আপ। বিশ্বনাথবাবু হিপ্নোটাইজ করলেন। বাবা বললেন – এবার তো খুলে দেখুন প্রদ্যুতবাবু, আপনার সোমেশ্বর বাবা আসলে কে?

প্রদ্যুতবাবু দাড়িগোঁফ সরাতে, একা প্রদ্যুতবাবু নন, বিশ্বনাথবাবুও চমকে গেলেন। চমকে উঠে বললেন বিশ্বনাথবাবু – এতো সোম!

বাবা হেসে বললেন – সোমশুভ্র চক্রবর্তী, আপনার ভাগ্নিজামাই। জালিয়াতি করে দেশের সম্পত্তি বিদেশে পাচার করেন। কেদারনাথের সোনা পাচার করেছেন, আরো অনেক কুকীর্তি আছে, আর এই ধনও পাচার করার জন্য কবির লোভকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ... বুঝলে রথিন , কেন বিশ্বনাথবাবুর বাড়ির সন্ধান করেন নি সোমেশ্বর বাবা! কেন প্রদ্যুতবাবুর বাড়ি থেকে ওই ভল্লুকের লোমের গন্ধ বেরচ্ছিল! ... নিজের শ্বশুরবাড়ি চিনবে না সোমশুভ্রবাবু! ...

আর নকল গোঁফদাড়ি লাগিয়ে প্রদ্যুতবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গরিলাকে প্রদ্যুতবাবু জানেন না , কিন্তু কালো দৈত্যকে তো সোমেশ্বরের সমস্ত অনুগামীরাই চেনেন , তাই তাকেও থাকতে দেন , কিন্তু কবিবাবু তো আর জানতেন না যে সে গরিলা সেজে খুন করে বেড়ায়... তাই ভল্লুকের লোমের গন্ধ পেলেও উৎস উনিও খুঁজে পেতেন না। আর তাই রুমস্প্রে ব্যবহার করে রাখছিলেন, যেদিন আমরা গেছিলাম, মনে আছে রথিন!

প্রদ্যুতবাবু বললেন – হ্যাঁ, কাল থেকে আর ওই বিকট বোটকা গন্ধটা বেরচ্ছে না!

বাবা হেসে বললেন – বেরোবে কি করে? এখন সেই পোশাক জ্বলে পুরে চুর্ণি নদীতে বিসর্জনপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। ... এবার আর চিন্তা নেই। ... সেই কালো দৈত্যও নিজের দেশে চলে গেছেন। ... তো প্রদ্যুত বাবু, আপনি সোমবাবুর হাত থেকে পয়সাটা নিন, আর পূর্বের দেওয়ালে রাখুন।

প্রদ্যুতবাবু তেমন করতেই , দরজা খুলে গেল। উনি বেরিয়ে এলেন। আর এবার মই ফেলে , আমাদের পাঁচজনকে উপরে তুললো তুহিন আর তোলা হলো সমস্ত গুপ্তধন। ... এক মাসের মধ্যে টাকাও এসে গেল। ভালুয়েসন হয়েছে দেড় লক্ষ কোটি টাকা। ভেঙে ভেঙে ১০টা মিজিয়ামে সমস্ত সম্পত্তি যাবে। বিশ্বনাথবাবু আসল পাথর দেখিয়ে পেলেন , ৫০ কোটি টাকা। ... কবি প্রদ্যুত লাহিড়ীকে দিলেন ১ কোটি টাকা, আর আমাদের বাড়িতে সস্ত্রীক এসে , রথিনকাকুকে ডেকে আমাদের হাতে ৯ কোটি টাকা দিয়ে গেলেন।

বাবা বললেন – রথিন ফিফটি ফিফটি।

রথিনকাকু বললেন – তিনজন ছিলাম, ৩ কোটি করে। ... মিলির জন্য একটা ভালো জমি কিনে বাড়ি করে দাও বিজয়। ওর নামে ওই এসেটটা হয়ে থাক।